জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদন

(২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বিডিআর সদর দপ্তর, পিলখানায় সংঘটিত হত্যাকান্ড বিষয়ক)

প্রারম্ভিকা

সূত্রঃ

ক। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন তারিখঃ ০৯ পৌষ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৪ ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ, এসআরও নং ৪২৪-আইন/২০২৪।

খ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন তারিখঃ ১২ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/২৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ, এসআরও নং ৪৫-আইন/২০২৫।

গ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন তারিখঃ ২৩ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ০৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ, এসআরও নং ৫১-আইন/২০২৫।

ঘ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন তারিখঃ ০৪ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৮ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ, এসআরও নং ৮৯-আইন/২০২৫।

ঙ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন তারিখঃ ০৪ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/১৮ মার্চ ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ, এসআরও নং ৯০-আইন/২০২৫।

চ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন তারিখঃ ১৬ আষাঢ়, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/৩০ জুন ২০২৫ এসআরও নং ৩১১-আইন/২০২৫।

ছ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন তারিখঃ ১৪ আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ এসআরও নং ৩৮৯-আইন/২০২৫।

জ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন তারিখঃ ০৪ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ/২০ অক্টোবর ২০২৫ এসআরও নং ৪২৩-আইন/২০২৫।

তদন্ত কমিশন গঠনের প্রেক্ষাপট

১। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বিডিআর সদর দপ্তর, পিলখানায় সংঘটিত হত্যাকান্ড বিষয়ে সেনাবাহিনী এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন দুটি তদন্ত হয়েছে। উভয় তদন্ত প্রতিবেদনেই সংঘটিত হত্যাকাণ্ডকে ষড়যন্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের বিষয়ে বা তাদের সাথে দেশি-বিদেশি ও রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি তদন্তে প্রতিফলিত হয়নি। এ বিষয়ে আরও সময় নিয়ে অধিকতর তদন্তের জন্য প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হলেও তৎকালীন সরকার অধিকতর তদন্তের বিষয়ে কোন উদ্যোগ নেয়নি। ফলে জনমনে সন্দেহ থেকে যায় এবং হত্যাকাণ্ডে ভুক্তভোগী পরিবার এবং জনগণের পক্ষ থেকে অধিক ও পুনঃতদন্তের দাবি অব্যাহত থাকে।

২। জুলাই বিপ্লবের মাধ্যমে ০৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখে পট পরিবর্তনের পর ভুক্তভোগী, বিপ্লবী ছাত্র-জনতা এবং রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যগণ বিডিআর হত্যাযজ্ঞের পুনঃতদন্তের দাবিটি পূনর্ব্যক্ত করে। একই সাথে তৎকালীন বিডিআর সদর দপ্তরে সংঘটিত নারকীয় হত্যাকাণ্ড ও নৃশংসতার পুন:তদন্ত চেয়ে ২০ অক্টোবর ২০২৪ তারিখ আইনজীবী মো. তানভীর আহমেদ ও বিপ্লব কুমার পোদ্দার জনস্বার্থে হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দাখিল করেন (বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ, রিট পিটিশন নং-১২১৬১/২০২৪)।

জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদন

(২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বিডিআর সদর দপ্তর, পিলখানায় সংঘটিত হত্যাকান্ড বিষয়ক)

৩। বিপ্লবী ছাত্র-জনতা ও রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের দাবির প্রেক্ষিতে এবং সুপ্রিম কোর্টের আদেশে সরকার বিডিআর সদর দপ্তরে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের পুন:তদন্তের জন্য একটি জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন গঠন করে।

৪। প্রাথমিকভাবে গঠিত জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনে সভাপতি ও ছয় জন সদস্য ছিলেন। পরবর্তীতে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে একজন নতুন সদস্য অন্তর্ভূক্ত (কো-অপ্ট) করা হয়।

জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের গঠন

ক্রমিক	পদবি এবং নাম	নিয়োগ
১।	মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান, এনডিসি, পিএসসি (অব.)	সভাপতি
২।	মেজর জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার (অব.)	সদস্য
৩।	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাইদুর রহমান, বীর প্রতীক (অব.)	সদস্য
৪।	মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ, এনডিসি, সচিব (অব.)	সদস্য
৫।	ড. এম আকবর আলী, বিপিএম, পিপিএম, অতিরিক্ত আইজিপি (অব.)	সদস্য
৬।	অধ্যাপক মোঃ শরীফুল ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭।	মোঃ শাহনেওয়াজ খান চন্দন, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮।	মেজর এটিকেএম ইকবাল, পিএসসি (অব.)	সদস্য

কমিশনের কর্মপরিধি

৫। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন বিডিআর সদর দপ্তর, পিলখানায় সংঘটিত ঘটনার প্রকৃতি ও স্বরূপ উদঘাটন করা ।

৬। ঘটনাকালে সংঘটিত হত্যাকান্ড ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটনকারী, সহায়তাকারী, ষড়যন্ত্রকারী, ঘটনার আলামত ধ্বংসকারী, ইন্ধনদাতা এবং ঘটনা সংশ্লিষ্ট অপরাপর বিষয়সহ দেশী-বিদেশী সংশ্লিষ্ট অপরাধী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/ সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/বিভাগ সংগঠন ইত্যাদি চিহ্নিতকরণ ।

৭। উক্ত ঘটনায় হত্যাকান্ডের সময় ও হত্যাকান্ডের আগে/পরে সংঘটিত অপরাপর অপরাধের স্বরূপ উদঘাটন, দায়ী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/বিভাগ/সংগঠন চিহ্নিত করা এবং ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা বা ঘটনা ঘটাতে সহায়তাকারী অন্যান্য দেশী-বিদেশী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/বিভাগ/সংগঠনের সম্পৃক্ততা নিরূপণ এবং দোষীদের চিহ্নিতকরণ।

৮। হত্যাকান্ডসহ সংঘটিত অপরাপর অপরাধ প্রতিরোধে ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থা/ প্রতিষ্ঠান/বিভাগ/সংগঠন চিহ্নিতকরণ।

৯। হত্যাকান্ডসহ সংঘটিত অপরাপর অপরাধে ইতোমধ্যে দায়েরকৃত মামলা এবং সংশ্লিষ্ট মামলায় অভিযুক্তগণের দায়/অপরাধ অক্ষুণ্ন রেখে সংশ্লিষ্ট মামলায় অভিযুক্ত করা হয়নি এমন প্রকৃত অপরাধীদেরকে তদন্ত প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তকরণ।

কমিশনের কার্যক্রম শুরু

১০। **কমিশন কার্যালয়ের ঠিকানা এবং সাচিবিক দায়িত্ব।** কমিশনের সাচিবিক দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হয়। প্রাথমিকভাবে কমিশন বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানার অভ্যন্তরে ঢাকা ব্যাটালিয়ন (৫ বিজিবি) এর সভা কক্ষে কাজ শুরু করে। কমিশনের কার্যালয় নির্ধারণ এবং প্রস্তুত হওয়ার পর কমিশন বিআরআইসিএম, নতুন ভবন, ৭ম তলা, (সায়েন্স ল্যাবরেটরি), ড. কুদরত-ই-খুদা রোড, ধানমন্ডি, ঢাকার ঠিকানায় পূর্ণোদ্যমে কার্যক্রম শুরু করে।

কমিশনের প্রতিষ্ঠানিক লোগো

১১। **কমিশন নিজস্ব উদ্যোগে প্রাতিষ্ঠানিক লোগো তৈরি করেছে যার অর্থ নিম্নরূপ**

ক। **বাংলাদেশের পতাকাঃ** স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতীক।
খ। **গাঢ় রক্ত-লাল রংঃ** শহীদের রক্তের প্রতীক।
গ। **সাদা লেখাঃ** সত্যের প্রতীক।

১২। **কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ওয়েবসাইট।** প্রাতিষ্ঠানিক পরিচিতি, স্বচ্ছতা ও অনলাইন বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত এবং জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন ও তথ্য আদান-প্রদানের জন্য কমিশন নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী ইন্ট্যারেক্টিভ ওয়েবসাইট তৈরি ও সক্রিয় করে। ওয়েবসাইটঃ bdr-commission.org

১৩। **কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক ফোন এবং ইমেইল।** কমিশন প্রধান এবং সদস্যগণ প্রাতিষ্ঠানিক পরিচয়ে সকল ক্ষেত্রে নিরাপত্তা এবং গোপনীয়তা নিশ্চিত করে যোগাযোগের জন্য প্রিমিয়াম ইমেইল, নির্দিষ্ট ফোন নম্বর এবং ভিজিটিং কার্ড ব্যবহার করেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক ইমেইল এবং ফোন নম্বর নিচে দেয়া হলোঃ

মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান, এনডিসি, পিএসসি (অব.)	সভাপতি	+৮৮০১৫৫০৭২১০০১	chairman@bdr-commission.org
মেজর জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার (অব.)	সদস্য	+৮৮০১৫৫০৭২১০০২	member.jahangir@bdr-commission.org
ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ সাইদুর রহমান, বীর প্রতীক (অব.)	সদস্য	+৮৮০১৫৫০৭২১০০৩	member.sayeed@bdr-commission.org
মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ, এনডিসি, সচিব (অব.)	সদস্য	+৮৮০১৫৫০৭২১০০৪	member.alauddin@bdr-commission.org
ড. এম আকবর আলী, বিপিএম, পিপিএম, অতিরিক্ত আইজিপি (অব.)	সদস্য	+৮৮০১৫৫০৭২১০০৫	member.akbar@bdr-commission.org
অধ্যাপক মোঃ শরীফুল ইসলাম, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য	+৮৮০১৭৬৬৪৪৫৫৯৯	member.sharif@bdr-commission.org
মোঃ শাহনেওয়াজ খান চন্দন, সহকারী অধ্যাপক, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য	+৮৮০১৭৭০৬৬৬৬৬৭	member.shahnawaz@bdr-commission.org
মেজর এটিকেএম ইকবাল, পিএসসি (অব.)	সদস্য	+৮৮০১৭১৪০২৬৮০৮	member.iqbal@bdr-commission.org
কমিশন ইমেইল			comission@bdr-commission.org

১৪। **কমিশনের প্রশাসনিক জনবল এবং যানবাহন**। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান কমিশনকে জনবল, যানবাহন এবং অন্যান্য প্রশাসনিক ও লজিস্টিক্স সহায়তা প্রদান করেছে **(জনবলের বিবরণঃ সংযুক্তি -১)** । সারসংক্ষেপ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক্রমিক	প্রতিষ্ঠান	জনবল	যানবাহন	মন্তব্য
১	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	১	১	চালক ও জ্বালানিসহ একটি গাড়ি
২	বিজিবি	২৮	২	সার্বক্ষণিক এবং খন্ডকালীন জনবলসহ
৩	পুলিশ	২১	১	চালক ও জ্বালানি সহ একটি গাড়ি গানম্যান এবং সভাপতির এস্কর্ট সহ
৪	কোস্ট গার্ড	১	১	চালক ও জ্বালানি সহ একটি গাড়ি
৫	আনসার	৩	২	চালক ও জ্বালানি সহ একটি পিকআপ এবং একটি গাড়ি
৬	ফায়ার সার্ভিস	১	১	চালক ও জ্বালানি সহ একটি গাড়ি
৭	ইনটার্ন	৫	-	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী

১৫। **তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের মেয়াদ বৃদ্ধি।** কমিশনের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত নিম্নবর্ণিত কারণে প্রতিবেদন দাখিলের মেয়াদ তিন ধাপে ৩০ নভেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় । মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ নিম্নে দেয়া হলোঃ

ক। প্রশাসনিক সহায়তা প্রাপ্তিতে বিলম্ব।

খ। বিডিআর হত্যাকান্ডের পর জাতীয় পর্যায়ে গঠিত কমিটির পূর্ণ তদন্ত প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্তিতে বিলম্ব।

গ। কিছু বিদেশি কর্তৃপক্ষ যেমন দূতাবাস/হাইকমিশন/ইউএন রেসিডেন্ট এর সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘ দিন সময় নেয়া।

ঘ। পলাতক, বিদেশে অবস্থানরত এবং কারাগারে আটক ব্যক্তিবর্গের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগের জন্য সময়।

ঙ। ১৬ বছর আগে সংঘটিত বিডিআর হত্যাকান্ড সংশ্লিষ্ট অনেক সেকেন্ডারি এভিডেন্স এবং তথ্য উপাত্ত যোগাড় ও বিশ্লেষণ করা সময় সাপেক্ষ।

চ। বিভিন্ন সংস্থা থেকে প্রাপ্ত বিপুল পরিমান সিডি এবং দলিলাদি পর্যালোচনা করা।

১৬। **সংবাদ সম্মেলন।** মোট তিনটি সংবাদ সম্মেলন আয়োজন করা হয়।

১৭। **গণবিজ্ঞপ্তি।** জনসচেতনতা এবং তথ্য সংগ্রহ করার জন্য কমিশন কর্তৃক গণবিজ্ঞপ্তি, টিভি স্ক্রল ও মোবাইলে ক্ষুদে বার্তা প্রচার করা হয়েছে। বিস্তারিত সংযুক্তি-৪।

১৮। **সংগৃহীত সাক্ষ্য।** ঘটনা পূর্ব, ঘটনাকালীন এবং ঘটনা পরবর্তী সময়ের সম্ভাব্য সকল সূত্র থেকে কমিশন তথ্য-উপাত্ত এবং সাক্ষ্যপ্রমাণ- সংগ্রহের চেষ্টা করেছে। সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত এবং সাক্ষ্য প্রমাণের পরিসংখ্যানঃ

জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের তদন্ত প্রতিবেদন

(২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বিডিআর সদর দপ্তর, পিলখানায় সংঘটিত হত্যাকান্ড বিষয়ক)

ক্রমিক	তথ্যের সূত্র	মন্তব্য
১।	শহীদ পরিবারের সদস্যদের জবানবন্দী	১৪ জন
২।	রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ	১০ জন
৩।	অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা	২ জন
৪।	সামরিক কর্মকর্তা	১৩০ জন
৫।	অসামরিক কর্মকর্তা	৪ জন
৬।	পুলিশ কর্মকর্তা	২২ জন
৭।	বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ	৯ জন
৮।	সাবেক এবং বর্তমান বিডিআর/বিজিবি সদস্য	২২ জন
৯।	কারাগারে আটক	২৬ জন
১০।	জাতিসংঘ আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়ের কর্মকর্তা (পরামর্শ/মতবিনিময়)	১ জন
১১।	সাংবাদিক	৩ জন
১২।	মোট সাক্ষী	২৪৭ জন সাক্ষী সাক্ষীর তালিকা সংযুক্তি-১ক
১৩।	কমিশন গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সমূহ মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে প্রাপ্ত ১২১৬১/২০২৪ নম্বর রিট পিটিশনের আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ কমিশনের প্রশাসনিক জনবল এবং যানবাহন গণবিজ্ঞপ্তি, টিভি স্ক্রল এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তা সাক্ষীর তালিকা	সংযুক্তি-১
১৪।	বিজিবি সদর দপ্তরের সাথে পত্রালাপ	সংযুক্তি-২
১৫।	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্রালাপ	সংযুক্তি-৩
১৬।	পত্রালাপঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বিটিআরসি	সংযুক্তি-৪
১৭।	পত্রালাপঃ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, র‍্যাব সদর দপ্তর, ইমিগ্রেশন পুলিশ, কারা অধিদপ্তর ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংগৃহীত হোটেল ইমপেরিয়াল সম্পর্কিত তথ্য	সংযুক্তি-৫
১৮।	সামরিক বাহিনীর সাথে পত্রালাপ (সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী)	সংযুক্তি-৬
১৯।	পত্রালাপঃ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, এনএসআই, ডিজিএফআই, বিদ্যুৎ বিভাগ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, জাতিসংঘ	সংযুক্তি-৭
২০।	জাতীয় সংসদ অধিবেশনের কার্যবিবরণীর অনুলিপি (২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৩ মার্চ ২০০৯)	সংযুক্তি-৮
২১।	সাক্ষীর প্রত্যয়ন পত্র	সংযুক্তি-৯
২২।	বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যনির্বাহের রিপোর্ট নবম জাতীয় সংসদের প্রথম (২০০৯ সালের ১ম) অধিবেশনের পঞ্চবিংশতিতম বৈঠক ০৩ মার্চ ২০০৯	সংযুক্তি-১০
২৩।	সাক্ষীর ব্যক্তিগতভাবে জমাকৃত সাক্ষ্য	সংযুক্তি-১০ক

ক্রমিক	তথ্যের সূত্র	মন্তব্য
২৪।	সাক্ষীর ব্যক্তিগতভাবে জমাকৃত সাক্ষ্য	সংযুক্তি-১০খ
২৫।	সাক্ষীর ব্যক্তিগতভাবে জমাকৃত সাক্ষ্য	সংযুক্তি-১০গ
২৬।	ইমেইল যোগাযোগ	সংযুক্তি-১১ক
২৭।	ইমেইল যোগাযোগ	সংযুক্তি-১১খ
২৮।	ফৌজদারি আইনে অভিজ্ঞ পরামর্শকের প্রতিবেদন	সংযুক্তি-১২
২৯।	মোবাইল কল ডিটেইল রেকর্ড (সিডিআর) এবং সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ	সংযুক্তি-১৩
৩০।	Source Code-Information Management System Software	সংযুক্তি-১৪
৩১।	Information Management System Software - Operating Manual	সংযুক্তি-১৫
৩২।	পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠান	ডিজিএফআই, র‍্যাব বিজিবি সদর দপ্তর, পিলখানা বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ
৩৩।	সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত আদালতের প্রতিবেদন পর্যালোচনা	তদন্ত প্রতিবেদন এবং ৬টি ক্রোড়পত্র/এক্সিবিট সেনাবাহিনীকে ফেরত দেয়া হয়েছে
৩৪।	জাতীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা	তদন্ত প্রতিবেদন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফেরত দেয়া হয়েছে
৩৫।	তৎকালীন বিডিআর কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত আদালত সমূহের প্রতিবেদন পর্যালোচনা	৫২ টি তদন্ত প্রতিবেদন বিজিবিতে ফেরত দেয়া হয়েছে
৩৬।	ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য (ইমেইল/জবানবন্দী/ভিডিও ক্লিপ)	৩১৬ টি বিভিন্ন তথ্য (হার্ডডিস্ক সংযুক্ত) সংযুক্তি-১৬
৩৭।	রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসারদের সাথে আলোচনা	একবার
৩৮।	শহীদ পরিবারের সদস্যদের সাথে আলোচনা	দুইবার
৩৯।	বেঁচে ফিরে আসা অফিসারদের আলোচনা	একবার
৪০।	সাক্ষীর ভিডিও রেকর্ডিং, ছবি, নিউজ পেপার কাটিং, স্টেটমেন্ট, সকল চিটিপত্র, ওয়েব সাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদ এবং ভিডিও ক্লিপ- প্রতিটি দুই টেরাবাইট এর দুটি পোর্টেবল হার্ডডিস্ক	সংযুক্তি-১৭
৪১।	ডিজিএফআই এবং র‍্যাব হতে প্রাপ্ত দলিলাদি	ফেরত প্রদান করা হয়েছে

১৯। **মোট কার্য দিবসঃ** ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে প্রতিবেদন দাখিলের দিন পর্যন্ত কমিশন মোট ২২৭ কার্য দিবসে কার্য সম্পাদন করেছে।

উপসংহার

২০। প্রশাসনিক বিষয়ে কমিশন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রশংসনীয় সহযোগিতা পেয়েছে। কমিশন একই সাথে জনবল, যানবাহন এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বিজিবি, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, আনসার এন্ড ভিডিপি, ফায়ার সার্ভিস এবং রিটায়ার্ড আর্মড ফোর্সেস অফিসার্স অয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।

২১। যারা নিজ উদ্যোগে ওয়েবসাইট ও পত্রের মাধ্যমে এবং কমিশনে স্বশরীরে হাজির হয়ে তথ্য প্রদান করে তদন্ত কার্যক্রমে সহায়তা করেছেন তাদের সকলকে কমিশন ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।

২২। যেসব সাংবাদিক ও সংবাদ মাধ্যম কমিশন সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রচার করে জনসচেতনা তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন তাদেরকেও কমিশন ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে। আমাদের বিশ্বাস, সংবাদ মাধ্যম তদন্ত সংক্রান্ত বিষয়ে সত্য প্রকাশে এবং ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় সবসময় জনগণের সাথে থাকবে।

২৩। **সংযুক্তি**

ক। সংযুক্তি-১ক: সাক্ষীর তালিকা

খ। সংযুক্তি-১: কমিশন গঠন সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন সমূহ, মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে প্রাপ্ত ১২১৬১/২০২৪ নম্বর রিট পিটিশনের আদেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ, কমিশনের প্রশাসনিক জনবল এবং যানবাহন গণবিজ্ঞপ্তি, টিভি স্ক্রল এবং মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ক্ষুদে বার্তা, সাক্ষীর তালিকা।

গ। সংযুক্তি-২: বিজিবি সদর দপ্তরের সাথে পত্রালাপ।

ঘ। সংযুক্তি-৩: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে পত্রালাপ।

ঙ। সংযুক্তি-৪: পত্রালাপঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় বিটিআরসি

চ। সংযুক্তি-৫: পত্রালাপঃ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, র‍্যাব সদর দপ্তর, ইমিগ্রেশন পুলিশ, কারা অধিদপ্তর ও পুলিশ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সংগৃহীত হোটেল ইমপেরিয়াল সম্পর্কিত তথ্য।

ছ। সংযুক্তি-৬: সামরিক বাহিনীর সাথে পত্রালাপ (সেনা, নৌ এবং বিমান বাহিনী)।

জ। সংযুক্তি-৭: পত্রালাপঃ রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, তথ্য অধিদপ্তর, এনএসআই, ডিজিএফআই, বিদ্যুৎ বিভাগ, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি, বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, জাতিসংঘ।

ঝ। সংযুক্তি-৮: জাতীয় সংসদ অধিবেশনের কার্যবিবরণীর অনুলিপি (২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৩ মার্চ ২০০৯)।

ঞ। সংযুক্তি-৯: সাক্ষীর প্রত্যয়ন পত্র।

ট। সংযুক্তি-১০: বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যনিবাহের রিপোর্ট নবম জাতীয় সংসদের প্রথম (২০০৯ সালের ১ম) অধিবেশনের পঞ্চবিংশতিতম বৈঠক ০৩ মার্চ ২০০৯।

ঠ। সংযুক্তি-১০ক: সাক্ষীর ব্যক্তিগতভাবে জমাকৃত দলিলাদি।

ড। সংযুক্তি-১০খ: সাক্ষীর ব্যক্তিগতভাবে জমাকৃত দলিলাদি।

ঢ। সংযুক্তি-১১ক: ইমেইল যোগাযোগ।

ণ। সংযুক্তি-১১খ: ইমেইল যোগাযোগ।

ত। সংযুক্তি-১২: ফৌজদারি আইনে অভিজ্ঞ পরামর্শকের প্রতিবেদন।

থ। সংযুক্তি-১৩: মোবাইল কল ডিটেইল রেকর্ড (সিডিআর) এবং সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ।

দ। সংযুক্তি-১৪: Source Code-Information Management System Software ।

ধ। সংযুক্তি-১৫: Information Management System Software -Operating Manual ।

ন। সংযুক্তি-১৬: ওয়েবসাইটের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য (ইমেইল/জবানবন্দী/ভিডিও ক্লিপ) ৩১৬ টি বিভিন্ন তথ্য (হার্ডডিস্ক সংযুক্ত)।

প। সংযুক্তি-১৭: সাক্ষীর ভিডিও রেকর্ডিং, ছবি, নিউজ পেপার কাটিং, স্টেটমেন্ট, সকল চিটিপত্র, ওয়েব সাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংবাদ এবং ভিডিও ক্লিপ- প্রতিটি দুই টেরাবাইট এর দুটি পোর্টেবল হার্ডডিস্ক।

সুচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা নম্বর
১।	প্রারম্ভিকা	i-xx
২।	উপক্রমনিকা	১-১০
৩।	উদঘাটিত তথ্যাবলি	১১-১২৩
৪।	ঘটনার বিশ্লেষণ ও কমিশনের মতামত	১২৪-১৭৭
৫।	কমিশনের সুপারিশ	১৭৮-১৮৯
৬।	সাক্ষ্য- প্রথম খন্ড	শহীদ পরিবার সাক্ষী-১-১৪ রাজনৈতিক সাক্ষী-১-১১ বেসামরিক সাক্ষী-১-০৫ পুলিশ সাক্ষী-১-২২ বেসরকারি ব্যক্তিবর্গ-১-০৯
৭।	সাক্ষ্য- দ্বিতীয় খন্ড	সেনা সাক্ষী-১-৫৩
৮।	সাক্ষ্য- তৃতীয় খন্ড	সেনা সাক্ষী-৫৪-১৩৫ নৌবাহিনী সাক্ষী-১-০২ বিমান বাহিনী সাক্ষী-১-০২ এনএসআই সাক্ষী-০১ কয়েদি সাক্ষী-১-২৭ সাংবাদিক সাক্ষী-১-০৩ বিডিআর সাক্ষী-১-২২
৯।	সংযোজনী- প্রথম খন্ড	সংযোজনী ১ হতে ৩২
১০।	সংযোজনী- দ্বিতীয় খন্ড	সংযোজনী ৩৩ হতে ৫৮

২৪। প্রতিবেদনে বহুল ব্যবহৃত সংক্ষেপিত ইংরেজি শব্দসমূহের তালিকা ও তাদের পূর্ণরূপঃ

AD-এডি- অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর
AD BRIGADE-এডি ব্রিগেড- এয়ার ডিফেন্স ব্রিগেড
ADC-এডিসি- এইড ডি ক্যাম্প
ADG-এডিজি- এডিশনাল ডাইরেক্টর জেনারেল
AD REGIMENT-এডি রেজিমেন্ট- এয়ার ডিফেন্স রেজিমেন্ট
AG-এজি- অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল
AHQ-এএইচকিউ- আর্মি হেডকোয়ার্টার্স
AIC-এআইসি- আর্মি ইন্টারোগেশন সেল
APC-এপিসি- আরমার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার
APS-এপিএস- অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রাইভেট সেক্রেটারি
ARTY-আর্টিঃ- আর্টিলারি
BDR-বিডিআর- বাংলাদেশ রাইফেলস
BGB-বিজিবি- বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড
BGTC&C-বিজিটিসিঅ্যান্ডসি- বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার অ্যান্ড কলেজ
BOP-বিওপি- বর্ডার আউটপোস্ট
BSF-বিএসএফ-বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স
CGS-সিজিএস- চিফ অভ জেনারেল স্টাফ
CIB (DGFI)-সিআইবি (ডিজিএফআই)- কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো
CID-সিআইডি-ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট
CMTD-সিএমটিডি- সেন্ট্রাল মেকানিকাল ট্রান্সপোর্ট ডিপো
CMH-সিএমএইচ- কম্বাইন্ড মিলিটারি হসপিটাল
CTIB (DGFI)-সিটিআইবি (ডিজিএফআই)- কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো
CO-সিও- কমান্ডিং অফিসার
CORD-কর্ড- কোঅর্ডিনেটিং অফিসার
DA-ডিএ- ডেইলি অ্যালাউন্স
DAAG-ডিএএজি-ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাডজুটেন্ট জেনারেল
DAD-ডিএডি- ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর
DC-ডিসি-ডেপুটি কমিশনার
DDG-ডিডিজি- ডেপুটি ডাইরেক্টর জেনারেল
DG-ডিজি- ডাইরেক্টর জেনারেল
DGFI-ডিজিএফআই- ডাইরেক্টরেট জেনারেল অভ ফোর্সেস ইন্টেলিজেন্স
DMI-ডিএমআই- ডাইরেক্টর মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স
DMP-ডিএমপি- ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ
DMO-ডিএমও- ডাইরেক্টর মিলিটারি অপারেশন্স
DOT-ডিওটি- ডাইরেক্টর অভ অপারেশনস অ্যান্ড ট্রেনিং
E.Bengal-ই.বেঙ্গল- ইস্ট বেঙ্গল
FGCM-এফজিসিএম- ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল
FS-এফএস- ফিল্ড স্টাফ
FSIB (DGFI)- এফএসআইবি (ডিজিএফআই)- ফোর্সেস সিগনাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো
FRAGO- ফ্র্যাগ ও- ফ্র্যাগমেন্টেশন অর্ডার
GSO-জিএসও- জেনারেল স্টাফ অফিসার
GSO-2 (I) জিএসও-২ (আই)- জেনারেল স্টাফ অফিসার-২ (ইন্টেলিজেন্স)
GSO-2 (Coord)-জিএসও-২ (কর্ড)- জেনারেল স্টাফ অফিসার-২ (কোঅর্ডিনেশন)

ICP-আইসিপি-ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট
INT-ইন্ট- ইন্টেলিজেন্স
IGP-আইজিপি- ইন্সপেক্টর জেনারেল অভ পুলিশ
ISPR-আইএসপিআর- ইন্টার সার্ভিস পাবলিক রিলেশন্স
JCO-জেসিও- জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার
JIC-জেআইসি- জয়েন্ট ইন্টারোগেশন সেল
LMG-এলএমজি-লাইট মেশিন গান
LRP-এল আর পি- লং রেঞ্জ পেট্রোল
MIST-এমআইএসটি-মিলিটারি ইনস্টিটিউট অভ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি
MO-এমও পরিদপ্তর- মিলিটারি অপারেশন্স পরিদপ্তর
NCE-এনসিই- নন কম্ব্যাটান্ট এনরোল্ড-
NCO-এনসিও – নন-কমিশন্ড অফিসার
NSA-এনএসএ- নায়েব সুবেদার অ্যাডজুটেন্ট
NSI-এনএসআই- ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স
NTMC-এনটিএমসি- ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার
NSG-এনএসজি- ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড (ভারত)
OC-ওসি- অফিসার ইন চার্জ
OT-ওটি- অপারেশন থিয়েটার
PSO, AFD-পিএসও, এএফডি- প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন
QMG-কিউএমজি- কোয়ার্টারমাস্টার জেনারেল
RAB-র‌্যাব- র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন
RP-আরপি- রাইফেলস পুলিশ
RSU-আরএসইউ- রাইফেলস সিকিউরিটি ইউনিট
RO-২-আরও-২- রেকর্ড অফিসার-২
RT-আরটি- রিলিজিয়াস টিচার
SB-এসবি- স্পেশাল ব্রাঞ্চ
SSF-এসএসএফ- স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স
SI&T-এসআইঅ্যান্ডটি- স্কুল অভ ইনফ্যান্ট্রি অ্যান্ড ট্যাকটিক্স
SM-এসএম- সুবেদার মেজর
SMG-এসএমজি- সাবমেশিন গান
TFI CELL-টিএফআই সেল- টাস্ক ফোর্স ইন্টারোগেশন সেল
ZFSO-জেডএফএসও- জোনাল ফিল্ড সিকিউরিটি অফিসার
2IC-টুআইসি- সেকেন্ড ইন কমান্ড
রাইপকস- রাইফেলস পরিবার কল্যাণ সমিতি

সাক্ষীর তালিকা

২৫। সাক্ষ্য-প্রথম খন্ড-শহিদ পরিবার সাক্ষী নং- ০১ থেকে ১৪

ক্রমিক	নাম	সাক্ষী নং
১।	ডাঃ রোয়েনা মতীন, স্বামীঃ শহিদ বিএ-১৮৯১, লেঃ কর্ণেল এনশাদ আমিন	০১

ক্রমিক	নাম	সাক্ষী নং
২।	নাদেজদা জেরিন চৌধুরী, স্বামীঃ শহিদ বিএ-৩১৯০ মেজর কাজী আশরাফ হোসেন	০২
৩।	শিরিন আক্তার, স্বামীঃ শহিদ বিএ-৩৬৮৯ মেজর মোঃ খালিদ হোসেন	০৩
৪।	ডা. সাইদা সুলতানা, স্বামীঃ শহিদ বিএ-১০০৩১০ ব্রিগেডিয়ার মোঃ জাকির হোসেন	০৪
৫।	রিতা রহমান জুলি, স্বামীঃ শহিদ বিএ-৩৭১৬, মেজর মাহবুবুর রহমান	০৫
৬।	মুনমুন আক্তার, স্বামীঃ শহিদ বিএ-১৯৬৯ লেঃ কর্ণেল শামসুল আজম	০৬
৭।	মোছাঃ মাহবুবা বেগম, স্বামীঃ শহিদ বিএ-২৬০৫ মেজর মোঃ আব্দুস সালাম খাঁন	০৭
৮।	আনোয়ারা বেগম স্বামীঃ শহিদ বিএ-৩৭৫২ মেজর মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	০৮
৯।	নুজহাত আহসান, স্বামীঃ শহিদ বিএ-২৬০১ কর্ণেল মোঃ শওকত ইমাম	০৯
১০।	সানজানা সোনিয়া জোবাইদা, স্বামীঃ শহিদ বিএ-৫৩৪৪ মেজর মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম	১০
১১।	ডা. ফাবলিহা বুশরা প্রমি, বাবাঃ লেফটেন্যান্ট কর্নেল লুৎফুর রহমান খান	১১
১২।	তাসনুভা মাহা, স্বামীঃ শহিদ বিএ-৫৯৮৭ মেজর তানভীর হায়দার নূর	১২
১৩।	রাকিন আহম্মেদ, বাবাঃ মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ	১৩
১৪।	নেহরীন ফেরদৌসী, স্বামীঃ শহিদ বিএ- ১৪৮০ কর্ণেল মুজীবুল হক	১৪

২৬। সাক্ষ্য-প্রথম খন্ড-রাজনৈতিক সাক্ষী নং- ০১ থেকে ১১

ক্রমিক	নাম	সাক্ষী নং
১।	এইচ. এম. গোলাম রেজা (সাবেক এমপি)	০১
২।	জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক	০২
৩।	জনাব মির্জা আজম	০৩
৪।	অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম	০৪
৫।	ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ	০৫
৬।	তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ (সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রি)	০৬
৭।	বিএ-৭৬৩ লেফট্যানেন্ট কর্ণেল মোহাম্মদ ফারুক খান	০৭
৮।	জনাবা মাহবুব আরা বেগম গিনি	০৮
৯।	মোসাঃ সুরাইয়া বেগম	০৯
১০।	সাবেক এমপি আসাদুজ্জামান নূর	১০
১১।	মোহাম্মদ তৌহিদ হোসেন (পরাষ্ট্র উপদেষ্টা)	১১

২৭। সাক্ষ্য-প্রথম খন্ড-বেসরকারি সাক্ষী নং- ০১ থেকে ০৯

ক্রমিক	নাম	সাক্ষী নং
১।	আফজাল ইবনে নাজিম	০১

ক্রমিক	নাম	সাক্ষী নং
২।	মোঃ ইব্রাহীম মিয়া (সুজন)	০২
৩।	মোঃ ফারুকুজ্জামান শাহ	০৩
৪।	এ এস এম রাজ্জাক (সুমন)	০৪
৫।	সৈয়দ আবু শাহীন	০৫
৬।	মোঃ মাজেদুল ইসলাম, আইটি সার্ভিসেস	০৬
৭।	নাজিফা চৌধুরী	০৭
৮।	মোঃ কামাল হোসেন	০৮
৯।	রাহাত মজুমদার	০৯

২৮। <u>সাক্ষ্য-প্রথম খন্ড-পুলিশ সাক্ষী নং- ০১ থেকে ২২</u>

ক্রমিক	নাম	সাক্ষী নং
১।	আইজিপি নূর মোহাম্মদ (অব.)	০১
২।	আইজিপি বাহারুল আলম, বিপিএম	০২
৩।	পুলিশ কমিশনার নাইম আহমেদ, ডিএমপি (অব.)	০৩
৪।	নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, এনডিসি (অব.)	০৪
৫।	উপ-মহা পরিদর্শক আব্দুল কাহার আকন্দ (অব.)	০৫
৬।	বিপি-৬০৮৬০৫২২৪৪, অতিঃ পুলিশ সুপার মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ (অব.)	০৬
৭।	বিপি-৬৭৮৯০৬৫০২০, অতিঃ পুলিশ সুপার মোঃ শাহানুর বারী	০৭
৮।	বিপি-৬২৮৭০২৯১৫৭, অতিঃ পুলিশ সুপার জনাব মোঃ সামসুল হক (অব.)	০৮
৯।	বিপি-৫৯৮১০৬৯৮১৯, অতিঃ পুলিশ সুপার মোঃ অহিদুজ্জামান (অব.)	০৯
১০।	বিপি-৫৬৮১১১৪১৪০, সিনিয়র সহঃ পুলিশ সুপার লুৎফুর রহমান (অব.)	১০
১১।	বিপি-৬৪৮৯১০৬৮৫৮, সহঃ পুলিশ সুপার অহিদুর রহমান (অব.)	১১
১২।	বিপি-৫৬৭৪০১০১৯৯, সহঃ পুলিশ সুপার বীর মুক্তিযোদ্ধা ইন্তেজার রহমান	১২
১৩।	বিপি-৬৮৯৪০৬৮৩৪৯, সহকারী পুলিশ সুপার মোঃ আনিছুর রহমান	১৩
১৪।	বিপি-৬৩৮৭০৫৮২৯৯, সাবেক অতিঃ পুলিশ সুপার নবজ্যোতি খীসা (অব.)	১৪
১৫।	বিপি-৬৬৯১০৩১৭১৬, অতিঃ আইজিপি মোঃ আতিকুল ইসলাম (অব.)	১৫
১৬।	অতিঃ পুলিশ সুপার মল্লিক মোঃ রুহুল ইসলাম	১৬
১৭।	অতিঃ পুলিশ সুপার রওনকুল হক চৌধুরি	১৭
১৮।	সিনিয়র সিস্টেম-এনালিস্ট মোহাম্মদ নুরূস সামাদ	১৮
১৯।	অতিঃ পুলিশ সুপার আওরঙ্গজেব খান	১৯
২০।	সিনিয়র সিস্টেম-এনালিস্ট মুহাম্মদ সফিউল আলম	২০

ক্রমিক	নাম	সাক্ষী নং
২১।	বিপি-৭০৯৫০৩১১৩৩, উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক মোঃ আহসান হাবিব পলাশ	২১
২২।	বিপি-৬৬৯৫০১০০৩৪, উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক মোঃ আব্দুল মালেক (অব.)	২২

২৯। <u>সাক্ষ্য-প্রথম খন্ড-বেসামরিক কর্মকর্তা সাক্ষী নং- ০১ থেকে ০৫</u>

ক্রমিক	নাম	সাক্ষী নং
১।	মোঃ গোলাম হোসেন (সিনিয়র সচিব)	০১
২।	মোঃ আব্দুল করিম (সাবেক মুখ্য সচিব)	০২
৩।	মোহাম্মদ মঈন উদ্দিন আবদুল্লাহ (সিনিয়র সচিব)	০৩
৪।	এ কে এম আরিফুর রহমান (সাবেক জেলা জাজ)	০৪
৫।	কাজী হাবিবুল আউয়াল (সাবেক আইন সচিব)	০৫

৩০। <u>সাক্ষ্য- দ্বিতীয় খন্ড-সামরিক কর্মকর্তা সাক্ষী নং- ০১ থেকে ৫৩</u>

ক্রমিক	নম্বর	পদবী	নাম	সাক্ষী নং
১।	বিএ-১১৩৭	জেনারেল	মঈন ইউ আহমেদ	০১
২।	বিএ-১৪৪৩	জেনারেল	মোহাম্মদ আব্দুল মুবীন	০২
৩।	বিএ-২৪২৪	জেনারেল	আজিজ আহমেদ	০৩
৪।	বিএ-১৪৪০	লেফট্যানেন্ট জেনারেল	মোল্লা ফজলে আকবর	০৪
৫।	বিএ-১৫৫৫	লেফট্যানেন্ট জেনারেল	সিনা ইবনে জামালী	০৫
৬।	বিএ-১৫৭৩	লেফট্যানেন্ট জেনারেল	মোঃ মুইনুল ইসলাম	০৬
৭।	বিএ-২০০৪	লেফট্যানেন্ট জেনারেল	চৌধুরী হাসান সরওয়ার্দী	০৭
৮।	বিএ-২২১৩	লেফট্যানেন্ট জেনারেল	শেখ মামুন খালেদ	০৮
৯।	বিএ-৪০০৫	লেফট্যানেন্ট জেনারেল	মোঃ মাইনুর রহমান	০৯
১০।	বিএ-১৫০৯	মেজর জেনারেল	মোঃ রফিকুল ইসলাম	১০
১১।	বিএ-১৬২৯	মেজর জেনারেল	মোঃ মাহবুব হায়দার খান	১১
১২।	বিএ-১৬৫১	মেজর জেনারেল	মোহাম্মদ মতিউর রহমান	১২
১৩।	বিএ-১৬৬৫	মেজর জেনারেল	মোঃ ফেরদৌস মিয়া	১৩
১৪।	বিএ-১৮০১	মেজর জেনারেল	শেখ মনিরুল ইসলাম (অবঃ)	১৪
১৫।	বিএ-১৯০৩	মেজর জেনারেল	আব্দুল মতিন	১৫
১৬।	বিএ-১৯১০	মেজর জেনারেল	মোহাম্মদ আসহাব উদ্দিন	১৬
১৭।	বিএ-১৯৫৬	মেজর জেনারেল	মুহাম্মদ ইমরুল কায়েস	১৭
১৮।	বিএ-২১৮২	মেজর জেনারেল	রেজানুর রহমান খান	১৮

ক্রমিক	নম্বর	পদবী	নাম	সাক্ষী নং
১৯।	বিএ-২৪০৬	মেজর জেনারেল	মোহাম্মদ কামরুজ্জামান	১৯
২০।	বিএ-৩১৩৬	মেজর জেনারেল	সুলতানুজ্জামান মোঃ সালেহ উদ্দীন	২০
২১।	বিএ-৪০৬০	মেজর জেনারেল	জিয়াউল আহসান	২১
২২।	বিএ-১৫৫৮	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	হাসান নাসির	২২
২৩।	বিএ-১৫৯১	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	আবু নাঈম মোঃ শাহিদ উল্লাহ	২৩
২৪।	বিএ-১৮৯০	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মাহমুদ হোসেন	২৪
২৫।	বিএ-২০৬৪	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ আব্দুল হাকিম আজিজ	২৫
২৬।	বিএ-১৪৬৬	জেনারেল	ইকবাল করিম ভূইয়া (অবঃ)	২৬
২৭।	বিএ-২০৭৭	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	তাসাদ্দেক হোসেন	২৭
২৮।	বিএ-২০৬৮	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ খোরশেদ আলম	২৮
২৯।	বিএ-২১৫১	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	চৌধুরী ফজলুল বারী	২৯
৩০।	বিএ-২২০৮	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	সামছুল আলম	৩০
৩১।	বিএ-২২৪১	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	এ টি এম জিয়াউল হাসান	৩১
৩২।	বিএ-২২৪২	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম	৩২
৩৩।	বিএ-২২৯৪	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	খোন্দকার ওবায়দুল আহসান	৩৩
৩৪।	বিএ-২৩৩৯	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	অহিদুল ইসলাম তালুকদার	৩৪
৩৫।	বিএ-২৬৭৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মেজবা উল আলম চৌধুরী	৩৫
৩৬।	বিএ-৩০১২	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ শামছুল আলম চৌধুরী	৩৬
৩৭।	বিএ-৩০৭২	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	এ কে এম ইকবাল	৩৭
৩৮।	বিএ-৩২৬৪	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোহাম্মদ আব্দুল মজিদ (অব.)	৩৮
৩৯।	বিএ-৩৪৬৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ খালেকুজ্জামান	৩৯
৪০।	বিএ-৩৪৯৬	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোহাম্মদ আব্দুল আলিম তরফদার	৪০
৪১।	বিএ-৪৬৪৬	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ জাহিদ হোসেন	৪১
৪২।	বিএ-১০০৬৪৫	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	ইয়াসমিন আক্তার	৪২
৪৩।	বিএ-১০০৬৮৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ ইকবাল হাসান	৪৩
৪৪।	বিএ-১৪৬৪	কর্ণেল	মাহমুদুর রহমান চৌধুরী	৪৪
৪৫।	বিএ-১৮৩৭	কর্ণেল	সাইদুল কবির	৪৫
৪৬।	বিএ-২৪৭০	কর্ণেল	আলমাস রাইসুল গণী	৪৬
৪৭।	বিএ-২৬৮৯	কর্ণেল	মোঃ নেয়ামুল ইসলাম ফাতেমী	৪৭
৪৮।	বিএ-৩১৬৯	কর্ণেল	মোঃ জাকির হোসেন ভূঞা	৪৮
৪৯।	বিএ-৩৭৮১	কর্ণেল	মোঃ শাহজাহান সিরাজ	৪৯

ক্রমিক	নম্বর	পদবী	নাম	সাক্ষী নং
৫০।	বিএ-৩৬৫৬	কর্ণেল	মোঃ শাহরিয়ার রশীদ	৫০
৫১।	বিএ-৪৬৬৪	কর্ণেল	মোহাম্মদ ইমরান ইবনে আব্দুর রউফ	৫১
৫২।	বিএ-২২০৯	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	জুলফিকার আলী হায়দার	৫৩

৩০। **সাক্ষ্য তৃতীয় খন্ড-সামরিক কর্মকর্তা সাক্ষী নং- ৫৪ থেকে ১৩৫**

ক্রমিক	নম্বর	পদবী	নাম	সাক্ষী নং
৫৩।	বিএ-২২৫৫	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	মোঃ আবু তাসনিম	৫৪
৫৪।	বিএ-২৩৫২	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	সৈয়দ কামরুজ্জামান	৫৫
৫৫।	বিএ-২৫৩৬	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	মোঃ আতিকুজ্জামান	৫৬
৫৬।	বিএ-২৮১১	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	আব্দুস সালাম মোহাম্মদ আরিফ	৫৭
৫৭।	বিএ-২৯৪১	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	সৈয়দ সাইয়েদিম সাকালায়েন	৫৮
৫৮।	বিএ-৩০৯২	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	মোঃ আসিফ আব্দুর রউফ	৫৯
৫৯।	বিএ-৩১৮৯	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	সামসুজ্জামান খান	৬০
৬০।	বিএ-৩২৯১	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	মোঃ আকরামউজ্জামান	৬১
৬১।	বিএ-৩৪৩০	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	মোঃ ইরশাদ সাঈদ	৬২
৬২।	বিএ-৩৫৬২	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	মোঃ নাসিমুল আলম	৬৩
৬৩।	বিএ-৪৩৯৭	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	মোঃ জাহিদ হাসান (অব.)	৬৪
৬৪।	বিএ-৪৬২৩	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	মোঃ রিয়াজুল করিম	৬৫
৬৫।	বিএ-৫১২৪	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	রওশনুল ফিরোজ	৬৬
৬৬।	বিএ-৫৭৭৬	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	মোঃ রেজাউল করিম	৬৭
৬৭।	বিএ-১০০৪২৪	কর্ণেল	রুখসানা খানম	৬৮
৬৮।	বিএ-২১৮৮	মেজর	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	৬৯
৬৯।	বিএ-২৪৪৭	মেজর	মোহাম্মদ মতিউর রহমান	৭০
৭০।	বিএ-২৫৫১	মেজর	রেজাউল মোস্তফা মোঃ আসাদ-উদ-দৌলা	৭১
৭১।	বিএ-২৫৯৮	মেজর	খন্দকার মিজানুর রহমান	৭২
৭২।	বিএ-২৬১৭	মেজর	মোঃ মোহসীনুল করিম	৭৩
৭৩।	বিএ-২৮৩৫	মেজর	খান মুহাম্মদ আলাউদ্দিন	৭৪
৭৪।	বিএ-২৮৬৬	মেজর	সৈয়দ আবু বক্কর সিদ্দিক	৭৫
৭৫।	বিএ-৩১৭৯	মেজর	মাছউদুল হাছান	৭৬
৭৬।	বিএ-৩৪০১	মেজর	মোঃ একরামুল হক খান	৭৭
৭৭।	বিএ-৩৫৬৪	মেজর	মুন্সী মাহবুবুর রহমান	৭৮

ক্রমিক	নম্বর	পদবী	নাম	সাক্ষী নং
৭৮।	বিএ-৩৭৫২	মেজর	মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম	৮০
৭৯।	বিএ-৩৮২৯	মেজর	এস এম মইনুল হাসান	৮১
৮০।	বিএ-৩৯৫৫	মেজর	হামিদ আব্দুল ওয়াদুদ	৮২
৮১।	বিএ-৪১৫৩	মেজর	সুমন আহম্মেদ	৮৩
৮২।	বিএ-৪২৫১	মেজর	মোঃ জায়েদী আহসান হাবিব	৮৪
৮৩।	বিএ-৪৩২৮	মেজর	সৈয়দ মনিরুল ইসলাম	৮৫
৮৪।	বিএ-৪৩৭৬	মেজর	মোঃ শামসুজ্জোহা	৮৬
৮৫।	বিএ-৪৩৮৯	মেজর	খন্দকার আব্দুল হাফিজ	৮৭
৮৬।	বিএ-৪৭২০	মেজর	সৈয়দ গোলাম মুরতাজা	৮৮
৮৭।	বিএ-৪৮৫৭	মেজর	মোঃ মোশারফ হোসেন	৮৯
৮৮।	বিএ-৫৩১২	মেজর	মোঃ আবু সাইদ খান	৯০
৮৯।	বিএ-৫৪৫০	মেজর	সৈয়দ মরিরুল আলম	৯২
৯০।	বিএ-৫৫৩৫	মেজর	শেখ আবু মেহেদী	৯৩
৯১।	বিএ-৫৭৬১	মেজর	ফয়েজ উল বারী রাজন	৯৪
৯২।	বিসএস-১১৮৩৮	মেজর	নাসির উদ্দিন	৯৫
৯৩।	বিএ-২৭৯৩	ব্রিগেঃ জেনারেল	জসিম উদ্দিন	৯৬
৯৪।	বিএ-৬১১৫	ক্যাপ্টেন	রেজাউল করিম	৯৭
৯৫।	বিএ-৬৪২৫	ক্যাপ্টেন	খন্দকার রাজীব হোসেন	৯৮
৯৬।	বিএ-৬৭০১	ক্যাপ্টেন	মোঃ খান সুবায়েল বিন রফিক	৯৯
৯৭।	বিএ-৬৪২৮	ক্যাপ্টেন	মোহাম্মদ ফুয়াদ খান শিশির	১০০
৯৮।	বিএ-৭০৩৬	ক্যাপ্টেন	শাহনাজ জাহান	১০১
৯৯।	বিএ-২৯০২	জেনারেল	ওয়াকার-উজ-জামান	১০২
১০০।	বিএ-	লেফট্যানেন্ট জেনারেল	জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরি	১০৩
১০১।	বিএ-২১৮০	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	ইমামুল হুদা	১০৪
১০২।	বিএ-৩০১৫	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ আব্দুল মুকিম সরকার (অব:)	১০৫
১০৩।	বিএ-১৭০১	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	মোঃ শায়েরুজ্জামান	১০৬
১০৪।	বিএ-১৯৮৬	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	ফোরকান আহমদ	১০৭
১০৫।	বিএ-২৭০১	মেজর	শোয়েব মোঃ তারিক উল্লাহ	১০৯
১০৬।	বিএ-১৪৯৯	মেজর	মোঃ আকরাম হোসেন মুর্শেদী	১১০
১০৭।	বিএ-৪০৯৭	মেজর	আব্দুল্লাহ আল মামুন	১১১
১০৮।	বিএ-১৪৫৬	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	মোঃ ফজল কাদের	১১২

ক্রমিক	নম্বর	পদবী	নাম	সাক্ষী নং
১০৯।	বিএ-১৯৯৫	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	মোঃ দিদারুল আলম	১১৩
১১০।	বিএ-২০৬৬	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ আমিন তারিক	১১৪
১১১।	বিএ-১৩৩৫	লেফট্যানেন্ট জেনারেল	আব্দুল ওয়াদুদ (অব.)	১১৫
১১২।	বিএ-৩৯৩৩	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	কে এম ফেরদাউসুল শাহাব (অবঃ)	১১৬
১১৩।	বিএ-২৮৬৮	মেজর	মোঃ রেজাউল ইসলাম	১১৭
১১৪।	বিএ-৩৮৭৬	মেজর জেনারেল	মোহাম্মাদ আইয়ূব চৌধুরী	১১৮
১১৫।	বিএ-২৩০৭	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ আব্দুস সোবহান সাদেক	১১৯
১১৬।	বিএ-৪৬৫৫	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ শামসুল আলম	১২০
১১৭।	বিএ-৩৯১৮	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	মোঃ মোস্তফা কামাল (অব.)	১২১
১১৮।	বিএ-৩২৬১	ব্রিগেডিয়ার জেনারেল	এস এস এম মাহমুদ হাসান	১২২
১১৯।	বিএ-২৭২০	মেজর জেনারেল	আবু সাঈদ মোঃ মাসুদ (অব.)	১২৩
১২০।	বিএ-৫৩৭১	লেঃ কর্ণেল	মোঃ খিজির খান	১২৪
১২১।	বিএ-৫১৯২	মেজর	নাজমূল আহমেদ (অব.)	১২৫
১২২।	বিএ-২৭৬৩	লে. কর্নেল	এ এম মোশারফ হোসেন (অবঃ)	১২৬
১২৩।	বিএ-৩৩৬২	ব্রিগেঃ জেনারেল	মোঃ মাহবুব সরওয়ার	১২৭
১২৪।	বিএ-৩২৬৬	লেফট্যানেন্ট কর্ণেল	মোঃ আনোয়ার হোসেন (অবঃ)	১২৮
১২৫।	বিএ-৫০০৮	মেজর	মোঃ এখলাছুর রহমান (অবঃ)	১২৯
১২৬।	বিএ-২১৭২	লেফট্যানেন্ট জেনারেল	মোঃ মাহফুজুর রহমান	১৩০
১২৭।	বিএ-১০০৩৭৩	লেফটেন্যান্ট কর্নেল	এস. এম. আব্দুল সালাম	১৩১
১২৮।	বিএ-২০৫৯	মেজর জেনারেল	সৈয়দ ইউসুফ মাহবুব আলী আরসি (অবঃ)	১৩২
১২৯।	বিএ-৩১৯৭	মেজর জেনারেল	মোঃ জাহাঙ্গীর আল মুস্তাহিদুর রহমান (অব.)	১৩৩
১৩০।	বিএ-৩৫৭২	মেজর জেনারেল	আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান	১৩৪
১৩১।	বিএ-৫৫৯০	মেজর	ডঃ হেলাল মুহাম্মদ খান (অব.)	১৩৫

৩১। **সাক্ষ্য- তৃতীয় খন্ড-নৌবাহিনী সাক্ষী নং- ০১ থেকে ০২**

ক্রমিক	নাম	সাক্ষী নং
১।	ভাইস অ্যাডমিরাল জহির উদ্দীন আহম্মেদ (এনডি)	০১
২।	পি নং-৬০৪ অ্যাডমিরাল এসএম আবুল কালাম (অব.)	০২

৩২। **সাক্ষ্য- তৃতীয় খন্ড-বিমান বাহিনী সাক্ষী নং- ০১ থেকে ০২**

ক্রমিক	নাম	সাক্ষী নং
১।	এয়ার মার্শাল এসএম জিয়াউর রহমান, এনডিসি, পিএসসি	০১
২।	উহং কমান্ডার জিয়াউল হাসান	০২

৩৩। <u>সাক্ষ্য তৃতীয় খন্ড-এনএসআই সাক্ষী নং- ০১</u>

ক্রমিক	নাম	সাক্ষী নং
১।	এ কে এম আসাদুজ্জামান	০১

৩৪। <u>সাক্ষ্য তৃতীয় খন্ড-কয়েদি সাক্ষী নং- ০১ থেকে ২৭</u>

ক্রমিক	কয়েদি/হাজতি নং	পদবী	নাম	সাক্ষী নং
১।	কয়েদি নং-১৫২৪/এ	ডিএডি	আব্দুল জলিল	০১
২।	কয়েদি নং-৭৪৩৮/এ	ডিএডি	সৈয়দ তৌহিদুল আলম	০২
৩।	কয়েদি নং-৪৫৪০/এ	ডিএডি	মেঃ নূরুল হুদা	০৩
৪।	কয়েদি নং-১৫৩৯/এ	সুবেদার মেজর	গোফরান মল্লিক	০৪
৫।	কয়েদি নং-১৫৮৬/এ	নায়েব সুবেদার	কবিরুদ্দিন	০৫
৬।	কয়েদি নং-৬৪৬৩/এ	নাঃ সুবেঃ-মেডিঃ সহঃ	মনোরঞ্জন সরকার	০৬
৭।	কয়েদি নং-১৬৪৩/এ	হাবিলদার	ইউসুফ	০৭
৮।	কয়েদি নং-২১১২/এ	হাবিলদার	মোঃ জসিম উদ্দিন খান	০৮
৯।	কয়েদি নং-১৭০৬/এ	হাবিলদার সহঃ	খন্দকার মনিরুজ্জামান	০৯
১০।	কয়েদি নং-৪৪৩/এ	ল্যাঃ নাঃ	মোঃ ইকরামুল ইসলাম	১০
১১।	কয়েদি নং-১৫৬৯/এ	সিপাহী	মোঃ শেখ আইয়ুব আলী	১১
১২।	কয়েদি নং-১৫৭৬/এ	সিপাহী	মোঃ আবুল মুহিত	১২
১৩।	কয়েদি নং-২১৫৩/এ	সিপাহী	সাজ্জাদ হোসেন	১৩
১৪।	কয়েদি নং-৬৪৬২/এ	সিপাহী	মোহাম্মদ সেলিম রেজা	১৪
১৫।	কয়েদি নং-৬২৪২/এ	সিপাহী	খন্দকার শাহাদাত	১৫
১৬।	কয়েদি নং-১৫৪৬/এ	সিপাহী	মোহাম্মদ আমিনার রহমান	১৭
১৭।	কয়েদি নং-৫৪৯৬/এ	সিপাহী	মোহাম্মদ আব্দুল মতিন	১৮
১৮।	হাজতি নং-৭৬/২৩	সিপাহী	রফিকুল ইসলাম	১৯
১৯।	কয়েদি নং-৬৪০৩/এ	সিপাহী	রাজিবুল হাসান	২০
২০।	কয়েদি নং-৪৫৪/এ	সিপাহী	মোঃ রুবেল মিয়া	২১
২১।	কয়েদি নং-১৫২২/এ	সিপাহী	মোঃ কাজল আলী	২২
২২।	কয়েদি নং-৫৩৬৬/এ	সিপাহী	মোঃ হাবিবুর রহমান	২৩
২৩।	কয়েদি নং-৩৭৬৪/এ	নায়েক	মোঃ শেখ শহীদুর রহমান	২৪
২৪।	হাজতি নং-৩২৯১৮/২৩	ঝাড়ুদার	আব্দুল হাকিম	২৫
২৫।	কয়েদি নং-৫৬৭৭/এ	সিগন্যালম্যান	মোহাম্মদ সালাউদ্দিন	২৬
২৬।	কয়েদি নং-৫০৫৮/এ	সিপাহী	রাজু মারমা	২৭

৩৫। সাক্ষ্য তৃতীয় খন্ড-সাংবাদিক সাক্ষী নং- ০১ থেকে ০৩

ক্রমিক	নাম	সাক্ষী নং
১।	মনজুরুল আহসান বুলবুল	০১
২।	মুন্নী সাহা	০২
৩।	জহিরুল ইসলাম মামুন	০৩

৩৬। সাক্ষ্য তৃতীয় খন্ড-বিডিআর/বিজিবি সাক্ষী নং- ০১ থেকে ২২

ক্রমিক	নাম	সাক্ষী নং
১।	নং-৪৫৩৩৮ হাবিলদার সহকারি মোঃ ওসমান গনি	০১
২।	নং-৪৮৯৯৭ ল্যান্স নায়েক সহকারি মোঃ আব্দুস সালাম	০২
৩।	কামরুন নাহার শিরীন (মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান স্ত্রী)	০৩
৪।	নায়েক সিগন্যাল মোঃ ইদ্রিস আলী	০৪
৫।	সিগন্যালম্যান নূর মোহাম্মদ	০৫
৬।	ল্যান্স নায়েক মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম	০৬
৭।	নায়েব সুবেদার কাজি তৌহিদুল ইসলাম	০৭
৮।	সিপাহী মোহাম্মদ শফিকুর রহমান	০৮
৯।	সিপাহী মোঃ মনিরুজ্জামান	০৯
১০।	সিপাহী ভিএম তোফায়েল আহমেদ খান	১০
১১।	সিপাহী মোঃ হারুনুর রশিদ	১১
১২।	জেসিও-৫০১১ সুবেদার ফখরুদ্দিন হাসান	১২
১৩।	নম্বর-২৫৮২৯ হাবিলদার মোঃ ইউসুফ আলী	১৩
১৪।	নম্বর- ৪৩৭২০ হাবিলদার মোঃ মনিরুজ্জামান	১৪
১৫।	নম্বর-৩৭৫৫৩ ল্যান্স নায়েক মোঃ জিল্লুর রহমান	১৫
১৬।	নম্বর-৫৯৮২৭ সিপাহী দেলওয়ার হোসেন (আর এস ইউ)	১৬
১৭।	নম্বর-৬০৫৪৮ সিপাহী মোঃ ফয়জুল আলম	১৭
১৮।	নম্বর-৬১৯৮২ সিপাহী মোঃ রেজাউল করিম	১৮
১৯।	নম্বর-৭৭৫৯৪ সিপাহী মোঃ ওবাইদুল ইসলাম	১৯
২০।	নম্বর- দ-৭৪ দর্জি মোঃ আছিফুর রহমান আকাশ	২০
২১।	ইঞ্জিনিয়ার রেজা মামুন (বাবাঃ ডিএডি মুদাসসির উদ্দিন)	২১
২২।	আশরাফুল আলম হান্নান (বাবাঃ সুবেদার মেজর নুরুল ইসলাম)	২২

বিভিন্ন নথিপত্র ও প্রতিবেদন ছাড়াও, যেসব বই ও অন্যান্য প্রকাশনা পর্যালোচনা করা হয়েছে

১। Government of the People's Republic of Bangladesh. (1956). *The Commissions of Inquiry Act, 1956.* http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-263.html. Retrieved November 29, 2025, from http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-263.html

২। Human Rights Watch. (2012). ভয় কখনো আমাকে ছেড়ে যায় না: বাংলাদেশ রাইফেলস (Bangladesh Rifles)- এর ২০০৯ বিদ্রোহের পর অত্যাচার, হেফাজতে থাকাকালীন মৃত্যুগুলো এবং অন্যায্য বিচারগুলো. In *http://www.hrw.org* (ISBN: 1-56432-908-9).

৩। Mukherjee, P. (2017). *The Coalition Years 1996-2012.* Rupa.

৪। Paliwal, A. (2024). *India's Near East: A new history.* Oxford University Press.

৫। Rahman, T. (2025). Pilkhana Massacre: The Complex Web of Foreign Interference, Institutional Collapse, and the Rise of Bangladesh's Covert Surveillance Future. *International Journal of Scientific and Research Publications*, *15*(2). https://doi.org/10.29322/IJSRP.15.02.2025.p15821

৬। Zahid, O. (n.d.). *Massacre at Pilkhana: Mutiny of the Bangladesh Rifles.*

https://www.academia.edu/36511105/Massacre_at_Pilkhana_Mutiny_of_the_Bangladesh_Rifles

৭। আবেদিন জয়নাল. (2009). *পিলখানায় হত্যাকান্ড: টার্গেট বাংলাদেশ.* ইস্টার্ন পাবলিকেশন.

৮। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন, ২০১০. (2010). http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-1067.html. Retrieved November 29, 2025, from

http://bdlaws.minlaw.gov.bd/act-details-১০৬৭.html

উপক্রমণিকা

বিডিআর/বিজিবির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১। **ভূমিকা**। বাংলাদেশ রাইফেলস্, যা বর্তমানে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ হিসাবে পরিচিত, বীরত্ব ও ঐতিহ্যের ধারক, গৌরবমন্ডিত এক সুশৃঙ্খল আধা-সামরিক ত্রিমাত্রিক বাহিনী। দেশের সীমান্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দৃঢ়প্রত্যয় ও দায়িত্ববোধে উজ্জীবিত হয়ে এ বাহিনীর অকুতোভয় সৈনিকেরা অতন্দ্র থেকে সীমান্ত পাহারা দেয়। বহু গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে বিডিআর গড়ে উঠেছিল যা ২০০৯ এর বিডিআর হত্যাকান্ডের পর বিজিবি নামে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ পর্যন্ত ২৩০ বছরের ইতিহাস সম্বলিত এ বাহিনীটিকে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে পুরনো পোশাকধারী বাহিনী হিসেবে পরিচিত করা হয়। বিজিবি'র পূর্বসূরি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সর্বপ্রথম নামকরণ করা হয়েছিল ফ্রন্টিয়ার প্রটেকশন ফোর্স (Frontier Protection Force)। পরবর্তীকালে রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন নামে ১৭৯৫ সালে রামগড়ে আঞ্চলিক দায়িত্ব পালনের জন্য এ বাহিনী গঠন করা হয়েছিল। সে সময় থেকে এই বাহিনীর মূল ভূমিকা অপরিবর্তিত থাকলেও তার সাংগঠনিক কাঠামো এবং সাজ-সরঞ্জামাদির অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। ক্রমবিকাশ ও ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এ বাহিনীর কর্মকুশলতা এখন বহুমাত্রিক এবং দায়িত্ব কর্তব্যের পরিধিও বিস্তৃত হয়েছে।

২। কালের বিবর্তনে বিডিআর/বিজিবি

ক। রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়ন ২৯ জুন ১৭৯৫ হতে ১৮৬০ পর্যন্ত।
খ। ফ্রন্টিয়ার গার্ডস - ১৮৬১ হতে ১৮৭৮ পর্যন্ত।
গ। স্পেশাল রিজার্ভ ফোর্স ১৮৭৯ হতে ১৮৯০ পর্যন্ত।
ঘ। বেঙ্গল মিলিটারি পুলিশ ব্যাটালিয়ন ১৮৯১ হতে ১৯১০ পর্যন্ত।
ঙ। ঢাকা মিলিটারি পুলিশ ব্যাটালিয়ন ১৯১০ হতে ১৯১১ পর্যন্ত।
চ। ইস্ট বেঙ্গল এন্ড আসাম মিলিটারি ১৯১২ হতে ১৯২০ পর্যন্ত।
ছ। ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রাইফেল (বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন) ১৯২১ হতে ১৯৪৬ পর্যন্ত।
জ। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ (ইপিআর) ১৯৪৭ হতে ১৯৭১ পর্যন্ত।
ঝ। বাংলাদেশ রাইফেলস্ (বিডিআর) ১৯৭২ হতে ১৯-১২-২০১০ পর্যন্ত।
ঞ। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ২০-১২-২০১০ হতে অদ্যাবধি।

৩। **রামগড় থেকে ঢাকার পিলখানা**। ১৭৯৫ সালের ২৯ জুন রামগড়ে একটি লোকাল ব্যাটালিয়ন গঠিত হয়েছিল। সীমান্তে বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে কিংবা দুর্গম প্রান্তরে দীর্ঘস্থায়ী সামরিক অভিযানের প্রয়োজন হলে এই বাহিনীকে ভারি অস্ত্রে অভিযান-উপযোগী করে সজ্জিত করা হতো। ব্যাটালিয়নটি যাতে কার্যত একটি গতিশীল সামরিক বাহিনীর কাজ করতে পারে সেজন্য এক সময় ৬ পাউন্ডের ৪টি কামান এবং অনিয়মিত দু'টি অশ্বারোহী দলে সজ্জিত করা হয়েছিল। ১৮৬১ সালে যখন পূর্বাঞ্চলে নিয়মিত বাহিনী এবং পুলিশ বাহিনীকে পুনর্গঠন করা হয়, তখন এই ব্যাটালিয়নকে ফ্রন্টিয়ার গার্ডস হিসাবে পুনঃ নামকরণ করা হয়, আর পরিচালকের দায়িত্ব দেওয়া হয় পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেলকে। মূলত রামগড় লোকাল ব্যাটালিয়নটিকে নিয়ে গঠিত ফ্রন্টিয়ার গার্ডের প্রথম পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন মেজর এইচ বনন নামে একজন বিচক্ষণ অধিনায়ক। ব্যাটালিয়নটির সর্বমোট সৈনিক সংখ্যা ছিল ১৪৫৪ জন। এর প্রধান ঘাঁটি ছিল চট্টগ্রামে। ১৮৭১ সালে এই বাহিনী লুসাই অভিযানে অংশগ্রহণ করেছিল।

৪। ১৮৮০ সালের ১২ ডিসেম্বর, সরকারি নির্দেশে পূর্ব সীমান্তের যে কোনো সীমান্ত সমস্যা মোকাবিলার জন্য ঢাকায় একটি স্পেশাল রিজার্ভ ফোর্স নিয়োজিত করা হয়। মি. লুকারে নামক একজন ইউরোপিয়ান এই ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন। লালবাগ কেল্লা সংস্কার করে বাহিনীর আবাসস্থল তৈরি করা হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই তারা খুব চটপটে সৈনিক এর বেশ ধারণ করে এবং ইন্সপেক্টর লুকারের সক্ষম প্রশিক্ষণে সুদক্ষ বাহিনীতে রূপান্তরিত হয়। প্রতীয়মান হয় যে, 'স্পেশাল রিজার্ভ' নামটি বাহিনীর খুব মনঃপূত ছিল না। তাই তারা ফ্রন্টিয়ার গার্ডস নামটি ব্যবহার করতে থাকে।

৫। ১৮৯১ সালে এই বাহিনীর নতুন নামকরণ হয় 'বেঙ্গল মিলিটারি পুলিশ ব্যাটালিয়ন'। কথিত বাহিনীটি আংশিকভাবে ব্রিজ লোডার (লং এন ফিল্ড) এবং আংশিকভাবে উন্নত সংস্করণের শর্ট ব্রিজ লোডার স্লাইডার (শর্ট এন ফিল্ড) এ সজ্জিত ছিল। ব্যাটালিয়নের গঠিত বাহিনীর কোম্পানিগুলো ছিল নিম্নোক্ত স্থানগুলোতেঃ

ক। ঢাকাতে- 'এ' কোম্পানি।
খ। দুমকাতে- 'বি' কোম্পানি।
গ। ভাগলপুরে- 'সি' কোম্পানি।
ঘ। গ্যাংটকে- 'ডি' কোম্পানি।

৬। ব্যাটালিয়নটির প্রথম অধিনায়ক ছিলেন মি. ডব্লিউডি গ্র্যাট। কোম্পানিসমূহ ইউরোপীয় সুবেদারের অধীনে ছিল। তবে অসাধারণ যোগ্যতা সম্পন্ন ভারতীয় সুবেদার এর অধীনেও দেওয়া হতো। কথিত আছে এ ধরনের একজন সুবেদার পিলখানা, ঢাকা কোম্পানিকে অতি বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করেছিলেন।

৭। **<u>পিলখানা ও পরবর্তী ইতিহাস</u>**

ক। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের প্রথমাংশে একসময় ব্যাটালিয়নের 'ঢাকা কোম্পানি' মিল ব্যারাকে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে মিল ব্যারাক ক্ষতিগ্রস্ত হলে উক্ত গ্যারিসনটি পিলখানাতে স্থানান্তরিত হয় যা বিজিবি বাহিনীর বর্তমান সদর দপ্তর।

খ। মিলিটারি পুলিশ ব্যাটালিয়ন এর অধিনায়ক ছিলেন ক্যাপ্টেন এইচজি বেলি। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গভঙ্গ পাশ হওয়ায় ১৯১০ সালে বাহিনীটির পুনঃনামকরণ করা হয়েছিল 'ঢাকা মিলিটারি পুলিশ ব্যাটালিয়ন' রূপে। ১৯১২ সালে বাহিনীর নাম হয় ইস্ট বেঙ্গল এন্ড আসাম মিলিটারি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এই বাহিনীও অংশগ্রহণ করেছিল। ব্যাটালিয়নের একজন ল্যান্স নায়েক মেসোপটেমিয়ায় চাকরি করা কালীন 'ইন্ডিয়ান অর্ডার অভ্ মেরিট' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন।

গ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সালে এ বাহিনী বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন অভ্ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ নামে পুনর্গঠিত হয়েছিল। ব্যাটালিয়নটির প্রধান কার্যালয় স্থানরিত হয় পিলখানায়। ব্যাটালিয়নটির অফিসার ছিল ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির। শুরু থেকে ১৬টি প্লাটুনে বিভক্ত ব্যাটালিয়নটি বাংলার গভর্নর এর প্রয়োজন অনুসারে সীমান্ত নিরাপত্তা ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত হতো।

ঘ। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর বেঙ্গল ব্যাটালিয়ন অভ্ ইস্ট ফ্রন্টিয়ার রাইফেলস্ এর কিছুসংখ্যক লোক নিয়ে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ (ইপিআর) একটি বিশেষ অংশ গঠিত হয়েছিল। কলকাতা মেট্রোপলিটন পুলিশের একদল সশস্ত্র পুলিশ এ বাহিনীতে যোগদান করে। কাঠামোগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কিছু প্রাক্তন সদস্য থাকলেও বাহিনীটিতে বহুসংখ্যক বাঙালি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তীকালে প্রাদেশিক পুলিশের প্রায় ৩০০০ বাঙালি সদস্যকে নির্বাচিত করে বাহিনীতে নিয়ে নেওয়া হয়।

ঙ। অতি ক্ষুদ্র কলেবর থেকে শুরু হয়েও বাহিনীটির কলেবর খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পেতে থাকে। তরুণ বাঙালি সৈনিকেরা শীঘ্রই দক্ষ সৈনিকে রূপান্তরিত হয়। এ দৃঢ়চেতা ইপিআর বাহিনী সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে থেকে অনেক সীমান্ত খন্ডযুদ্ধে অপূর্ব নজির স্থাপন করেছিল। ১৮৫৮ সালের শুরুতে আজিজ আহম্মদ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী ইপিআর বাহিনীকে সীমান্ত রক্ষার সাথে চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রমেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

৮। <u>বাংলাদেশ রাইফেলস (১৯৭২-১৯ ডিসেম্বর ২০১০)</u>। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালের ০৩ মার্চ এ বাহিনীর নামকরণ করা হয় বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেলস্)। ১৯৮০ সালের ০৩ মার্চ বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে এ বাহিনীর কর্মকান্ডের বিশেষ স্বীকৃতি হিসেবে বাহিনীটিকে জাতীয় পতাকা প্রদান করা হয়। ১৬ মার্চ ১৯৯৭ থেকে বিডিআরের জন্য খাকি ইউনিফর্মের পরিবর্তে তিন রঙের সংমিশ্রণে ছাপা কাপড়ের ইউনিফর্ম প্রবর্তন করা হয়।

বিডিআর তার ১২টি সেক্টর, ৪৭টি ব্যাটালিয়ন ও বহুসংখ্যক বিওপির মাধ্যমে বাহিনীর কর্মকান্ড পরিচালনা করতো। টেলিযোগাযোগ ও সিগন্যাল ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের ফলে অভিযান পরিচালনাসহ জরুরি বিষয়ে সময়োচিত ও তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ অনেক সহজ হয়। অন্যদিকে, বিডিআর সদস্য ও তাদের পরিবারবর্গের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিবাহ ইত্যাদির জন্য সংস্থার কল্যাণ তহবিল থেকে সহায়তা-সুযোগ ও পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়। এছাড়াও সেক্টর সদরের জন্য ১০টি আর্মার্ড পার্সোনেল ক্যারিয়ার (এপিসি) প্লাটুন সংযোজন, ৪৩টি রাইফেল ব্যাটালিয়নে একটি করে এন্টি-ট্যাংক প্লাটুন সংযোজন করা হয়।

৯। **বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (২০ ডিসেম্বর ২০১০)**। ২০০৯ সালের ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি বিডিআর সদর দপ্তরে ঘটে যায় বিশ্ব ইতিহাসের জঘন্যতম নারকীয় এক হত্যাকান্ড। বিডিআরের কিছু বিপথগামী উচ্ছৃঙ্খল সদস্যের হাতে বিডিআরের মহাপরিচালকসহ নির্মমভাবে প্রাণ হারান বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ৫৭ জন মেধাবী কর্মকর্তাসহ মোট ৭৪ জন। কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল সদস্যের দ্বারা কান্ডজ্ঞানহীন এই বিদ্রোহ ও নৃশংস হত্যাকান্ড সংঘটনের মাধ্যমে বাহিনীটির সুদীর্ঘ ২১৫ বছরের গৌরবময় ইতিহাসের ছন্দপতন ঘটে। এ ঘৃণ্য ও কলঙ্কময় ঘটনা কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসেই নয় বরং সমগ্র বিশ্বে একটি ন্যক্কারজনক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে বিডিআর বাহিনীর নাম, পোশাক ও লোগো পরিবর্তনের প্রস্তাব তৎকালীন সরকার কর্তৃক ০৮ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে জাতীয় সংসদে পাশ হয় এবং যা ২০ ডিসেম্বর ২০১০ তারিখে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের মাধ্যমে 'বিজিবি আইন ২০১০' নামে পরিচিত। ২৩ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শুরু হয় 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' নামে এ বাহিনীর নতুন পথচলা। বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্বিন্যাস, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাঠামো প্রস্তুত করা হয় ***(সূত্রঃ সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, প্রশাসন শাখা, প্রশাসনিক পরিদপ্তর, পত্র নং*** *৪৪.০২.১২০৫.০০৪.০৫. ০০৫.২৫/৪০৪* ***তারিখ*** *১৪* ***মে*** *২০২৫,* ***সংযোজনী****-০১)।*

২০০৯ সাল পর্যন্ত সংঘটিত শৃঙ্খলাজনিত ঘটনাসমূহ

১০। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৭২। ১৯৭২ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি বিডিআরের সদর দপ্তর পিলখানায় একটি বিদ্রোহের ঘটনা ঘটে যখন বিডিআর সৈনিকেরা এলোপাথার গুলি ছুঁড়ে এক অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপে বিদ্রোহের সমাপ্তি ঘটে। তবে তেমন কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। ঘটনাটি সম্বন্ধে বিশদ তথ্য পাওয়া যায়নি। ***(সূত্রঃ উইকিপিডিয়া)*** **এ বিদ্রোহের বিষয়ে বিজিবি হতে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।**

১১। ০১ ডিসেম্বর ১৯৯১

ক। সারাংশ। ০১ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখে ১ রাইফেল ব্যাটালিয়ন নওগাঁয় পূর্ব প্রচারকৃত লিফলেটের ব্যাপারে বিস্তারিত অনুসন্ধান করে উক্ত ব্যাটালিয়নে কর্মরত নং ২৬২৩৮ নায়েক আফজাল হোসেন এর সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়। নায়েক আফজালকে সেক্টর সদর দপ্তরে প্রেরণ করার সময় কিছু উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক প্রথমে লাঠি ও বাঁশ নিয়ে প্রতিরোধ করে পরবর্তীতে কোত ভাঙ্গার চেষ্টা করে। ব্যাটালিয়ন অধিনায়কের সাহসী ও সময়োচিত পদক্ষেপের ফলে উপরিউক্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব হয়। পরবর্তীতে উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত নায়েক আফজালসহ আরো ২০ জন সৈনিককে অভিযুক্ত করে শাস্তি প্রদান করা হয়।

খ। বিস্তারিত

(১) ০১ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখে সকালে শরীর চর্চার সময় ১ রাইফেল ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন স্থানে ৫টি হাতে লেখা প্রচারপত্র (Leaflet) পাওয়া যায়। ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক বিএসএস ১১৬২ মেজর খায়রুল আলম তৎক্ষণাৎ লিফলেট সম্পর্কে সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এমএস জাহাঙ্গীর, পিএসসিকে জানান। হাতের লেখা পরীক্ষা করে নং ২৬২৩৮ নায়েক আফজাল হোসেনের হাতের লেখার সঙ্গে প্রচারপত্রের লেখার মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

(২) সেক্টর কমান্ডারের নির্দেশে ০১ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখ আনুমানিক বেলা ১৭৩০ ঘটিকার সময় যখন এসকর্ট পার্টি নায়েক আফজালকে নিয়ে সৈনিক ব্যারাক থেকে নিচে নামছিল, তখন

কিছু সংখ্যক সৈনিক উচ্ছৃঙ্খল ও উত্তেজিত অবস্থায় বাঁশের লাঠি, কাঠ হাতে নিয়ে 'বিডিআর সৈনিক এক হও, আমাদের দাবি মানতে হবে, সেনা অফিসার ফেরত যাও, গাড়ির চাকা ঘুরবেনা, সৈনিক সৈনিক ভাই ভাই, বেতনের সমতা চাই, নায়েক আফজালকে সেক্টরে যেতে দেওয়া হবে না' ইত্যাদি স্লোগান দিতে দিতে মারমুখী হয়ে প্রশিক্ষণ মাঠে একত্রিত হয়।

(৩) অধিনায়ক মেজর আলম উক্ত সৈনিকদের মাঝে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে বিভিন্ন ভাবে বুঝিয়ে শান্ত করার চেষ্টা করলে উচ্ছৃঙ্খল ও উত্তেজিত সৈনিকরা অধিনায়কের কথায় কর্ণপাত না করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মারমুখী হয়ে উঠে।

(৪) ঐ দিন ৩৫ রাইফেল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক মেজর মনীষ দেওয়ান ১ রাইফেল ব্যাটালিয়নের রেস্ট হাউসে অবস্থান করছিলেন। উত্তেজিত ও মারমুখী সৈনিকের একটি দল রেস্ট হাউসে মেজর মনীষ দেওয়ানকে ঘিরে ফেলে অকথ্য ও অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে এবং তার শয়ন কক্ষে রক্ষিত ব্যবহার্য জিনিসপত্রের ক্ষতিসাধন করে। রেস্ট হাউস থেকে উত্তেজিত সৈনিকগণ ব্যাটালিয়ন উপ-অধিনায়ক মেজর আবুল কালাম আজাদ এবং মেডিক্যাল অফিসার ক্যাপ্টেন মুস্তাফিজুর রহমানের বাসায় হামলা চালায়।

(৫) অফিসার্স বাসস্থান থেকে উচ্ছৃঙ্খল ও উত্তেজিত সৈনিকরা কোয়ার্টার গার্ডের দিকে যায়। প্রশিক্ষণ মাঠ থেকেও কিছু উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। কোয়ার্টার গার্ডে যাওয়ার পথে তারা ইউনিটের সকল টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারা কোত ভেঙ্গে অস্ত্র বের করার চেষ্টা করে। অধিনায়ক মেজর আলম এবং বিভিন্ন পদবির অফিসার/সৈনিকবৃন্দ যেমন ডিএডি ওয়াহেদ, সুবেদার মেজর মেজবাউল ইসলাম, হাবিলদার মেজর লিয়াকত, ডিউটি জেসিও দেলওয়ার হোসেন, কোয়ার্টার মাস্টার হাবিলদার আব্দুল হাই, আরপি এনসিও নায়েক আজিজ প্রমুখ ব্যক্তি উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদের শান্ত করতে সমর্থ হন এবং শেষ পর্যন্ত কোয়ার্টার গার্ডের কোত ভাঙ্গা থেকে রেহাই পায়।

(৬) পরবর্তীতে নায়েক আফজালকে ০১ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখে রাজশাহী না পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলে রাত্রি প্রায় ২১৩০ ঘটিকায় পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে এবং সকল সৈনিক ব্যারাকে ফিরে যায়। ০২ ডিসম্বর ১৯৯১ তারিখ সেক্টর কমান্ডার ব্যাটালিয়নে যান এবং দরবার গ্রহণ করেন। উপস্থিত সকল স্তরের সৈনিক কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয় এবং কর্তৃপক্ষের অনুকম্পা প্রার্থনা করে। সেক্টর কমান্ডার রাজশাহী ফেরার সময় নায়েক আফজালকে সঙ্গে নিয়ে যান।

গ। **গৃহীত ব্যবস্থা।** আপত্তিকর বক্তব্য সম্বলিত প্রচারপত্র লেখা এবং সৈনিকদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির দায়ে দোষী নম্বর ২৬২৩৮ নায়েক মোঃ আফজাল হোসেনকে 'চাকরি হতে বরখাস্তসহ বেসামরিক কারাগারে ০২ বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২০০ টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও ০১ মাসের সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয় *(সূত্রঃ ১ রাইফেল ব্যাটালিয়নে সংগঠিত ঘটনার তদন্ত আদালত থেকে প্রাপ্ত উদঘাটিত তথ্যাবলী, সংযোজনী-২ ও সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ প্রশাসন শাখা আইন পরিদপ্তর পত্র নং ৪৪.০২.১২০৫.০০৪.০৩.০৬.২৫/৩৬৭ তারিখ ১২ নভেম্বর ২০২৫, সংযোজনী-৩)।*

১২। ০৩ ডিসেম্বর ১৯৯১

ক। সারাংশ। ০৩ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখ আনুমানিক ২০১৫ ঘটিকায় পিলখানার ভিতরে পর পর ০২/০৩ টি বিকট আওয়াজ হয়। ৩৮ রাইফেল ব্যাটালিয়ন, পিলখানায় কর্মরত নং ২৪৭৭২ ল্যান্স নায়েক (নার্সিং) মোঃ আব্দুল হামিদের নিকট ৫টি ককটেল পাওয়া যায়।

খ। **বিস্তারিত।** ০৩ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখে সংঘটিত ঘটনার পূর্বে বিডিআর পিলখানায় কয়েকবার লিফলেট বিলি করা হয়। ০৩ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখে ৩ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সুবেদার মেজর কাজী

আব্দুল মান্নান এবং আরপি এনসিও মোঃ খোরশেদ আলম, ল্যান্স নায়েক (নার্সিং) মোঃ আব্দুল হামিদকে সর্বসাধারণের অব্যবহৃত রাস্তায় একটি পলিথিন ব্যাগসহ একা দেখতে পাওয়ার পর চ্যালেঞ্জ করে। এতদপ্রেক্ষিতে ল্যান্স নায়েক (নার্সিং) মোঃ আব্দুল হামিদ ভড়কে যায় এবং পলিথিন ব্যাগ রেখে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। ৩ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সুবেদার মেজর কাজী আব্দুল মান্নান, নায়েক মোঃ খোরশেদ আলম উক্ত পলিথিন ব্যাগে ৫টি ককটেল দেখতে পায়, যার প্রেক্ষিতে ল্যান্স নায়েক (নার্সিং) মোঃ আব্দুল হামিদকে ০৩ ডিসেম্বর ১৯৯১ ইং তারিখ আনুমানিক ১৯০০ ঘটিকায় গ্রেফতার করা হয় এবং কোয়ার্টার গার্ডে আনার পর আনুমানিক ২০১৫ ঘটিকায় পিলখানার ৩ নং গেইটের বাইরে, ২ এবং ৩ নং গেইটের মাঝামাঝি শিক্ষকদের কোয়ার্টারের পিছনে, ঢাকা সেক্টর এবং রেকর্ড উইং এর সৈনিক লাইনের মাঝের পার্ক এলাকায় বেশ কিছু ককটেল ফাটানো হয়।

গ। **গৃহীত ব্যবস্থা**। উক্ত ঘটনার পর ঢাকা সেক্টর পত্র নং ৩০৫/৫-এ/১/এ তারিখ ০৩ ডিসেম্বর ১৯৯১ মোতাবেক ০৩ সদস্যের সমন্বয়ে একটি তদন্ত আদালত গঠন করা হয়। তদন্ত আদালত উপরিউক্ত ঘটনার বিস্তারিত কারণ অনুসন্ধান এবং প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করতে ব্যর্থ হয়। তৎকালীন মহাপরিচালক ল্যান্স নায়েক নার্সিং আব্দুল হামিদের বিশেষ সংক্ষিপ্ত আদালতে বিচার সম্পন্ন করার আদেশ প্রদান করেন। বিশেষ সংক্ষিপ্ত আদালত ল্যান্স নায়েক নার্সিং মোঃ আব্দুল হামিদকে দোষী সাব্যস্ত করে বেসামরিক কারাগারে ০৬ মাসের সশ্রম কারাদন্ড ও ৫০ টাকা অর্থদন্ড প্রদান করেন *(সূত্রঃ বিশেষ সংক্ষিপ্ত আদালতের কার্যবিবরণী, সংযোজনী-৪)।* ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বে সংঘটিত বিদ্রোহের **প্রেক্ষিতে** বিডিআরে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি এবং বিডিআর সদস্যদের বিদ্রোহের চেষ্টা বা অংশগ্রহণ কঠোরভাবে দমন এবং উচ্চমানের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে তৎকালীন সরকার এবং তৎকালীন বিডিআর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করে কঠোর আইন প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর অব্যবহিত পূর্বের অসন্তোষসমূহ

১৩। **ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে বিডিআর সদর দপ্তরের সার্বিক কমান্ড পরিস্থিতি**

ক। কমান্ড কার্যক্রমে অফিসারদের সম্পৃক্ততা শূন্যের কোঠায় ছিল। এডি ও ডিএডিদের উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায়। কিছু জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা ক্ষমতার অপব্যবহার ও অযাচিত কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়েন। ডাল-ভাত কর্মসূচি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিধি লঙ্ঘন এবং অনৈতিক নীতিমালা সরাসরি সৈনিকদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। অপর দিকে কিছু অফিসার ক্ষমতা ও পদ ব্যবহার করে ডাল-ভাত কর্মসূচির আড়ালে ব্যক্তিগত সুবিধা নিয়েছেন। তৎকালীন ডিজির স্ত্রীর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগের প্রেক্ষিতে ডিজিএফআই কর্তৃক পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রম সাবেক ডিজি বিডিআরের হস্তক্ষেপে স্থগিত করা হয়।

খ। ডিজির প্রশ্রয়ে তার স্টাফ অফিসারের (মেজর মাহবুব) এখতিয়ার-বহির্ভূত কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ সকল ক্ষেত্রে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। অবসরের পূর্বে এবং মানবিক কারণে অফিসারদের বিডিআরে প্রেষণে নিয়োগ ইত্যাদি কারণে বিডিআর সদর দপ্তরের কমান্ড কার্যক্রমে তারা পরিপূর্ণ মনোযোগ দিতে পারেননি। ফলে বিদ্রোহীরা নির্বিঘ্নে বিদ্রোহের প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।

গ। পিলখানার ভিতরে দিনে দুপুরে রাজনৈতিক এবং অজ্ঞাত বেসামরিক ব্যক্তিবর্গের ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত মিটিং, ব্যাটালিয়নের যানবাহন নিয়ে পিলখানার বাইরে রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে নিয়মিত মিটিং, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর জন্য বিডিআরের পোশাক তৈরি, ভান্ডার থেকে বিডিআরের পোশাকের থান কাপড় বাইরে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি বিষয়ে পিলখানার কোন অফিসার কিছুই জানতে পারেনি এবং জানার চেষ্টা করেছিল মর্মে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এছাড়া সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতির জন্য ঘটনাপূর্ব সময়ে দীর্ঘ দিন থেকে নিয়মিতভাবে গ্রেনেড প্রাইম করে ম্যাগাজিনে বাক্সগুলি নিচের দিকে সাজানো, খাগড়াছড়িতে বিডিআর হেডকোয়ার্টার্স লেখা গুলির বাক্স পুকুর থেকে উদ্ধার ইত্যাদি বিষয় প্রমাণ করে পিলখানায় অফিসারদের কমান্ড কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয়তা এবং উদাসীনতা বিদ্রোহের প্রস্তুতিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করেছে।

ঘ। বিডিআরের উপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কোন প্রশাসনিক তদারকি ছিল না। এমনকি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব রাইফেলস সপ্তাহ ২০০৯ এর মত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। ডাল ভাত কর্মসূচি নিয়ে অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগ ছিল যা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তদারকি করেনি। ক্রয় প্রক্রিয়া এবং ব্যয়িত সরকারি অর্থের উপরও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কোন অডিট করা হয়নি ।

(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-০২, সাক্ষী নম্বর-২৬, সাক্ষী নম্বর-০৬, সাক্ষী নম্বর-৪২, সাক্ষী নম্বর-৪৫, সাক্ষী নম্বর-১০৭, সাক্ষী নম্বর-৮৮, সাক্ষী নম্বর-১১৭, জাতীয় তদন্ত প্রতিবেদন, সেনা তদন্ত প্রতিবেদন এবং কেস ডকেট পর্যালোচনা)।

১৪। অপারেশন ডালভাত কর্মসূচি ও বিডিআর শপ (মার্চ ২০০৭ হতে সেপ্টেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত)

ক। **ডাল-ভাত প্রকল্প।** নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখা, বাজার পরিস্থিতি তদারকি ও সুব্যবস্থাপনার অধীনে আনয়ন এবং সর্বোপরি ব্যবসা-বাণিজ্যে স্থবিরতা দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৫ মার্চ ২০০৭ তারিখ হতে ২৮ সেপ্টেম্বর ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত বিডিআরের তত্ত্বাবধানে 'অপারেশন ডালভাত' কর্মসূচি পরিচালিত হয় যেখানে ক্রয় কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করেছেন মূলত মেজর জেনারেল শাকিল এবং কর্নেল মুজিব। ডাল-ভাত প্রকল্পের অনিয়ম সমূহঃ

(১) **ডাল-ভাত প্রকল্পের ক্রয়**। মালয়েশিয়া থেকে আমদানিকৃত নিম্নমানের ভোজ্য তেল উচ্চ দামে বিক্রি করা, চীন থেকে আমদানি করা নিম্নমানের দুধ সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করা বিডিআর সদস্যদের ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলে বলে জানা যায় *(সূত্রঃ সেনা তদন্ত আদালতে উদঘাটিত তথ্যবলী পৃষ্ঠা-৭৬৩)।* এই প্রেক্ষিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে পণ্য ক্রয় করা হয়েছিল কি-না তা যাচাইয়ের জন্য কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী বিজিবি কর্তৃক প্রয়োজনীয় দলিলাদি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি *(সূত্রঃ জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন পত্র নং বিডিআরসি ০৪-২০২৫/৩৫৮ তারিখ ১৯ অক্টোবর ২০২৫, সংযোজনী-০৫)।*

(২) **ডাল-ভাত প্রকল্পে দোকান বরাদ্দ**। 'নির্মল উদ্যোগের' ব্যানারে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য সর্বসাধারণের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখার লক্ষ্যে সারাদেশে ১০০টি বিডিআর শপ চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শপগুলো পরিচালনার দায়িত্ব লে. কর্নেল কামাল আহমেদ (অব.) এর উপর ন্যস্ত করা হয় (যিনি পত্রিকায় প্রদত্ত বিজ্ঞাপন ছাড়া সরাসরি আবেদনের প্রেক্ষিতে 'নির্মল উদ্যোগের' পরিচালনার দায়িত্ব পান)। এছাড়াও বিডিআর কল্যাণ সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত ঢাকা শহরের বিভিন্ন স্থানে যে ১৮টি দোকান চালু ছিল যার মালিকানা ও লাভের অর্থ সম্পর্কে বিডিআর সদস্যদের স্বচ্ছ ধারণা না দেওয়ার বিষয়টিও তাদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে বলে ধারণা করা হয় *(সূত্রঃ সেনা তদন্ত আদালতে উদঘাটিত তথ্যবলী পৃষ্ঠা-৭৬৩)।* এই প্রেক্ষিতে নিয়মতান্ত্রিকভাবে দোকান বরাদ্দ করা হয়েছিল কি-না তা যাচাইয়ের জন্য কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী বিজিবি কর্তৃক প্রয়োজনীয় দলিলাদি সরবরাহ করা সম্ভব হয়নি *(সূত্রঃ জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন পত্র নং বিডিআরসি ০৪-২০২৫/৩৫৮ তারিখ ১৯ অক্টোবর ২০২৫, সংযোজনী-০৫)।*

খ। **আর্থিক সংশ্লেষ**। প্রাথমিক পর্যায়ে ১৫ মার্চ ২০০৭ হতে ডালভাত কার্যক্রমে বিডিআর কর্তৃক নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আনুমানিক ২০ কোটি টাকার পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে ০১ জুলাই ২০০৭ পর্যন্ত অপারেশন ডালভাত পরিচালনা করা হয়। পরবর্তীতে সরকার কর্তৃক প্রদানকৃত আনুমানিক ৩৫৪ কোটি টাকার পণ্য সামগ্রী ক্রয়ের মাধ্যমে এ অপারেশন পরিচালনা করা হয়। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধকল্পে বিডিআর কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম দেশের সাধারণ জনগণের মধ্যে ইতিবাচক সাড়া জাগালেও পূর্ব অভিজ্ঞতা ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এবং সুষ্ঠু মনিটরিং এর অভাবে বিভিন্ন অনিয়মের সৃষ্টি হয় *(সূত্রঃ সেনা তদন্ত আদালতে উদঘাটিত তথ্যবলী পৃষ্ঠা-৭৬৩)।* সেনাবাহিনী খবর পেয়েছিলো যে অপারেশন ডাল-ভাত এর যে কার্যক্রম

ছিল সেটি নিয়ে বিডিআর জওয়ানদের মধ্যে অসন্তোষ ছিল। বিডিআর জওয়ানদের এধরণের কাজে সম্পৃক্ত করা কোন ভাল উদাহরণও ছিল না *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

১৫। <u>প্রশাসনিক বিষয়াদি</u>

ক। <u>অপারেশন ডাল-ভাতের ডিএ</u>। ২৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন অপারেশন ডাল ভাতের অংশ হিসাবে ঢাকা শহরে ৫০টি আউটলেটে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি বিক্রি করছিল। এই কাজে লোয়ার লেভেলে বেশ কিছু 'মিসঅ্যাপ্রোপ্রিয়েশন' হয়। যেমন এক কেজি ডালের জায়গায় ১০ গ্রাম কম ২০/দেওয়া হতো। পরবর্তীতে ২০০৮ সালের আগস্টে সৈনিকদের জন্য সরকার থেকে কিছু 'ডেইলি এলাউন্স' (ডিএ) বরাদ্দ হয়। সকল সৈনিক তাদের নিজেদের মতো করে ডেইলি এলাউন্স পাওয়ার একটি হিসাব করে। কিন্তু সরকারি ভাতার ব্যাপারে একটি নিয়ম আছে যে' প্রথম কিছুদিন ,ফুল রেটে' পাওয়া যাবে এবং পরবর্তীতে দিনানুপাতিক হারে ডিএ কমে যাবে। ফলে তাদের হিসাব অনুযায়ী তারা কিছু কম টাকা পায়। এই কম পাওয়াটাকে তারা বঞ্চনা হিসেবে গণ্য করেছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৯)।*

খ। **<u>নির্বাচনের ডিএ</u>।** নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ এবং ৩য় উপজেলা পরিষদ নির্বাচন ২০০৯ এর জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় হতে টাকা যথাসময়ে প্রাপ্ত না হওয়ায় তা বিডিআর সৈনিকদের প্রদান করা সম্ভব হয়নি। সংসদ ও উপজেলা নির্বাচনের ডিএ যথাসময়ে প্রদান না কারার কারণসমূহও সৈনিকদের যথাযথভাবে অবহিত করা হয়নি *(সূত্রঃ সেনা তদন্ত প্রতিবেদনের উদঘাটিত তথ্যবলী, পৃষ্ঠা-৭৬৪)।*

গ। **<u>বিডিআর সদস্যদের ছুটি</u>।** ২০০১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দরবারে বিডিআর সদস্যরা সেনাসদস্যদের ন্যায় ০২ মাস বাৎসরিক ছুটির দাবি উত্থাপন করে। সীমান্ত রক্ষা, চাকরির অত্যাবশ্যকীয়তা এবং বিডিআর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন হওয়ায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূর্বের মতো ০১ মাস বাৎসরিক ছুটি বহাল রাখা হয় *(সূত্রঃ সেনা তদন্ত প্রতিবেদনের উদঘাটিত তথ্যবলী, পৃষ্ঠা-৭৬৪)।*

ঘ। **<u>বিডিআর স্কুল</u>।** জানুয়ারি ২০০৯ হতে পিলখানার অভ্যন্তরে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস্ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ রাইফেলস্ কলেজের সাথে পরিচালিত ইংলিশ সেকশন সমূহকে একত্রিত করে ন্যাশনাল কারিকুলামের একটি ইংলিশ ভার্সন স্কুল পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়। ২৪ নভেম্বর ২০০৮ এবং ১৮ ডিসেম্বর ২০০৮ নোটসিট অনুযায়ী *(সূত্রঃ সংযোজনী-০৬)* নতুন স্কুলটির নামকরণ করা হয় বীর উত্তম ফজলুর রহমান স্কুল ও কলেজ। ০২ নভেম্বর ২০০৮ এর একটি নোটসিট অনুযায়ী *((সূত্রঃ সংযোজনী-০৬)।* উক্ত স্কুলের শিক্ষক নির্বাচনের জন্য মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করা হয় উপদেষ্টা, ইংরেজি মাধ্যমকে। নোটসিট এর উপরে উপদেষ্টা হিসেবে সই করেছেন নাজনীন আহমেদ। ১৮ জানুয়ারি ২০০৯ এ প্রেরিত বীর উত্তম ফজলুর রহমান স্কুল ও কলেজের একজন শিক্ষককে নিয়োগ পত্রেও তিনি সই করেছেন *(সূত্রঃ সংযোজনী-৬)।*

ঙ। বিডিআর হত্যাকান্ডের পর ১৮ আগস্ট ২০০৯ তারিখে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস্ পাবলিক স্কুল এ্যান্ড কলেজের গভার্নিং বডির ৫৭ তম সভায় *(সূত্রঃ বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্কুল ও কলেজের ৫৭ তম সভার কার্যবিবরণী, সংযোজনী-০৬)* বীর উত্তম ফজলুর রহমান স্কুলটিকে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ ও কলেজের সাথে একীভূত করা হয়। ফেব্রুয়ারি ২০১০ অনুষ্ঠিত বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস্ পাবলিক স্কুল এন্ড কালেজের ৫৯ তম সভায় *(সূত্রঃ বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ স্কুল ও কলেজের ৫৯ তম সভার কার্যবিবরণী সংযোজনী-০৬)* সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইংরেজি মাধ্যমে বিডিআর সদস্যদের জন্য ভর্তির সময় মোট প্রদেয় ১২,০০০ টাকা থেকে কমিয়ে ২,৭০০ টাকা করা হয়।

চ। **<u>অন্যান্য বিষয়ে অনিয়ম</u>**

(১) ডালভাতের সিস্টেম লসের (ওজনে কম পাওয়া গেলে তার দায় বিডিআর সৈনিকদের উপর দেয়া হতো, জাল নোট দিয়ে ক্রেতা মালামাল ক্রয় করলে সেই টাকা সংশ্লিষ্ট বিডিআর সদস্যদের কাছ থেকে আদায় করা হতো *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১৭)।*

(২) **অস্বাভাবিক হারে সাজা**। ডালভাত কর্মসূচিতে কর্মরত বিডিআর সদস্যদের বিভিন্ন অনিয়মের কারণে অস্বভাবিক হারে সাজা দেয়া হয় যা সৈনিকদের মাঝে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১৭)।*

(৩) বিডিআর প্যারেড ২০০৯ সালে লালকালি যুক্ত জওয়ানদের অংশ গ্রহণ কিংবা দর্শক হিসেবে উপভোগ করতে পারবে না মর্মে যে সিদ্ধান্ত হয় তাও বিডিআর সদস্যদের মাঝে অসন্তোষের সৃষ্টি করে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১৭)।*

(৪) তৎকালীন ডিজির স্ত্রীর নামে টাকা পাচারের একটি খবর প্রচারিত হয়। বিষয়টি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র সচিব অবগত হবার পরও তদন্ত না করে প্রশ্নবিদ্ধ বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধই রেখে দিয়েছিলেন *(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-০২)।*

(৫) দরবার হল ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ডিজির কোর্সমেটকে দেয়া হয়। যেখানে মনোপলির কারণে ব্যবহারকারীরা সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪২) ।*

(৬) ডিজি এবং তাঁর স্ত্রীর বিরুদ্ধে বিডিআর সদস্যদের বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআইসহ অনেক অফিসার অবগত ছিলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৫, সাক্ষী নম্বর-৪৬, সাক্ষী নম্বর-১০৭ এবং সাক্ষী নম্বর-৮৮)।*

(৭) সৈনিকদের মধ্যে অসন্তোষের কারণ ছিল মূলত রেশন, চাল-ডাল, পেঁয়াজ ইত্যাদি বিতরণ ও আর্থিক সম্পর্কিত অনিয়ম। তারা মনে করত অফিসাররাই বাজার থেকে বা কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে এবং সিস্টেম লসের টাকাও তাদেরকেই বহন করতে হবে। অফিসাররা চাল-ডালের টাকা দিয়ে গাড়ি ও অন্যান্য জিনিস ক্রয় করত। এসবই সৈনিকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের কারণ *(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-০৪)।*

(৮) সেনাবাহিনী বিদ্রোহ দমনে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, বিডিআরও বিদ্রোহ প্রতিরোধে তেমনি ব্যর্থ হয়েছে। এটাকে কেবল ব্যর্থতা বলা নয়, ষড়যন্ত্রও হতে পারে। বিশেষতঃ জেনারেল শাকিলের দুর্বল নেতৃত্ব। তিনি দু'বছরে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে যাননি, কেবল পর্যটন খ্যাত সেক্টরে পরিবার, আত্মীয় স্বজন এবং বন্ধু বান্ধব নিয়ে বেড়াতে গেছেন। ডাল-ভাত কর্মসূচিতে নিয়োজিত এবং অন্যান্য সৈনিকদের সুবিধা অসুবিধার খবর রাখেননি। দৈনিক ভাতা বিতরণ নিয়ে গুজব যথাসময়ে স্পষ্টীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেননি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১)।*

২০০৯ সাল পর্যন্ত সংঘটিত উল্লেখযোগ্য বর্ডার সংঘর্ষ

১৬। রেজুপাড়া বিওপিতে সংঘর্ষের ইতিহাস। পার্বত্য চট্টগ্রামের কক্সবাজার এলাকার রেজুপাড়া সীমান্ত ফাঁড়িতে ২১ ডিসেম্বর ১৯৯১ তারিখে আনুমানিক ০৮৩০ ঘটিকায় মিয়ানমার সীমান্ত প্রহরী (নাসাকা) মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সহায়তায় মর্টার এর সাহায্যে অতর্কিত হামলা করে। উক্ত হামলায় ল্যান্স নায়েক মো. মোশারফ হোসেন নিহত এবং ০৬ জন বিডিআর সদস্য গুরুতর আহত হয়। পূর্বের দিন বিওপির বেশির ভাগ সৈনিক এলারপিতে যাওয়ায় ডিউটি পোস্টে নিয়োজিত মাত্র ১০/১২ সৈনিক শত্রুর মোকাবেলা করে। ডিউটি পোস্টের গোলাবারুদ শেষ হয়ে যাওয়ায় উপস্থিত সবাই নিরুপায় হয়ে বিওপি হতে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীতে একপর্যায়ে মিয়ানমার সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ফেরত চলে যায়। উক্ত সংঘর্ষে মিয়ানমার সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ০৩ জন ক্যাম্প এলাকায় নিহত হয়, মায়ানমারে ফিরে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে ০২ জন গুলিবিদ্ধ এবং আরো ০২ জন মায়ানমারে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। উল্লেখ্য, নাসাকা বাহিনী রেজুপাড়া ক্যাম্প হতে ০১টি মেশিন গান, ০২টি এলএমজি, ০২টি এসএমজি, ২৯টি রাইফেল ও বেশ কিছু গোলাবারুদ নিয়ে যায়। পরবর্তীতে উভয় দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক পর্যায়ে মায়ানমারের মংডুতে অনুষ্ঠিত পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে উল্লিখিত অস্ত্র ও গোলাবারুদ ফেরত আনা

সম্ভব হলেও ০১টি রাইফেল ফেরত পাওয়া যায়নি *(সূত্রঃ সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, প্রশাসন শাখা, প্রশাসনিক পরিদপ্তর, পত্র নং ৪৪.০২.১২০৫.০০৪.০৫.০০৫. ২৫/৪০৪ তারিখ ১৪ মে ২০২৫, সংযোজনী-০১)।*

১৭। <u>নাফ সংঘর্ষ</u>। ০৪ জানুয়ারি ২০০১ তারিখে টেকনাফ এ অবস্থিত ৩৬ রাইফেল ব্যাটালিয়ন এর দায়িত্বাধীন হোয়াইক্যং বিওপি এলাকার বিপরীতে আন্তর্জাতিক সীমারেখা হতে ১০০ গজ মায়ানমারের অভ্যন্তরে টোটারদ্বীপ নাসাকা ক্যাম্পের নিকটে বোট ফাঁড়ি খালে (নাফ নদীর একটি প্রশাখা) বাঁধ নির্মাণ আরম্ভ করে। সীমান্ত সংলগ্ন উক্ত বাঁধ নির্মাণের ফলে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত চিংড়ি চাষ প্রকল্পসমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার আশংকার পাশাপাশি ভূ-প্রকৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকায় উক্ত বাঁধ নির্মাণ স্থগিত করার জন্য বিডিআর কর্তৃক বিওপি, কোম্পানি এবং ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের আহ্বান জানানো হলে নাসাকা কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে বাঁধ নির্মাণ কাজ অব্যাহত রাখে। পুনঃ পুনঃ আহ্বানের প্রেক্ষিতে অবশেষ ০৭ জানুয়ারি ২০০১ তারিখে আনুমানিক ১০৪৫ ঘটিকায় কোম্পানি কমান্ডার পর্যায়ে একটি পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ বাঁধ নির্মাণ বন্ধে অস্বীকৃতি জানায়। ০৮ জানুয়ারি ২০০১ তারিখে পুনরায় ব্যাটালিয়ন এর পক্ষ থেকে বিশেষ দূত মারফত বাঁধ নির্মাণের কাজ বন্ধ করে পতাকা বৈঠকের পুনঃ আহ্বান জানানো হলে নাসাকা কর্তৃপক্ষ কোন কর্ণপাত না করে ঐ দূতকে তিরস্কার করে এবং প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। ফলে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণের নিমিত্ত স্থানীয় বিডিআর ব্যাটালিয়ন ০৮ জানুয়ারি ২০০১ তারিখে ১২১৫ ঘটিকায় হুশিয়ারিমূলক গুলি বর্ষণ করতে বাধ্য হয়। উক্ত গুলিবর্ষণের পর বাঁধ নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেয়। পরিস্থিতির অবনতি রোধকল্পে এবং প্রয়োজনে তড়িৎ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ১৮ জানুয়ারি ২০০১ তারিখ রাংগামাটি সেক্টর হতে অতিরিক্ত ২৫০ জন বিডিআর সদস্য ভারি অস্ত্রসহ উক্ত স্থানে মোতায়েন করা হয় *(সূত্রঃ সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, প্রশাসন শাখা, প্রশাসনিক পরিদপ্তর, পত্র নং ৪৪.০২.১২০৫. ০০৪.০৫.০০৫.২৫/৪০৪ তারিখ ১৪ মে ২০২৫, সংযোজনী-০১)।*

১৮। <u>পদুয়া সংঘর্ষ</u>। সিলেট সেক্টরের অধীনস্থ তৎকালীন ৪০ রাইফেল ব্যাটালিয়নের দায়িত্বাধীন সোনারহাট বিওপির বিপরীতে লাকাট এলাকায় পদুয়া বিওপির সাথে সংযোগ স্থাপনের নিমিত্ত বিএসএফ ১৯৭৫ সালের সীমান্ত চুক্তি লংঘন করে আন্তর্জাতিক সীমান্ত রেখা হতে ৩০ গজের মধ্যে ২০০১ সালের জুলাই মাসে সীমান্ত সড়ক নির্মাণের চেষ্টা করে। বিডিআরের সতর্ক অবস্থানের প্রেক্ষিতে দিনের আলোতে রাস্তা নির্মাণে ব্যর্থ হয়ে ১২ এপ্রিল ২০০১ তারিখে রাতের আঁধারে বিএসএফ রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ করে। এ ব্যাপারে বিডিআরের পক্ষ হতে জোরালো প্রতিবাদ করা সহ রাস্তাটি ভেঙ্গে ফেলার দাবি জানানো হয়। বিএসএফ কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। এ ব্যাপারে কোম্পানি ও ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে পতাকা বৈঠকের পরেও ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অনমনীয় মনোভাব পোষণ করে। আলোচনার মাধ্যমে কোন সুরাহা না হওয়ায় ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে চাপের মুখে রেখে উক্ত রাস্তা ভাঙ্গার ব্যাপারে বাধ্য করার অভিপ্রায়ে বিডিআর ১৪ এপ্রিল ২০০১ তারিখ রাতে পদুয়া এলাকায় তিনটি স্থানে অবস্থান নেয়। উক্ত অবস্থান গ্রহণকালে বিডিআর কোন ফায়ার না করলেও বিএসএফ উস্কানিমূলকভাবে ০২ রাউন্ড ফায়ার করে। অতঃপর বিডিআর নিজস্ব অবস্থান সুদৃঢ় করে কোন রক্তপাত/বুলেট ফায়ার ছাড়াই পদুয়া ক্যাম্পটি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। অন্যদিকে পদুয়া এলাকায় ১৯ এপ্রিল ২০০১ তারিখ সকাল ০৬০০ ঘটিকায় বিএসএফ অতর্কিতভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যবহৃত তিনটি এপিসিসহ বিডিআরের অবস্থান হতে মাত্র ১০ গজ দূরে অবস্থান গ্রহণ করে। পরবর্তীতে ১৯ এপ্রিল ২০০১ তারিখ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত চুক্তি অনুসারে সেক্টর কমান্ডার বিডিআর সিলেট ও ডিআইজি বিএসএফ শিলং এর মধ্যে তামাবিল আইসিপিতে পতাকা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। পতাকা বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেকে ঐদিনে বিডিআর সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করে এবং বিকাল ১৫৩০ ঘটিকায় সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে, সোনারহাট বিওপির অপর দিকে পাকা বিএসএফ রাস্তাটিও ভেঙ্গে ফেলে *(সূত্রঃ সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, প্রশাসন শাখা, প্রশাসনিক পরিদপ্তর, পত্র নং ৪৪.০২.১২০৫.০০৪.০৫.০০৫.২৫/৪০৪ তারিখ ১৪ মে ২০২৫, সংযোজনী-০১)।*

১৯। <u>বড়াইবাড়ি সংঘর্ষ</u>

ক। ১৮ এপ্রিলের কয়েকদিন পূর্ব হতে সিলেটের পদুয়া এলাকায় বিডিআর ও বিএসএফ এর মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। পদুয়া এলাকার বাংলাদেশের ভূ-খন্ডে দীর্ঘদিন ধরে ভারতের বিএসএফ ছোট একটি ক্যাম্প করে অবস্থান করছিল এবং বাংলাদেশের ভূ-খন্ডের ভিতর দিয়ে সে ক্যাম্পে যাওয়ার একটি রাস্তা তৈরি করছিল। যা বিডিআর বিনা রক্তপাতে দখল করে নেয়। এর প্রতিশোধ হিসেবে বিএসএফ সম্ভবত বিডিআরের কোন দুর্গম ক্যাম্প দখলের পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যেটাকে পদুয়া পুর্নদখলের জন্য দর কষাকষির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

খ। ১৮ এপ্রিল রাতে কাঁটা তারের বেড়া অতিক্রম করে অন্তত ৩০০ বিএসএফ সদস্য কুড়িগ্রামের রৌমারি উপজেলার বড়াইবাড়ি গ্রামে ঢুকে পড়ে এবং বিওপির অবস্থান খুঁজতে থাকে। রাতে গ্রামের মানুষজন ক্ষেতে পানি দেওয়ার জন্য সেলো মেশিনে কাজ করছিল। তাদের মধ্যে মিনহাজ নামের একটি ছেলে অসংখ্যা বিএসএফ সদস্যের বাংলাদেশে প্রবেশের বিষয়টি খেয়াল করে এবং সে ঘটনাটি সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসী ও বিডিআরের বিওপিকে জানায়।

গ। রাত প্রায় ০২৩০ হতে ০৩০০ ঘটিকার মধ্যে বিএসএফ বড়াইবাড়ি বিওপি ঘেরাও করে ফেলে। বিওপি স্ট্যান্ড টু'তে চলে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যে গোলাগুলি শুরু হয়ে যায়। দুঃখজনক ভাবে গোলাগুলির মধ্যে রাত ০২৩০ হতে ০৩০০ ঘটিকার মধ্যে এলএমজি পোস্টে দায়িত্ব পালনরত ল্যা. না. সিদ্দিক গুলিবিদ্ধ হয়ে শাহাদাত বরণ করে। বিওপি সদস্যদেরকে মনোবল না হারিয়ে বিওপিতে থেকে আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অধিনায়ক লে. কর্নেল মো. শায়েরুজ্জামান নির্দেশ দেন।

ঘ। পরের দিন সকালে ব্যাটালিয়ন সদর হতে অধিনায়কের নেতৃত্বে বড়াইবাড়ি এলাকায় রিইনফোর্সমেন্ট পৌঁছায় এবং বিএসএফের সাথে প্রচন্ড গুলি বিনিময় হয়। বিডিআর আক্রমণে বিএসএফ সম্পূর্ণরূপে পর্যুদস্ত হয়ে ভারতে পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে বড়াইবাড়ি বিওপির আশ-পাশ হতে বিএসএফ এর ১৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় এবং ০২ জন সদস্য আহত অবস্থায় আত্মসমর্পণ করে। এছাড়াও বিডিআরের মর্টার ফায়ারে বিএসএফ এর আরো অসংখ্য সদস্য হতাহত হয় বলে জানা যায় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর -১০৬)।*

ঙ। অপরদিকে, বিডিআর কর্তৃক নয়াদিল্লীস্থ বিএসএফ সদর দপ্তরসহ বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের এই অনাকাঙ্খিত হামলা বন্ধ করে বাংলাদেশের সীমানা ত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। অবশেষে বিডিআরেবং কূটনৈতিক পর্যায়ে যোগাযোগের প্রেক্ষিতে বিএসএফ তাদের অবস্থান ত্যাগ করতে সম্মত হয় এবং ২০ এপ্রিল ২০০১ সকাল থেকে প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয় এবং ২২ এপ্রিল ২০০১ তারিখে বিকালে সীমান্তে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার ব্যাপারে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা পত্র স্বাক্ষরিত হয়। এই যুদ্ধে বিডিআরের ০৩ জন বীর সৈনিক শাহাদত বরণ করেন এবং ০৫ জন সৈনিক গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন ***(সূত্রঃ সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, প্রশাসন শাখা, প্রশাসনিক পরিদপ্তর, পত্র নং ৪৪.০২.১২০৫.০০৪.০৫.০০৫.২৫/৪০৪ তারিখ ১৪ মে ২০২৫ সংযোজনী-০১)।***

<u>পদুয়া রৌমারি সংঘর্ষ নিয়ে ভারতের প্রতিক্রিয়া</u>

২০। পদুয়া ও রৌমারির যুদ্ধ বিডিআরের ইতিহাসে শৌর্য, বীর্য ও বীরত্ব প্রদর্শনের এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এই খন্ডযুদ্ধে বিএসএফ এর যে শোচনীয় ও লজ্জাজনক পরাজয় ঘটে, ভারত কখনোই মেনে নিতে পারেনি।

২১। ২০০৮ সালে ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি মেজর নাসির উদ্দিন ভারতীয় হাইকমিশনে ট্যুরিস্ট ভিসার জন্য আবেদন করেন। সে সময় ভারতীয় হাইকমিশনে মিনিস্টার কনস্যুলারের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় এবং সাক্ষাৎকারের এক পর্যায়ে মিনিস্টার কনস্যুলার জনাব নিরাজ শ্রীবাস্তব তাকে জিজ্ঞেস করেন তিনি পদুয়া সম্পর্কে কিছু জানেন কি-না? মেজর নাসির উদ্দিন এ বিষয়ে তার অজ্ঞতার প্রকাশ করলে জনাব নিরাজ শ্রীবাস্তব বলেন ''পদুয়া'তে বিডিআর ১৬-১৭ জন বিএসএফ সদস্যকে হত্যা করেছে। এটি ছিল একটি গুরুতর উস্কানিমূলক ঘটনা Padua will not go unchallenged and unpunished.' *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৫)।*

২২। তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার তৎকালীন ডিজিকে ১৭ মার্চ ২০০২ তারিখে অকালীন অবসর প্রদান করে। এখানে উল্লেখ্য যে, তৎকালীন ডিজি যতদিন চাকরিতে বহাল ছিলেন ততদিন ডিজি পর্যায়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কোন বিডিআর-বিএসএফ সম্মেলন হয়নি *(সূত্রঃ বিজিবি সদর দপ্তর পত্র নং ৪৪.০২.১২০৫.০০৩.০২.৫২৬. ২৫/৬২৮ তারিখ ০৪ মার্চ ২০২৫ সংযোজনী-০৭)।*

উদঘাটিত তথ্যাবলী

ঘটনাপূর্ব বিষয়বলী

২৩। **রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট**

ক। **সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাজনীতিতে আসার উদ্দেশ্যে**

(১) ১৯৮১ সালে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের নেত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। সাংবাদিক সিরাজুর রহমানের লেখা 'এক জীবন এক ইতিহাস' (পৃষ্ঠা ২২৮-২২৯) গ্রন্থে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনীতিতে আসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণ পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থে সাংবাদিক সিরাজুর রহমান উল্লেখ করেছেন, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জন রেনারের 'তাহলে আপনি রাজনীতিতে এসেছেন কেন' প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন 'ওরা আমার পিতাকে হত্যা করেছে, আমার মাতাকে হত্যা করেছে, আমার ভাইদের হত্যা করেছে, আমি প্রতিশোধ নিতে চাই।'

(২) জনাব সিরাজুর রহমান আরো বলেছেন, 'উত্তর-পশ্চিম লন্ডনের পার্ক রোডের এক রেস্তোরাঁয় হাসিনার একটা সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা। এক পর্যায়ে নেত্রী পার্বত্য চট্টগ্রামে সৈন্য রাখার সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন যে, 'বাংলাদেশি সৈন্যরা উপজাতীয়দের ওপর অত্যাচার করছে।' আমি বলেছিলাম যে, 'হাসিনা দেশের বৃহত্তম দলের নেত্রী, বিদেশে বসে জাতীয় সেনাবাহিনীর নিন্দা করা তার উচিত হচ্ছে না।'

(৩) **সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সহকর্মীগণ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি বিভিন্ন সময় সামরিক বাহিনীর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন** ***(সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০১ এবং রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০৬)।***

খ। **সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন ইউ আহমেদের ভারতীয় নেতৃত্বের অনুকম্পা প্রার্থনা**। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি জরুরি অবস্থা জারি ও ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ নেয় সেনাবাহিনী। সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ তারিখ ৬ দিনের সফরে ভারত গমন করেন ও প্রনব মুখার্জির সাথে সাক্ষাৎ করেন। উক্ত সাক্ষাতে হাসিনাকে আটকাবস্থা থেকে মুক্তি দিলে জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ তার চাকরির নিশ্চয়তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলে প্রনব মুখার্জি (The Coalition Years 1996-2012 by Pranab Mukherjee) জেনারেল মঈন ইউ আহমেদের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করেন।

তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ ১৫ জুন ২০০৮ তারিখ জেনারেল মঈন ইউ আহমেদের চাকরির মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় নবম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ করে। 'In February 2008, Bangladesh Army Chief Moeen Ahmed came to India on a six-day visit. He called on me too. During the informal interaction, I impressed upon him the importance of releasing political prisoners. He was apprehensive about his dismissal by Sheikh Hasina after her release. But I took personal responsibility and assured the General of his survival after Hasina's return to power.' The Coalition Years 1996-2012 by Pranab Mukherjee.

২৪। **ঘটনার পূর্বে আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে বিডিআর সদস্যদের যোগাযোগ**

ক। ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে ঢাকা ৯ আসনের আওয়ামী-লীগের প্রার্থী ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস তার প্রচারণার স্বার্থে বেশ কয়েকবার পিলখানায় জুম্মার নামাজ পড়তে যান *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৪, কয়েদি সাক্ষী নম্বর-২৫ এবং বিডিআর সাক্ষী নম্বর-০৩)।* ব্যারিস্টার তাপসের সাথে লেফটেন্যান্ট

কর্নেল ফোরকান (প্রাক্তন অধিনায়ক ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়ন), মেজর রেজাউল ইসলাম (প্রাক্তন উপ-অধিনায়ক ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়ন) এবং সিপাহী মইনুদ্দিন বসতেন। মেজর রেজার সাথে সিপাহী মইনুদ্দিন এর সম্পর্ক খুব ভাল ছিল। মসজিদে নামাজ শেষ হলে লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফোরকান মুয়াজ্জিনকে বলত যে আপনি জানালা বন্ধ করে চলে যান, আমাদের কথা বার্তা শেষ হলে দরজা বন্ধ করে চলে যাব *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৪)।* তবে বিষয়টি লে. কর্নেল ফোরকান আহমেদ ও মেজর রেজাউল ইসলাম উভয়েই অস্বীকার করেছেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০৭ এবং সাক্ষী নম্বর-১১৭)।* মরহুম মাওলানা সিদ্দিকুর রহমান (পিলখানায় কেন্দ্রীয় মসজিদের ভারপ্রাপ্ত পেশ ইমাম) এর স্ত্রী কামরুন নাহার শিরীনের ভাষ্য মতে তার স্বামী তাকে বলেছেন যে ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাস থেকেই ফজলে নূর তাপস পিলখানার সেন্ট্রাল মসজিদে কয়েক জন সৈনিক এবং ডিএডি পর্যায়ের কর্মকর্তার সাথে বৈঠক করতেন। ঘটনার পর তিনি তার স্বামীকে একদম ভেঙ্গে পড়তে দেখেন এবং বলতে শোনেন 'এখন আমি বুঝতে পারছি, কেন তারা মসজিদে বৈঠক করছিল। মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা একদম পছন্দ করতাম না। কিন্তু আমাকে বের করে দিয়ে তারা কথা বলত। এখন বুঝতে পারছি কেন তারা এসব করতো' *(সূত্রঃ বিডিআর সাক্ষী নম্বর-০৩)।*

খ। ২০০৮ এর নির্বাচনে মনোনয়ন পত্র দাখিল করার দিন ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস পিলখানার ৫ নং গেইট দিয়ে প্রবেশ করে পিলখানার ভিতরে, দরবার হলের পাশের মাঠে একটা জনসভার মত করে। সেই সভায় ২০০ জনের মত বিডিআর সদস্য অংশ নিয়েছিল। সেখানে ব্যারিস্টার তাপস বলেন যে আপনাদের তো অনেক দাবি-দাওয়া এবং অভাব-অভিযোগ আছে। তবে এখানে সব কথা আলোচনা করা যাবে না। আপনারা আমার চেম্বারে আসবেন। এর কিছুদিন পরে ১০-১৫ জন বিডিআর সদস্যের একটা দল তোরাব আলী ও তার ছেলে লেদার লিটনের নেতৃত্বে ব্যারিস্টার তাপসের চেম্বারে দেখা করে *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৪)।*

গ। বিডিআর সৈনিকদের সাথে ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসের যোগাযোগ এর মাধ্যম ছিল যুবলীগ এর নেতা জাকির, লেদার লিটন এবং আওয়ামী লীগ এর নেতা তোরাব আলী। তোরাব আলীর বরাতে নায়েক শেখ শহীদুর রহমান-এর ভাষ্য, 'শেখ সেলিম এবং তাপস অনেকবার তোরাব আলীকে ডেকে বিডিআরের সৈনিকদের অবস্থা এবং দাবি-দাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করেছে। এরপর শেখ সেলিম তোরাব আলীকে দায়িত্ব দিয়েছে বিডিআর সৈনিকদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে আরো খোঁজ নিতে এবং তাদের সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা করতে। সেসময় শেখ সেলিমের সাথে ব্যারিস্টার তাপসও উপস্থিত ছিল।' নায়েক শেখ শহীদুর রহমানকে তোরাব আলীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, শেখ সেলিমের সাথে বিডিআর সৈনিকদের পরিকল্পনা হয়েছিল মূলত অফিসারদের জিম্মি করার। এরপর সোহেল তাজ এবং শেখ সেলিমের উপস্থিতিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW এর ২৪ জনের একটি কিলার গ্রুপের সাথে বৈঠক হয়। ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসের উপর দায়িত্ব ছিল কিলারসহ বিডিআর সৈনিকদের নিরাপদে পালানোর সুযোগ করে দেয়ার। ভারতীয়দের সাথে বৈঠকের পরে পুরো পরিকল্পনা সাজানো হয় এবং সমন্বয় করার জন্য তাপসের বাসায় বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিল জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, জনাব মির্জা আজম, ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, শেখ সেলিম, লেদার লিটন এবং তোরাব আলী। সেখানে যখন জানানো হয় যে, অফিসারদের হত্যা করা হবে, তখন তোরাব আলী সেখানে আপত্তি করে। সে বলে যে অফিসারদের হত্যা করা যাবে না। তখন শেখ সেলিম তাকে মুরুব্বি সম্বোধন করে বলেন, 'আপনার তো বয়স হয়েছে। আপনার আর এর মধ্যে থাকার দরকার নাই। আপনার ছেলে আমাদের সাথে থাকলেই হবে।' ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন এর সিও কর্নেল শামস এই বিষয়গুলো জানতেন এবং তিনিও শেখ সেলিম এবং তাপসের সাথে দেখা করার ব্যাপারে সৈনিকদের সহায়তা করেছেন *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-২৪)।*

ঘ। ঝাড়ুদার আব্দুল হাকিম অন্তত তিন দিন দেখেছেন যে ফজলে নূর তাপস ডিএডি তৌহিদের সাথে এবং আরো সৈনিকদের সাথে নামাজের পরে মসজিদের ভিতরে বৈঠক করছে। ফজলে নূর তাপস মাঝে মাঝে ভোট চাইতে পিলখানায় আসতেন এবং ভোটের দিনও পিলখানায় এসেছিলেন। ভোটের দিন অনেক সৈনিকসহ ঝাড়ুদার আব্দুল হাকিমকেও জড়িয়ে ধরে নৌকা মার্কায় ভোট দিতে অনুরোধ করেছেন *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-২৫)।*

ঙ। নির্বাচনের পরে ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নে লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামসুল আলম চৌধুরী কমান্ডিং অফিসার অধিনায়ক হিসেবে বদলি হয়ে আসেন। সিপাহী সেলিম যেহেতু অফিস ক্লার্ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন তাই লে. কর্নেল শামস তাকে চিনতেন। একদিন ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের বাস্কেটবল গ্রাউন্ডে লে. কর্নেল শামস সিপাহী সেলিমকে ডেকে বললেন, 'তোমরা তো তোমাদের দাবি-দাওয়ার কথা বললে কিন্তু কোন কাজ তো হল না। তোমরা শেখ সেলিমের সাথে দেখা কর। তোমাদের সাথে শেখ সেলিমের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।' ঐ সময় লে. কর্নেল শামস শুধু সিপাহী সেলিমকেই ডেকেছিলেন, আর কেউ ছিল না *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৪)।*

চ। পরবর্তীতে সিপাহী সেলিম এবং মইনুদ্দিনসহ আরো ২০-২২ জন (সিপাহী সেলিমের ১৬৪ ধারা জবানবন্দী অনুসারে এখানে ছিল সিপাহী মইনুদ্দিন, ল্যান্স নায়েক শাহাবুদ্দিন, সিপাহী কাজল, হাবিলদার মনির, সিপাহী আইয়ুব, সিপাহী মেহেদি, সিপাহী সাজ্জাদ, সিপাহী আরপি রেজাউল, প্রিম কোচিং সেন্টারের জাকির, ডিএডি হাবিব, ডিএডি জলিল) শেখ সেলিমের বনানীর বাসায় ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে দেখা করে। মইনুদ্দিন শেখ সেলিমের বাসার গেইটে লেফটেন্যান্ট কর্নেল শামস এর কথা বলতেই সবাইকে গেস্ট রুমে বসতে দেয় এবং কিছুক্ষণ পর শেখ সেলিম নেমে আসেন। শেখ সেলিমের কাছে মইনুদ্দিন তাদের দাবি-দাওয়া যেমন নিজস্ব অফিসার, ডাল-ভাতের দুর্নীতি, ১০০ শতাংশ রেশন, বিদেশ মিশন ইত্যাদি তুলে ধরে। এসব আলোচনা শেষে শেখ সেলিম মইনুদ্দিনকে বলেন যে তিনি সবকিছু প্রধানমন্ত্রীকে জানাবেনে এবং প্রধানমন্ত্রীর গ্রিন সিগন্যাল পেলে তা তাদেরকে জানানো হবে। তিনি বলেন, 'তোমরা অফিসারদের জিম্মি করে রাখবা। এরপর কী কী করতে হয় আমরা করব। তোমাদের দাবি-দাওয়া কিভাবে আদায় করতে হয়, আদায় করে দিব।' *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৪ এর ১৬৪ ধারা জবানবন্দী প্রদর্শিত বস্তু, সংযোজনী-০৮)।*

ছ। ফজলে নূর তাপস ১৬১ ধারায় প্রদত্ত জবানবন্দীতেও স্বীকার করেছেন যে তাঁর কাছে বিডিআর সদস্যরা দাবি-দাওয়া নিয়ে এসেছিল। তিনি বিডিআর সদস্যদের দাবি-দাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানাবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন এবং পরবর্তীতে নিশ্চিত করেন যে তিনি দাবি-দাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন *(সূত্রঃ ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসের ১৬১ ধারা জবানবন্দী, সংযোজনী-০৯)।*

জ। ঐদিনই (২০ বা ২১ জানুয়ারি) সিপাহী সেলিমরা শেখ সেলিমের বাসা হতে চলে যাওয়ার পরে সোহেল তাজ এর নেতৃত্বে, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এবং শেখ সেলিমের নিজস্ব কিছু লোকজন নিয়ে বিডিআর সংক্রান্ত আরো একটি বৈঠক হয়। ২২ বা ২৩ ফেব্রুয়ারি মইনুদ্দিনকে শেখ সেলিম জানায় যে প্রধানমন্ত্রীর গ্রিন সিগন্যাল পাওয়া গেছে *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৪)।*

ঝ। এনএসআইয়ের তৎকালীন সহকারী পরিচালক TFI সেলে কাজ করার সময় বিভিন্ন জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারেন যে, শেখ সেলিম, ব্যারিস্টার তাপস, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন, জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানকের সাথে বিদ্রোহের পূর্বে বিডিআর জওয়ানরা নিয়মিত সাক্ষাৎ করেছেন। শেখ সেলিম তখন আর্মি অফিসারদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'জওয়ানরা দাবি আদায়ে দুই-একজনকে মেরেও ফেললে সমস্যা নেই' *(সূত্রঃ এনএসআই সাক্ষী নম্বর-০১)*

ঞ। ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সন্ধ্যায় ডিএডি হাবিবের গাড়িতে করে সিপাহী সেলিম, ডিএডি জলিল, ডিএডি হাবিব এবং আরো কয়েকজন বিডিআর সৈনিক তেজকুনিপাড়ায় হোটেল ইমপেরিয়াল-এ তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের সাথে দেখা করতে যায়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে না পাওয়ায় তারা পরেরদিন স্বরাষ্টমন্ত্রীর বেইলি রোডের বাসায় যায় কিন্তু সেইদিনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে কথা হয়নি। এভাবে দুই তিনবার চেষ্টার পরেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দেখা করতে না পেরে তাদের ৫৫টি দাবি-দাওয়া সম্বলিত একটি দাবিনামা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এপিএসের কাছে দিয়ে আসেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সিপাহী সেলিম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে ফোন করে এপিএসের নিকট প্রদত্ত তাদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে আলাপ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাকে জানান যে, তিনি দাবিগুলো দেখার সময় পাননি। *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী-২৪ এর ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী সংযোজনী-০৫)।* জনাব আনিস-উজ-জামানের নেতৃত্বাধীন জাতীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে ৫১ টি দাবি সম্বলিত একটি দাবিনামা সংযোজিত হয়েছে *(সূত্রঃ সংযোজনী-১০)*

ট। **২৫ ফেব্রুয়ারির অব্যবহিত পূর্বে ফজলে নূর তাপসের অফিসে বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ডের চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।** 'তোরাব আলীর দেয়া তথ্য অনুযায়ী, শেখ সেলিমের সাথে বিডিআর সৈনিকদের পরিকল্পনা হয়েছিল মূলত অফিসারদের জিম্মি করার। এরপর সোহেল তাজ এবং শেখ সেলিমের উপস্থিতিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ২৪ জনের একটি কিলার গ্রুপের সাথে বৈঠক হয়। ফজলে নূর তাপসের উপর দায়িত্ব ছিল কিলাদেরসহ বিডিআর সৈনিকদের নিরাপদে পালানোর সুযোগ করে দেয়ার।' বিডিআর সদস্যরা ছাড়াও এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন নানক, মির্জা আজম, ফজলে নূর তাপস, শেখ সেলিম, লেদার লিটন এবং তোরাব আলী। সেখানে যখন জানানো হয় যে অফিসারদের হত্যা করা হবে, তখন তোরাব আলী সেখানে আপত্তি করে। সে বলে যে অফিসারদের হত্যা করা যাবে না। তখন শেখ সেলিম তাকে 'মুরুব্বি' সম্বোধন করে বলেন, 'আপনার তো বয়স হয়েছে। আপনার আর এর মধ্যে থাকার দরকার নাই। আপনার ছেলে আমাদের সাথে থাকলেই হবে' *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-২৪)।* আওয়ামী লীগ নেতাদের উপস্থিতিতে বৈঠকের পরে তোরাব আলীর মাধ্যমে বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ডের উদ্দেশ্যে বিডিআর সদস্যদের মাঝে বিপুল পরিমান টাকা বিতরণ করা হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৪ ভিডিও সাক্ষ্য এবং শহীদ পরিবার সাক্ষী নম্বর-১১)।*

ঠ। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখের ঘটনার পূর্বে মেজর (পরবর্তীতে লে. কর্নেল) রওশনুল ফিরোজ মেজর খন্দকার আব্দুল হাফিজ (অব.)-কে বেশ কয়েক শুক্রবার জুম্মার নামাজের পরে ডিএডি নাসিরের সঙ্গে অফিসার বাসস্থানের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দেখেন। একবার ডিএডি জলিলও সেখানে ছিলেন। একদিন মেজর রওশনুল ফিরোজ মেজর খন্দকার আব্দুল হাফিজকে জিজ্ঞেস করেন ডিএডি নাসির তার (মেজর হাফিজ) আত্মীয় কি-না। উত্তরে মেজর হাফিজ বলেন ডিএডি নাসিরের সঙ্গে তার শুধু পরিচয় আছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর- ৬৬)*

২৫। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখের পূর্বে হত্যাকারীদের বৈঠক। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সন্ধ্যায় ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের মাঠে সিপাহী মইনুদ্দিন, সিপাহী শাহাদাত (১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়ন), সিপাহী রুবেল (১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়ন), সিপাহী মিজান (৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন), সিপাহী হাসিবুল, সিপাহী কাজলসহ ১৪/১৫ জমা হয়। সেখান থেকে ৫ নং গেইট দিয়ে বের হয়ে আনুমানিক ১০০ গজ সামনে একটি টিনশেড বিল্ডিংয়ের খালি বাসাতে ৩০/৩৫ জন মিটিং করে। আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সকাল ০৭০০ ঘটিকায় সবাই ৪৪ ব্যাটালিয়নের মাঠে সমাবত হয়ে কোত ও ম্যাগাজিন লুট করে অফিসারদের জিম্মি করা হবে। অফিসারদেরকে রাইফেলস্ পাবলিক স্কুল ও কলেজে জিম্মি করে রেখে সরকারকে জানিয়ে দাবি আদায় করা হবে *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী-১৪ ও কয়েদি সাক্ষী-২২ এর ১৬৪ ধারায় জবানবন্দী সংযোজনী-৮)।*

২৬। **ঘটনাপূর্ব অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমুহ**

ক। **রাইফেলস সপ্তাহ ২০০৯ এর তারিখ বারংবার সংশোধন।** সদর দপ্তর বাংলাদেশ রাইফেলস, প্রশাসনিক পরিদপ্তর পত্র নং ৩০৪/১৩/××/এ তারিখ ২৫ নভেম্বর ২০০৮ *(সূত্রঃ **সংযোজনী**-০৭)* অনুযায়ী বিডিআর সপ্তাহ উদযাপিত হওয়ার কথা ছিল ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত। একই পরিদপ্তরের পত্র নং-৩০৪/১৩/×××/এ তারিখ ১০ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ *(সূত্রঃ **সংযোজনী-১১**)* এর মাধ্যমে তা সংশোধন করে ০২ মার্চ ২০০৯ হতে ০৬ মার্চ ২০০৯ করা হয়। পরবর্তীতে একই পরিদপ্তরের পত্র নং-৩০৪/১৩/×/এ তারিখ ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ *(সূত্রঃ **সংযোজনী-১১**)* মাধ্যমে বিডিআর সপ্তাহের তারিখ পুনরায় সংশোধন করে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ করা হয় যেখানে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজের দিন ধার্য্য ছিল ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এবং প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে নৈশভোজের দিন ধার্য ছিল ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯। পরবর্তীতে একই পরিদপ্তরের পত্র নং ৩০৪/১৩/X/এ, তারিখ ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ *(সূত্রঃ **সংযোজনী-১১**)* এর মাধ্যমে বিডিআর সপ্তাহের তারিখ পুনরায় পরিবর্তন করে ২৩ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি করা হয় এবং সে অনুযায়ী ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয় এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সকাল ০৮০০ ঘটিকায় মহাপরিচালকের দরবার এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সন্ধায় প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে নৈশভোজ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। তবে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ডিজি বিডিআর প্যারেড গ্রাউন্ডে সকলকে জানান যে প্রধানমন্ত্রী নৈশভোজে আসবেন না ***(সূত্রঃ সাক্ষী***

নম্বর-৫৫)। বিষয়টি কাকতালীয় হলেও হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ বিডিআর সৈনিকদের সভার পরই ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর সপ্তাহের তারিখ চূড়ান্ত হয়।

খ। **বিডিআর সদর দপ্তর থেকে ইউনিফর্মের কাপড় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অপসারণ**। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দিকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে দুইটি গাড়ি পিলখানায় এসে বিডিআর সৈনিকদের জন্য বরাদ্দকৃত ইউনিফর্মের ০৯ থান কাপড় নিয়ে যায়। ঐ সময় ভান্ডারে দায়িত্ব পালনকারী হাবিলদার জসিম উদ্দিন খানের সাক্ষ্য অনুযায়ী আনুমানিক ১০০০ থেকে ১১০০ ঘটিকার দিকে দুইটি গাড়ি ভান্ডারের গেইট এ এসে হর্ন দেয় এবং দায়িত্বরত সিপাহীকে গেইট খুলে দিতে বলে। তাদের পরিচয় জানতে চাইলে তারা বলেন তারা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এসেছেন। গাড়ি ঢুকিয়ে ০২ জন সিভিল অফিসার নামেন এবং তখন ভান্ডারে কর্তব্যরত অফিসারের (মেজর বা ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার) সাথে কথা বলেন। কথা বলে তারা ফেরত এলে সুবেদার ইসহাক ভান্ডার খুলে ০৯ থান নতুন ইউনিফর্ম এর কাপড় তাদের কাছে হস্তান্তর করেন। হাবিলদার জসিমের সাক্ষ্য অনুযায়ী এসব কাপড় প্যারেড এর জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল এবং তখনো এই কাপড় সৈনিকদের জন্য ইস্যু করা হয়নি। হাবিলদার জসিম যখন এরকম একটি ঘটনা নিয়ে ভান্ডারে সুবেদার ইসহাককে জিজ্ঞেস করে কাপড় কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন তিনি জানান এসব কাপড় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নেওয়া হচ্ছে এবং তারা বিডিআরের ইউনিফর্ম পরে প্যারেড দেখতে আসবেন। এরকম নজিরবিহীন একটি ঘটনা শুনে হাবিলদার জসিম বিস্ময় প্রকাশ করলে সুবেদার ইসহাক তাকে বলেন 'বাবারে, উপরের দিকে তাকাইয়ো না, নিচের দিকে তাকাও' *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-০৮)।*

গ। **তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ এর জন্য বিডিআর ইউনিফর্ম তৈরি করা।** বিডিআর সদর দপ্তরে কর্মরত দর্জি আসিফুর রহমান এর সাক্ষ্য অনুযায়ী ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে তিনি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ এর জন্য ইউনিফর্ম বানাতে তার অফিসে গমন করেন এবং তার শরীরের মাপ নিয়ে আসেন। সোহেল তাজ এর ইউনিফর্ম বানানোর জন্য সদর রাইফেল ব্যাটালিয়ন এর মেজর মোস্তাক তাকে নির্দেশ দেন। ইউনিফর্মের জন্য মাপ নিতে বিডিআর হত্যাকান্ডে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী ডিএডি তৌহিদ আকাশকে সোহেল তাজ এর অফিসে নিয়ে যান। সেখানে সোহেল তাজ এর শরীরের মাপ নিয়ে তার কিছুদিন পরেই তিনি ইউনিফর্ম তৈরি করে সোহেল তাজ এর অফিসে পৌঁছে দেন। আকাশের এর সাক্ষ্য অনুযায়ী ইউনিফর্ম এ কোন র‍্যাংক লাগানো হয়নি কিন্তু ডিপ সাইন ছিল। ইউনিফর্ম পৌঁছে দেয়ার দিন আকাশ এর সাথে সোহেল তাজ এর দেখা হয়নি। আকাশ আরো জানান যে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ প্যারেড দেখতে আসবেন বলে তার নিজের জন্য একটি ইউনিফর্ম বানাচ্ছেন, এমন অভূতপূর্ব ঘটনা অন্যান্য অফিসাররা জানতে পারলে তাদের মধ্যে ব্যাপক কৌতুহল সৃষ্টি করে এবং তারা অনেকেই ইউনিফর্মটি দেখেন যেমন হত্যাকান্ডে শহীদ কর্নেল আনিস, মেজর হুমায়ুন প্রমুখ *(সূত্রঃ বিডিআর সাক্ষী নম্বর-২২)।*

ঘ। **বিডিআর সদর ব্যাটালিয়নের ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর মোস্তাক ২৫ ফেব্রুয়ারির ২/১ দিন আগে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত দেহরক্ষী মেজর শোয়েব মোঃ তারিক উল্লাহ (অব.)কে সতর্ক করেন যেন ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রী পিলখানায় না আসেন। মেজর শোয়েব খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন যে, শেখ হাসিনা আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি পিলখানায় যাবেন না** *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০৯ এর ভিডিও সাক্ষাৎকার, সংযোজনী-১৮)।*

ঙ। **লিফলেট**

(১) **কমান্ড চ্যানেল কর্তৃক বিডিআর সদস্যদের অসন্তোষ অনুধাবন এবং প্রেষণার মাধ্যমে তা প্রশমনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার কারণে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যরা রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাৎ পরবর্তী সময়ে বিক্ষিপ্তভাবে লিফলেটে তাদের দাবি, অসন্তোষ এবং তাদের পরবর্তী পদক্ষেপের বিষয়ে স্পষ্ট বার্তা দেয় ।**

(২) ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে আরএসইউ অফিসারগণ একটি লিফলেট হাতে পায়। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সকাল বেলা আরএসইউ এর নায়েক জাহাঙ্গীর টেলিফোনে হাবিলদার

মাসুদকে জানায় ২৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সিঁড়ির নিচে বিভিন্ন দাবি দাওয়া সম্বলিত একটি লিফলেট লাগানো আছে। হাবিলদার মাসুদ লিফলেটটি এনে মেজর সোহেল শাহনেওয়াজকে দেয়। পরবর্তীতে আরো দুটি লিফলেটের একটি জেসিও মেসের নিকট গাছের থেকে, অন্যটি নূর মোহাম্মদ কলেজের সামনে থেকে উদ্ধার করা হয়। মেজর শাহনেওয়াজ, জেডএফএসও, ঢাকা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে আনুমানিক ১০০০ ঘটিকায় উক্ত লিফলেটটি সম্পর্কে অধিনায়ক, আরএসইউকে জানায়। অধিনায়ক, আরএসইউ মেজর শাহনেওয়াজ ও মেজর আসাদ-উদ-দৌলার সাথে তার অফিসে বসে লিফলেট সম্পর্কে আলোচনা করেন। অধিনায়ক আরএসইউ, মেজর শাহনেওয়াজ ও মেজর আসাদকে জানায় যে, ডিজি মহোদয় এ ব্যাপারে একটি কাউন্টার লিফলেট তৈরি করে সকল ক্যান্টিন এবং অন্যান্য জায়গায় লাগাতে বলেছেন। মেজর আসাদ একটি লিফলেট তৈরির কাজ অনেকটা সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে ডিজি পুনরায় জানান যে কাউন্টার লিফলেটের প্রয়োজন নেই, এ বিষয়ে তিনি দরবার হলে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বিস্তারিত জানাবেন। লিফলেটে উল্লিখিত প্রধান বিষয়গুলো ছিলঃ

(ক) বাংলাদেশ রাইফেলস একটি স্বাধীন দেশের পরাধীন, অবহেলিত বাহিনী।

(খ) এই বাহিনীতে সেনাবাহিনীর অফিসাররা কমান্ড করতে এসে পাজারো, নিশান পেট্রোল এর মত বিলাস বহুল গাড়ি ও বিলাসবহুল কোয়ার্টার ব্যবহার করে।

(গ) বেতন বৈষম্যের নেত্রী খালেদা জিয়া দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে পুলিশ বিডিআরের বেতন এক কোটায় এবং সেনাবাহিনীর বেতন অন্য কোটায় দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

(ঘ) প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি মাত্র দাবি বিডিআর থেকে সেনাবাহিনীর অফিসার তুলে নেওয়া হোক।

(ঙ) সেনাবাহিনীর অফিসাররা কোন রকম জবাবদিহিতা ছাড়া যা মন চায় তাই করে।

(চ) ইউনিটের সৈনিক মেসে সৈনিকের প্রাপ্য খাবার দেওয়া হয় না। মেস কমান্ডার মাসের শেষে ৪ লক্ষ টাকা ব্যালেন্স না দেখালে তার প্রমোশন বন্ধ থাকে।

(ছ) ডিজি এবং ঢাকা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মুজিবুল হক ডাল ভাতের মালামাল স্টক করে দাম বাড়িয়ে অনেক টাকা আত্মসাত করেছে। প্রায় ৬০০ কোটি টাকা মেজর মাহবুবের নেতৃত্বে বিদেশে পাচার করার সময় জিয়া বিমান বন্দরে ধরা পড়ে।

(জ) অফিসাররা ইজতেমা ডিউটিতে থাকা সৈনিকের নাস্তার বাজেটের টাকা খেয়ে ফেলেছেন।

(ঝ) ডিজি মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ, সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মুজিবুল হক এবং ডিজির স্ত্রীর ব্যাংক একাউন্ড তদন্ত করা প্রয়োজন।

(ঞ) ডাল ভাতের টাকা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার গাড়ি কিনে সে গাড়ি আবার নিজেরাই নিলামে ৮ লক্ষ টাকার গাড়ি ১ লক্ষ টাকায় নিয়েছে।

(ট) বিডিআর বাহিনীতে ওদের দেখতে চাইনা। প্রয়োজনে আন্দোলনের মাধ্যমে কুকুরের ন্যায় সরাব।

(সূত্রঃ সাক্ষী নং-৭১, লিফলেট সংযোজনী-১২)।

(৩) ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে আনুমানিক ১০০০ ঘটিকায় অধিনায়ক রাইফেলস্ সিকিউরিটি ইউনিট (আরএসইউ) তার অফিসে মেজর শাহনেওয়াজ ও মেজর আসাদকে ডেকে লিফলেট সম্পর্কে আলোচনা করেন এবং ডিজি বিডিআরের নির্দেশনা অনুযায়ী একটি কাউন্টার লিফলেট প্রস্তুত করতে মেজর আসাদকে নির্দেশ দেন। কাউন্টার লিফলেটে নিম্নবর্ণিত বিষয় সমূহ উল্লেখ করা সিদ্ধান্ত হয়। লিফলেটটি ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখের মধ্যে প্রস্তুত করার নির্দেশ দেওয়া হয়ঃ

(ক) গত ৩/৪ বছরে সৈনিকদের জন্য ওয়েলফেয়ার জাতীয় যে সমস্ত কাজ করা হয়েছে, যেমন মেয়ের বিবাহে এবং চিকিৎসার জন্য আর্থিক অনুদান, হাসপাতালের চিকিৎসা সুবিধার উন্নতি।

(খ) বিভিন্ন স্থান থেকে সৈনিক ও তার পরিবারকে দ্রুত চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারে Evacuation.

(গ) পিলখানার দুটি স্কুলে বিডিআর সদস্যদের সন্তানদের জন্য কোটা বর্ধিতকরণ।

(ঘ) অপারেশন ডাল-ভাত এর টাকা প্রদান করা হয়েছে।

(ঙ) সৈনিকদের রেশন, বাসস্থান, পোষাক ইত্যাদি সুবিধা বৃদ্ধি।

(চ) বিওপির উন্নয়ন এবং পেট্রোলিং এর জন্য যে সমস্ত নতুন গাড়ি কেনা হয়েছে, ইত্যাদি।

কিছুক্ষণ পরেই অধিনায়ক আরএসইউ মেজর আসাদকে বলেন যে, ২২ ফেব্রুয়ারি নয় বরং ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখের মধ্যে লিফলেটটি প্রস্তুত করতে হবে। মেজর আসাদ লিফলেট প্রস্তুতের সময় অধিনায়ক তাকে এবং মেজর শাহনেওয়াজকে পুনরায় তার অফিসে ডাকেন এবং বলেন যে, কাউন্টার লিফলেট ছাপানোর দরকার নেই, ডিজি এ ব্যাপারে দরবারে বিস্তারিত বলবেন বলে জানিয়েছেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৭১)।*

(৪) গত ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সন্ধ্যার দিকে মেজর মুন্সী মাহবুবুর রহমানকে তার ব্যাটালিয়ন অধিনায়ককে ফোন করে বলেন যে সকল অফিসারকে অফিসে যেতে হবে। সৈনিকদের মাঝে লিফলেট বিলি হয়েছে। এই ব্যাপারে কনফারেন্স হবে। মাগরিব নামাজের পরে তারা অফিসে যান। পরবর্তীতে ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক ও আরএসইউ এর ঢাকা ডিটাচমেন্ট কমান্ডার মেজর শাহনেওয়াজ তাদের অফিসে আসে। লিফলেট নিয়ে আলোচনা হয়। লিফলেট হাতে না পেলেও তারা লিফলেটের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে জানতে পারেন। লিফলেটের প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ ছিল নিম্নরুপঃ

(ক) বিডিআর সেনাবাহিনী অফিসারদের কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতে চায় না।

(খ) অপারেশন ডাল-ভাত নিয়ে তাদের অসন্তোষ।

(গ) মহাপরিচালক কর্তৃক গৃহীত কিছু পদক্ষেপের ফলে তাদের আর্থিক ক্ষতি।

(ঘ) ইলেকশন ডিউটি ও বিশ্ব ইজতেমা ডিউটি পালনকালীন সময়ে তাদের প্রাপ্য আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্ত না হওয়া, ইত্যাদি।

(৫) ২৩ ফেব্রুয়ারি কর্নেল মাহমুদুর রহমান চৌধুরী তার রিপোর্টারের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি লিফলেট নিয়ে বিডিআরের তৎকালীন ঢাকা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মুজিবুল হকের বাসায় যান। কর্নেল মুজিব লিফলেটটি ছুড়ে মেরে বলেন এরা কিছু জানেনা *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৪)*

(৬) ২৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সুবেদার মেজর গোফরান মল্লিক ২০০৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তাদের ব্যাটালিয়নে দেয়ালে টাঙ্গানো অবস্থায় একটি লিফলেট দেখতে পান। লিফলেটটি ঐ সময়েই আরএসইউ এর লোকজন এসে নিয়ে যায়। পরের দিন ২৪ তারিখ সকাল ৮ টা থেকে সাড়ে আটটার মধ্যে তিনি তার অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল লুৎফরকে লিফলেট সম্পর্কে জানান। লে. কর্নেল লুৎফর তাকে জানান যে, সব অফিসার লিফলেট সম্পর্কে জানেন, এটি নিয়ে তাদের মধ্যে মিটিং হয়েছে। এটি নিয়ে তাকে চিন্তা করতে হবে না *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-০৪)।*

(৭) মেজর শাহনেওয়াজ এই লিফলেট ঘটনার সাথে ৪৪ ব্যাটালিয়ন এর সৈনিকদের জড়িত থাকার ব্যাপারে মোটামুটি নিঃসন্দেহ ছিলেন। তাই তিনি এই ব্যাটালিয়নের অধিনায়কের অফিসে এসেছিলেন। এই লিফলেট ঘটনার পর থেকে পিলখানার নিরাপত্তা বৃদ্ধিকল্পে সকল বহিরাগত

মেহমানকে পিলখানা ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়। অবশ্য এর সাথে প্রধানমন্ত্রীর আগমনের ব্যাপারটিও জড়িত ছিল। এছাড়া মাগাজিন ও কোয়ার্টার গার্ডে ডিউটিতে অফিসারদেরকে নিয়োগ দেয়া হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নং ৭৮)।*

চ। **লিফলেটের তথ্য জানার পর সেনাবাহিনী, বিডিআরেবং গোয়েন্দা সংস্থার গৃহীত ব্যবস্থা**

(১) **সেনাবাহিনী**। ডিএমআই এর ভাষ্য মতে সেনাসদর আগেই জানতে পারে বিডিআর সদস্যরা মার্চ ২০০৮ থেকে চাঁদা তুলছিল বিদ্রোহের জন্য। কিন্তু সেনা সদর কোন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৪)*

(২) **বিডিআর।** ডিজি বিডিআর লিফলেটের তথ্য সরকার এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন এবং অধিকতর তথ্য সংগ্রহের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৮)।* ডিজি বিডিআরের উচিৎ ছিল তাৎক্ষণিক ভাবে লিফলেটের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

(৩) **ডিজিএফআই**। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ডিজিএফআই এর মেজর মুরতাজা ২৪ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় অনুষ্ঠিতব্য প্যারেডের ভেন্যুতে গিয়ে ইঙ্গিত পান যে বিডিআরের ভেতরে কিছু অসন্তোষ বিদ্যমান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার ডিটাচমেন্ট কমান্ডার কর্নেল আলমাস রাইসুল গণিকে জানান এবং এফএসদের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি নিশ্চিত হন যে, বিডিআর সদস্যরা লিফলেট বিতরণ করেছে। তিনি মেজর গাজ্জালি, লে. কর্নেল ইনশাদ, মেজর শাহনেওয়াজ এবং মেজর আসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোন সাড়া পাননি। এমন কি মেজর শাহনেওয়াজ কোনরকম তথ্য শেয়ার করতেও অস্বীকৃতি জানান *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৮)।* লিফলেটের তথ্য তৎকালীন পরিচালক সিআইবি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন খালেদকে জাননো হয় এবং পরিচালক সিআইবি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন খালেদ বিষয়টি তৎকালীন ডিজি বিডিআরকে জানিয়েছিলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৮ এবং সাক্ষী নম্বর-৪৬)।*

(৪) **এনএসআই**। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর সদস্যদের দাবি-দাওয়া সম্বলিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আহ্বান করা লিফলেটটি এনএসআই এর নজরে আসে এবং তাৎক্ষণিকভাবে তারা মৌখিকভাবে তা আরএসইউ সদস্য মেজর মাহমুদুল হাসানকে অবহিত করে। কিন্তু বিষয়টি এনএসআই সরকারকে জানায়নি। লিফলেটটিতে সেনা কর্মকর্তাদেরকে 'কুকুরের মত সরাবো' মর্মে যে হুমকি দেয়া হয়েছে তাতে এনএসআই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে বলে প্রতীয়মান হয় না *(সূত্রঃ ২০০৯ সালে গঠিত জাতীয় কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা নম্বর-১৮)*।

(৫) **পুলিশ**। পুলিশ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সকাল ০৮০০ ঘটিকায় নিউমার্কেট এলাকায় আলোচিত লিফলেটটি হাতে পায় যেখানে সামরিক অফিসারদেরকে 'কুকুরের মত' তাড়িয়ে দেয়ার মত ভয়ানক বার্তা ছিল। পুলিশ উক্ত লিফলেটের বিষয়ে বিডিআরের মেজর গাজ্জালিকে জানায় এবং বিডিআর থেকে এফএস পাঠিয়ে উক্ত লিফলেট সংগ্রহ করা হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৭১)।*

ছ। **ঘটনার পূর্ব রাত**। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে রাতে ডিজির বাসভবনে আয়োজিত নৈশভোজে ডিনারের সময় তাঁর কিছু কোর্সমেট উপস্থিত ছিলেন। নৈশভোজ চলাকালে ২১৩০ ঘটিকায় ডিজির বাসভবনে ঢাকা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মুজিবুল হক ডিজিকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ০৮০০ ঘটিকায় নির্ধারিত দরবারের সময়সূচি পরিবর্তন করতঃ তা ০৯০০ ঘটিকায় করার জন্য অনুরোধ জানান। ডিজি, ডিওটি কর্নেল আনিস এর সাথে টেলিফোনে এ বিষয়ে কথা বলেন ও দরবারের সময়সূচি পরিবর্তনের আদেশ প্রদান করেন। *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১২)।*

জ। **বিডিআরের অসন্তোষ নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অবস্থান**

(১) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব জনাব আব্দুল করিমের ভাষ্য মতে তিনি ডিজিএফআই, এসবি এবং এনএসআইয়ের যেসব রিপোর্ট পেতেন সেগুলোতে বিডিআরের অসন্তোষের বিষয়ে কোন তথ্য ছিল না। ২০০৯ সালে বিডিআরের ঘটনা যখন ঘটে, তখন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় একটি অফিশিয়াল মিটিং-এ বাংলাদেশের ডেলিগেশন লিডার হিসেবে ছিলেন। বিডিআর সপ্তাহের তারিখ কয়েকবার পরিবর্তন হওয়ায় বিডিআর প্যারেডে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। পিলখানা ঘটনার সংবাদ শুনে তিনি প্রথম Available ফ্লাইটে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ঢাকায় ফিরে আসেন *(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-০২)।*

(২) ডাল-ভাতের আর্থিক হিসাব মেজর জেনারেল শাকিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দিয়েছিলেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেটি অনুমোদন করে। প্রফিটের যে অংশ ছিল তা বিতরণের অনুমোদনও দেওয়া হয়েছিল। ইলেকশনের সময় বিডিআরের সদস্যদের টাকা পরিশোধের ব্যাপারেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছিল *(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-০২)।*

(৩) তৎকালীন ডিজির স্ত্রীর অর্থপাচার সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিজি বিডিআরকে জিজ্ঞাসা করেছিল। প্রচারিত সংবাদটি মিথ্যা বলে তিনি অবহিত করেন। তবে এ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ বা প্রতিবেদন কোনো সংস্থা বা দপ্তর থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পায়নি। ডিজির স্ত্রীর বা অন্য কোনো অফিসারের অনৈতিক জীবন-যাপন সম্পর্কে এনএসআই, ডিজিএফআই, এসবি বা অন্য কোনো দপ্তর/সংস্থা থেকে কখনো কোনো অভিযোগ বা প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি *(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-০২)।*

ঝ। <u>কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার গার্ডে অফিসারদের ডিউটি প্রদান ও ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে তদন্ত আদালত গঠন</u>

(১) প্রধানমন্ত্রীর ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানা পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বাড়তি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার গার্ড, সেক্টর কোয়ার্টার গার্ড এবং কোলোকেটেট ম্যাগাজিনে অফিসারদের ডিউটি প্রদানের জন্য আদেশ দেয়া হয় যা একাধিবার পরিবর্তনও করা হয় *(সূত্রঃ বিডিআর সদর দপ্তর দৈনিক আদেশবলী সংযোজনী-১৩)।*

(২) ইউনিট এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা জন্য এবং প্রাপ্ত লিফলেটের বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের জন্য সদর ব্যাটালিয়নে ডিএডি তৌহিদের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করা হয় *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-০২ এবং দৈনিক আদেশাবলী সংযোজনী-১৪)।*

ঞ। <u>২৩ ফেব্রুয়ারি ডিজিএফআই কর্তৃক লিফলেট বিতরণ সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া</u>। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ডিজিএফআই এর মেজর মুরতাজা ২৪ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় অনুষ্ঠিতব্য প্যারেডের ভেন্যুতে গিয়ে ইঞ্জিত পান যে বিডিআরের ভেতরে কিছু অসন্তোষ বিদ্যমান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার ডিটাচমেন্ট কমান্ডার কর্নেল আলমাস রাইসুল গণিকে জানান এবং এফএসদের বিষয়টি খতিয়ে দেখতে বলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি নিশ্চিত হন যে বিডিআর সদস্যরা লিফলেট বিতরণ করেছে। তিনি মেজর গাজ্জালি, লে. কর্নেল ইনশাদ, মেজর শাহনেওয়াজ এবং মেজর আসাদ সঙ্গে যোগাযোগ করেও কোন সাড়া পাননি। এমনকি মেজর শাহনেওয়াজ কোনরকম তথ্য শেয়ার করতেও অস্বীকৃতি জানান *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৮)।*

ট। <u>২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর বৈঠক</u>। ২৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সিপাহী মইনুদ্দিন ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের মাঠে একটি মিটিং ডাকে। সেখানে সিপাহী সেলিম ও মইনুদ্দিনসহ আরো ১০-১২ জন ছিল। সেখানে সিদ্ধান্ত হয় যে সবাই দরবারের দিন রশি আর চাকু নিয়ে প্রস্তুত থাকবে জিম্মি করার জন্য। যেহেতু তারা সেনা অফিসার তারা তো আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে। তাই সবার সাথে চাকু রাখার পরিকল্পনা হয়। সেদিন রাতেই লে. কর্নেল শামস সাহেব সিপাহী সেলিম এবং মইনুদ্দিনকে ডাকে। সেখানে তিনি তাদেরকে বলেন, 'আগামীকাল কোয়ার্টার গার্ডে ডিউটিতে থাকবে মেজর রিয়াজ। তোমরা সেখানে গেলে সে তোমাদের অস্ত্র দিয়ে দিবে' ***(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নং-১৪)।***

ঠ। সেন্ট্রাল কোয়ার্টার গার্ডে তিনটি ব্যাটালিয়নের (২৪, ৪৪ এবং সদর ব্যাটালিয়ন) এর অস্ত্র রক্ষিত ছিল। ঘটনার পূর্বে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ থেকেই অফিসাররা কোয়ার্টার গার্ডে ডিউটি দিয়ে আসছিলেন। এই ডিউটি দেয়ার বিষয়ে মেজর রিয়াজ জিএসও-২ (আই) মেজর মাহমুদকে জিজ্ঞাসা করলে মেজর রিয়াজকে তিনি জানান যে উড়ো চিঠি আছে, তাই বাড়তি সতর্কতা। এর বেশি কিছু তিনি জানাননি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৫)।*

ড। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ২১৩০ ঘটিকায় ডিজি মহোদয়ের বাসভবনে ঢাকা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মুজিবুল হক ডিজি মহোদয়কে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ০৮০০ ঘটিকায় নির্ধারিত দরবারের সময়সূচি পরিবর্তন করতঃ তা ০৯০০ ঘটিকায় করার জন্য অনুরোধ জানান। ডিজি মহোদয়, ডিওটি কর্নেল আনিস এর সাথে টেলিফোনে এ বিষয়ে কথা বলেন ও দরবারের সময়সূচি পরিবর্তনের আদেশ প্রদান করেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১২)।*

২৭। **<u>ঘটনার পূর্বে বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানায় 'কমান্ড এনভায়রণমেন্ট'</u>**

ক। পিলখানার কমান্ড এনভায়রণমেন্টে কাঠামোগত সমস্যা ছিল। অফিসার সৈনিকদের গ্যাপ বেড়ে গিয়েছিল। অফিসার এবং তাদের পরিবারের আচরণে পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। ইনফ্যান্ট্রি ব্যতীত অন্যান্য আর্মস এবং সার্ভিসের অফিসারদের আধিক্য অফিসার-জওয়ান সম্পর্কে প্রভাব ফেলেছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৫)।*

খ। দরবার হল ভাড়া দেওয়ার সময় কিছুটা স্বজনপ্রীতি ছিল। Open Tender নীতিমালা অনুসৃত হয় নাই। জনাব বাবুল নামক ডিজির পরিচিত জনৈক ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ উক্ত লিজ দেয়া হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৫)।*

গ। ডিজির জিএসও-২ (কর্ড) মেজর মাহবুবের বিদেশ ভ্রমণের একটি প্রস্তাবে সেনাসদর ছাড়পত্র দেয়নি। বিষয়টি কর্নেল এ্যাডমিন ডিজিকে জানালে তিনি সরাসরি সেনাসদরে কথা বলে ছাড়পত্র আনার ব্যবস্থা করেন। মেজর মাহবুব এর সাথে ডিজি ও তার স্ত্রীর দৃষ্টিকটু সম্পর্ক ছিল। মেজর মাহবুব সাধারণত ডিজির বাসাতেই অবস্থান করতেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৫)।*

ঘ। অফিসারের স্বল্পতার জন্য প্রশাসন ব্যাহত হলেও কখনও অকার্যকর ছিল না। সহানুভূতিসূচক পোস্টিং এর জন্য অফিসারদের, বিশেষত ঢাকা সেক্টর অফিসারদের, কাজের প্রতি অমনোযোগিতা দেখা যেত। অফিসাররা সাধারণত সৈনিক কেন্দ্রিক ছিলো না *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৫)।*

ঙ। 'অপারেশন ডাল-ভাত' শুরু হবার পরে প্রথম এক দেড়মাস পূর্ণোদ্যমে কাজ শুরু হলেও দিন দিন সৈনিকদের মধ্যে তা কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ৩৬ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা অপারেশন ডাল-ভাতে নিদারুণ কষ্টের ভেতর দিন অতিক্রম করতো। প্রায়ই ৩৬ রাইফেল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক কর্তৃক ডকুমেন্টারি শাস্তি প্রদান করা হতো। ডাল-ভাতের স্টলগুলোতে প্রথমদিকে জাল টাকা এবং পরিমাপের ঘাটতি মওকুফ করা হলেও এক পর্যায়ে স্টলগুলোয় নিয়োজিত সৈনিকদের উপর দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়। জরুরি প্রয়োজনেও সৈনিকরা ছুটি পেতো না। ডিডিজি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বারী ছিলেন কড়া প্রকৃতির মানুষ। সেনা কর্মকর্তা হিসাবে বিডিআরে এসে সেনাবাহিনীর মত প্রশিক্ষণকে কঠিন করে ফেলেছিলেন। ইউএন মিশনের জন্য বিডিআর সৈনিক নির্বাচনে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল বারী বেশ কিছু নিয়মনীতি আরোপ করেছিলেন যার ফলে অনেকেই মিশনে যাবার জন্য অযোগ্য হয়ে পড়েন। এ বিষয়টি অনেকের মাঝে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১৭)।*

চ। জুনিয়র অফিসার, অফিসারদের স্ত্রী এবং বিভিন্ন পদবির সৈনিকগণ ডিজি বিডিআর মেজর জেনারেল শাকিলের স্ত্রীকে ভয় পেতেন। বিডিআরের ডিজি মেজর জেনারেল শাকিল যখন ব্যাটলিয়নের অধিনায়ক ছিলেন তখন মেজর মাহবুব তার এ্যাডজুটেন্ট ছিলেন। পরবর্তীতে মেজর জেনারেল শাকিল

যেখানেই বদলি যেতেন সেখানেই মেজর মাহবুবকে বদলি করে নিয়ে যেতেন। এভাবে তিনি সামরিক সচিব হিসেবে তার নিজের কাছে এবং পরবর্তীতে বিডিআরএ প্রেষণে যাবার পরে মেজর মাহবুবকেও প্রেষণে বিডিআরএ নিয়ে আসেন এবং তার জিএসও-২ (কর্ড) হিসেবে বিডিআর হত্যাযজ্ঞের পূর্ব পর্যন্ত নিয়োজিত রেখেছিলেন। মেজর মাহবুবও পিলখানায় ক্ষমতাধর ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। মেজর মাহবুব উচ্চপদস্থ অফিসারদেরও রীতিমত অবজ্ঞা করতে দ্বিধা করত না *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১৭)।*

ছ। জেনারেল ইকবাল করিম ভূঁইয়া সিজিএস হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে তৎকালীন ডিজি বিডিআর মেজর জেনারেল শাকিল সমন্ধে বেশ কিছু নেতিবাচক প্রতিবেদন পান। বিষয়টি তিনি তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন ইউ আহমেদকে জানালেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৬)।*

জ। বিডিআরের নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা (আরএসইউ) এবং ডিএডি গ্রুপ যে ষড়যন্ত্র করতে পারে তা ঐ সময় বিডিআরের ডিজি থেকে শুরু করে আরএসইউ অফিসাররা কেউ কল্পনা করতে পারে নাই। বিডিআর সপ্তাহে নিরাপত্তা ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক দায়িত্ব ডিএডিদের উপর অর্পিত হয়েছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১৭)।*

<u>মুল ঘটনা (২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯)</u>

২৮। **<u>দরবার হল (২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সকাল ০৬০০ হতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সন্ধ্যা ০৬০০ পর্যন্ত)</u>**

ক। <u>দরবার হলে দরবারের প্রস্তুতি</u>। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর দরবার হলে অফিসার, জেসিও এবং অন্যান্য পদবির বিডিআর সদস্যদের বসার আয়োজন ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের উপর ন্যস্ত ছিল। নন-কমিশন্ড অফিসাররা (এনসিও) সিপাহীদের পিছনে বেঞ্চে বসেছিলেন। জুনিয়র কমিশনড অফিসাররা (জেসিও) দক্ষিণ দিকে দুটি সারিতে বসেছিলেন এবং অফিসাররা দরবার হলের উত্তর দিকে তিন সারিতে বসেছিলেন। সিনিয়র অফিসার এবং সেক্টর কমান্ডাররা প্রথম সারিতে বসেছিলেন, বাকি অফিসাররা দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সারিতে বসেছিলেন। তৃতীয় সারি পদক এবং পুরস্কারপ্রাপ্ত অফিসার, জেসিও এবং সৈন্যদের জন্য নির্ধারিত ছিল। দরবার হলে স্টেজের উপরে ডিজি ও ডিডিজির বসার আয়োজন ছিল। ইউনিটগুলির হিসাব অনুসারে, দরবার হলে মোট ২,৬৫০ জন উপস্থিত ছিলেন, যার মধ্যে ১৩৩ জন কর্মকর্তা এবং ৭২ জন জেসিও ছিলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২০ এবং সাক্ষী নম্বর-৫৫)।*

খ। <u>দরবার শুরু</u>। সকাল ০৯০০ ঘটিকায় ডিজি দরবার হলে পৌঁছান এবং সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মুজিব ডিজির নিকট প্যারেড হস্তান্তর করেন। ডিজি এবং ডিডিজি স্টেজের উপরে নিজ নিজ আসনে আসন গ্রহণ করেন। ডিডিজি ডিজির ডানে এবং সামান্য পিছনে অবস্থান গ্রহণ করেন। পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দরবার শুরু হয়। জেনারেল শাকিল সর্বপ্রথম সকলকে সম্ভাষণ জানিয়ে দরবার শুরু করেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর তিনি ডাল ভাত কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন, সম্ভবত তোমাদের কারও কারও ডাল-ভাত এর হিসাবের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব আছে, আমি এখন কিছুটা হিসাব তোমাদেরকে বলছি, আমরা সর্বমোট ডাল-ভাত এ ৪০০ কোটি টাকার লেনদেন করেছি। ইতোমধ্যে যারা তোমরা এর সাথে জড়িত থেকে কাজ করেছো তাদের সকলকে সকল দিনের সম্পূর্ণ ডিএ দেয়া হয়েছে এবং যারা ডাল-ভাত এর সাথে জড়িত ছিলে না তাদেরকেও ১০ দিনের করে ডিএ দেয়া হয়েছে। এছাড়া সরকারের কাছ থেকে যে টাকা লোন নেওয়া হয়েছিল তার বেশির ভাগ ইতোমধ্যে পরিশোধ করা হয়েছে। এখনও অনেক মালামাল আছে যা বিক্রয় করে বাকি টাকা পরিশোধ করা হবে। পরবর্তীতে অডিট কমিটির মাধ্যমে সম্পূর্ণ হিসাব বের করা হবে। তোমরা এই ভেবে নিশ্চিত থেকো যে লাভের সব টাকা তোমাদের কল্যাণে ব্যবহৃত হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। এক পর্যায়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনারা কি এই বিষয়ে সবকিছু বুঝতে পেরেছেন?' বেশিরভাগ সৈনিক চুপ ছিল ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২০ ও সাক্ষী নম্বর-৫৫ এবং ডিজির ভাষণ সংযোজনী-১৫)।***

গ। <u>দুইজন বিদ্রোহীর প্রবেশ</u>। ঐ সময়ই অর্থাৎ ৯টা বেজে ১০/১২ মিনিটে দরবার হলের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে বেল্ট ও টুপি ছাড়া ইউনিফরর্ম পরিহিত দু'জন বিজিবি সৈনিক অস্ত্র হাতে দৌড়ে স্টেজের উপরে উঠে আসে। প্রথমজন ডিজিকে অতিক্রম করে চলে যায় এবং দ্বিতীয়জন তার রাইফেলটি মেজর জেনারেল

শাকিলের কপালের বাম দিকে তাক করে। ততক্ষণে বেশ কয়েকজন অফিসার ও সুবেদার মেজর স্টেজে উঠে আসে এবং সৈনিকটিকে নিরস্ত্র করে। কর্নেল আনিস এ্যামুনিশন আনলোড করে রাইফেলটিকে সুরক্ষিত করেন। সৈনিকটি মঞ্চের উপর পড়ে যায়। কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজর নূরুল ইসলামসহ মঞ্চে থাকা অফিসাররা সৈনিকটিকে ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সিপাহী মইনুদ্দিন হিসেবে সনাক্ত করে এবং তাকে বুট এর ফিতা দিয়ে বেঁধে ফেলা হয়। অপর সৈনিক, সিপাহী কাজল, সে দক্ষিণ দিকের জানালা দিয়ে বের হয়ে গিয়ে সম্ভবত একটা গুলি করে। গুলির আওয়াজে দরবার হলের ভিতরে 'জাগো' বলে একটি চিৎকারের সাথে সাথে সকলে এদিক ওদিক ছোটাছুটি শুরু করে এবং দুই মিনিটের মধ্যে দরবার হল খালি হয়ে যায়। সৈনিক ও জেসিওদের সাথে অনেক অফিসারও দরবার হল থেকে বের হয়ে যায়। দরবার হলে যারা থেকে যান তাদের মধ্যে ছিলেন ডিজি, ডিডিজি (ব্রি. জেনারেল বারী), কর্নেল আনিস (DOT), কর্নেল মসিউর, কর্নেল এমদাদ, কর্নেল জাহিদ, কর্নেল গুলজার লে. কর্নেল কামরুজ্জামান, মেজর খালিদ, ক্যাপ্টেন মাজহার (ADC), ক্যাপ্টেন তানভীর, মেজর সালেহ, লে. কর্নেল এনশাদ, লে. কর্নেল আযম, DAD ফসিউদ্দিন, NSA এবং RP জেসিও, দু'জন ইমাম, লে. কর্নেল ইয়াসমীন (ডাক্তার), মেজর রোকসানা (ডাক্তার), মেজর ফারজানা, লে. কর্নেল বদরুল, লে. কর্নেল কাউসার, কর্নেল লুৎফর প্রমুখ *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২০, সাক্ষী নম্বর-৪২, সাক্ষী নম্বর-৫৫ এবংসাক্ষী নম্বর-৮৪)।* হাবিলদার ইউসুফ দরবার হলের পিছনের দিকে বসেছিলেন। দরবার শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখেন একজন সৈনিক একটি এসএমজিসহ স্টেজে উঠে পড়ল। আরেকজন সৈনিক এসএমজিসহ দরবারের ভিতরে ঢুকে পড়ল। এরপর হঠাৎ করেই দরবারে প্রচন্ড হুড়াহুড়ি শুরু হয়ে যায়। হাবিলদার ইউসুফ দরবার হল থেকে বের হয়ে একটি ছাই রঙের গাড়ি দরবার হলের কাছে আসতে দেখেন। তিনি লক্ষ্য করেন গাড়িতে যারা বসে আছে সবাই ইউনিফর্ম পরা কিন্তু কোন র‍্যাংক নাই। তিনি আরো লক্ষ্য করেন তাদের মাথার চুল বড়। তাদের হাতে এসএমজি ছিল। তারা কথাবার্তা বলে গাড়িতে উঠে পড়ে এবং গাড়িটা সদর রাইফেল ব্যাটালিয়নের রাস্তা দিয়ে সেক্টরের দিকে যেতে না যেতেই গোলাগুলির আওয়াজ হতে থাকে (*সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-০৭)।*

২৯। <u>দরবার হল আনুমানিক সকাল ০৯৩০-১০৩০ ঘটিকা</u>

ক। সিপাহী মইনুদ্দিনকে নিরস্ত্র করার পর জুতার ফিতা দিয়ে বাঁধা অবস্থায় সে স্টেজের উপর শুয়ে থাকে। সবাই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলেও সে কোন কথার উত্তর না দিয়ে অজ্ঞানের মত পড়ে থাকে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।* যে অস্ত্র নিয়ে সিপাহী মইনুদ্দিন প্রবেশ করে সেটি ছিল ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের রাইফেল এবং তাতে ৬-১০টি গুলি ভর্তি ছিল। ডিজি, বিডিআর ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল শামসুল আলমকে উদ্দেশ্যে করে বলেন যে অস্ত্রটা লে. কর্নেল শামস এর ইউনিটের *(সূত্রঃ জাতীয় কমিটির নিকট ইমাম মরহুম জনাব সিদ্দিকুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বিবৃতি)।* এ বক্তব্যের সঠিকতা অন্য কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য দ্বারা যাচাই করা যায়নি। সাক্ষী মৃত্যুবরণ করায় তার বক্তব্যও নেয়া সম্ভব হয়নি। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সামসুল আলম চৌধুরী বিষয়টি অস্বীকার করেছেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২০)।*

খ। এর মধ্যে দেখা যায় লাল সবুজ কাপড় দিয়ে নাক মুখ বাঁধা বিডিআর সৈনিকরা দরবার হল ঘিরে ফেলেছে এবং কিছুক্ষণ পরপর গুলি করছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৩ এবং সাক্ষী নম্বর-৫৫)।* তখন দরবার হলের জানালা খুলে কর্নেল গুলজার, কর্নেল এমদাদ, লে. কর্নেল এনশাদ এবং লে. কর্নেল কামরুজ্জামান চিৎকার করে ওদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা ফায়ার করো না, তোমরা ফেরত যাও।' এই সময় দেখা যায়, অনেক সৈনিক দৌড়ে এসে এই সকল সৈনিকদেরকে এমুনিশন সাপ্লাই দিচ্ছে। এসময় একটি পিকআপ সম্ভবতঃ সদর রাইফেল ব্যাটালিয়নের রাস্তা দিয়ে দরবার হলের পাশের মাঠে এসে দাঁড়ায়। ঐ সময়ে গুলি কাঁচ ভেঙ্গে দরবার হলের ভিতরে ঢুকছিল। অফিসাররা কেউ দেয়ালের পিছনে, কেউ পিলারের আড়ালে আশ্রয় নেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।*

গ। এসময় লে. কর্নেল কামরুজ্জামান লক্ষ্য করেন ডিজি কারো সাথে মোবাইলে কথা বলছেন। তিনি বলছিলেন, '৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের কিছু সৈনিক বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, তাড়াতাড়ি সেনাবাহিনী পাঠান।' মোবাইলে কথা শেষ হলে ডিজি কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজর নূরুল ইসলামকে বলেন, 'এসএম সাহেব, আপনি তো কোন দিন সৈনিকদের এরকম ক্ষোভ আছে, একবারও বলেননি।' এসময় কেউ একজন ডিজিকে

বললেন, ‘স্যার, গাড়ি লাগানো আছে, আপনি চলে যান।’ ডিজি বললেন, ‘আমি কোথায় যাব এবং কেন যাব’? সঙ্গে সঙ্গে তিনি ঢাকা সেক্টর কমান্ডার এবং ঢাকার অধিনায়কদের উদ্দেশ্যে বললেন, ‘You all rush to the unit and get back your people’ এবং সকলের সাথে কথা বলো ‘and try to motivate them’ এই কথা শোনার পর ঢাকা সেক্টর কমান্ডার ও অধিনায়কগণ দরবার হল থেকে নিজ নিজ ইউনিটে যাবার উদ্দেশ্যে রওনা হন’ *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।*

ঘ। লে. কর্নেল শামসুল আলম চৌধুরী, লে. কর্নেল তাসনিম (সিগন্যাল সেক্টর), লে. কর্নেল এনায়েত (সিও ৩৬ রাইফেল ব্যাটালিয়ন, মেজর শাহনেওয়াজ (আরএসইউ), মেজর হুমায়ুন (জিএসও-২) এবং মেজর দিদার দরবার হলের দক্ষিণ দিক দিয়ে বের হয়ে আসেন। ঢাকা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মুজিব, লে. কর্নেল এনায়েত সুইমিং পুলের দিকে অগ্রসর হন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২০)।*

ঙ। এদিকে যে অস্ত্রটি দরবারে সিপাহী মইনুদ্দিন ডিজির দিকে তাক করেছিল, সেটি দিয়ে মেজর আজিজুল হাকিম গুলি করতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু ডিজি বললেন ‘Don’t shoot’ *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৩)।*

চ। ডিজি সেনাপ্রধান ও ডিজি র‍্যাব এর সাথে মোবাইলে কথা বলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০১ এবং সাক্ষী নম্বর-৫৫)।* ০৯৩৭ ঘটিকায় মেজর জায়েদী মোবাইলে ডিফেন্স এ্যাডভাইজার মেজর জেনারেল তারেককে (যিনি পূর্বে মেজর জায়েদীর কমান্ডিং অফিসার ছিলেন) ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন এবং সাহায্য প্রার্থনা করেন। অতপর ফোনটি তিনি মেজর জেনারেল শাকিলের হাতে দেন মেজর জেনারেল তারেকের সাথে কথা বলার জন্য। সম্ভবত কলটি কেটে যাওয়ায় কথা হয়নি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৪)।* ইতোমধ্যে কর্নেল গুলজার জানায় যে র‍্যাব এর সকলের সাথে কথা হয়েছে তারা কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা দিবে। এরমধ্যেই ডিএমও, ব্রি. জেনা. জিয়া এবং লে. কর্নেল কামরুজ্জামানের সাথে কথা বলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।* পরিস্থিতি আরো খারাপ হলে অফিসাররা স্টেজের ভিতরে পর্দার পিছনে যেয়ে দুই ভাগ হয়ে স্টেজের দুই পাশে আশ্রয় নেন। এক পাশে দক্ষিণ দিকে ০৩ জন মহিলা অফিসার, লে. কর্নেল লুৎফর রহমান খান, লে. কর্নেল রবি, লে. কর্নেল বদরুল হুদা ও মেজর জাহিদসহ আরো কয়েকজন অফিসার। অপর পাশে উত্তর দিকে ডিজি, ডিডিজি, লে. কর্নেল কামরুজ্জামান এবং আরো কয়েকজন অফিসার ছিলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৮)।* স্টেজের পর্দার ভেতরে যাবার সময় ডিওটি (কর্নেল আনিস) এবং লে. কর্নেল কামরুজ্জামান বেঁধে রাখা সৈনিকটাকে টেনে পর্দার ভিতরে নিয়ে আসেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।*

ছ। আনুমানিক ০৯৪৮ ঘটিকার দিকে ডিজি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলেন। তখন ডিজি প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন বলে সবাই চুপ করে থাকায় উনার কথা স্পষ্টই শোনা যায়। উনি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী, ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা আপনার সরকারকে হেয় করার জন্য বিদ্রোহ করেছে। আপনি আমাদেরকে সাহায্য পাঠান। আপনি আমাদেরকে বাঁচান।’ এটা ছিল ০৯৪৮ ঘটিকার পর *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪২, সাক্ষী নম্বর-৫৫ এবং সাক্ষী নম্বর-৮৪)।* এর পরই ডিজি অন্য কাউকে (সম্ভবতঃ ডিজির স্ত্রী) ফোনে বলেন ‘ভয় পেয়োনা। বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রাখো’ *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৮ এবং সাক্ষী নম্বর-৮৪)।*

জ। ঐ সময় সেখানে অফিসারদের সাথে আটকে পড়া আরপি জেসিও তখন আস্তে আস্তে ওয়াকি টকি শুনছিলেন। লে. কর্নেল কামরুজ্জামানের কথায় সাউন্ড বাড়িয়ে শোনা গেল, অপর পাশ থেকে বলছে, ‘অফিসার মেসে অফিসারদের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বিডিআরের সব গেইট এর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে বিদ্রোহীরা এবং কোত ভেঙ্গে অস্ত্র গোলা বারুদ নিয়ে যাচ্ছে।’ এর মধ্যে দেখা গেল এডিসি (ক্যাপ্টেন মাজহার) কেঁদে কেঁদে কারো সাথে মোবাইলে কথা বলছে। তাকে জিজ্ঞেস করাতে জবাব দিল, ‘রাইফেল ভবনে বিদ্রোহী বিডিআররা ঢুকেছে। হাউজ গার্ড অনেক আগে চলে গিয়েছে। ম্যাডাম বলছেন দরজা ধাক্কা দিচ্ছে।’ ডিজি বিষয়টি শুনে বললেন ‘ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে থাকতে বলো’ *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।*

ঝ। গুলির শব্দ যখন আরো কাছে মনে হচ্ছিল, তখন ডিজি স্টেজের সব আলো নিভিয়ে ফেলতে বলেন। কর্নেল আনিস একটি লম্বা কাঠ দিয়ে সব বাল্ব ভেঙ্গে ফেলেন। মাইকে ডিজি সবাইকে শান্ত হতে বলছিলেন। বলছিলেন, ‘তোমরা গুলি থামাও, তোমাদের সব দাবি মেনে নেয়া হবে।’ এই সময়, একজন সৈনিক দৌড়ে

পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে, ওর হাতে বা কাঁধে গুলি লেগেছিল। একজন আরটি ভিতরে ছিলেন, তার পাগড়ির কাপড় দিয়ে একজন তার ক্ষতস্থান বেঁধে দেয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৮)।*

ঞ। ডিজিসহ কয়েকজন অফিসার স্টেজের পর্দার ভিতরে উত্তর দিকের উইং এ অবস্থান নিয়েছিলেন। কর্নারে একটি চেয়ারে ডিজিকে বসানো হল, বাকিরা সবাই ডিজির গা ঘেঁষে দাঁড়ান। ডিজি বললেন 'তোমরা মৃত্যুকে কেন ভয় পাচ্ছো? মরতে তো একদিন হবেই।' অফিসাররা বললেন 'স্যার আপনার সেফটির দরকার আছে।' ডিজি তখন বললেন, 'র‍্যাব বা সেনাবাহিনী কেউ এখানো এলো না?' ঐ সময় কর্নেল মসিউর ডান দিকের উইং থেকে দৌড়ে বাম দিকের উইং এ চলে এলেন। বাম উইং এর বামে অবস্থিত সিঁড়িতে ডিডিজি ছিলেন। ডিডিজি এবং কর্নেল মসিউর দু'টি সাউন্ড বক্স ওখানকার পেছনের দরজার সামনে একটার উপর একটা রাখেন, তবে ডিডিজি বলেন সাউন্ড বক্স গুলি ঠেকাতে পারবে না *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।*

৩০। <u>দরবার হল, আনুমানিক ১০৩০-১১৩০ ঘটিকা</u>

ক। সকাল ১০৩০ এর পর থেকে দরবার হলের অভ্যন্তরে বিদ্রোহীরা চিৎকার করে অফিসারদের স্টেজের ভিতর থেকে বের হতে বলতে থাকে। ১০৩১ ঘটিকার পর পরই স্টেজের পর্দার আড়ালে দক্ষিণ উইং এ থাকা ০৩ জন লেডি অফিসারসহ বাকি অফিসারগণ হাত উঁচু করে পর্দার বাইরে বের হয়ে আসেন (১০৩১ ঘটিকায় মেজর রুখসানা তাঁর স্বামীকে মোবাইলে বিদ্রোহীদের দরবার হলে ঢুকে পড়ার কথা জানান, তিনি সময়টি পরবর্তীতে তাঁর স্বামীর মোবাইল থেকে নিশ্চিত করেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৮ এবং সাক্ষী নম্বর-৬৪)।*

খ। পর্দার ভিতর থেকে দেখা যায় বাইরে স্টেজের নিচে ১৫-১৬ জন বিদ্রোহী কাপড়ে মুখ ঢেকে অস্ত্র হাতে দাঁড়িয়ে আছে। বিদ্রোহীরা প্রথমেই যে সকল অফিসার বের হয়ে আসেন তাদের সবার মোবাইল ছিনিয়ে নেয়। সবাইকে মাটিতে শুয়ে পড়তে এবং র‍্যাংক খুলে ফেলতে বলে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৮)।* অফিসাররা দরবার হলের খালি ফ্লোরে এবং কার্পেটের উপর শুয়ে পড়েন। তখন দরবার হলের ভিতরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কিছুটা দূরে দাঁড়ানো মুখে কাপড় বাঁধা একজন বিডিআর সৈনিক তাদের উপর ৩/৪ রাউন্ড গুলি চালায়। ঐ গুলিতে লে. কর্নেল কায়সার (একিউ কনস্ট্রাকশন) ও অপর ০২ জন অফিসার গুলিবিদ্ধ হন। লে. কর্নেল কায়সার গুলি লেগে উপুড় অবস্থা থেকে চিৎ হয়ে যান *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৪)।* মেজর রুখসানা দেখেন তার বামপাশে লে. কর্নেল কায়সার এর গায়ে গুলি লেগেছে এবং রক্তে চার দিক ভেসে যাচ্ছে। তখন সময় আনুমানিক ১০৩৫ ঘটিকা *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৮)।* মেজর জাহিদ এবং আরো ০২ জন অফিসার উঠে লে. কর্নেল কায়সারকে উঁচু করে দরবার হলের দক্ষিণের মেইন দরজার বাইরে নিয়ে আসেন। বাইরে ডিজির গাড়ি দাঁড়ানো ছিল। গাড়ির কাঁচ ও ফ্ল্যাগ স্ট্যান্ড ভাঙ্গা ছিল। তারা ডিজির গাড়ির কাছে যাবার আগেই বাইরে থেকে একজন মুখবাঁধা বিদ্রোহী দৌড়ে এসে অস্ত্র ধরে বাধা দেয়। মেজর জাহিদ তাকে অনুরোধ করেন যে কর্নেল কায়সারকে হাসপাতালে নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু সে বলে 'কেউ কোথাও যাবে না। এখানেই মরবে। তোরা দরবার হলের ভিতরে যা।' লে. কর্নেল কায়সারকে বাইরে রেখে ঐ ০৩ জন অফিসার পুনরায় ভেতরে প্রবেশ করেন। লে. কর্নেল কায়সারের তখনো মুখ নড়ছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৪)।*

গ। লে. কর্নেল কায়সার গুলি বিদ্ধ হবার পর দরবার হলের ভিতরে মহিলা অফিসারদের দিকে এক জওয়ান দৌড়ে এসে বলে 'মহিলা ম্যাডামদের মারিসনে, ওনারা ডাক্তার।' ফলে অন্য একজন সৈনিক তাদেরকে দরবার হলের পশ্চিম দিকের গেইটের দিকে নিয়ে যায়। তাদের পেছনে পেছনে অন্য অফিসারগণও আসতে থাকেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৮)।* মেজর জাহিদ, লে. কর্নেল কায়সারকে বাইরে রেখে আসার পর ভিতরে ঢুকে ০২ জন অফিসারকে দরবার হলের মেঝেতে শোয়া অবস্থায় দেখতে পান এবং আরো দেখেন অন্যান্যদের এক লাইনে সারিবদ্ধভাবে পিছনের পশ্চিম দিকের দরজা দিয়ে বাইরে নেয়া হচ্ছে। তাকেও ঐ লাইনে দাঁড়াতে বলে। তখন কর্নেল এলাহীও তাদের সাথে ছিলেন। লাইনে মেজর জাহিদের সামনে ছিলেন ডিএএজি মেজর সালেহ *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৪)।* দরজা দিয়ে বের হবার সময় মেজর সালেহ এর পেটে গুলি লাগে। মেজর রুখসানা দেখেন মেজর সালেহ এর ইউনিফর্ম খোলা। পেটের কাছে গেঞ্জি তোলা এবং পেটে গুলির ছিদ্র রয়েছে। তখন সময় আনুমানিক ১০৪৫ ঘটিকা *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৮)।*

ঘ। দরবার হল থেকে বের হবার পরই আর একদল অস্ত্রধারী স্কুলের কাছে থেকে দৌড়ে আসে এবং চিৎকার করতে থাকে 'অফিসারদের শেষ কর' *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪২)।* ছাই রংয়ের সিভিল শার্ট পরা একজন বলে 'ওদের একজনকেও ছাড়বোনা, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলবো, বাঁধো সবাইকে।' গায়ে গুলি লাগার ভয়ে লে. কর্নেল ইয়াসমিন মাটিতে শুয়ে পড়েন। অস্ত্রধারীরা এসে তাদেরকে রাইফেলের বাট, বেয়নেট ও বুট দিয়ে মারতে থাকে। এক সময় বিদ্রোহীরা পুরুষ অফিসারদের চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে ফেলে। মহিলা পুরুষ সবাইকে লাইনে দাঁড় করায় এবং রাইফেল নিয়ে প্রস্তুত হয় গুলি করার জন্য। এই পর্যায়ে মেজর জাহিদ চোখের বাঁধন খুললে একজন সৈনিক তাকে লাথি মারে। তিনি কর্নেল ইয়াসমিনের গায়ের উপর পড়েন, তারা অন্য লেডি অফিসারসহ মাটিতে পড়ে *যান (সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪২)।* তখন একজন পিছন থেকে বলে 'আর মারিসনা।' তারপর তাদেরকে উঠতে বলে। মহিলারা উঠে দাঁড়াতেই রাইফেলধারী বিদ্রোহীটি তাদেরকে সামনের নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুলে চলে যেতে বলে। মেজর রুখসানা লোকটির হাত ধরে বলেন 'আপনি আমাদের সাথে চলেন।' তখন একটি পিকআপ তাদের সামনে আসতেই লোকটি গাড়িটি থামায়। পিকআপটি ছিল ছাই রংয়ের, তবে বিডিআরের। লোকটি তাদেরকে পিকআপে উঠতে বলে। ভিতরে মুখ-ঢাকা ০৩ জন অস্ত্রধারী বিদ্রোহী বসা ছিল। তারা প্রথমে নিতে রাজি হয়নি। তখন তাদেরকে বোঝানো হয় ডাক্তারদেরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হবে চিকিৎসা প্রদানের জন্য। মহিলা ডাক্তাররা গাড়িতে উঠে দেখতে পান ০৩ বাক্স গুলি মেঝেতে রাখা। লে. কর্নেল লুৎফর রহমান খান গাড়িতে উঠতে চাইলে তাকে উঠতে দেয়া হয়নি। গাড়ি সাথে সাথে ছেড়ে দেয়। মেজর রুখসানা দেখেন লে. কর্নেল কাজী রবি কোন রকমে গাড়ির সাথে ঝুলছেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৮)।* পিকআপটি চলতে থাকলে লে. কর্নেল ইয়াসমিন দেখেন, অস্ত্রধারীরা বাকি অফিসারদের ক্রমাগত মারধর করছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪২)।*

ঙ। ইতোমধ্যে মেজর জাহিদ একটি গুলির আওয়াজের পর শোয়া অবস্থায় শুনতে পান যে, একজন বলছে, 'ও মরেনি।' তখন রাইফেলের বাট দিয়ে তার চোয়ালে খুব জোরে আঘাত করে এবং তার মুখ দিয়ে প্রচন্ড বেগে রক্ত বের হতে থাকে। তিনি সাথে সাথে চোখের কাপড় খুলে দেখতে পান যে, মহিলা ডাক্তারদেরকে পিকআপের পেছনে উঠানো হয়েছে, সাথে আরো একজন অফিসার এবং পিকআপ ছেড়ে যাবার মুহূর্তে মেজর মিজানকে (জিএসও-২, প্রশিক্ষণ) দৌড়ে পিকআপে উঠতে দেখেন। মেজর জাহিদের মুখ দিয়ে তখনও রক্তক্ষরণ হচ্ছে, তিনি জিহ্বা দিয়ে বুঝতে পারছিলেন যে, নিচের দাঁতের মাঝখানে ফাঁকা হয়ে গিয়েছে (তাঁর নিচের চোয়ালের হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল)। ইতোমধ্যে মুখ বাঁধা একজন সিপাহী দৌড়ে এসে মেজর জাহিদকে ঝাপটে ধরে এবং বলে 'এ স্যারকে চিনি, উনাকে মারিসনা।' এরপর উক্ত সৈনিক মেজর জাহিদকে চোখ বেঁধে হাঁটিয়ে আনুমানিক ৫০-৬০ গজ দূরে একটা ঘরে নিয়ে যায়। পরে চোখ খুলে দিলে তিনি দেখেন একটা গার্ড রুমের বাথরুম এবং সেটা ছিল হাজারিবাগ ৫ নং গেইটের গার্ডরুম। হাতের ঘড়িতে তিনি দেখেন তখন সময় ১০৪৫ ঘটিকা *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৪)।*

চ। একটি পিকআপ এ মহিলা ডাক্তারদেরকে উঠানো হলে কর্নেল রবি, লে. কর্নেল লুৎফর এবং মেজর জায়েদ উঠার চেষ্টা করেন কিন্তু তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়া হয়। পিক-আপটি লে. কর্নেল ইয়াসমিন, মেজর রুখসানা ও মেজর ফারজানাকে নিয়ে দরবার হলের পশ্চিম প্রান্ত থেকে রওয়ানা দেয়। সেটি প্রথমে নিকটবর্তী ৫ নং গেইটে যায়। কিন্তু গেইটের অস্ত্রধারী সৈনিকরা তা ফিরিয়ে দেয়। এমনকি ৫ নং গেইটের বাইরে অবস্থানরত কিছু সিভিল পোশাকের লোক হৈ-চৈ করে ওঠে যাতে ঐ অফিসারদের বের হবার সুযোগ দেয়া না হয়। পিক-আপটি তখন ৩ নং গেইটের দিকে রওয়ানা হয়। পিক-আপটি ৩ নং গেইটের কাছে এলে কয়েকজন সৈনিক পিক-আপটিকে হাসপাতালে যেতে বলে। অবশেষে পিক-আপটি হাসপাতালে আসে এবং মহিলা অফিসারদেরকে অপারেশন থিয়েটারের সামনে নামিয়ে দেয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪২)।*

ছ। দরবার হলের স্টেজের পর্দার আড়ালে উত্তর দিকের উইং এ লে. কর্নেল সৈয়দ কামরুজ্জামান যাদেরকে আশ্রয় নিতে দেখেছিলেন তারা হলেন ডিজি, ডিডিজি, ডিওটি, কর্নেল মশিউর, কর্নেল এমদাদ, কর্নেল জাহিদ, তিনি নিজে, লে. কর্নেল এনশাদ, লে. কর্নেল আজম, মেজর খালিদ, মেজর সালেহ, এডিসি ক্যাপ্টেন তানভীর, ডিএডি ফসিউদ্দিন, সাথে এনএসএ ও আরপি জেসিও *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।*

জ। এক সময় তারা দেখলেন দক্ষিণ দিকের উইং এ আশ্রয় নেয়া অফিসাররা এক এক করে হাত উপরে তুলে পর্দার বাইরে যাচ্ছে। ডিওটি কর্নেল আনিস তখন ডিজি মহোদয়কে বললেন, 'স্যার ঐ দিকে অবস্থান

নেয়া সকল অফিসার সারেন্ডার করেছে। আমাদের জন্য কি অর্ডার?' ডিজি কি বললেন তা লে. কর্নেল কামরুজ্জামান ভালভাবে শুনতে পাননি। বিদ্রোহীরা বলছিল মেগাফোনে, 'ভিতরে কেউ থাকলে বাইরে বের হয়ে আসেন।' সেই সাথে স্টেজের দিকে প্রচন্ড গুলি বর্ষণ হচ্ছিল। হঠাৎ একজন সৈনিক মুখে কাপড় বাঁধা অস্ত্র হাতে পর্দা সরিয়ে স্টেজে ঢুকলো এবং চিৎকার করে বললো 'ভিতরে কেউ আছে?' সাথে সাথে অফিসারদের দিকে তাকিয়ে ২ রাউন্ড ফায়ার করলো। গুলি অফিসারদের গায়ে লাগেনি, উপরে লেগেছিল। তখন ভিতর থেকে কেউ বলে উঠলো, 'এই, ফায়ার করো না'। তখন সে বললো সবাই বাইরে বের হন। ঐ সময়ে যারা ওখানে ছিলেন এক এক করে স্টেজের পর্দা সরিয়ে বাইরে এলেন। বের হয়ে লে. কর্নেল কামরুজ্জামান দরবার হলে কোন ডেড-বডি প্রত্যক্ষ করেননি। স্টেজের বর্ধিত অংশের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় আরেকজন সৈনিক চিৎকার করে বলল, 'মোবাইলসহ তোদের কাছে যা যা আছে আমাদের দিয়ে দে।' সবার মোবাইল নিয়ে নিলেও কেমন করে যেন লে. কর্নেল এনশাদ মোবাইল দেননি তা লে. কর্নেল কামরুজ্জামান খেয়াল করেননি। অফিসাররা নিচে নেমে ডিজিকে মধ্যে রেখে স্টেজের সামনে অনেকটা গোল করে দাঁড়ালেন। একজন সৈনিক চিৎকার করে বললো 'শুয়োরের বাচ্চারা সারা জীবন আমাদের সিংগেল লাইন করে হাঁটিয়েছ, নিজেরা গোল করে দাঁড়িয়েছিস' হুংকার দিয়ে বললো, 'সবাই সিংগেল লাইন করে দাঁড়া'। সিংগেল লাইনে দাঁড়ানোর সময় ডিজি প্রথমেই দাঁড়ালেন, তারপর কিছুটা সিনিয়রিটির মত সবাই লাইনে দাঁড়ালেন। তখন দরবার হলের ভিতরে অনেক সৈনিক ছিল, সকলের হাতেই অস্ত্র এবং সবার মুখ কাপড়ে বাঁধা। সৈনিকদের মধ্যে একজন বলে উঠলো 'হাত উপর এবং সামনে এডভান্স'। অফিসারদেরকে দরবার হলের ডানপাশ (উত্তর) ঘেঁষে পশ্চিম দিকে যেতে নির্দেশ দিল। অফিসাররা সিংগেল লাইনে হাঁটছেন। অস্ত্রধারীরা পেছন থেকে নির্দেশ দিচ্ছে, সামনে বা পাশে কেউ হাঁটছে না। একটু হেঁটে লে. কর্নেল কামরুজ্জামান লাইনের সামনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন যে ডিজি দরবার হল থেকে বাইরে পা দেওয়ার সাথে সাথে চারজন সৈনিক ডিজির সামনে লাফ দিয়ে এসে দাঁড়ায়। সকলের মুখে কাপড়, মাথায় হলুদ রঙের হেলমেট, খুব সম্ভবতঃ এগুলো গল্ফ ক্লাবে ব্যবহৃত হেলমেট। চারজনই প্রথমে ডিজিকে লক্ষ্য করে গুলি করে। ডিজি সাথে সাথে ডান দিকে হেলে মাটিতে পড়ে গেলেন। তখন সময় আনুমানিক সকাল ১০৩০। অফিসাররা ডিজিকে ধরার জন্য সামনের দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করলে সৈনিকরা চিৎকার করে বলে, 'কেউ সামনে আসবে না'। তখন সামনে থেকে আরো ০৭-০৮ জন সৈনিক এসে অফিসারদের দিকে ফায়ার শুরু করল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।*

ঝ। সিপাহী সেলিমের ভাষ্য মতে সে ডিজিসহ ১০-১২ জন অফিসারকে বের করে নিয়ে আসে। সে যখন ডিজিসহ বাকিদের নিয়ে উত্তর-পশ্চিম গেইট দিয়ে বের হয়, তার আগেই ৫ নম্বর গেইট দিয়ে অ্যাশ কালারের একটি বেসামরিক পিকআপ প্রবেশ করে। পিকআপে ০৫-০৬ জন ব্যক্তি বিডিআরের ইউনিফর্ম পরা ছিল এবং তাদের হাতে অস্ত্র ছিল। তারা পিকআপে বসা অবস্থাতেই ডিজি এবং অন্যান্য অফিসারকে লক্ষ্য করে বার্স্ট ফায়ার করে। ডিজিসহ সব অফিসার গুলি খেয়ে পড়ে যান। সিপাহী সেলিমের গায়ে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ছিল। তার বুলেট প্রুফ জ্যাকেটে গুলি লেগে সেটি প্রতিফলিত হয়ে তার হ্যান্ডমাইকে লাগে। কোন একটি গুলি কোথাও প্রতিফলিত হয়ে সিপাহী সেলিমের পিঠে লাগে এবং সে আহত হয়। সিপাহী সেলিম পাল্টা গুলি ছুঁড়ে কিন্তু তা ব্লাংক এ্যামুনিশন হওয়ায় কারো গায়ে লাগেনি। এরপর সে গড়িয়ে গড়িয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় যায় এবং সেখানে অস্ত্রধারীদের দেখতে পায়। তাদের মুখ বাঁধা থাকলেও তাদের চুল সিভিলিয়ানদের মত লম্বা, বিডিআর কাটিং না এবং তারা হিন্দিতে কথা বলছিল। সেখানে প্রায় ০৮-১০ জন অস্ত্রধারী ব্যক্তি ছিল *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৪)*।

ঞ। দরবার হলে উপস্থিত ছিলেন বিডিআর কেন্দ্রীয় মসজিদের পেশ ইমাম সিদ্দিকুর রহমান। তিনি তার স্ত্রীকে দরবার হলের ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন ডিজি যখন ফোনে সাহায্য চাচ্ছিলেন এরকম সময় উত্তর দিক থেকে একটি গাড়ি (পিকআপ) এসে দরবার হলের পশ্চিম গেইটে দাঁড়ায়। ঐ গাড়ি থেকে প্রচুর সৈনিক অস্ত্রসহ নামে। এইসব সৈনিকদের হিন্দিতে এবং ইংলিশে কথা বলতে সিদ্দিকুর রহমান শুনেছেন। তারা অন্যান্য সৈনিকদের গুলি করার জন্য কমান্ড করছিল। এছাড়াও তিনি বাংলাতেও সৈনিকদের অফিসারদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালি-গালাজ করতে শুনেছেন। সিদ্দিকুর রহমান তার স্ত্রীকে পরবর্তীতে বলেছেন যে ঐ সৈনিকদের পোশাকেও অস্বাভাবিকতা ছিল। তিনি বলেছেন যে এগুলো দেখলে মনে হবে বিডিআরের পোশাক কিন্তু এগুলো আসলে বিডিআরের ছাপা না। সিদ্দিকুর রহমান যখন দরবার হল থেকে

এগুলো দেখছিলেন তখন দুই জন সৈনিক তাঁকে ডাক দিয়ে অফিসারদের থেকে আলাদা করে। এরপর অস্ত্রের মুখে দুই হাত উঁচু করিয়ে তাঁকে পায়ে হাটিয়ে বাসায় দিয়ে যায়। বাসায় আসার পরে সিদ্দিকুর রহমান একদম ভেঙ্গে পড়েন। তিনি উপরে বর্ণিত বিষয়গুলো তাঁর স্ত্রীকে বলেন। তিনি বারবার বলছিলেন, 'এখন আমি বুঝতে পারছি, কেন তারা মসজিদে বৈঠক করছিল। আমি মসজিদে দুনিয়াবি কথা বলা একদম পছন্দ করতাম না। কিন্তু আমাকে বের করে দিয়ে তারা কথা বলত। এখন বুঝতে পারছি কেন তারা এসব করতো' *(সূত্রঃ বিডিআর সাক্ষী নম্বর-০৩)।*

ট। লে. কর্নেল কামরুজ্জামান বুঝতে পারেন যে, তার পেটের ডান দিকে কি জানি লেগেছে। সরাসরি গুলি না কি রিকোসেট করে লাগলো তা বুঝতে পারেননি। তবে অনুভব করলেন পেটের ভেতরে যায়নি, টাচ করে চলে গিয়েছে। তিনি সাথে সাথে মাটিতে শুয়ে পড়লেন। শোয়ার সাথে সাথে খেয়াল করলেন খুব নিকটে ডান দিকের টয়লেট/ওয়াশ রুমের দরজা খোলা। তিনি সাথে সাথে ক্রলিং করে ওয়াশ রুমের ভিতরে ঢুকে পড়লেন। ভিতরে ডান দিকের ইউরিনালের দেয়াল ঘেঁষে বসেন। তখন সময় আনুমানিক সকাল ১১০০ ঘটিকা বা বেশি। ওখানে বসে তিনি শুধু ফায়ার এর শব্দ শুনছিলেন। দরবার হলের বাইরে ও ভিতরে বেশ কিছু সৈনিক এদিক ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছিল। কেউ চিৎকার করে বলছিল 'ডিজি শেষ'। টয়লেটের পাশ দিয়ে যারা হেঁটে যাচ্ছিল তারা বিশ্রী ভাষায় ডিজি এবং সেনা অফিসারদের গালাগালি করছিল। ১০ মিনিট পর ঐ জায়গায় ফায়ার বন্ধ হয়ে যায়। লে. কর্নেল কামরুজ্জামানের কানে আসে 'মাগো আল্লাগো, বাঁচাও' এ ধরণের গোঙ্গানির শব্দ। এরপর তার মনে হয় আবার সৈনিকরা এসে দরবার হলের ভিতরে অনবরত ফায়ার করছে। তখন ভেতর এবং বাইরের বিদ্রোহী সকলেই উল্লাস করছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।*

ঠ। দরবার হলের দক্ষিণ পূর্ব কোনে টয়লেট এলাকায় যারা লুকিয়ে ছিলেন তারা ১০৩০ থেকে ১১০০ ঘটিকা পুরো সময়টা দরবার হলে প্রচুর গোলাগুলি ও গোঙ্গানির শব্দ পাচ্ছিলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯২)।* ইতোপূর্বে বেসিনের নিচে আশ্রয় নেয়া মেজর মনির ও মেজর মাকসুম আরো ভেতরের দিকের বেসিনের নিচে আশ্রয় নেন। মেজর মাকসুম ও মেজর মনির বাথরুমে তাদের সামনে বসা থাকা ধর্মীয় শিক্ষককে বলেন যে, বিদ্রোহীরা যদি এদিকে আসে তাহলে উনি যেন তাদের চলে যাবার জন্য অনুরোধ করেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯২)।* বেলা ১১০০ টার দিকে একটি টয়লেটের ভিতর থেকে মেজর ইকবাল হাসান এবং কর্নেল আফতাবুল ইসলাম পেছনের ভেন্টিলেটর দিয়ে বাইরে এসে পড়েন। এই জায়গাটা ফোকরযুক্ত দেয়াল ঘেরা একটি স্থান যেখানে বড় বড় ডেগচি থরে থরে রাখা আছে। একই সময়ে অপর বাথরুমের ভেন্টিলেটর দিয়ে আরো চারজন লাফিয়ে ডেগচি রাখার স্থানে আশ্রয় নিলেন। তারা হলেন কর্নেল রেজা, কর্নেল আরেফিন, আরেকজন কর্নেল যার নাম জানা যায়নি এবং লে. কর্নেল সাজ্জাদ *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৩)।*

ড। আনুমানিক ১১০৮-১১১০ ঘটিকায় সম্ভবতঃ দুইজন সৈনিক মেজর মনির এবং মেজর মাকসুমের অবস্থান থেকে ১০-১২ গজ দূরে এসে দাঁড়ায়। আরটি সাহেবকে দেখে এক বিদ্রোহী বললো 'হুজুর আপনি এখানে কেন? বেরিয়ে যান, না হলে গুলি করবো'। তারা আরো জিজ্ঞাসা করে 'এখানে কোন অফিসার আছে কি-না। আরটি কোন উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে যান। একজন সৈনিক মেজর মাকসুমের পা দেখে ফেলে বলে ওঠে 'একটা কুত্তার বাচ্চা এখানে আছে'। তারপর বার্স্ট ফায়ার শুরু করে সামনের টয়লেটের দেয়ালে। এ সময় মেজর মাকসুম মেজর মনিরের দিকে মুখ করে অর্ধ শোয়া অবস্থায় ছিলেন। তার গায়ে পেছনের দিকে সম্ভবতঃ কয়েকটি গুলি লাগে। মেজর মাকসুম বলেন 'আমর গায়ে গুলি লেগেছে, তোমরা আর ফায়ার করো না, আমাকে একটু হাসপাতালে নিয়ে যাও'। তারা এবার মেজর মাকসুমকে লক্ষ্য করে পুনরায় বার্স্ট ফায়ার করে। এ সময় কিছুটা আড়ালে থাকা মেজর মনির ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা দিয়ে নিজের কপালের নিচে কেটে ফেলেন মৃত সাজার জন্য। মেজর মাকসুমের শরীর থেকে রক্তের ধারা পাশে এলে সেই রক্ত নিয়েও মুখের ডানপাশে মেখে মৃত সেজে শুয়ে থাকেন। এরপর বিদ্রোহীরা 'কুত্তার বাচ্চারা মরছে' বলে চলে যায়। মেজর মনির কয়েক মিনিট মৃতের ভান করে পড়ে থাকেন। দরবার হলের দিক হতে কোন সাড়া শব্দ না পেয়ে উঠে সামনের বাথরুমের দরজা জোরে ধাক্কা দেন হাত দিয়ে। এতেও না খুললে সজোরে লাথি মেরে খুলে ফেলেন। বাথরুমের মধ্যে যারা লুকিয়ে ছিলেন তারা ইতোমধ্যে পিছনের জানালা খুলে পালিয়ে গেছেন। মেজর মনিরও একই কায়দায় পেছনে পড়ে থাকা পাতিলের পাশেই একজনকে লুকিয়ে থাকতে দেখেন। কিন্তু সেখানো লুকানো নিরাপদ মনে না হওয়ায় একটু সামনে এগিয়ে একটা ড্রেন পান যার উপর অনেক কাঠের তক্তা থরে থরে সাজানো ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ একপাশ হয়ে ড্রেনের ভেতর ঢুকে পড়েন। কিন্তু যথেষ্ট আড়াল

নেই মনে হওয়ায় একটু পরেই নিজেকে ঢাকার জন্য ড্রেন হতে বের হয়ে ড্রেনের পাশেই পড়ে থাকা একটা পুরনো রানিং ম্যাট দেখে সেটাকে নিয়ে আবার ড্রেনের ভেতরে ঢুকে পড়েন এবং ম্যাটটি দিয়ে যতদূর সম্ভব নিজেকে আবৃত করে রাখেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯২)।*

ঢ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ আনুমানিক ১২২০ ঘটিকায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি বেল্ট ২১২ হেলিকপ্টার এর মাধ্যমে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের আত্মসমর্পণের জন্য সরকারের তরফ থেকে একটি লিফলেট ছাড়া হয় *(সূত্রঃ বিমান বাহিনী সাক্ষী নম্বর-০২ লিফলেটের কপি সংযোজনী-১৬ যা সেনা তদন্ত আদালতের কার্যবিবরণীতে পাওয়া যায়)।*

৩১। <u>দরবার হল - আনুমানিক ১১৩০-১৪০০ ঘটিকা</u>

ক। এগারোটার পর সবকিছু স্তিমিত হয়ে আসে। দরবার হলের পিছনে রান্নার সামগ্রী মজুত করার জায়গায় মেজর ইকবালসহ ০৬ জন অফিসার লুকিয়ে ছিলেন। তখন দু'জন সৈনিক এসএমজিসহ সেখানে ঢুকে তিনজনকে বার্স্ট ফায়ার করে হত্যা করে। কর্নেল রেজা, কর্নেল আরেফিন এবং অন্য একজন কর্নেল শাহাদত বরণ করেন। প্রথম ঘাতক তখন চলে যাবার সময় বলে 'সুমন তাড়াতাড়ি আয়'। সুমন চলে না গিয়ে ডেগচি ধাক্কা দিয়ে লে. কর্নেল সাজ্জাদকে দেখতে পায় এবং খুব কাছ থেকে গুলি করে। কর্নেল আফতাবুল ইসলাম এবং মেজর ইকবাল হাসান পাশাপাশি অবস্থান করছিলেন এবং তখনকার মত বেঁচে যান *(সূত্রঃ সাক্ষী নং-৪৩)।*

খ। ড্রেনের ভেতরে ম্যাটে নিজেকে আবৃত করে লুকিয়ে থাকা মেজর সৈয়দ মনিরুল আলম ম্যাটের ছিদ্র দিয়ে তাকিয়ে বুঝতে পারেন সম্ভবত ০২ জনের একটি সশস্ত্র দল দরবার হলের পিছনে, তার লুকানোর স্থানের নিকটে, এসেছে এবং কেউ লুকিয়ে আছে কি-না খুঁজছে মেজর মনির তাদের পা গুলো দেখতে পাচ্ছিলেন। ড্রেনের সাথেই পাশাপাশি ২টা রুম ছিল। রুমের দরজায় ধাক্কা দিয়ে তারা সেটা বন্ধ দেখতে পায়। ভিতর থেকে সাঁড়া শব্দ না পেয়ে সশস্ত্র দলের একজন গুলি করার হুমকি দিলে ভিতরে অবস্থানরত একজন বলে ওঠেন, 'আমি রাজশাহী সেক্টর কমান্ডার, আপনারা কী চান?' সশস্ত্র গ্রুপটি তাকে বলে 'আমরা আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি'। একথা শুনে বাইরে বেরিয়ে আসার পর তারা তাঁকে গুলি করে। তাঁর দেহ ড্রেনের উপরেই পড়ে। মেজর মনির ড্রেনের ভিতর থেকে রাজশাহী সেক্টর কমান্ডার কর্নেল এমদাদের মাথায় এক পাশ এবং একটি হাত দেখতে পাচ্ছিলেন। ঐ রুমে আরো একজন লুকিয়ে ছিলেন। তাকেও ঐ সময় বের করে মেরে ফেলা হয়। এরপর খুনিদের দুজনের একজন ড্রেন, ম্যানহোলগুলো খুঁজে দেখতে বলে। এরপর তারা ড্রেনের উভয় প্রান্ত থেকে টর্চের আলো ফেলে খোঁজ করে। তবে মেজর মনির ম্যাটের আড়ালে তাদের দৃষ্টির অগোচরে থাকতে সমর্থ হন। অতঃপর তারা অপর একটি রুম থেকে ০২-০৩ জনকে বের করে মেরে ফেলে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯২)।* এই সময় বাইরে মাইকিং এর শব্দ শোনা যায়। মাইকে উত্তেজনাপূর্ব কথাবার্তা বলে সৈনিকদের উত্তেজিত করতে শোনা যায় *(সূত্রঃ সাক্ষী নং-৪৩)।*

৩২। <u>দরবার হল-আনুমানিক ১৪০০-১৮০০ ঘটিকা</u>

ক। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ জোহরের আজানের পরও চার জন অফিসার জীবিত অবস্থায় দরবার হল এলাকায় আত্মগোপন করেছিলেন। তারা হলেন লে. কর্নেল সৈয়দ কামরুজ্জামান দরবার হলের উত্তর-পশ্চিম কোণের টয়লেটে, কর্নেল আফতাবুল ইসলাম ও মেজর ইকবাল হাসান একসাথে দরবার হলের দক্ষিণ পূর্ব কোণ টয়লেটের পিছনে ডেগচি রাখার স্থানে এবং মেজর সৈয়দ মনিরুল আলম দরবার হলের পূর্ব দিকে পেছনের একটি ড্রেনের ভেতর *(সূত্রঃ সাক্ষী নং-৪৩, সাক্ষী নম্বর-৫৫ এবং সাক্ষী নম্বর-৯২)।*

খ। লে. কর্নেল সৈয়দ কামরুজ্জামান দরবার হলের উত্তর পশ্চিম কোণের ওয়াশ রুমের ইউরিনালের পাশের অবস্থান থেকে যোহরের আজানের পর একটি টয়লেটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। দরজাটি ছিল প্লাস্টিকের। আনুমানিক ১৩৪৫-১৪০০ ঘটিকার দিকে তাঁর মনে হয় কয়েকজন সৈনিক ওয়াশ রুমের ভিতর প্রবেশ করেছে। তাদের কেউ একজন উচ্চস্বরে বলে 'এই টয়লেটের দরজা বন্ধ, দেখতো ভিতরে কেউ

আছে নাকি? উপরে উঠে দেখ'। একজন টয়লেটের দেয়ালের উপরে উঠে। লে. কর্নেল কামরুজ্জামান দেখেন, যে উঠেছে তার হাতে অস্ত্র ছিল না, পরনে লুঙ্গি এবং গায়ে নেভি-ব্লু কালারের শার্ট ছিল। সে উপরে উঠে অফিসারকে দেখে চিৎকার করে বলে 'ভিতরে আছে'। লে. কর্নেল কামরুজ্জামান বলেন 'আমাকে মেরোনা, আমি কোন অন্যায় করিনি'। উত্তরে সে বলে 'শালা আমাদের দিয়ে জুতা পালিশ করিয়েছিস'। লে. কর্নেল কামরুজ্জামান অনেক অনুনয় বিনয় করতে থাকলে বাইরে থেকে একজন বলে, 'এই নাম, শালাকে গুলি করবো'। লে. কর্নেল কামরুজ্জামান খেয়াল করলেন ঐ ব্যক্তি নেমে যাবার সময় কি মনে করে হাত দিয়ে তাকে আরো ভেতরে সরে দাঁড়াবার ইঙ্গিত দেয়, এমনভাবে যাতে বাইরে থেকে বোঝা না যায়। তিনি তাই করলেন। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ অবস্থাতেই তারা ০৬-০৭ রাউন্ড গুলি করলো। অবশ্য তার গায়ে লাগেনি। এই সময় আবার শুনতে পেলেন, কে যেন বললো, 'দেখতো শালা মরেছে কি-না?' পূর্বের সৈনিকটিই আবার দেয়ালের উপর উঠলো। লে. কর্নেল কামরুজ্জামান করুণ চোখে হাতজোড় করে নিঃশব্দে তার কাছে মিনতি করলেন। সে বললো, 'স্যার শেষ'। এটা বলার সাথে সাথেই একজন বিদ্রোহী জোরে দরজায় লাথি মারলে দরজা খুলে যায়। একজন ভিতরে ঢুকেই বলে, 'শালাতো মরেনি' বলেই তাঁর বুকে অস্ত্র ধরে। তিনি সাথে সাথে ব্যারেলের মাথা ধরে ব্যারেলটি উঁচু করে ফেলেন এবং সৈনিকটিকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, যাতে সে গুলি করতে না পারে। সেই অবস্থায় টয়লেটের বাইরে আসেন। মুখে কাপড় বাঁধা আরো দুই সৈনিক তার দিকে অস্ত্র তাক করে বলে, 'ওকে ছাড়'। একাধিক বার এসব বলাবলির পর তার বুকে আটকে থাকা সৈনিক বলে উঠে, 'স্যার এত গুলিতেও যখন মরেনি, চল স্যারকে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে যাই'। সেই সাথে আরো বলেন, 'কেউ গুলি করবে না'। অতঃপর তাঁকে হাত উপর করে এডভান্স করতে বলে। লে. কর্নেল কামরুজ্জামান ওয়াশ রুম থেকে বের হয়ে দেখেন তার সাথে যে অফিসারগণ ছিলেন সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। এক নজরে ডিজি, কর্নেল এমদাদ, কর্নেল জাহিদ, কর্নেল মশিউর এবং লে. কর্নেল এনশাদের লাশ পড়ে থাকতে দেখেন। বাকিদের মুখ উপুড় হয়ে পড়েছিল বলে চিনতে পারেননি। লে. কর্নেল এনশাদ ও কর্নেল মশিউরের লাশ পেছনের দিকে পড়েছিল। তখন ভিতরে বেশ কয়েকজন সৈনিক অস্ত্র হাতে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করছিল। যারা তাঁকে নিয়ে যাচ্ছিল সেই সৈনিকদের একজন বললো, 'স্যারকে কোয়াটার গার্ডে নিয়ে যা'। তাকে পুনরায় দরবার হলের ভেতরের দিকে (পূর্ব দিকে) যেতে নির্দেশ দিল। যেতে যেতে তিনি আরো ২/৩ টা লাশ উপুড় হয়ে পড়ে থাকতে দেখলেন কিন্তু চিনতে পারলেন না। তাকে দরবার হলের উত্তর পূর্ব কোণা দিয়ে বের করে। সামনে খোলা মাঠ, ডানে উঁচু টিলা। ওখান থেকেই কেউ কেউ তার দিকে অস্ত্র তাক করেছিল। কিন্তু যারা তাকে নিয়ে যাচ্ছিল তারা চিৎকার করে বলে 'কেউ গুলি করবে না'। স্যারকে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে যাচ্ছি'। আরেকটু পর একজন সৈনিক কারো কথা না শুনেই গুলি করতে উদ্যত হলে সঙ্গে থাকা সৈনিক তাকে নিবৃত্ত করে এবং অনেকটা দৌড়ে লে. কর্নেল কামরুজ্জামানকে সদর রাইফেল ব্যাটালিয়নের দিকে নিয়ে যায় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।*

গ। দরবার হলের পেছনে পূর্ব দিকে ডেগচি রাখার স্থানে কর্নেল আফতাব ও মেজর ইকবাল এবং ড্রেনের মধ্যে মেজর মনির স্বস্থানে লুকিয়ে ছিলেন। মেজর মনির এই সময়ের মধ্যে একাধিক বার বিভিন্ন সৈনিক দলকে এই এলাকায় এসে সার্চ করতে দেখেন **(***সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৩ এবং সাক্ষী নম্বর-৯২)।*

ঘ। আসরের আজানের পর গাড়ির শব্দ পাওয়া যায়। ডেডবডি নেবার জন্য লোকজন আসা শুরু করে। লাশ গাড়িতে তোলার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। তখন মেজর ইকবাল, কর্নেল আফতাবকে ফিস ফিস করে বলেন 'এখানে থাকা বোধ হয় ঠিক হবে না। লাশ নিতে এসে আমাদের জীবিত দেখে মেরে ফেলবে'। কিন্তু বাইরে অনেক লোক ঘোরাঘুরি করছে বলে কর্নেল আফতাব বাইরে যেতে নিষেধ করলেও মেজর ইকবাল চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেন। মাগরিবের আজানের সময় যেতে পারলেন না। যখন এশার আজান শুরু হল, তিনি একটি ঝুড়ি হাতে নিয়ে উপরের একটি জানালার মসকুইটো নেট ভেঙ্গে বাইরে পড়লেন। পড়েই ঝুড়িতে মাটি তুলতে লাগলেন। তখনো কেউ তাকে লক্ষ্য করেনি। র‍্যাংক নেম প্লেট আগেই খোলা ছিল। ঝুড়ি হাতে কিছুদূর যেতেই একজন ডেকে বললো 'কে রে?'। তিনি জোরে জবাব দিলেন 'আমি জহির, বালু আনতে যাচ্ছি।' এইভাবে দরবার হলের পূর্ব দিকে কিছুদূর গিয়ে উত্তরের পথ ধরে এগিয়ে যান। পথিমধ্যে একটি টহলদলের প্রশ্নের উত্তরে একই কথা বলে রক্ষা পান। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পরিচিত জাহিদ নামক এক মেস ওয়েটারের বাসায় যাওয়া। কিন্তু সেখানে সৈনিকরা সার্চ করছে দেখে বামে রাইপকস (রাইফেলস্ পরিবার কল্যাণ সমিতি) বিল্ডিং এ উঠে দোতলায় স্টেজের নিচে আশ্রয় নেন। সেখানে তিনি ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

তারিখ বিকেলে উদ্ধার পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ছিলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৩)।* কর্নেল আফতাব দরবার হলের পেছনে ডেগচি রাখার স্থানেই থেকে যান। পরবর্তীতে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় এবং মেজর ইকবাল জেনেছিলেন যে, কর্নেল আফতাব ২৫ তারিখ দিবাগত রাত ০১০০ ঘটিকা পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৩)।*

ঙ। দরবার হলের পেছনে ড্রেনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা মেজর মনিরুল আলম সন্ধ্যার পূর্বে গাড়ির শব্দ পান এবং পরে বুঝতে পারেন কয়েকজন সৈনিক এসে মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে। তিনি নিজের চোখে রাজশাহী সেক্টর কমান্ডারের হাত ঘড়ি খুলে নিতে দেখেন। মৃতদেহগুলি নিয়ে যাবার বেশ খানিকটা পর রক্তের দাগ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলার জন্য সম্ভবতঃ এনসিইদেরকে আনা হয়। তারা রক্ত ধোয়া পানি ড্রেনে ফেলছিল। মেজর মনির পালানোর সুবিধাজনক সময়ের অপেক্ষায় একই ড্রেনের ভেতর মধ্যরাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯২)।*

চ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখেই আড়াইটা থেকে পৌনে তিনটার দিকে নায়েব সুবেদার মনোরঞ্জন, নায়েব সুবেদার-ওয়ার্ড মাস্টার হাশেম ঝাড়ুদার আব্দুল হাকিমকে একটি পিকআপে উঠতে বলে। পিকআপে ওঠার পরে তারা তাকে দরবার হলে নিয়ে যায়। দরবার হল জুড়ে প্রায় ৩০টি লাশ তিনি দেখতে পান। একজন অফিসার দরবার হলের পিছনে হাড়ি-ডেগচির মধ্যে লুকিয়ে ছিলেন এবং সেখানেই তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল। ঝাড়ুদার আব্দুল হাকিম তিনটি মৃতদেহ একটি তিন টন ট্রাকে তুলে দেয়। সেখানে নায়েব সুবেদার মনোরঞ্জন, নায়েব সুবেদার তোরাব আলী, ওয়ার্ড মাস্টার হাশেম, হাবিলদার মোক্তার উপস্থিত ছিল। সেসময় মনোরঞ্জন কে লাশের দিকে তাকিয়ে বলতে শুনেন, 'খেয়ে দেয়ে তো তোমরা তন্দুরের মত মোটা হইছ, এখন দেখ কেমন লাগে' *(সূত্রঃ কয়েদি নম্বর-২৫)।*

ছ। প্রাথমিকভাবে কিছু কিছু মৃতদেহ ম্যানহোলের ভিতর ফেলে দেয়া হয়। পরবর্তীতে মৃতদেহগুলো সুয়ারেজ লাইন দিয়ে কামরাঙ্গীর চরে চলে যাওয়ায় এবং প্রচার মাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ায় কৌশল পরিবর্তন করা হয়। এর পর মৃতদেহগুলো আনুমানিক ১৬০০ থেকে ১৭৩০ ঘটিকার দিকে পিকআপ এবং ৩টন ট্রাকের মাধ্যমে স্থানান্তর করে এমটি গ্যারেজের পার্শ্বে রাখা হয়। স্থানান্তরের বিষয়টি নায়েব সুবেদার মনোরঞ্জন সরকার (বিডিআর হাসপাতাল) তদারকি করেন। কিছু লাশ ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়নের দিকে নেয়া হয় *(সূত্রঃ সেনা তদন্ত প্রতিবেদন সাক্ষী নং-১৬৩)।* রাত আনুমানিক ২২৩০ ঘটিকার দিকে ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সুবেদার মেজর কেন্দ্রীয় এমটি গ্যারেজের পাশ থেকে লাশ বহনকারী গাড়িগুলোকে মর্চুয়ারির পার্শ্বে নিয়ে যায়। উল্লিখিত স্থানে হাবিলদার জাকির (আরএসইউ) এবং নায়েক ড্রাইভার আলী (সদর রাইফেল ব্যাটালিয়ন)-কে ঐ স্থানে দেখা যায়। সিপাহী ওবায়দুল ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের ভাষ্য মতে দরবার হলে পৌছানোর পর সে দেখে সিপাহী সেলিম, সিপাহী হাবিব ও অন্যান্য অনেকে অফিসারদের মৃতদেহগুলোর উপর বেয়নেট চার্জ করছে এবং বলছে 'ডাল ভাতের টাকা অনেক খাইছিস, এখন দিয়ে যা'। এই সময় সিপাহী ওবায়দুল কর্নেল আনিসের লাশ চালের বস্তায় ভরে। উল্লেখ্য যে, পিকআপের ড্রাইভার সিপাহী জমির এই চালের বস্তাগুলো সরবরাহ করেছিল। এই একই সময় দরবার হলের সামনের মাঠে আরও কয়েকজন সৈনিক বস্তার মধ্যে লাশ ভরার কাজে নিয়োজিত ছিল। তারা আনুমানিক ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ১১০০ ঘটিকার দিকে ১০-১২টি লাশ পিকআপে উঠায়। লাশ ভরা ঐ পিকআপটির ড্রাইভার জমির এবং দ্বিতীয় আসনধারী সিপাহী সেলিমসহ গলফ গ্রাউন্ডের পার্শ্বে ম্যানহোলের দিকে যায়। সিপাহী ওবায়দুলের ভাষ্য অনুযায়ী (যদিও সে সেখানে উপস্থিত ছিল না বলে জানায়) ০৩টি লাশ কেরোসিনের আগুনে পুড়িয়ে ফেলে ও বাকি লাশগুলো গলফ গ্রাউন্ডের পাশে ড্রেনে ফেলে *(সূত্রঃ সেনা তদন্ত প্রতিবেদন সাক্ষী নং ১৬৭)।*

৩৩। <u>দরবার হল-আনুমানিক ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, সন্ধ্যা ১৮০০ ঘটিকা হতে ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, সকাল ০৬০০ ঘটিকা পর্যন্ত)</u>

ক। আনুমানিক রাত ২৪০০ ঘটিকার পর মেজর মনির আশে পাশে কেউ নেই আন্দাজ করে ড্রেন থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। লুকানোর লক্ষ্যে আরো ভালো স্থান খোঁজার জন্য দরবার হলের ছাদের দিকে উঠতে

থাকেন। খুব সাবধানে উপরের দিকে পানির ট্যাংক, এসির যন্ত্রপাতি ইত্যাদি পার হয়ে দরবার হলের ছাদের নিচে ফলস সিলিং এ ঢোকার পথ পেয়ে যান এবং নিঃশব্দে ঢুকে পড়েন। এই স্থান পরিবর্তনের সময় কোন লাশ তার চোখে পড়েনি। ফলস সিলিং এর এঞ্জোলে স্থির হয়ে বসে থেকে নিচে দরবার হলে সারারাত বিভিন্ন সময়ে ২০-৩০ জন সৈনিকের উপস্থিত আন্দাজ করতে পারেন। তাদের বিভিন্ন কথা বার্তা শুনতে পেয়েছিলেন। এধরণের কিছু কথাবার্তা নিম্নরুপঃ

(১) সৈনিক মোবাইলে বরিশালের আঞ্চলিক ভাষায় বলছিল 'সিচুয়েশন কনট্রোল আছে'।

(২) 'শহীদ' নামটি বার বার শুনতে পায়।

(৩) রাত ০১০০ ঘটিকার দিকে একজনের কথা শোনা যায় '১৫ টারে মাইরা আসলাম। মরছে মোট ৬০-৭০টা। আরো কিছু রাখা উচিৎ ছিল'।

(৪) 'শালারা এসে আরাম করে, মজা খায়, আমাদের কষ্ট দেয়, গোসলের পানি পাইনা, গাছে পানি দেয়'।

(৫) ডিজি ম্যাডামকে নিয়ে (সম্ভবতঃ তাকে নির্যাতনকারী সৈনিক হবে) অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় মন্তব্য শোনা যায়। আরো বলে তিনি কোথায় গিয়ে ক্লাস না নিয়েই ৬০/৭০ হাজার টাকা নেয়। টাকা আয় করা কত সহজ!

(৬) অপরিচিত ভাষায় দুইজনকে কথা বলতে শোনেন। কোন ভাষা বুঝতে পারেননি।

(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯২)।

৩৪। **<u>দরবার হল-(২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সকাল ০৬০০ হতে সন্ধ্যা ১৮০০ ঘটিকা পর্যন্ত)</u>**। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে দরবার হল এলাকায় সৈনিকদের উপস্থিতি কমে গেলে মেজর মনিরুল আলম পালানোর চেষ্টা করেন, পরে পালানো সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে পুনরায় দরবার হলের ফলস সিলিং এ ঢুকে পড়েন। বিকাল সোয়া পাঁচটার দিকে হুইপ গোলাম রেজার কণ্ঠ শুনে বের হন, তিনি তাকে গাড়িতে করে পিলখানার মেইন গেইটে নিয়ে যান। পথে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন বলেন, 'আপনি বেঁচে আছেন, পরে কথা হবে' *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯২)।*

৩৫। <u>দরবার হলের আশেপাশের এলাকায় হত্যাযজ্ঞ</u>

ক। দরবার হল থেকে বের হয়ে লে. কর্নেল শামসুল আলম চৌধুরী এক জেসিওর বাসায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। জেসিওর বাসায় লুকানো থাকা অবস্থায় লে. কর্নেল শামস ড্রইং রুমের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেন যে, একজন জেসিও (তার ঐ দিন ডিএডি হবার কথা ছিল) সামনের রাস্তা পার হওয়ার সময় দু'জন অস্ত্রধারী সৈনিকের সাথে কথা কাটাকাটি হচ্ছিল এবং এক পর্যায়ে তার মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে। সে রাস্তায় লুটিয়ে পড়ে। এর ০৫-০৭ মিনিট পর লে. কর্নেল শামস দেখলেন যে, মেজর শাহনেওয়াজ হাত উপরে তুলে ৫ নং গেইটের দিকে দৌড়াচ্ছে। কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ শুনতে পান। তারপর তিনি দেখেন মেজর হুমায়ুন এবং মেজর সালেহকে একইভাবে ৫ নং গেইটের দিকে যেতে। পেছনে অস্ত্রসহ ০২-০৩ জন সৈনিক। কিছুক্ষণ পর আবার গুলির শব্দ শুনতে পান *(সূত্রঃ সাক্ষীর নম্বর-৩৬)।*

খ। ঝাড়ুদার আব্দুল হাকিম বিডিআর হাসপাতালের চার তলার বারান্দা থেকে ১০৪৫ মিনিটে দন্ত চিকিৎসক লে. কর্নেল রবিকে দরবার হল থেকে দৌড়ে আসতে দেখেন। ৫/৬ জন বিডিআরের পোশাক পরা, মুখোশধারী তাকে তাড়া করছিল। এমটি গ্যারেজের সামনে বট গাছের গোড়ায় লে. কর্নেল রবিকে গুলি করে এবং গুলি বিদ্ধ হয়ে লে. কর্নেল রবি ড্রেনে পড়ে যান। ড্রেন থেকে তুলে লে. কর্নেল রবিকে আবার গুলি করা হয়। এরপর হাসপাতালের নার্সিং সিপাহী শেখ রাসেলসহ মুখোশধারী ব্যক্তিরা লে. কর্নেল রবিকে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে ভিতরে ফেলে দেয় *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-২৫)।*

গ। হাবিলদার সহকারী খন্দকার মনিরুজ্জামান দরবার হল থেকে জেসিও কোয়ার্টার এলাকা হয়ে রাইপকস (রাইফেলস্ পরিবার কল্যাণ সমিতি)-এর পাশে ৪৪ রাইফেলস্ ব্যাটালিয়নের কাছে রেকর্ড উইং

এর ব্যারাকে পৌঁছায়। এ সময় কেউ একজন বলে যে ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সুবেদার মেজর এর অফিসে একজন অফিসার লুকিয়ে আছে। তখন তাদের পাশেই এসএমজি হাতে দাঁড়ানো সিপাহী আইয়ুব অফিসারের উদ্দেশ্যে গালি দিয়ে সুবেদার জাহাঙ্গীরকে বলে, 'শেষ করে দেন নাই কেন?' তখন সুবেদার জাহাঙ্গীর এসএমজি নিয়ে জানালা দিয়ে ঐ অফিসারের দিকে বার্স্ট ফায়ার করে। অফিসারটা কে ছিলেন হাবিলদার সহকারী খন্দাকার মনিরুজ্জামান তা দেখেননি। পরবর্তীতে এই সুবেদার জাহাঙ্গীর সদর ব্যাটালিয়নের মামলার বাদী হয়। হাবিলদার সহকারী খন্দকার মনিরুজ্জামান এই হত্যাকান্ডের বিষয়টি রেকর্ড অফিসার (আরও-২) মেজর খালেদ আহমেদকে জানিয়েছিলেন *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-০৯)।*

ঘ। দরবার হল থেকে বের হওয়ার পর লে. কর্নেল কামরুজ্জামানকে যখন সদর রাইফেল ব্যাটালিয়নে মেইন অফিসের পাশের গেইট দিয়ে (কপালসিবল গেইটে) মেইন অফিসে ঢুকানো হয় তখন সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় তিনি দেখেন সিঁড়িতে থোক থোক রক্তের দাগ *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।*

ঙ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজের পর দরবার হলের আশ পাশের এলাকায় লাইট বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বাইরে থেকে আসা আলোতে বেশ কিছু দূর পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। এমতাবস্থায় লুকানো স্থান থেকে লে. কর্নেল শামস দেখেন ১টি সাদা এ্যাম্বুলেন্স ও ১টি পিকআপ ঘন ঘন দরবার হলের সামনে এসে আরএসইউ/১৩ রাইফেলের দিকে ফেরত যাচ্ছিল। তিনি দূর থেকে আরো লক্ষ্য করেন যে এনসিই/ঝাড়ুদাররা ময়লা ফেলার দুই চাকার ঠেলা গাড়ি, বালতি ইত্যাদি নিয়ে দরবার হলের দিকে যাচ্ছিল এবং কেউ কেউ গ্রাউন্ড সিটে কিছু নিয়ে আরএসইউ/১৩ রাইফেলের দিকে ফেরত যাচ্ছিল। এছাড়া উক্ত এ্যাম্বুলেন্স ও পিকআপটি দরবার হল থেকে পুকুরের পাশের মসজিদের নিকট কয়েকবার যাওয়া আসা করে *(সূত্রঃ সাক্ষীর নম্বর-৩৬)।*

৩৬। <u>ডিজির বাসভবনের ঘটনা</u>

ক। দরবার হলে হত্যাযজ্ঞ সম্পন্ন হওয়ার পর সিপাহী ওবায়েদ এবং তার দল ডিজির বাসায় যায়। সেখানে গিয়ে তারা সিপাহী হাবিব ও সিপাহী সেলিমসহ ১০-১৫ জনকে দেখে। সাবাই বাসার ভিতর ঢুকলে সিপাহী হাবিব ও সিপাহী সেলিম ফাঁকা গুলি করে। ফায়ারের শব্দ শুনে ডিজির স্ত্রী নিচে নেমে এলে সিপাহী হাবিব ও সিপাহী সেলিমসহ ০৩-০৪ জন তাকে ধরে ফেলে। সিপাহী সেলিম তার জামা ধরে টানা হেঁচড়া করতে তাকে এবং এক পর্যায়ে তাকে শারীরিক ভাবে নির্যাতন ও লাঞ্ছিত করে। পরে সে শুনেছে সিপাহী হাবিব ও আরোও ০১ জন ডিজির স্ত্রীকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছে। দুই তলায় উঠতেই ডিজির বাসার কাজের মেয়েকে সামনে থেকে একজন গুলি করে। দ্বিতীয় তলায় সিভিল পোষাকে একজন পুরুষ ও একজন মাহিলাকে তারা দেখতে পায় এবং তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়। পরে সে জানতে পারে তারা ছিলেন লে. কর্নেল দেলোয়ার ও তার স্ত্রী। মুখোশধারী একজন লে. কর্নেল দেলোয়ারের স্ত্রীর মাথার উপর টিভি ফেলে আঘাত করে। নিচে নামার সময় তারা ডিজির স্ত্রীর লাশ দেখতে পায় *(সূত্রঃ নম্বর ৭৭৫৯৪ সিপাহী মোঃ ওবায়দুলের বিডিআর হত্যা মামলায় ১৬৪ ধারার জবানবন্দী, সংযোজনী-১৭)।*

খ। ২৬ তারিখ রাত ০৯০০ বা ১০০০ ঘটিকার দিকে এসপি মালেকের গাড়িতে করে লে. কর্নেল সামছুজ্জামান খান, মেজর ফয়সাল ও মেজর রাজন পিলখানার ভিতরে ঢুকে ডিজির বাসায় যান। পুরো বাসায় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল। দোতালায় উঠার সময় তারা দেখেন সিঁড়ি দিয়ে রক্ত নিচ পর্যন্ত চলে এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠার পর দেখেন বাম পাশে একটা বেডরুম। দরজা ঠেলে ঢুকতেই একটা লাশের সাথে তারা ধাক্কা খায়। সাদা শার্ট ও টাই পরা অবস্থায় লাশটা পড়েছিল। সেটা ছিল লে. কর্নেল দেলোয়ারের লাশ। খাটের পাশে একজন মহিলার লাশ পড়েছিল। পরে জানতে পারেন লে. কর্নেল দেলোয়ারের স্ত্রীর লাশ *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬০)*

৩৭। <u>কোত ও ম্যাগজিন এ হত্যাকারীদের কার্যক্রম</u>

ক। <u>কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার গার্ডে প্রবেশ</u>

(১) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ভোর ০৬০০ থেকে দুপুর ১৪০০ ঘটিকা পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার গার্ডে ডিউটি থাকাতে মেজর রিয়াজ ভোর ০৬০০ ঘটিকার ০৫ মিনিট পূর্বে কোয়ার্টার গার্ডে মেজর রফিককে প্রতিস্থাপন করেন। দায়িত্ব বুঝে নেয়ার পর মেজর রিয়াজ কোয়ার্টার গার্ডের চাবির বক্স এবং গার্ডদের চেক করে সব সঠিক দেখতে পান। ঐ সময় কোয়ার্টার গার্ডের চাবি গার্ড কমান্ডারের কাছে ছিল। কোয়ার্টার গার্ডে ডিউটি অফিসারদের কোন রুম না থাকায় ডিউটি জেসিও এর রুমটাই কয়েকদিন থেকে ডিউটি অফিসাররা ব্যবহার করে আসছিলো *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৫)।*

(২) আনুমানিক ০৯০০ ঘটিকার কিছু পূর্বে ডিউটি অফিসার মেজর রিয়াজ যখন ডিউটি অফিসারের রুমে (ডিউটি জেসিও রুম) বসেছিলেন তখন তিনি দেখতে পান যে, ১০-১২ জন সৈনিক (ওয়ার্কিং ড্রেস পরিহিত) গার্ড কমান্ডারের কাছাকাছি পিছনের দিকে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। গার্ড দুইজন অস্ত্র হাতে তাদের স্বস্থানে দাঁড়ানো। এমতাবস্থায় মেজর রিয়াজ রুম থেকে বের হয়ে তাদের কাছে এগিয়ে যান এবং চ্যালেঞ্জ করে বলেন 'এই তোমরা কারা, এখানে কোয়ার্টার গার্ডে কি করছো?' মুহূর্তের মধ্যে সৈনিকগুলো 'এই কুত্তার বাচ্চা আর্মি অফিসার' বলে মেজর রিয়াজের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, মুখ চেপে ধরে তাকে তার রুমের মধ্যে নিয়ে চোখ, মুখ, হাত, পা সব বেঁধে ফেলে। সম্পূর্ণ বাঁধার পর উপুড় করে খাটের উপর রেখে উক্ত রুমের দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে দেয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৫)।*

(৩) আক্রমণকারীদের কারো কাছে কোন অস্ত্র ছিলনা। তবে একজনের হাতে একটি ছুরি ছিল। বহিরাগত সৈনিকেরা যখন মেজর রিয়াজের উপর আক্রমণ করে তখন গার্ড কমান্ডারসহ কোন গার্ডই তাকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসেনি। এর কিছুক্ষণের মধ্যে তারা গার্ড কমান্ডারের কাছ থেকে চাবি নিয়ে কোতের দরজা খুলে ফেলে। কিছুক্ষণ পর মেজর রিয়াজ অসংখ্য সৈনিকের বুটের আর অস্ত্র নিয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে পান। এ সময় সৈনিকেরা 'কুত্তার বাচ্চা আর্মি অফিসার আমাদের ভাত মারছে, আর্মি অফিসাররা বলে আমরা চোর' এই কথাগুলো খুব বেশি করে বলছিলো। ০১-০২ ঘন্টার মধ্যে সৈনিকেরা সমস্ত অস্ত্র নিয়ে যায় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৫)।*

(৪) সিপাহী সেলিমের ভাষ্য অনুযায়ী সিপাহী মইনুদ্দিন এই ৪০ জনকে ০২ দলে ভাগ করে। একটি দল প্রায় ২০ জন সদস্য যায় অস্ত্রাগারে, আরেকদল যায় ম্যাগাজিন কোতে। মইনুদ্দিন এর সাথে ডিজির খুব কাছের কারো যোগাযোগ ছিল যে মইনুদ্দিনকে ফোনে খবর দিচ্ছিল যে ডিজি সাহেব কখন বাসা থেকে বের হয় এবং কখন দরবারে যায়। মইনুদ্দিন এর সাথে কার যোগাযোগ ছিল সেটা সিপাহী সেলিম জানে না। সিপাহী সেলিম ও সিপাহী মইনুদ্দিন ও আরো প্রায় ২০ জন কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার গার্ডে যায়। সেখানে মেজর রিয়াজের সাথে ০৫ জন সৈনিক, একজন হাবিলদার আর একজন নায়েক ছিল। সম্ভবত মেজর রিয়াজ বাদে বাকিরা পরিকল্পনা সম্বন্ধে জানত না। সেখানে পৌঁছাতেই মেজর রিয়াজ ইশারায় মইনুদ্দিনকে বলে যে অন্যান্য সৈনিকদের বেঁধে কোয়ার্টার গার্ডের একটি রুমে আটকে রাখতে। মেজর রিয়াজের কথামত ওদেরকে আমরা কোয়ার্টার গার্ডের একটি রুমে আটকে রাখি। তখন মেজর রিয়াজ আমাদেরকে বলে যে এভাবে আমি যদি তোমাদেরকে চাবি দেই তাহলে তো সব বোঝা যাবে। তোমরা আমাকে বেঁধে একটি রুমে আটকে রাখ *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৪)।*

খ। <u>কেন্দ্রীয় ম্যাগাজিনে প্রবেশ</u>। বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যরা কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার গার্ড দখলের অব্যবহিত পরে আনুমানিক ০৯১৫ ঘটিকার সময় কেন্দ্রীয় ম্যাগাজিনে আক্রমণ করে ম্যাগাজিনের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। পরবর্তীতে ম্যাগাজিন হতে ৩ টন ট্রাকের মাধ্যমে গোলাবারুদ সরবরাহ করতঃ দরবার হল হত্যাযজ্ঞে নিয়োজিত বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের মাঝে বিতরণ করে। ম্যাগাজিনে রক্ষিত সিসিটিভির ভিডিও ফুটেজ থেকে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যগণ কর্তৃক গোলাবারুন্দ সংগ্রহ, নিজেদের মধ্যে বন্টন, বিডিআর বিদ্রোহে অংশগ্রহণে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদেরকে শারীরিকভাবে নির্যাতন এবং পরিশেষে

বিডিআর বিদ্রোহের প্রমাণ ধংসের জন্য ম্যাগাজিনে রক্ষিত সিসিটিভি ক্যামেরাটি আনুমানিক ১১৩০ ঘটিকার সময় ভেঙ্গে ফেলে *(সূত্রঃ সিসি টিভি ফুটেজ সংযোজনী-১৮)।*

৩৮। **<u>সদর রাইফেলস্ ব্যাটালিয়ন</u>**

ক। ঘটনার চার-পাঁচ দিন আগে কয়েকটি লিফলেট পাওয়া যায়। ডিএডি তৌহিদের অধিনায়ক (অ্যাক্টিং সিও সদর ব্যাটালিয়ন) মেজর মোস্তাক ডিএডি তৌহিদকে জিজ্ঞাসা করেন যে লিফলেট পাওয়া সমন্ধে তিনি কিছু জানেন কি না। ডিএডি তৌহিদ এ বিষয়ে কিছু জানেন না জানালে মেজর মোস্তাক সিনিয়র জেসিওদের ডিএডি তৌহিদকে একটি বোর্ড গঠন করে বিষয়টি তদন্ত করতে বলেন।

খ। ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে গোলাগুলি শুরু হলে ডিএডি তৌহিদ তার অফিসের ছাদের উপরে একটি সিঁড়িঘরে লুকিয়ে থাকেন এবং দুপুর ১২০০ টা বা ১২৩০ পর্যন্ত সেখানেই অবস্থান করেন। গোলাগুলি বেড়ে যাওয়ার পর এবং উপরে হেলিকপ্টার উড়ার শব্দ শুনতে পাওয়ার পর ডিএডি তৌহিদ তিন তলার বাথরুমে অবস্থান নেন। এরপর ঐদিন বেলা আনুমানিক ১৫০০ ঘটিকার দিকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল কামরুজ্জামানকে দুইজন সৈনিক ধরে নিয়ে আসে এবং তার কাছে রেখে চলে যায়।

গ। তার কিছুক্ষণ পরেই ডিএডি রহিম এসে হাজির হয়। সে ডিএডি তৌহিদকে বলে যে, ৪ নম্বর গেইটে প্রধানমন্ত্রী এসেছেন তাকে (ডিএডি তৌহিদ) সেখানে যেতে হবে। ডিএডি রহিমের সঙ্গে ডিএডি তৌহিদ চার নম্বর গেইটে যায়।

ঘ। ডিএডি রহিম ছাড়া যেসব বিডিআরের পোশাক পরিহিত সৈনিক ডিএডি তৌহিদকে বিডিআরের চার নম্বর গেইট এ নিয়ে যায় তাদের মুখ কাপড়ে ঢাকা এবং তাদের চুল বড় ছিল।

ঙ। ডিএডি তৌহিদ চার নম্বর গেইটে গিয়ে অনেক সৈনিককেসহ মির্জা আজম, কামরুল ইসলাম ও জাহাঙ্গীর কবির নানককে দেখতে পান। মির্জা আজম, জাহাঙ্গীর কবির নানক এর সাথে ওদের গাড়িতেই তারা ১৩-১৪ জন বিডিআর সদস্যসহ যমুনায় যায়। এর মধ্যে ০৫ জন ডিএডি এবং ০২-০৩ জন এনসিও ছিল। যমুনাতে প্রবেশের সময় কেউ তাদেরকে সার্চ করেনি বা নাম লেখেনি। যমুনাতে যে হল রুমে তারা যায় সেখানে প্রধানমন্ত্রী এবং তার উপদেষ্টারা ছিল। মির্জা আজম এবং জাহাঙ্গীর কবির নানকও তাদের সাথে প্রবেশ করে। তিন বাহিনীর প্রধান সেখানে ছিলেন। উপদেষ্টাদের মধ্যে এইচটি ইমাম ছিলেন।

চ। কিছু সৈনিককের অনুরোধে প্রধানমন্ত্রী সেনা অফিসারদেরকে চলে যেতে বলেন। কিছুক্ষণ পরই তিনি জিজ্ঞেস করেন, 'ডিজির অবস্থা কী?' এ সময়ই সেনাপ্রধান এডিসি ডিএডি তৌহিদকে ডেকে নিয়ে যায়। সেনাপ্রধান তার কাছে পিলখানার ভিতরে অবস্থা জানতে চান। ডিএডি তৌহিদ বলেন ডিজিসহ অফিসারদের অনেককেই হত্যা করা হয়েছে। হল রুমে ফেরত গিয়ে ডিএডি তৌহিদ প্রধানমন্ত্রীকে হাস্যোজ্জ্বল মুখে তার সহকর্মীদের সাথে রাজনৈতিক আলাপে মগ্ন থাকতে দেখেন।

ছ। প্রধানমন্ত্রী ডিএডি তৌহিদকে বলেন যে মিডিয়াতে যাও এবং মিডিয়ার সামনে বল যে প্রধানমন্ত্রী সব দাবি দাওয়া মেনে নিয়েছেন এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে। ডিএডি তৌহিদ প্রধানমন্ত্রীর শিখিয়ে দেয়া কথাগুলো মিডিয়ার সামনে বলেন। সাংবাদিকরা যখনই প্রশ্ন করে যে ভিতরে কতজনকে মেরে ফেলা হয়েছে বা মেরে ফেলা হয়েছে কি-না। ঠিক তখনই আজম, জাহাঙ্গীর কবির নানকরা তাকে টেনে সাংবাদিকদের কাছ থেকে সরিয়ে ফেলে।

জ। এর কিছুক্ষণ পর ডিএডি তৌহিদ ও অন্যান্য বিদ্রোহীরা পিলখানায় ফেরত আসে। রাতে ডিএডি তৌহিদ এবং ডিএডি রহিম হোটেল আম্বালাতে ছিলেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হোটেল আম্বালায় বিডিআর সৈনিকদের সাথে অনেকক্ষণ ধরে বৈঠক করেন এবং পরে আইজিপি সহযোগে ভিতরে যান।

ঝ। ডিএডি তৌহিদের মতে শেখ হাসিনা এবং তার মন্ত্রিপরিষদ বিডিআর হত্যাকান্ডের জন্য দায়ী। আওয়ামী লীগ নেতা যেমন শেখ সেলিম, জাহাঙ্গীর কবির নানক, তাপস এদের বাসায় বিডিআর সদস্যরা যেতো এবং তারাই তাদেরকে উসকে দিয়েছে। শেখ পরিবারের হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ এবং পার্শ্ববর্তী দেশ সম্ভবত পদুয়া-রৌমারি যুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চেয়েছে *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-০২)।*

ঞ। পক্ষান্তরে, ঝাড়ুদার আব্দুল হাকিম শুক্রবারে পিলখানায় কেন্দ্রীয় মসজিদে নামাজের সময় লক্ষ্য করতেন যে মাঝে মাঝেই শুক্রবারে শেখ ফজলে নূর তাপস বিডিআর মসজিদে নামাজ পড়তে আসত। নামাজের পরে বিডিআর সৈনিকদের সাথে মসজিদের ভেতরে বৈঠক করত। তিনি অন্তত তিন দিন ফজলে নূর তাপসকে ডিএডি তৌহিদ এবং আরো সৈনিকদের সাথে নামাজের পরে মসজিদের ভিতরে বৈঠক করতে দেখেছেন। ০৪-০৫ বছর আগে, কাশিমপুর হাই সিকিউরিটি জেল-২ এ অবস্থানকালে অসুস্থ সিপাহী জুয়েল এর কাছে ঝাড়ুদার আব্দুল হাকিম জানতে পারেন যে, বিডিআর বিদ্রোহের জন্য তৎকালীন সরকারি লোকজন ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন সিপাহী জুয়েল টাকা পেয়েছে কি-না। সিপাহী জুয়েল কোন সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলে যে, 'যার যা পাওয়ার তারা পেয়েছে।' ঐদিন রাত্রেই জুয়েল স্ট্রোক করে মারা যায় *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-২৫)।*

৩৯। <u>১৩ রাইফেলস্ ব্যাটালিয়ন</u>।

ক। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সকাল ১১০০ ঘটিকায় ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সিপাহী সাজ্জাদ সুইমিং পুলের গ্যালারির নিচে যেখানে কয়েকটি স্টোররুম আছে সেখান থেকে হঠাৎ ফিসফাস শব্দ শুনতে পায় এবং সিগারেট এর ধোঁয়া দেখতে পায়। যেহেতু সাঁতার অনুশীলন ছাড়া সুইমিং পুলের স্টোর রুম খোলা হয় না তাই সেখানে মানুষের উপস্থিতি তাকে কৌতুহলি করে তোলে। ঐ সময়ে সে দেখতে পায় দরবার হলের সামনের পাঁচ নম্বর গেইট দিয়ে একটি মিছিল এগিয়ে আসছে। মিছিলটি কাছাকাছি এলে সে শুনতে পায় মিছিলকারীরা 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, বিডিআর-সিভিল ভাই ভাই' ইত্যাদি শ্লোগান দিচ্ছে। এমন সময় হঠাৎ স্টোররুমের দরজা গুলো শব্দ করে খুলে যায় এবং সেখান থেকে কমপক্ষে ২০-৩০ জন লোক বা তারও বেশি হতে পারে বের হয়ে মিছিলের কাছে যায়। লোকগুলো সবাই সিভিল ড্রেস এ ছিল। তাদের দৌড়ে আসতে দেখে মিছিলটি একটু থমকে দাঁড়ায় এবং সিপাহী সাজ্জাদের মনে হয় যারা মিছিল করে আসছিল আর যারা দৌড়ে মিছিলের দিকে গেল তারা পূর্ব পরিচিত এবং তারা নিজেদের মধ্যে, 'আরে তোরা, এখানে কি অবস্থা?' এ ধরনের কথা বার্তা বলে। সিপাহী মিছিলটি অনুসরণ করে দেখতে পায় বিপরীত দিকে আরো একটি মিছিল আসছে এবং দুটো মিছিল এক হয়ে কিছুক্ষণ তারা জড়ো হয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলাবলি করে। এরপর তারা আবার দুই ভাগ হয়ে এক দল পাঁচ নম্বর গেইট দিয়ে আর আরেক দল তিন নম্বর গেইট দিয়ে বের হয়ে যায়। সিপাহী সাজ্জাদ এবং আরো কয়েকজন বিডিআর সৈনিক সুইমিং পুলের স্টোর রুমে, যেখান থেকে কিছু ব্যক্তি বের হয়ে মিছিলে মিশে গিয়েছিল, সেখানে কমপক্ষে ৩০-৪০ সেট একদম নতুন ইউনিফর্ম মাটিতে পড়ে থাকতে দেখতে পায়। সে সব ইউনিফর্মের বেশিরভাগেই নেম ট্যাগ, ফর্মেশন নম্বর এগুলো যা থাকে তার কিছু ছিল না *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৩)।*

খ। ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে সিপাহী সাজ্জাদ সিগন্যাল সেক্টরের মসজিদের কাছে একটি সাদা মাইক্রোবাসে ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসকে দেখতে পান। ফজলে নূর তাপস একজন বিডিআর সৈনিকের মাধ্যমে সিগন্যাল বিল্ডিং থেকে দুই জন অফিসারকে ডেকে আনেন এবং তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দ্রুত বের হয়ে যান। দুই অফিসারের মধ্যে একজন ছিলেন ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দার নূর যাকে সিপাহী সাজ্জাদ খুব ভালোভাবে চিনতো এবং অপরজনের নাম মেজর মইনুল *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৩)।*

৪০। <u>৪৪ রাইফেলস্ ব্যাটালিয়ন</u>।

ক। ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দার নূর ও সিপাহী মুহিত ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে একটি স্টোররুমে লুকিয়ে ছিলেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি প্রায় ১৬৩০ ঘটিকায় সিপাহী মুহিত হঠাৎ শুনতে পায় পিলখানার ভিতরে মাইকিং হচ্ছে 'এখানে কোন অফিসার থাকলে বের হয়ে আসুন, আমরা আপনাকে উদ্ধার করার জন্য এসেছি।' এর কিছুক্ষণ পরেই পৌনে পাঁচটা বা সাড়ে পাঁচটার দিকে একটা র‍্যাব এর গাড়ি সিপাহী মুহিতদের অবস্থানের

কাছাকাছি (তিন-চার হাত দূরে) রাস্তায় আসে। গাড়ির দ্বিতীয় আসনধারী ছিলেন ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস। তার সঙ্গে ০৪ জন মুখোশধারী র‍্যাব সদস্য ছিল। ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস সেখান ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দার নূরকে তার সাথে নিয়ে যান ***(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১২)।***

খ। র‍্যাবের টিএফআই সেলে জিজ্ঞাসাবাদের সময় সিপাহী মুহিত ব্যারিস্টার তাপস কর্তৃক ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দার নূরকে নিয়ে যাওয়ার কথা বললে উক্ত স্থানে উপস্থিত ব্যারিস্টার তাপস সিপাহী মুহিতকে শারীরিকভাবে নির্যাতন করে ***(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১২)।***

৪১। <u>সেক্টর সদর দপ্তর, ঢাকা</u>

ক। বিএ-৪০৯৭ মেজর আব্দুল্লাহ আল মামুন, ১৫ রাইফেল ব্যাটালিয়ন দেড় বৎসর যাবৎ ঢাকা সেক্টরের অধীনে 'অপারেশন ডালভাত' এর সমন্বয়কারী অফিসার হিসাবে সংযুক্ত ছিলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে তিনি ছুটিতে থাকায় বাসায় অবস্থান করছিলেন। ঐদিন সকালে ঘুম থেকে উঠার পর প্রস্তুতি নিয়ে বাইরে বের হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে বিভিন্ন দিক থেকে গুলির আওয়াজ শুনতে পান। তিনি রুমের জানালা দিয়ে ২৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের অফিসের বারান্দার দিকে তাকিয়ে তিনি দেখতে পান যে, কিছু সংখ্যক বিডিআর জওয়ান বিক্ষিপ্তভাবে ছোটাছুটি করছে। এদের দু'একজনের হাতে রাইফেল ছিল এবং কেউ কেউ চিৎকার বা ধমক দিয়ে অন্যদেরকে অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র ও গোলাবারুদ আনতে বলছিলো। উক্ত অস্বাভাবিক অবস্থা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা লাভের জন্য নিজ অফিস ঢাকা সেক্টর সদরে চলে যান। অফিসের বারান্দায় চাপা উত্তেজনা এবং দুশ্চিন্তার ছাপ নিয়ে সাত আটজন সৈনিক দাঁড়িয়ে ছিল। গোলাগুলির বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তাদের একজন জানায় যে, বিডিআর সৈনিকেরা বিদ্রোহ করেছে এবং অফিসারদের জিম্মি করেছে। তাকে তারা বাসায় চলে যেতে অথবা পালিয়ে যেতে পরামর্শ দেয়। তিনি বাসায় ফিরে গিয়ে দুই সন্তান ও গৃহপরিচারিকাকে খাটের নিচে লুকিয়ে রেখে নিজে বাইরে পালাতে ব্যর্থ হয়ে পুনরায় অফিসে ফিরে আসেন। এ সময় বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্ন দিক থেকে বিদ্রোহী সৈনিকগণ গুলি চালাচ্ছিল। অফিস কক্ষে থাকা নিরাপদ হবে না মনে করে তিনি দোতলায় তিনজন ক্লার্কের সহায়তায় তাদের ক্লার্ক রুমে রক্ষিত স্টিলের আলমারির পেছনে লুকিয়ে থাকেন। বেলা আনুমানিক ১১০০ ঘটিকার দিকে একদল উচ্ছৃঙ্খল সৈনিক ঢাকা সেক্টরে প্রবেশ করে বিভিন্ন রুমে ঢুকে মেজর মামুনকে সন্ধান করতে থাকে। তারা কমান্ডারের অফিস, সেক্টর অপারেশন রুম এবং জিএসও-২ এর অফিস ভেঙ্গে তছনছ করে এবং রুমের ভেতর এলোপাথাড়ি গুলি করে। এক পর্যায়ে তারা তিনি যে রুমে লুকিয়ে ছিলেন সে রুমে প্রবেশ করে এবং রুমে উপস্থিত ক্লার্ককে সেখানে কোন অফিসার আছে কি-না জিজ্ঞাসা করে। ক্লার্কদের মুখে কোন অফিসার নেই এই কথা শোনার পর তাদেরকে গালিগালাজ করে এবং দ্রুত অস্ত্র, গোলাবারুদ নিয়ে তাদের বিদ্রোহে যোগ দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়। জীবন বাঁচাবার তাগিদে ক্লার্করা নির্দেশ পালন করার জন্য রুম থেকে বের হয়ে যায়।

খ। শেষ বিকেল অথবা সন্ধ্যার আগে র‍্যাবের একজন অফিসার তার মোবাইলে রিং করে পরিস্থিতি জানতে চায়। মেজর মামুন তাকে জানায় যে, প্রায় প্রতিটি অফিস বিল্ডিং ও অফিসারদের কোয়ার্টারের ছাদে এবং নিচে বিদ্রোহীরা অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ অবস্থান নিয়েছে। এমতাবস্থায় র‍্যাব ও সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে কোন সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে চাইলে তা ৩ নম্বর গেইট থেকে ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়নের লাইন বরাবর স্থান থেকে আরম্ভ করতে হবে এবং 'ফাইটিং ইন বিল্ডআপ এরিয়ার' কৌশল অবলম্বন করতে হবে।

গ। অন্ধকার হতে শুরু করলে উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকদের চলাচল ও উত্তেজনা কিছুটা কমতে থাকে। এই সময় দুইজন ব্যক্তি পিকআপের উপরে হ্যান্ড মাইক নিয়ে সৈনিকদেরকে পুনরায় উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করে। এদের একজনের কন্ঠস্বর ছিল ডিএডি নাসির, ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের। রাত ২২০০ ঘটিকা বা ১০৩০ ঘটিকায় সে ঘুরে ঘুরে মাইকিং করে বলছিল 'বিডিআরের কোন সৈনিক লাইনে থাকবে না, প্রত্যেকে তার ডিফেন্সে অবস্থান করবে। সৈনিক লাইন চেক করা হবে, যদি কোন সৈনিককে লাইনে পাওয়া যায় তাহলে তার বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা নেয়া হবে'।

ঘ। রাত আনুমানিক ১২৩০ বা ১৩০০ ঘটিকার দিকে তিনি শুনতে পান কেউ একজন মাইকে ঘোষণা করছে যে 'মেজর মামুন পিলখানার অভ্যন্তরে কোথাও লুকিয়ে আছে এবং সে মোবাইলের মাধ্যমে ক্যান্টনমেন্টে আমাদের তথ্য জানিয়ে দিচ্ছে এবং ট্যাংক নিয়ে আমাদেরকে আক্রমণ করার জন্য পরামর্শ দিচ্ছে। যে কোন প্রকারেই হোক তাকে খুঁজে বের করে শেষ করে দাও।'

ঙ। রাত আনুমানিক ০২১৫ ঘটিকার দিকে পাঁচ ছয় জনের একদল বিদ্রোহী সৈন্য মেজর মামুনকে আলমারির পিছন থেকে খুঁজে বের করে এবং প্রহার করতে করতে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে আটকে রাখে *(সূত্রঃ সাক্ষী নং-১১১)।*

চ। নাজিফা চৌধুরী ২০০৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি সিটিসেল মোবাইল কোম্পানিতে কর্মরত ছিলেন। আনুমানিক ২টা থেকে ৩টার দিকে সিটিসেল তাদের নেটওয়ার্ক বন্ধ করে সবাইকে ছুটি দিয়ে দেয়। পরের দিন অফিসে এসে রিপোর্ট তৈরি করতে গিয়ে নাজিফা চৌধুরী দেখেন যে, সফটওয়্যারে কোনো ডাটা নেই। তার মতে সিটি সেলের তৎকালীন টেকনিক্যাল প্রধান তানভির রানা ডাটা মুছে দিয়েছিলেন। পরের দিন সকাল ১০৩০ বা ১১০০ ঘটিকার দিকে তানভীর রানা, সবুজ, ইমরুল এবং রাহাত মজুমদার ডাটা সেন্টারে আসে এবং টেলিফোন করে কাউকে জানান যে, একটি মোবাইল নম্বর একটিভ আছে। তারপর আবার নেটওয়ার্ক বন্ধ করে দিয়ে সবাইকে ছুটি দেওয়া হয়। তারা ট্র্যাক করে বের করেছিল কোন অফিসাররা পিলখানার বিটিএস এর ভিতরে আছে তাদের অবস্থান কাউকে জানাচ্ছিল। নাজিফা চৌধুরী জিজ্ঞেস করেছিলেন কার লোকেশন কাকে জানানো হচ্ছে। তানভির রানা বলেছিলেন বিডিয়ার বিদ্রোহীরা যারা পালাচ্ছে, তাদের ব্যাপারে তিনি জানাচ্ছেন। অথচ কাজ করা হচ্ছিল ঠিক এর বিপরীত। ঘটনার ছয় মাস পরেই তানভির রানা ইংল্যান্ডে চলে যান *(সূত্রঃ বেসামরিক ব্যক্তি সাক্ষী নম্বর-০৭, ভিডিও বক্তব্য, সংযোজনী-১৮)*

৪২। **<u>রাইফেল সিকিউরিটি ইউনিট (আরএসইউ)</u>**। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ আনুমানিক ০৮০০ ঘটিকার সময় একজন পুলিশ কর্মকর্তা (মেজর গাজ্জালীর আত্মীয়) মেজর গাজ্জালীকে ফোন করে জানান যে, ফার্মগেইট এলাকায় বিডিআর সম্পর্কে একটি লিফলেট পাওয়া গেছে। জিজ্ঞাসাবাদে মেজর গাজ্জালী নিশ্চিত হন যে, উক্ত লিফলেটটি এবং পিলখানায় প্রাপ্ত লিফলেটটি একই। অধিনায়ক আরএসইউ তখন মেজর শাহনেওয়াজকে জরুরি ভিত্তিতে একজন এফএসকে উক্ত এলাকায় পাঠিয়ে কোন্ কোন্ জায়গায়, কী সংখ্যক লিফলেট ছড়ানো হয়েছে তা জানাতে বলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৭১)।*

৪৩। **<u>বিডিআর হাসপাতাল</u>**

ক। দরবার হল থেকে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরানোর পর তিনজন মহিলা ডাক্তার লে. কর্নেল ইয়াসমিন, মেজর রুখসানা ও মেজর ফারজানাকে হাসপাতালের অপারেশন থিয়েটারে নামিয়ে দেয়া হয়। তখন অপারেশন থিয়েটারে বেশ কিছু আহত সৈনিক ছিল। লে. কর্নেল সদরুল (Anaesthetist) ও লে. কর্নেল তানভীর (Surgical Specialist) ওদের চিকিৎসা করছিলেন। দুপুর ১২টার দিকে বিডিআর হাসপাতালের সিভিল ডাক্তার জনাব আমজাদের মিসেসকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় বিডিআর সৈনিকরা হাসপাতালে নিয়ে আসে। তার পেটে গুলি করা হয়েছিলো। Intestine এ ৫টা ফুটা ছিলো। রুগীর অবস্থা খুবই আশঙ্কা জনক ছিলো। সাথে সাথে অপারেশন করা হয়। ব্লাড ব্যাংক থেকে রক্ত এনে দেয়া হয়। বিডিআর সদস্যরা কোন আহত অফিসারকে হাসপাতালে আনে নাই। মোটামোটি সারাদিনই ওদের আহত সৈনিকরা এসেছে, যার মধ্যে গুরুতর আহত ১৪ জনকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। বাকিরা চিকিৎসা নিয়ে চলে যায়। ঘন্টা তিনেক পর মেজর এ্যানি ওটিতে আসে। তিনি স্কুল ঘরে লুকিয়ে ছিলেন। সন্ধ্যায় লে. কর্নেল রাজ্জাক, লে. কর্নেল আনোয়ার, লে. কর্নেল জাহানারা, লে. কর্নেল ফরহাদ ও মেজর আহসানের সাথে মেজর রুখসানার ওটিতে দেখা হয়। তাদের একেকজন একেকভাবে ওটিতে এসেছিল। রাতে ওটি এ্যাসিস্ট্যান্টরা ডাক্তারদেরকে খবর দেয় যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুন ও জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক পিলখানায় এসেছিলেন এবং চলেও যান।

খ। ওটির বাইরে সর্বক্ষণ গ্রেনেড ও রাইফেল হাতে কয়েকজন পাহারা দিচ্ছিলো। ডাক্তারদের মধ্যে দু একজন ওটি এ্যাসিসটেন্টদের মোবাইল নিয়ে বাইরে আত্মীয় স্বজনদের সাথে কথা বলেছে এবং আশ্চর্য্যের ব্যাপার হলো কথা বলার কিছুক্ষণের মধ্যেই বিডিআর সদস্যরা ঘরে ঢুকে ডাক্তারদেরকে চার্জ করেছে কে মোবাইলে কথা বলেছে কারণ, সেটা নাকি তাদের টাওয়ারে ধরা পড়েছে। যখনই কেউ মোবাইলে কথা বলেছে তখনই বিডিআর সদস্যরা এসে হুমকি দিয়েছে। রাত ২টার সময় ডাক্তাররা খবর পায় যে ৩ ট্রাক লাশ আনা হয়েছে। সম্ভবত গণকবর দেওয়ার জন্য।

গ। ২৬ ফেব্রুয়ারিও কয়েকজন বিদ্রোহী গ্রেনেড ও রাইফেল হাতে লে. কর্নেল সদরুলের রুমে বসে ডাক্তারদেরকে পাহারা দেয় । দুপুর ৩টার দিকে প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেন। ওটিতে একটি টিভি ছিলো যাতে শুধু বিটিভি দেখা যেতো। সেখানে সারাদিনই গান বাজনা হতো। এমনকি প্রথম দিন খবরেও বলা হয়েছে বিডিআর বিদ্রোহে কোন প্রাণহানি হয় নাই। বেলা ৪টার দিকে হঠাৎ প্রচন্ড গুলাগুলি শুরু হয়। ডাক্তাররা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। ততক্ষণে বিদ্রোহী সৈনিকের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। একজন সিস্টারের দেওয়া শাড়ি পরে তিনজন মহিলা ডাক্তার আতাউরের সহযোগিতায় ১ নং গেইট দিয়ে বের হয়ে যান *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪২ এবং সাক্ষী নম্বর-৬৮)।*

ঘ। ঝাড়ুদার আব্দুল হাকিম এর সাক্ষ্য অনুযায়ী ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরের দিকে ডিএডি তৌহিদ আরো কিছু লোকজন নিয়ে হাসপাতালে এসেছিল। সেখানে সে সবাইকে এই বলে আশ্বাস দেয় যে, আমাদের (বিদ্রোহীদের) পিছনে অনেক বড় শক্তি আছে। আমাদের কিছু হবে না। আমরা যেন সবাই নিশ্চিন্তে থাকি *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-২৫)।*

৪৪। **<u>অফিসার মেসের ঘটনা</u>।** অফিসার মেসের মেইন বিল্ডিং ও কৈখালী বিল্ডিং এর বিভিন্ন রুমে বেশ কিছু অফিসারের পরিবার অবস্থান করছিলেন। সকাল ১০০০ ঘটিকার পর বিডিআরের সদস্যরা মেস এ এসে বিভিন্ন দরজা ভেঙ্গে ভিতরে ঢোকে। মিসেস সুস্মিতা মাহবুব, স্বামী মেজর মাহবুবুর রহমান তার মেয়েসহ শাড়ি ঝুলিয়ে মেসের পিছন দিক দিয়ে নিচে নামেন এবং একজন বিডিআর সৈনিকের সাহায্যে দেয়াল টপকিয়ে পিলখানা হতে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। বিকাল ১৬০০ ঘটিকার পূর্বে তাদেরকে বিভিন্ন সময়ে কোয়ার্টার গার্ডে রাখা হয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিকাল ১৬০০ ঘটিকার দিকে কোয়ার্টার গার্ড থেকে তারা মুক্তি পান ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৭৮)।***

৪৫। **<u>অফিসার বাসভবনের ঘটনা</u>**

ক। পুরাতন ডিজি ভবন এলাকায় আনুমানিক ০৪টি পরিবার, ঢাকা সেক্টর সদর দপ্তর সংলগ্ন অফিসার আবাসিক এলাকায় আনুমানিক ৭টি পরিবার এবং মূল অফিসার্স বাসস্থান এলাকায় প্রায় ৩০ জন অফিসারের পরিবার অবস্থান করছিলেন। প্রায় প্রত্যেক বাসাতেই বিডিআর সদস্যরা ১০৩০ ঘটিকার পর বিভিন্ন সময়ে দরজা ভেঙ্গে প্রবেশ করে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করে, তাদেরকে খুবই বাজে ভাষায় গালিগালাজ করে এবং তাদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার করে ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে কোয়াটার গার্ডে নিয়ে যায়। অফিসার বাসস্থানে রাখা অফিসারদের ব্যক্তিগত গাড়িগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ বিকাল ১৬০০ ঘটিকার দিকে তারা কোয়ার্টার গার্ড হতে মুক্তি পান। এর মধ্যে মিসেস নেহেরীন ফেরদৌস, কর্নেল মুজিবুল হক এর স্ত্রী পিলখানায় জিমনেসিয়ামের ভিতর লুকিয়ে ছিলেন। অপরদিকে লে. কর্নেল কামরুজ্জামানের স্ত্রী, ছেলে ও মেয়ে পিলখানাস্থ বাসা নম্বর ৭/এ (শঙ্খ) এর নিচ তলায় বসবাস করেতেন। তার বাসায় বিডিআর সৈনিকরা গেলেও বাসায় প্রবেশ করতে পারেনি। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ দিবাগত রাতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনের সাথে লে. কর্নেল কামরুজ্জামানের স্ত্রী ও সন্তানেরা তাদের ব্যক্তিগত কার যোগে পিলখানা ত্যাগ করে। মেজর আসাদ-উদ-দৌলা এবং মেজর নওরোজ নিকোশিয়ার এর পরিবার ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ১৬০০ ঘটিকায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন কর্তৃক উদ্ধারপ্রাপ্ত হন। এ ছাড়াও অনেক শহীদ অফিসারের পরিবার পিলখানার বাইরে অবস্থান করছিলেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫, সাক্ষী নম্বর-৫৯, সাক্ষী নম্বর-৭১ এবং শহীদ পরিবার সাক্ষী নম্বর-১৪)।***

খ। অফিসার বাসস্থানে অবস্থানরত লে. কর্নেল ইয়াসমিনের স্বামী জনাব একেএম আরিফুর রহমান ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ০৯৩০ থেকে ১০০০ ঘটিকার মধ্যে ফোনে বিভিন্ন জনকে বিডিআর বিদ্রোহের বিষয়টি জানান। প্রধান বিচারপতির জামাতার সঙ্গে তার কথা হয় এবং ল' মিনিস্ট্রিতে কল করেন। চিফ জাস্টিসের মাধ্যমে বিষয়টি আইজিপিকে জানানো হয়েছে মর্মে তিনি জানতে পারেন। আইজিপি ও প্রধান বিচারপতির ইন্টারভেনশনের কথা শুনে তিনি কিছুটা আশ্বাস পান। তিনি কিছু গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিতে দেখেন এবং চারদিকে ভয়াবহ অস্থিরতায় ছড়িয়ে পড়ে। জোহরের নামাজের সময় আকাশে একটি হেলিকপ্টার উড়ে যাচ্ছিল, সেটার উপরও গুলি চালানো হয় *(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-০৪)।*

গ। ২০০৯ সালে লে. কর্নেল লুৎফর রহমান খানের মেয়ে ফাবলিহা বুশরার বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। পিলখানার পারিবারিক বাসস্থানে থাকা অবস্থায় প্রায় ০৯৩০ থেকে ১০০০ ঘটিকার মধ্যে তার বাবার সঙ্গে ফোনে তার শেষ বারের মতো কথা হয়। বাসায় তার মা ও ছোট ভাই ছিল। গোলাগুলি শুরু হয়েছে বলে তার বাবা বাইরে যেতে নিষেধ করেন। ১১০০ ঘটিকার পরে তাদের বাসার দরজায় ধাক্কা দেওয়া শুরু হয়। ততক্ষণে অনেক বাসা থেকে পরিবারের সদস্যদেরকে বের করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কারও পরনে ছিল ঘরোয়া পোশাক, কেউ অর্ধনগ্ন। দরজায় ভারি কিছু দিয়ে আঘাত করা শুরু হলে দরজা খুলতে হয়। দু'জন অস্ত্রধারী লোক ভিতরে ঢোকে, ইউনিফর্ম পরা, কোমরে অস্ত্র, মাথায় কাপড় বাঁধা। তারা চিৎকার করে বলে, 'দরজা খোল, অনেক খাইছিস, এখন বাইর হ।' তাদের আচরণ ছিল হিংস্র ও বিদ্বেষপূর্ণ। বিদ্রোহীরা তাদের সাথে 'তুই-তোকারি' করে কথা বলে এবং এক পর্যায়ে তারা ফাবলিহা বুশরাকে যৌনভাবে হেনস্থা করে। বাসা থেকে তাদেরকে কোয়ার্টার গার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। কোয়ার্টার গার্ডের ভিতরে ছিল অল্পবয়সী, ১৭-১৮ বছরের সশস্ত্র জওয়ানদের ভিড়। সেখানে অসংখ্য নারী, শিশু ও বৃদ্ধ বন্দী অবস্থায় ছিল। বিদ্রোহীরা সাবাইকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করে। দুপুর পর্যন্ত ভয়ঙ্কর অবস্থা চলতে থাকে। বন্দুক উঁচিয়ে ভয় দেখানো, নারীদের ধর্ষণের হুমকি, নাম ধরে গালাগালি সবই ঘটছিল। তারা জিন্স বা গেঞ্জি পরা মেয়েদের ধর্ষণের হুমকি দিচ্ছিল। রাত দুইটার দিকে বিদ্রোহীরা দরজা বন্ধ করে হুমকি দেয়, 'চুপ থাকো, সাহারা খাতুন যেন না জানে।' তারা বলছিল, 'এটা অস্ত্র সমর্পণ না।' আমরা বুঝেছিলাম তারা আত্মসমর্পণের নাটক করছে। সাহারা খাতুন এলেও কাউকে বের করেননি। রাতের দিকে একজন বলে, 'কোনো অফিসারই বেঁচে নেই।' তারা কর্নেল মুজিব ও অন্যান্য কমান্ডারদের নাম নিয়ে বলছিল সবাইকে মেরে ফেলা হয়েছে। ফোনে খবর দিচ্ছিল, 'অনেককে মেরে ফেলেছি।' এক সৈনিক ফোনে বলেছিল, 'প্রতি অফিসার এত লাখ টাকা'-কর্নেল ৫১ লাখ, লেফটেন্যান্ট কর্নেল ৩১ বা ৩৭ লাখ। মনে হচ্ছিল, হত্যার বিনিময়ে দর কষাকষি চলছে *(সূত্রঃ শহীদ পরিবার সাক্ষী নম্বর-১১)।*

৪৬। **<u>কোয়ার্টার গার্ড এলাকায় অফিসার পরিবারবর্গের জিম্মিকরণ।</u>**

ক। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সকাল ১১০০ ঘটিকার পর থেকেই অফিসার ও অফিসার পরিবারবর্গকে কোয়ার্টার গার্ডে আনা শুরু হয়। আস্তে আস্তে অফিসারদের স্ত্রী ও পরিবারবর্গের সদস্যদের আগমন বাড়ছিলো। তারা নোংরা ভাষায় অফিসারদের স্ত্রীদের গালাগালি করছিল এবং আনন্দ করার কথা বলছিলো। কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে সবাইকে মেরে ফেলতে চায়, আবার কেউ কেউ তাদের শান্ত হতে বলে। তাদের কথাবার্তায় একটা জিনিস স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, আর্মি অফিসাররা তাদের অতিরিক্ত ইনকাম বন্ধ করে দিচ্ছে, এটাই তাদের ক্ষোভ। মোট তিনটি সেলে অফিসাদের স্ত্রী ও বাচ্চাদের গাদাগাদি করে বন্দী করে রাখা হয়। একটি সেলে দুইজন বিদেশীও ছিল। একটি সেলে অফিসারদের কয়েকজন ছেলে দরজার একদম কাছে ছিল এবং এরা গার্ডদের সাথে কথাও বলছিলো ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৫)।***

খ। ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে লে .কর্নেল আসিফ ও তার পরিবারকে বাসা থেকে অত্যাচার করতে করতে কোয়ার্টার গার্ডে নেওয়া হয়। লে .কর্নেল আসিফকে দক্ষিণ দিকের ফার্স্ট সেলে বন্দী করে রাখা হয়। একই সেলে মেজর দেওয়ান এবং কিছু ভাবি ও বাচ্চারা ছিলো। এক সময় সংখ্যাটা ৬০এ পৌ ৭০/ঁছায়। তিনি এবং তার ছেলে বিদ্রোহী সৈনিকদের বেশকিছু আলোচনা শোনেন। আলোচনার মধ্যে ছিল' ,একটা করে মাথা নিমু, চার লাখ টাকা করে পাবো। 'জয় বাংলা! জয় বঙ্গবন্ধু!' ইত্যাদি ***(সূত্রঃ সাক্ষী নং-৫৯)।***

গ। রাতে মেজর রিয়াজকে ডিউটি অফিসারের রুম থেকে বের করে আনা হয়। কেউ তাকে বার্স্ট ফায়ার করে মেরে ফেলতে চায়। কেউ তখন বলে 'না, এখন মারা যাবে না।' তারপর তাকে আবার একটি সেলে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। উক্ত সেলে তখন আহত অবস্থায় মেজর মামুনসহ (মাথায় রক্তক্ষরণ হচ্ছিলো এবং গোঙ্গাচ্ছিল) গাদাগাদি করে অন্যান্য ভাবী ও বাচ্চারা ছিলো ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৫)।***

ঘ। গভীর রাতে কোতে বন্দী অফিসার এবং ভাবীরা শুনতে পান যে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন কোতে আসছেন। তাদেরকে কোনো শব্দ না করার জন্য সতর্ক করে দিয়ে সমস্ত সেল বাহির থেকে লক করে দেয়া হয়। আনুমানিক রাত ০২০০ ঘটিকার সময় অফিসার এবং ভাবীরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর গলা শুনতে পেলেন। উনি সৈনিকদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করেন। তারপর অস্ত্র জমা শুরু হয়।। কিছুক্ষণ পর মন্ত্রী বললেন 'আপনারা নিজে অস্ত্র জমা করুন, আমি যাই'। মন্ত্রী চলে যাওয়ার কিছু সময় পর সৈনিকেরা পুনরায় অস্ত্র হাতে তুলে নিতে থাকে ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৫)।***

ঙ। কোতে বন্দী অফিসারদের কাছে মনে হয়েছে, যে ভাবে অস্ত্র জমা পড়ছিলো, মন্ত্রী ওখানে কয়েকঘন্টা অবস্থান করলে সম্ভবতঃ অধিকাংশ অস্ত্র জমা পড়তো এবং সে রাতেই সমস্যার সমাধান হতে পারতো ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৫)।***

চ। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ২৫/২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ রাতে কোয়ার্টার গার্ড থেকে কোন অফিসার কিংবা পরিবারবর্গকে উদ্ধার করে বাইরে নিয়ে যাননি ***(সূত্রঃ সাক্ষী নং-৫৯)।***

ছ। ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে বারোটার দিকে জানানো হয় যে, বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করতে চায়। তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুন, প্রতিমন্ত্রী জনাব কামরুল ইসলাম এবং আইজিপি নূর মোহাম্মদ একত্রে পিলখানায় যান। তারা গিয়ে দেখেন বিদ্রোহীরা উত্তেজিত অবস্থায় হইচই করছে। তাদের শান্ত করতে অনেক সময় লেগে যায়। এরপর বিদ্রোহীরা বিভিন্ন অভিযোগ তুলে ধরে যেমনঃ ডাল-ভাত প্রোগ্রামের অনিয়ম, স্কুলে ভর্তিতে অনিয়ম, খাবারের সংকট ইত্যাদি। পরে তারা কিছু অস্ত্র জমা দিয়ে আত্মসমর্পণের নাটক করে। তারা আইজিপি কন্যা এবং আরো ১৫ জনের মতো মানুষকে গাড়িতে করে নিয়ে বের হয়ে আসেন *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নং-০১)।*

জ। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ আনুমানিক ০৯০০-১০০০ ঘটিকায় মেজর রিয়াজ যে সেলে বন্দী ছিলেন সেখান থেকে মহিলা ও বাচ্চাদের পৃথক সেলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং উক্ত সেলে নতুন করে লে. কর্নেল কামরুজ্জামান, লে. কর্নেল আসিফ, লে. কর্নেল সালাম, মেজর মামুন, মেজর ইসতিয়াক, মেজর মোকাররম, মেজর আলমগীর, মেজর জাহিদ, মেজর জায়েদি ও মেজর আশরাফ (অব.)সহ অন্যান্য আরো অফিসারদের আনা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ দুপুরের দিকে হঠাৎ করেই গোলাগুলি শুরু হয়। সৈনিকেরা বলতে থাকে সেনাবাহিনী আক্রমণ করলে বাচ্চাসহ কাউকেই রেহাই দেয়া হবে না, সবাইকে মেরে ফেলা হবে। হঠাৎ করেই কিছু সৈনিক বললো, ৩ এবং ৪ নং গেইটের দিকে দৌড়াও। কিছুক্ষণের মধ্যে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৫)।***

ঝ। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ আনুমানিক ১৫৩০ ঘটিকার পর মহিলা ও বাচ্চাদের মুক্তি দেয়া শুরু হয়। এর কিছুক্ষণ পর এমপি রেজা কোতে এসে সেখানে বন্দী অফিসারদের নাম লিখে নিয়ে যান। তিনি বলে যান যে, আলোচনা করে তিনি অফিসারদের মুক্তির প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এর কিছুক্ষণ পর আনুমানিক ১৫৪৫ ঘটিকার সময় তিনি ফিরে এসে অফিসারদের মুক্ত করে গেইটের বাইরে নিয়ে যান ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।***

ঞ। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ আনুমানিক ১৬০০ ঘটিকায় মুক্তি দেয়ার উদ্দেশ্যে কোয়ার্টার গার্ডে বন্দী অফিসারদের যখন ৪ নং গেইটের কাছে নিয়ে আসা হয়, তখন ডিএডি তৌহিদ, ডিএডি রহিম, ডিএডি নাসির, সুবেদার মেজর আনসার, সুবেদার মেজর গোফরানসহ আরো অনেকে রাস্তায় পাশে গোল করে চেয়ারে বসে আলোচনা করছিল ***(সূত্রঃ সাক্ষী নং-৫৯)।***

৪৭। <u>জেসিও মেস এবং জেসিও/সৈনিক আবাসিক এলাকা</u>

ক। মেজর মুন্সী মাহবুবুর রহমান দরবার হল থেকে বের হয়ে তার ফ্যামিলির কাছে যাওয়ার জন্য অফিসার মেসের দিকে দৌড়ে যাচ্ছিলেন। নায়েব সুবেদার মোস্তফার সাথে তার পথিমধ্যে দেখা হয়। নায়েব সুবেদার মোস্তফা তাকে জেসিও মেসে যাওয়ার জন্য বলে। দৌঁড়াতে দৌঁড়াতে তারা জেসিও মেসে একজন জেসিও রুমে গিয়ে আশ্রয় নেয় আনুমানিক ০৯৪৫ ঘটিকায়। সাথে তার ইউনিটের আইএনটির ল্যান্স নায়েক কাদেরও ঐ রুমে আশ্রয় নেয়। রুমে ঢুকেই তিনি তার ইউনিটের প্রধান করণিক নায়েব সুবেদার কাশেম ও সুবেদার আলাউদ্দিনকে দেখতে পান। তিনি রুমে প্রবেশের পর সুবেদার আলাউদ্দিন ও প্রধান করনিক রুম ছেড়ে বেরিয়ে যায়। তিনি তখন মোবাইলে সিজিএস এর সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেন। ঢাকা সেনানিবাস এক্সচেঞ্জ হয়ে তিনি সিজিএস এর রুমে ফোন সংযোগ নেন। সিজিএস এর রানার ফোন ধরে। তিনি তখন সিজিএসকে ফোন দিতে বলেন। তখন সময় আনুমানিক ০৯৪০ ঘটিকা। রানার বলে সিজিএস কনফারেন্সে আছে। তিনি বলেন যে, স্যারকে বল বিডিআরে ক্যু হয়েছে। তখন সে পিএ কে ফোন দেয়। পিএও তাকে একই কনফারেন্সের কথা বলে। তখন তিনি পিএকে বলেন স্যারকে ফোন দাও আর বল বিডিআরে ক্যু হয়েছে। তখন পিএ ফোনের লাইন কেটে দেয়। এমতবস্থায় তিনি বগুড়ার জিওসিকে মোবাইলে ফোন দেন। যেহেতু তিনি মাত্র কিছুদিন আগে বগুড়া সেনানিবাস থেকে এসেছেন এবং তাকে পরিস্থিতি জানান ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৭৮)।***

খ। জেসিওস মেসে থাকা অবস্থায় তিনি যেসব তথ্য পান তা নিম্নরুপঃ

(১) টাট্টু শোতে আসা সিপাহীরাই এই ঘটনার মূল সূত্রপাতকারী।

(২) কম বয়স্ক সিপাহীরাই মূলত অংশ নেয়।

(৩) প্রথম দিকে অংশগ্রহণকারীরা অনেককে জীবনের ভয় দেখিয়ে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করে।

(৪) দুপুর ১৩০০ ঘটিকার দিকে তারা জেসিও মেসে এসে জেসিওদেরকে নেতৃত্ব দিতে আহ্বান জানাতে থাকে। পরবর্তীতে বিকাল তিনটার দিকে সিপাহীরা এসে মাইকে ঘোষণা দেয় যে, যদি জেসিওরা নিচে না নামে তবে তারা রুমে রুমে ঢুকতে বাধ্য হবে। তখন জেসিওরা নিচে নেমে যায়।

(৫) প্রথমদিকে অংশগ্রহণকারী দুস্কৃতিকারীদের মধ্যে কোন প্রকার সমন্বয় ছিল না। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মাইকে ঘোষণা দিয়ে দিয়ে তাদের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

(৬) প্রথম দিকে সেনা আক্রমণ পরিচালনা করলে অধিকাংশ অংশগ্রহণকারী দুস্কৃতিকারী পালিয়ে বা অস্ত্র ফেলে দিত।

(৭) ব্যক্তিগতভাবে তিনি কোন সিপাহীকে হত্যা কান্ডে অংশগ্রহণ করতে দেখেননি।

(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৭৮)

গ। বিএ-২২৫৫ লে. কর্নেল মোঃ আবু তাসনীম দরবার হল থেকে বের হয়ে সুইমিং পুল হয়ে জেসিওস মেসের সামনে আসার পর বেশ কিছু সৈনিক দৌড়ে এসে জানায় ‘স্যার সৈনিকেরা ১৩ এবং ৩৬ এর কোত ও ম্যাগাজিন ভেঙ্গে অস্ত্র গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছে। আপনি ওদিকে যাবেন না’। তখন জেসিওস মেস থেকে দুইজন জেসিও এসে তাকে জেসিওস মেসে অবস্থান করতে বললো। তখন তিনি পরিস্থিতি শান্ত হওয়ার অপেক্ষায় জেসিওস মেসের চিত্তবিনোদন কক্ষে অবস্থান নেন। এরপর আনুমানিক ১১০০ ঘটিকার দিকে তিনি সিগন্যাল সেক্টরের দিকে যাবার উদ্দেশ্যে জেসিওস মেস ত্যাগ করেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৪)।***

ঘ। বিএ-৪২৫১ মেজর মো. জায়েদী আহসান দরবার হলে স্টেজের পর্দার আড়ালে থেকে বের হওয়ার পর ৪/৫ জন অস্ত্রধারী সৈনিক তাকে ধরে তাকে প্রহার করে এবং মোবাইল দুটো নিয়ে যায়। এক পর্যায়ে সহানুভূতিশীল দুইজন সৈনিক তাকে একটি জেসিওস পারিবারিক বাসস্থানে রেখে চলে যায়। পরবর্তীতে তিনি জানতে পারেন বাসাটি সুবেদার মেজর গোফরান মল্লিক, ২৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন এর। অফিসার উক্ত বাসায় অবস্থানকালীন উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা নিম্নরুপ ***(সূত্রঃ সাক্ষী নং-৮৪)।***

(১) বাসায় ছোট ছেলের কাছে চেয়ে মেজর জায়েদী ইউনিফর্ম খুলে একটি লুঙ্গি ও হাফ হাতা গেঞ্জি পরে নেন।

(২) উক্ত বাসা থেকে একটি মোবাইল চেয়ে নিয়ে মেজর মঈনুল (অব.) (শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত নিরাপত্তা অফিসার) এবং নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

(৩) এক পর্যায়ে এসএম সাহেব অস্ত্রসহ বাসায় এসে মেজর জায়েদীর কাছে বড় ছেলেকে রেখে বাকি সবাইকে নিয়ে চলে যান।

(৪) মেজর জায়েদী যাকে এসএম সাহেবের বড় ছেলে হিসাবে জানতো সে এক সময় বলে সে ২৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সৈনিক মো. বরুন খান। এসএম সাহেবের ছেলেকে প্রাইভেট পড়ান। সৈনিক বরুনের কাছ থেকে মোবাইল নিয়ে মেজর জায়েদী তার ছোটভাই ও বোনের সাথে কথা বলে।

(৫) ইতোমধ্যে আরপি জেসিও সেখানে আসে তিনি মেজর জায়েদীকে জানান যে দরবার শুরুর পূর্বে একটা গাড়িতে করে অস্ত্রসহ কিছু লোক ঢুকেছে যারা বিডিআরের সৈনিক নয়। এর মধ্যে মেজর জায়েদীর কাছে মেজর মঈন এর ফোন আসে এবং সে জানায় যে ৮/১০ জন অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে। বরুনের মাধ্যমে সুবেদার মেজর গোফরানকে ডেকে আনা হয়। মেজর জায়েদী তাকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলার প্রস্তাব দিলে তিনি তার মোবাইলটা দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। মেজর জায়েদী, মেজর মঈনকে টেলিফোন করলে মেজর মঈন মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীকে ফোনটা দেন এবং মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিকীর সাথে সুবেদার মেজর গোফরানের কথা হয়। কথা বলার পর সুবদার মেজর গোফরান জানান যে রাইফেল স্কয়ারে মিটিং হবে তিনি সেখানে যাচ্ছেন।

(৬) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সকালে সুবেদার মেজর গোফরান বারান্দায় গিয়ে ক্ষেপে নিচু স্বরে বললেন 'আপনারা ডিডি হবেন, এডি হবেন, ডিএডি হবেন আমার ইচ্ছা নাই। কাল সারারাত ডিউটি দিলাম তখন আপনারা কোথায় ছিলেন। তাপস ডিজি হবে ওটাই ভালো ছিল।'

(সূত্রঃ সাক্ষী নং-৮৪)।

ঙ। বিএ-৩০১২ লে. কর্নেল শামসুল আলম চৌধুরী দরবার হল থেকে বের হয়ে সৈনিকদের বুঝিয়ে দরবারে ফেরাতে ব্যর্থ হয়ে কয়েকজন জেসিওর পরামর্শে জেসিও কোয়ার্টার ইবনে সিনার তিন তলায় নায়েব সুবেদার ইসমাইলের বাসায় যান। সে সময় সুবেদার ইসমাইল, সুবেদার সিরাজ, নায়েব সুবেদার সাইফুল তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। লে. কর্নেল শামস উক্ত বাসায় অবস্থানকালীন কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা যা তিনি ৩য় তলার বাসার ড্রইং রুম এর জানালা দিয়ে দেখতে পান তা নিম্নরূপঃ

(১) দরবার হলের দিকে কয়েকজন সৈনিকের দ্বারা গুলি করে একজন জেসিওকে হত্যা করতে দেখেন। জেসিওদের নিকট থেকে পরে জানতে পারেন উনার নাম আবুল কাশেম।

(২) তিনজন অফিসার হাত উঁচু করে দৌঁড়াতে দেখেন। পিছনে কয়েকজন সৈনিক তাদেরকে তাড়া করে নিয়ে যাচ্ছিলো।

(৩) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সাড়ে এগারো/বারোটার দিকে হেলিকাপ্টারের শব্দ শোনেন।

(৪) সে পর্যন্ত তাদের মধ্যে কোন কমান্ড কন্ট্রোল বলে কিছু ছিল না বলে তিনি মনে করেন।

(৫) তার ধারণা সাড়ে বারোটার দিকে ডিএডি তৌহিদ একটা জিপে চড়ে দরবার হলের দিকে আসে। তার আগেই একটা মাইকে ঘোষণা করা হয় ডিএডি তৌহিদ বিডিআরের দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ডিএডি তৌহিদ জেসিও কোয়ার্টার ও সুইমিং পুলের মাঝামাঝি স্থানে দাঁড়িয়ে সৈনিকদের সঙ্গে কথা বলে ১৩/৩৬ রাইফেল ব্যাটালিয়নের দিকে চলে যান।

(৬) সন্ধ্যার পর পিলখানার সব আলো নিভে যায়। এ সময় একটা এ্যাম্বুলেন্স ও একটা পিকআপ বেশ কয়েকবার দরবার হলে যাওয়া আসা করেছে। এগুলোতে করে সম্ভবত লাশ সরানো হয়েছিল।

(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৬)।

চ। লে. কর্নেল শামস তার ব্যক্তিগত মোবাইলটি দরবারে ঢোকার পূর্বে রানারকে দিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি নায়েব সুবেদার ইসমাইলের ছেলে রাসেলের মোবাইল নিয়ে ডিজি এসএসএফ, মেজর জেনারেল আবেদীন এর সাথে কথা বলেন এবং পরিস্থিতি জানান। মেজর জেনারেল আবেদীন জানান যে, বিদ্রোহীরা সারেন্ডার করবে। *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৬)।*

ছ। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ দুপুর ১২০০ ঘটিকা বা সাড়ে বারোটার দিকে বাইরে থেকে ৫ নং গেইট দিয়ে একটা মিছিল আসে। মিছিলটা বীরশ্রেষ্ঠ নুর মোহাম্মদ স্কুল পর্যন্ত যায়। সে মিছিলের সাথে সম্ভবত অনেক বিডিআর সদস্য বের হয়ে যায় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৬)*

জ। দুপুরে কিছু সৈনিক জোর করে বাসায় ঢুকে পড়ে। লে. কর্নেল শামস খাটের নিচে লুকিয়ে থাকায় ওরা তাকে খুঁজে পায়নি। তারা নায়েব সুবেদার রহিম ও হাবিলদার জাকির বাদে বাকি সবাইকে সাথে নিয়ে যায়। তারা আবার ফিরে এসে ডাইনিং হলে বসে থাকে *(সাক্ষী নম্বর-৩৬)।*

ঝ। লে. কর্নেল মো. শামসুল আলম চৌধুরী নায়েব সুবেদার ইসমাইল সাহেবের ছেলের মোবাইলটা ব্যবহার করে মেজর জেনারেল আবেদীন, ডিজি এসএসএফ এর সঙ্গে কথা বলেন। মেজর জেনারেল আবেদীন সন্ধ্যার দিকে জানিয়েছিলেন যে বিডিআরের একটা টিম আলোচনার জন্যে প্রধানমন্ত্রীর অফিসে যাচ্ছে। পরবর্তীতে মেজর জেনারেল আবেদীন বলেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রীর সাথে বৈঠকে বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমর্পণ করতে রাজি হয়েছে। তিনি আরও উল্লেখ করেছিলেন যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন রাতে পিলখানা যাবেন। বিদ্রোহীরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অস্ত্র সমর্পণ করবে। এর পরপরই অফিসার এবং পরিবারের সদস্যদের উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হবে। পিলখানার ভিতরে, পিকআপে বাঁধা মাইকের ঘোষণা ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। পিকআপ হতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসার পর সৈনিকদের অস্ত্র সমর্পণ না করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছিল-প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুতির কথা ঘোষণা করা হচ্ছিল। তাদের দাবি পূরণের জন্য তারা প্রধানমন্ত্রীকে পিলখানায় আসার দাবি জানাচ্ছিল। প্রকৃতপক্ষে, স্বরাষ্টমন্ত্রীর কাছে অস্ত্র সমর্পণের উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল। মেজর জেনারেল আবেদীনকে ফোন করে পরিস্থিতি জানিয়ে আবারও তাদেরকে উদ্ধার করা জন্য লে. কর্নেল মোঃ শামসুল আলম চৌধুরী আবেদন করেন। মেজর জেনারেল আবেদীন জানিয়েছিলেন যে সকালে মতিয়া চৌধুরী (তৎকালীন মন্ত্রী) বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনার জন্য একটি বুলেট প্রুফ গাড়িসহ পিলখানা ঢুকবে। সে গাড়িতেই অফিসার ও পরিবারদেরকে ক্রমান্বয়ে উদ্ধার করা হবে। সে গাড়িটি ইবনে সিনা বিল্ডিং এর সামনে এলে লে. কর্নেল শামস যেন দৌড়ে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়েন। রাতেও পালানোর চেষ্টা করে তিনি ব্যর্থ হন। আনুমানিক ভোর ০৫০০ ঘটিকার দিকে মেজর জেনারেল আবেদীনকে তিনি আবার ফোন করেন। বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনার জন্যে বেগম মতিয়া চৌধুরীর পিলখানা আসার পরিকল্পনা ঠিক কাছে কি না-জানতে চান। তিনি 'হ্যাঁ' সূচক জবাব দেন। কার সাথে যোগাযোগ করবেন জানতে চাইলে মেজর জেনারেল আবেদীনকে ড্রাইভারের মোবাইল নম্বরটা দেন। তিনি কয়েকবার ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলেন কিন্ত কিছুক্ষণ পর ড্রাইভার নিজেই ফোন করে জানায় যে বিদ্রোহীরা' গাড়ি ভিতরে ঢুকতে না দেয়াতে' তারা ফিরে যাচ্ছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৬)।*

ঞ। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতা দেন। প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার পর সবাই অস্ত্র জমা দেয়া শুরু করে। ইসমাইল সাহেবের বাসায় বসে থাকা সৈনিকরাও এক পর্যায়ে চলে যায়। বিকেলে ইবনে সিনা বিল্ডিং এর নিচে একটা গাড়ি আসে। নায়েব সুবেদার সাইফুল নিচে গিয়ে কনফার্ম হন যে গাড়িটি বেঁচে যাওয়া অফিসারদেরকে নিতে এসেছে। পিকআপ এর কাছে গিয়ে সেখানে বেশ কিছু সশস্ত্র সৈনিক দেখে লে. কর্নেল শামস ভয় পেয়ে যান। তখনো ১৩/৩৬ রাইফেল ব্যাটালিয়নের দিক থেকে গুলির শব্দ আসছিল। সৌভাগ্যবশতঃ তখন সেখানে একটা জিপ আসে এবং তাকে তুলে বাইরে নিয়ে যায়। বাইরে যাওয়ার সময় ৪ নং গেইট এর কাছে বেশ কয়েকজন এমপিকে দাঁড়ানো বা বসা অবস্থায় দেখেন। তাদের একজন ছিলেন জনাব আসাদুজ্জামান নূর *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৬)।*

ট। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ মাগরিবের পর মেজর জায়েদী, সৈনিক বরুন ও মেয়েটি বেড রুমে চলে যায়। আনুমানিক সন্ধ্যা ১৯০০ ঘটিকার সময় এসএমজিসহ এক সৈনিক রুমে প্রবেশ করে। এক পর্যায়ে উক্ত সৈনিক মেজর জায়েদীকে গুলি করতে উদ্যত হয়। কিন্তু মেজর জায়েদীর আবেগ ঘন বক্তব্য কথা শুনে সে গুলি না করে বাসা ত্যাগ করে চলে যায়। এর কিছুক্ষণ পর এসএম সাহেব হন্তদন্ত হয়ে উক্ত মেয়েটিকে (লুনা) নিয়ে চলে যায়। মেয়েটি চলে যাওয়ার পর গভীর রাতে এসএম সাহেব রুমে ঢুকলে মেজর জায়েদী অন্যান্য কথার সাথে এক পর্যায় এসএম সাহেবকে বলেন 'আমি কিছুক্ষণ পর মারা যাবো। তাই একটা অনুরোধ করছি। আপনার ছেলেকে ভালভাবে পড়াশুনা করিয়ে আর্মি অফিসার বানাবেন, কেননা তারা সৎ। আর মৃত্যুর আগে আমার একটি ইচ্ছা। আমি আপনার হাতেই মরতে চাই, কেননা বাবার হাতে পুত্রের মরণ পুত্রের কাছে বড় গর্বের। এসএম সাহেব তখন তার ম্যাগজিন লোডেড এসএমজিটি আমাকে দিয়ে বলে, 'স্যার আপনিই আমাকে গুলি করেন। আমার সামনেই আমার প্রাণ প্রিয় স্যার মেজর সালেহকে বাঁচাতে পারলাম না। বাঁচাতে পারলামনা আরো অনেককে। আপনাকে যদি বাঁচাতে পারি তাহলে সেটাই হবে আমার সার্থকতা' ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৪)।***

(ঠ) দরবার হলের ঘটনার পর দুপুরের দিকে সুবেদার মেজর গোফরান মল্লিক বাসায় গিয়ে একজন পুরুষ মানুষ এবং একজন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া মেয়েকে তার বাসায় দেখতে পান। পুরুষ মানুষটি মেজর জায়েদী আহসান হাবীব বলে নিজেকে পরিচয় দেয়। সুবেদার মেজর গোফরান মল্লিক তাকে আশ্বস্ত করেন এবং তার স্ত্রীকে বলেন মেজর জায়েদীর যেন কোন অসুবিধা না হয়। মেজর জায়েদী তার ছেলের ফোন থেকে অনেকগুলো ফোন কল করেন এবং বাইরের অফিসারদের সাথে কথা বলেন। সুবেদার মেজর গোফরান ততক্ষণে সৈনিকদের সাথে কথা বলে জেনেছেন যে দরবার হলের আশেপাশে সকাল ১১০০ ঘটিকার মধ্যেই সব অফিসারকে মেরে ফেলা হয়েছে। রাত আনুমানিক ১২০০ ঘটিকার দিকে তিন চার জন সৈনিক সুবেদার মেজর গোফরানকে বাসা থেকে ডেকে নিয়ে প্যারেড গ্রাউন্ডের কাছে যায়। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন ১৫০ জনের মত সৈনিক সশস্ত্র অবস্থায় বসে আছে। আর সামনে বসে আছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন, ফজলে নূর তাপস এবং আইজি নূর মোহাম্মদ। তিনি সৈনিকদের ওখানে গেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সবার উদ্দেশ্যে বলেন আপনারা কাকে ডিজি হিসেবে পেতে চান? ফজলে নূর তাপসকে নাকি আইজি নূর মোহাম্মদকে? সুবেদার মেজর গোফরান বলেন আপনি যেটা ভাল মনে করেন সেটাই করবেন। পরের দিন মেজর জায়েদী আহসান হাবিবকে সুবেদার মেজর গোফরান ৪ নম্বর গেইটে দিয়ে আসেন ***(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-০৪)।***

৪৮। <u>ঘটনাস্থলের রাজনৈতিক ব্যক্তিদের কর্মকান্ড</u>।

ক। <u>১ম যোগাযোগ</u>।

(১) নায়েক শহীদুর ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়ন সকাল থেকে জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানককে ৩ নম্বর গেইট এর কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখেন। তবে তিনি ভিতরে ঢুকেছিলেন কি-না নায়েক শহীদুর জানেন না। সে সময়ে ঐ এলাকায় স্থানীয় যুবলীগ এর নেতৃত্বে লোক সমাগম ও মিছিল সংগঠিত হয়। মিছিল এবং লোক সমাগম থেকে বিদ্রোহীদের পক্ষে স্লোগান দেয়া হয় ***(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-২৪)।***

(২) মেজর সুমন আহমেদ, ৪ ইস্ট বেঙ্গল ১০৩৪ মিনিটে বিডিআরের প্রধান গেইট থেকে ৩০০ গজ দূরে পৌঁছান। গেইটে পৌঁছেই দেখতে পান জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, জনাব মির্জা আজম, ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস এবং আইজিপি নূর মোহাম্মদ আরও কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ অবাধে গোলাগুলির মধ্যে পিলখানায় একাধিকবার প্রবেশ করেছে এবং বের হয়েছে। মেজর সুমন ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসকে সকাল আনুমানিক ১১৩০ ঘটিকায় লিফলেট বিতরণ করতে দেখেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৩ এর ভিডিও বক্তব্য সংযোজনী-১৮)***

(৩) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ১১৩০ ঘটিকার পর কয়েকজন সংসদ সদস্য ও কতিপয় রাজনৈতিক ব্যক্তি বিডিআর পিলখানা ৪ নং গেইটে আসেন এবং বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগের

জন্য প্রচেষ্টা চালান। তারা ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেড কমান্ডার হাকিমের নিকট থেকে পতাকা হিসেবে ব্যবহারের জন্য সাদা রুমাল নেন। তাদের মধ্যে মাহবুব আরা গিনি ও ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল ছিলেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৫)।***

(৪) ১১৪৫ ঘটিকায় অব্যবহিত পরেই ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল হাকিম আজিজ সেনাপ্রধান মঈন ইউ আহমেদকে ফোন করে পরিস্থিতি অবগতি করেন। সেনাপ্রধান তাকে বলেন, 'Mr. Tapos is on the ground. He has already controlled them এবং তাদেরকে মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছেন। আরও বলেন Government has decided to solve the problem politically. If negotiation fails you will conduct military operation'. ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৫)।***

(৫) মেজর ওয়াকার-উজ-জামান, উপ-অধিনায়ক ১৭ ইস্ট বেঙ্গল ১০৩০ ঘটিকায় পিলখানায় ৪ নং গেইটের কাছে পৌঁছান এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। তিনি তার অধিনায়ক এবং ব্রিগেড কমান্ডারের কাছ থেকে কোন নির্দেশনা না পেয়ে মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকের সাথে যোগাযোগ করেন। তারেক সিদ্দিক তাকে পিলখানায় কোনরূপ আক্রমণ পরিচালনা করতে নিষেধ করেন এবং বলেন যে সরকার বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে সমাধানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০২ এর সাথে কমিশনের অনানুষ্ঠানিক আলোচনা, তারিখ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)।***

(৬) দুপুর ১২০০ ঘটিকার পরে মাহবুব আরা গিনি (প্রাক্তন এমপি) ও ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল সাদা পতাকা নিয়ে পিলখানার ৪ নং গেইটে কাছে যান। তারা মাইকে বলতে থাকেন যে, 'আমরা এমপি, সরকারের সেরকম কেউ না, আমরা আপনাদের সাথে কথা বলতে চাই।' তখন বিডিআর সৈনিকরা তাদেরকে নানা রকম কথা বলছিল। একজন বলছিল, 'ওরা সবাইকে মেরে ফেলেছে, আমাদের এখন কী হবে?' তখন আরেকজন তাকে ভিতরে টেনে নিয়ে বলছিল ওর মাথার ঠিক নাই। বিডিআর সৈনিকরা এরপর খালি বলছিল, 'আমাদের এমপি সাহেব কোথায়? আমরা এমপি সাহেবের সাথে কথা বলতে চাই। আমাদের এমপি সাহেব কেন আসে নাই?' বিডিআর সৈনিকেরা মূলত তাপসের সাথে কথা বলতে চাচ্ছিল। ঠিক তখনই আরেক পাশ থেকে জনাব মির্জা আজম এবং জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক আসেন। তারাই পরে বিডিআর সদস্যদের সাথে কথা বলেন। তারাই ঠিক করেন যে কারা কারা যমুনাতে যাবে। কিছুক্ষণ পর মাহবুব আরা গিনির সাথে যুক্ত হন নেত্রকোনার এমপি রুহি, সানজিদা খানম এবং আরো অনেকেই বিকেলের দিকে আসেন ***(সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০৮)।***

(৭) দুপুর ১২০০ ঘটিকার পর মেজর খন্দকার আব্দুল হাফিজ পিলখানা ৪ নং গেইটের কাছে রাইফেলস্ স্কয়ার এলাকায় আম্বালা ইনের কাছে আসেন। মেজর হুমায়ুন সম্বন্ধে খবর নেওয়ার জন্য তিনি ডিএডি নাসিরের সাথে টেলিফোনে কথা বলেন। তিনি ডিএডি তৌহিদকেও ফোন করেছিলেন কিন্তু তাকে পাননি। তিনি প্রায় সন্ধ্যা পর্যন্ত সেদিন আম্বালা ইনে র কাছেই ছিলেন। যেখানে সকল মিডিয়ার সাংবাদিক, পুলিশের আইজি নূর মোহাম্মদ এবং সরকারের ও পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ছিলেন। এক পর্যায়ে সাবেক রাষ্ট্রপতি হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ সেখানে আসেন। রাস্তার উপর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুন, ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মির্জা আজম তিনি দেখতে পান ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৭)।*** তবে এটিএন বাংলার ভিডিও ফুটেজে দেখা যায় মেজর খন্দকার আব্দুল হাফিজ সন্ধ্যার পরেও দীর্ঘ সময় ঘটনাস্থলে ছিলেন এবং রাজনৈতিক সমাধানের কালক্ষেপণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

(৮) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানার অভ্যন্তরে বিদ্রোহ সংঘটিত হলে বিদ্রোহ দমনের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবীর নানক এবং হুইপ জনাব মির্জা আজম বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের সাথে সমাঝোতা করার উদ্দেশ্যে আনুমানিক ১৪০০ ঘটিকার দিকে যমুনা থেকে রওনা দিয়ে বিডিআর ০৪ নং গেইটে উপস্থিত হন ***(সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০২)***

(৯) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০৯ তারিখে ১৪০০ ঘটিকার দিকে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুন পিলখানার ভিতরে উস্কানিমূলক তৎপরতা চালাচ্ছিলেন মর্মে সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে প্রত্যক্ষদর্শী সিপাহী আইয়ুব সাক্ষ্য দেন যে দুপুরের দিকে তিনি দেখতে পান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বুলেট প্রুফ জিপ গাড়িতে করে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন পুরো পিলখানায় ঘুরে বেরাচ্ছেন। তিনি প্যারেড গ্রাউন্ডের কাছে বিদ্রোহীদের সাথে কথা বলছেন। সিপাহী আইয়ুব শুনতে পান সাহারা খাতুন বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্যে বলছেন, 'তোমরা আমার সন্তানের মত। তোমাদের কিছু হবে না। ডিএডি তৌহিদকে ডিজির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে' ইত্যাদি। সাহারা খাতুন ছাড়াও মির্জা আজম এবং জাহাঙ্গীর কবির নানককে সিপাহী আইয়ুব পিলখানার ভিতরে দেখেছেন ***(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১১)।***

(১০) আনুমানিক ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ১৪৩০ ঘটিকায় ডিএডি রহিম ডিএডি তৌহিদের খোঁজে সদর রাইফেল ব্যাটালিয়নে আসেন এবং ডিএডি তৌহিদকে বিডিআর পিলখানার অভ্যন্তরে অবস্থানরত বিদ্রোহী বিডিআর জওয়ানদের সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলার জন্য বলেন। ডিএডি তৌহিদের ভাষ্য মতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ১৪০০ ঘটিকায় চাপের মুখে এবং পরিবার জিম্মি করে ডিএডি তৌহিদকে নেতৃত্ব প্রদানে বাধ্য করে *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-০২)।*

(১১) সিপাহী সেলিমের সাক্ষ্য অনুযায়ী ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুরের মধ্যেই হত্যাকান্ড সম্পর্কে ফজলে নূর তাপসকে জানানো হয়। সিপাহী মইনুদ্দিন মাধ্যমে যোগাযোগ করে শেখ ফজলে নূর তাপস সিপাহী সেলিমের মোবাইলে ফোন দেয় এবং পিলখানার ভিতরে কী অবস্থা জানতে চায়। সিপাহী সেলিম সব খুলে বলাতে তাপস বলেন, সব জানি, অর্ধেক অফিসার মারা গেছে এবং অর্ধেক বেঁচে আছে, অনেকে আহত অবস্থায় আছে। তখন সিপাহী সেলিম আহতদের উদ্ধারের জন্য ১০-১২ টি অ্যাম্বুলেন্স পাঠাতে বলে। তখন তাপস বলেন, 'ঠিক আছে ফুফুর সাথে (শেখ হাসিনার সাথে) কথা বলে ব্যবস্থা নিচ্ছি' *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৪)।*

(১২) প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং হুইপ জনাব মির্জা আজম বিদ্রোহীদের সাথে সমঝোতা করার লক্ষ্যে পিলখানা ৪ নং গেইট-এ যাওয়ার সময় এমপি ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল (কর্নেল তাহেরের ভাই) ও এমপি মাহবুব আরা গিনি (গাইবান্ধা) সাদা পতাকা হাতে তাদের সাথে যোগ দেন ***(সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০২)।***

(১৩) বিদ্রোহীদের সাথে ১৫/২০ মিনিট আলোচনার পর তারা একমত হয় যে তাদের একটি দল প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রীয় অতিথিভবন যমুনায় যাবে ***(সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০২)।*** বিদ্রোহীদের আলোচনার জন্য এবং বিডিআরের কোন কোন সদস্য যমুনাতে যাবে তা নির্ধারণ করার জন্য জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজম পিলখানার ৪ নং গেইট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন এবং সেখানে প্রায় ৩০ মিনিট অতিবাহিত করেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০৯ এর ভিডিও সাক্ষ্য)।*

(১৪) তৎকালীন হুইপ মির্জা আজমের গাড়ি এবং প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানকের মন্ত্রণালয়ের গাড়িতে করে ১৩/১৪ জন বিডিআর সদস্যকে নিয়ে পৌনে ৫ টার দিকে যমুনার উদ্দেশ্যে রওনা দেন ***(সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০২)***

(১৫) ১৩-১৪ জন বিডিআর সদস্য যমুনায় যায়। এর মধ্যে ৫ জন ডিএডি এবং ২/৩ জন এনসিও ছিল ***(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-০২)।***

(১৬) তৎকালীন সংসদ সদস্য জনাব গোলাম রেজার ভাষ্য মতে তিনি ১৪০০ ঘটিকার দিকে বিডিআরের ৪ নং গেইট দিয়ে পিলখানায় প্রবেশ করে ডিজির বাংলোর কাছে জনাব জাহাঙ্গীর

কবীর নানক ও জনাব মির্জা আজমকে দেখেন এবং তাদেরকে ডিজির বাংলোর ভিতরে নিয়ে লে. কর্নেল দেলোয়ার ও তার স্ত্রীর লাশ দেখান ***(সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০১)।***

(১৭) প্রধানমন্ত্রীর নিকট আলোচনায় যাবার সময় যমুনার সামনে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসান শহীদ সারওয়ার্দী, কর্নেল রেজানুর, কর্নেল ওয়াহিদের সাথে ডিএডি রহিমের দেখা হয়। তখন ডিএডি রহিম তাদেরকে জানায় তিনি জিম্মি অবস্থায় আলোচনার জন্য এসেছেন। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হোসেন শহীদ সারওয়ার্দী তাকে অভয় দেন তার কিছু হবে না। পরবর্তীতে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ রাতে আবার মেজর (অবঃ) হাফিজের ফোনে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হোসেন শহীদ সারওয়ার্দীর সাথে কথা বলেন এবং তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হোসেন শহীদ সারওয়ার্দীকে জানান বিডিআর জওয়ানদের কোন নেতা নেই। তারা সবাই উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করছে। এ তথ্যের মাধ্যমে উনি নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন ***(সূত্রঃ সেনা তদন্ত প্রতিবেদন, সাক্ষী নম্বর-১২৮)।***

(১৮) র‍্যাব এর তৎকালীন রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করার জন্য ১৪ সদস্যের একটি দল প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন, যমুনা মিন্টু রোডে গমন করেন। উক্ত দলে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেনঃ

(ক) ডিএডি তৌহিদ
(খ) ডিএডি জলিল
(গ) ডিএডি নাসির
(ঘ) ডিএডি হাবিব
(ঙ) ডিএডি রহিম
(চ) সিপাহী সেলিম
(ছ) সিপাহী হাবিব
(জ) সিপাহী ইব্রাহীম
(ঝ) নায়েক এনতাজ
(ঞ) ল্যান্স নায়েক রেজওয়ান
(ট) সিপাহী রাজ্জাক
(ঠ) নায়েক সালাম
(ড) হাবিলদার শহিদ
(ঢ) হাবিলদার রফিক

(সূত্রঃ সেনা তদন্ত প্রতিবেদন পৃষ্ঠা-৮১৫)।

(১৯) বিজিবি প্রেরিত তথ্য অনুযায়ী উক্ত দলের ১১ জন বিডিআর সদস্যদের নাম পাওয়া যায়। নামগুলো নিম্নবর্ণিত হলোঃ

(ক) আরডিও-১০৫ ডিএডি তৌহিদুল আলম।
(খ) আরডিও-১৩৩ ডিএডি মোঃ নাছির উদ্দিন।
(গ) আরডিও-১৫৩ ডিএডি মির্জা হাবিবুর রহমান।
(ঘ) আরডিও-১৬২ ডিএডি মোঃ আব্দুর রহিম।
(ঙ) আরডিও-১৬৫ ডিএডি মোঃ আঃ জলিল।
(চ) নম্বর-৬৩৯০৭ সিপাহী মোঃ সেলিম রেজা।
(ছ) নম্বর-৪৬৯৮২ হাবিলদার রফিকুল ইসলাম।
(জ) নম্বর-৭৪৫২০ সিগন্যালম্যান মোঃ মনির হোসেন।
(ঝ) নম্বর-৬৮১৫১ সিপাহী মোঃ মনিরুজ্জামান।
(ঞ) নম্বর-৬৬৫৩৫ সিগন্যালম্যান মোঃ সালাউদ্দিন।
(ট) নম্বর-৬২৭৪২ সিপাহী মোঃ আবুল কালাম।

(সূত্রঃ সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, প্রশাসন শাখা, প্রশাসন পরিদপ্তর পত্র নং ৪৪.০২.১২০৫. ০০৪.০২.৩৭৪.২৫.১৭০৪ তারিখ ১৭ নভেম্বর ২০২৫, সংযোজনী-১৯)। মহামান্য আদালতের রায় পর্যালোচনা করে 'নায়েক মোঃ সফিকুল ইসলাম ওরফে শফির' নামও পাওয়া যায়।

(২০) যমুনায় প্রবেশের সময় এই দলটিকে কেউ তল্লাশি করেনি এবং তাদের নামও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। তাদেরকে হলরুমে বসানো হয়। হলরুমে তিন বাহিনী প্রধান, মির্জা আজম, জাহাঙ্গীর কবির নানক ও এইচটি ইমামসহ অনেকে ছিলেন। বিডিআর সদস্যদের দাবিতে প্রধানমন্ত্রী সকলকে বাইরে যেতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী দলনেতাকে জানতে চাইলে সবাই ডিএডি তৌহিদকে দেখায়। প্রধানমন্ত্রী প্রথমে তার কাছে ডিজির অবস্থা জানতে চান। কোনো উত্তর দেননি। এর পরই সেনাপ্রধানের এডিসি ডিএডি তৌহিদকে সেনাপ্রধানের নিকট ডেকে নিয়ে যায় এবং তিনি সেনাপ্রধানকে জানান যে ডিজিসহ অনেক অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে। তিনি হলরুমে ফিরে গিয়ে দেখেন প্রধানমন্ত্রী হাস্যোজ্জ্বল মুখে তার রাজনৈতিক নেতাদের সাথে আলাপে মগ্ন। তারা কেন নির্বাচনে বগুড়া জেলায় জয়লাভ করেন না সেটাই ছিল তাদের আলোচ্য বিষয়। প্রধানমন্ত্রী তখন ডিএডি তৌহিদকে বলেন যে মিডিয়ায় গিয়ে বল, প্রধানমন্ত্রী সব দাবি দাওয়া মেনে নিয়েছে এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছে। ডিএডি তৌহিদ মিডিয়ার সামনে উক্ত কথাগুলো বলে *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-০২)।*

(২১) যমুনায় বিডিআর বিদ্রোহীদের সঙ্গে যে বৈঠক হয়েছিল সেই প্রসংগে সিপাহী সেলিম সাক্ষ্য দেন যে বৈঠক কক্ষে শুধু বিডিআর সদস্যরা আর শেখ হাসিনার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ছিল। বিডিআর সদস্যদের মধ্যে থেকে সেখানে ছিল ডিএডি তৌহিদ, ডিএডি হাবিব এবং আরো অনেকেই। সিপাহী সেলিম সবাইকে চিনতো না। শেখ হাসিনার সাথে ছিল জেনারেল তারেক, নানক, আজম, সাহারা খাতুনসহ আরো কয়েকজন নেতা। শেখ হাসিনা রুমে প্রবেশ করেই বললেন, 'আমি সব জানি। কিছু অফিসার মারা গেছে, কিছু বেঁচে আছে। আমি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলাম। তোমাদের দাবি-দাওয়া পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে।' সিপাহী সেলিমের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের কোন বক্তব্যই রাখতে হয়নি বা কিছু চাইতেও হয়নি। প্রধানমন্ত্রীর কাছে সব প্রস্তুত করা ছিল, এমনটাই সিপাহী সেলিমের মনে হয়েছে। এরপর শেখ হাসিনা বিডিআর সদস্যদেরকে বললেন, 'তোমাদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে দিয়েছি। তোমরা ব্যারাকে ফিরে যাও। অস্ত্র সমর্পণ কর। সেনাবাহিনী পিলখানায় ঢুকবে না।' তিনি আরো জিজ্ঞেস করেন যে বিডিআর সদস্যদের মধ্যে সিনিয়রকে। বিডিআর সদস্যরা ডিএডি তৌহিদের নাম বলায় তিনি ডিএডি তৌহিদকে বলেন, 'তুমি ডিজির দায়িত্ব পালন করবা। তোমাদের সব সমস্যার সমাধান করা হবে।' এরপর জাহাঙ্গীর কবির নানক বিডিআর সদস্যদেরকে বাইরে যেতে বলেন। বাইরে গিয়ে সাংবাদিকদের সামনে নানক প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করেন এবং সবাইকে ব্যারাকে ফিরে যেতে বলেন' *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৪)।*

(২২) ২৫ ফেব্রুয়ারি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এর উপস্থিতিতে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে বিডিআর বিদ্রোহীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয় এবং আহত বিডিআর বিদ্রোহীদের সরকারি খরচে চিকিৎসা প্রদানের আশ্বাস দেয়া হয়। প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে এই ঘোষণা দেন জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং তার পাশেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এবং ফজলে নূর তাপস দন্ডায়মান ছিলেন *(সূত্রঃ বিটিভি এর ভিডিও ফুটেজ, সংযোজনী-১৮)।*

(২৩) ২৫ ফেব্রুয়ারি বিকাল ১৬০০ ঘটিকায় ধারণকৃত ফুটেজে দেখা যায় যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন একটি লিখিত বক্তব্য পাঠ করে বিডিআর সদস্যদের আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাচ্ছেন। ততক্ষণে পিলখানায় অফিসারদের এবং পিলখানার বাইরেও গুলি চালিয়ে সৈনিক, পুলিশ ও সাধারণ নাগরিকদের হত্যার বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া সত্ত্বেও সাহারা খাতুন তার লিখিত বক্তব্যে পিলখানা হত্যাকান্ডকে 'অসন্তোষ ও ভুল বোঝাবুঝি' হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এই সময়

সাহারা খাতুন এর সাথে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের কয়েকজন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন *(সূত্রঃ চ্যানেল ওয়ান এর ভিডিও ফুটেজ, সংযোজনী-১৮)।*

খ। <u>২য় যোগাযোগ-আম্বালা ইন</u>।

(১) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে দিবাগত রাতে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন শেখ হাসিনার সঙ্গে পরামর্শক্রমে সমর্পিত অস্ত্র গ্রহণ করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন। কোন রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই সাহারা খাতুন, প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবীর নানক, হুইপ জনাব মির্জা আজম, ব্যারিস্টার তাপস এবং আইজিপি নূর মোহাম্মদ অস্ত্র সমর্পণের উদ্দেশ্যে পিলখানায় গমন করেন। রাত ২৪০০ ঘটিকার পূর্বে সাহারা খাতুন, ফজলে নূর তাপস, নানক এবং মির্জা আজম হোটেল আম্বালা ইনে র কাছে পৌছান। আম্বালা ইনে প্রবেশের পূর্বে সাহারা খাতুন উপস্থিত সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি সমর্পিত অস্ত্র গ্রহণের জন্য এসেছেন। তিনি নিশ্চিত করে জানান যে, পিলখানার ভিতরে অফিসারদের হত্যা করা হয়েছে কিন্তু তিনি সঠিক সংখ্যা জানেন না। তিনি দাবি করেন যে তখনো বিডিআর মহাপরিচালকের অবস্থা তিনি জানেন না। তিনি নিশ্চিত করেন যে, বিডিআর বিদ্রোহী এবং হত্যাকারীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়েছে এবং তাদের দাবি অনুযায়ী সেনাবাহিনীকে সরে যেতে বলা হয়েছে এবং পিলখানার আশেপাশে সেনাবাহিনীর কেউ নেই। তিনি আরো নিশ্চিত করেন যে বিডিআর বিদ্রোহীদের সব দাবি-দাওয়া যেমন বিডিআর থেকে সেনা কর্মকর্তাদের সরিয়ে নেয়া, প্রধানমন্ত্রী বিবেচনা করছেন। সাহারা খাতুন এর এই সাক্ষাৎকার এর সময় তাপস তার পাশেই ছিলেন এবং তিনি সাহারা খাতুনকে উত্তর বলে দিচ্ছিলেন। এই সময় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও র‍্যাব সদস্যদের উপস্থিতিতে কয়েকটি এ্যাম্বুলেন্সে করে কোন রকম তল্লাশি ছাড়াই বিডিআর সদস্যদের পিলখানা ত্যাগ করতে দেখা যায় *(সূত্রঃ বিটিভির ভিডিও ফুটেজ, সংযোজনী-১৮)।*

(২) অস্ত্র সমর্পণ আয়োজনের পূর্বে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের সঙ্গে উপরিউক্ত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ হোটেল আম্বালা ইনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। এই আলোচনা আয়োজনে বিডিআর সদস্যদের সঙ্গে আরো একজন আওয়ামী নেতা মেজর খন্দকার আব্দুল হাফিজকে (অব.) কে সক্রিয় ভূমিকায় দেখায় যায় *(সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০৪, বিটিভির ভিডিও ফুটেজ, সংযোজনী-১৮)।*

(৩) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ আনুমানিক ২০৩০ ঘটিকা পর্যন্ত অস্ত্র জমা না দেয়ায় এবং সপরিবারে মহিলা জিম্মিদের না ছাড়ার প্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবীর নানক, হুইপ জনাব মির্জা আজম, ব্যারিস্টার তাপস, ডিএডি তৌহিদ, ডিএডি রহিম, সিপাহী কামাল এবং কতিপয় বিদ্রোহী বিডিআর সদস্য হোটেল আম্বালা ইনে আলোচনায় অংশগ্রহণ করে। উক্ত আলোচনায় ডিএডি তৌহিদ বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের পক্ষ হতে প্রধানমন্ত্রীর লিখিত গেজেট (রাষ্ট্রপতির অনুমোদন) এবং সংসদে হতে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের সাধারণ ক্ষমার অনুমোদন দাবি করেন। ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।*** ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ আনুমানিক ০১৩০ ঘটিকার দিকে ডিএডি তৌহিদ ও ডিএডি রহিম হোটেল আম্বালা ইনে রাত্রিযাপন করেন ***(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-০২)।***

গ। <u>৩য় যোগাযোগ-পিলখানার অভ্যন্তরে</u>। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে আনুমানিক ০১০০ ঘটিকার দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, প্রতিমন্ত্রী কামরুল ইসলাম ও পুলিশের আইজিপি নূর মোহাম্মদ কয়েকজন বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের কাছ হতে অস্ত্র জমা নেয়ার উদ্দেশ্যে বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার গার্ডে কিছু সংখ্যক বিডিআর সদস্য অস্ত্র জমা দেয়। তারা ৮ টি পরিবারকে (৩ অফিসার ফ্যামিলি এবং ৫ টি ডিএডি ফ্যামিলি) মুক্ত করে নিয়ে আসে। তারা চলে আসার পর পরেই বিডিআর সৈনিকরা আবার অস্ত্র হাতে তুলে নেয়। অস্ত্র জমা নেওয়ার সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন বিডিআর সদস্যদের আশ্বস্ত করেন যে সেনাবাহিনী কোন ধরণের আক্রমণ পরিচালনা করবে না। অস্ত্র সমর্পণের পূর্বে বিডিআর সদস্যদের সঙ্গে প্যারেড গ্রাউন্ডে সাহারা খাতুন একটি বৈঠক করেন এবং বিডিআর সদস্যদের প্রস্তাব করেন ফজলে নূর তাপস অথবা

আইজিপি নূর মোহাম্মদ বিডিআর মহাপরিচালক নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে *(সূত্রঃ **পুলিশ সাক্ষী নম্বর**-০১, **রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর**-০২ **এবং সাক্ষী নম্বর**-০১ **এর ভিডিও ফুটেজ সংযোজনী**-১৮)।*

ঘ। **৪র্থ যোগাযোগ-আম্বালা ইন**। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০০০ ঘটিকায় মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে সরকারি দলে সাথে বিদ্রোহীদের সাথে একটি বৈঠক হয় আম্বালা হোটেলে তৃতীয় তলায় একটি কক্ষে। বিদ্রোহী পক্ষে ছিল ডিএডি তৌহিদ, ডিএডি রহিম ও ডিএডি সফিক। বৈঠক শেষে মতিয়া চৌধুরী এবং ফজলে নূর তাপস সাংবাদিকদেরকে বলেন দুপুর ১৪০০ ঘটিকা থেকে অস্ত্র সমর্পণ শুরু হবে *(**সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর**-৪৬ **এবং চ্যানেল ওয়ানের ভিডিও ফুটেজ, সংযোজনী**-১৮)।*

ঙ। **৫ম যোগাযোগ- আম্বালা ইন**। ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে জনাব আওয়ামী লীগের বর্ষীয়ান নেতা জনাব আব্দুল জলিলের নেতৃত্বে মহাজোটের ১২ সদস্যদের একটি প্রতিনিধি দল বিডিআর বিদ্রোহীদের আর একটি বৈঠক করে। সেখানে অন্য এমপিদের সাথে ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদও উপস্থিত ছিলেন *(সূত্রঃ এটিএন বাংলার ভিডিও ফুটেজ, সংযোজনী-১৮)।*

চ। **ষষ্ঠ যোগাযোগ-বিডিআর হাসপাতাল**। যে সব বিডিআর সদস্য পিলখানা ছেড়ে পালায়নি তাদের উদ্দেশ্যে বিডিআর হাসপাতালে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে এক বক্তব্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সরকার ও তার পক্ষে থেকে বিডিআর সদস্যদেরকে নিশ্চিত করেন যে তাদের কিছুই হবে না। এই বক্তব্যর সময় জাহাঙ্গীর কবির নানক, মির্জা আজম, ঢাকা ডিএমপি কমিশনার নাইম আহমেদ এবং আওয়ামী লীগের আরো নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন *(সূত্রঃ ভিডিও ফুটেজ সংযোজনী-১৮)।*

৪৯। প্রতিরক্ষা বাহিনী/আইন-শৃংখলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রম

ক। সেনাবাহিনী

(১) ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড

(ক) গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সকাল ০৯০০ ঘটিকায় সেনা সদরের সভাকক্ষে জিএসপিসি সভা শুরু হয়। সভা শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই সেনাপ্রধান তার ব্যক্তিগত সচিবের মাধ্যমে পিলখানায় বিদ্রোহের সংবাদ প্রাপ্ত হন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করে তিনি তৎক্ষণাৎ ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে অভিযানের জন্য প্রস্তুত হতে নির্দেশ দেন *(সূত্রঃ **সাক্ষী নম্বর**-০১)।*

(খ) ০৯৪৩ ঘটিকায় কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড ডিএমও কর্তৃক সতর্কী আদেশ প্রাপ্তির সাথে সাথে ২ ইস্ট বেঙ্গল, ৪ ই বেঙ্গল এবং ১৭ ইস্ট বেংগল হতে পৃথক পৃথক তিনটি কোম্পানিকে দ্রুত প্রস্তুত হওয়ার আদেশ প্রদান করেন। ০৯৪৮ ঘটিকায় ডিএমও পুনরায় টেলিফোন করে পুরো ব্রিগেডকে নিয়ে মুভ করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য আদেশ দেয়। কমান্ডার সিও/ওসিদের নিজ অফিসে ব্রিফিং এর জন্য ডাকেন *(**সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর**-২৫)।*

(গ) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সকাল ০৯৪৭ ঘটিকায় লে. কর্নেল আলীম, তৎকালীন সিও ১৭ ইস্ট বেঙ্গল (পরবর্তিতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল) কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডকে টেলিফোন করে জানায় যে, পিএসও, এএফডি লে. জেনারেল মুবীন (পরবর্তীতে জেনারেল ও সেনাপ্রধান) তাকে ফোনে জানিয়েছেন যে, পিলখানাতে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে এবং তিনি ১৭ ইস্ট বেঙ্গালকে অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ যত দ্রুত সম্ভব পিলখানায় যাবার জন্য প্রস্তুত হতে বলেছেন *(**সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর**-২৫)।*

(ঘ) তৎকালীন পিএসও এফডি লে. জেনারেল আব্দুল মুবীন মেজর ওয়াকার-উজ-জামানকে বলেছিলেন পিলখানার গেইটের নিকট ধানমন্ডির একটি বিল্ডিং এর উপরে উঠে গেইটকে লক্ষ্য করে কয়েকটি রকেট লঞ্চার নিয়ে একাধিক শেল ফায়ার করতে। কিছু

সময় পর মেজর জেনারেল তারেক (অব.) লে. জেনারেল মুবীনকে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার জন্য নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে মেজর জেনারেল তারেক (অব.) লে. জেনারেল মুবীনকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ট্রুপস মুভ করানোর অথরিটি লে. জেনারেল মুবীনের ছিল কি-না। লে. জেনারেল মুবীন বলেছিলেন যে অথরিটি ছিল না, কিন্তু পরিস্থিতি দেখে তিনি ব্যবস্থা নিয়েছেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০২)।***

(ঙ) ডিএমও কর্তৃক ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে পিলখানা কর্ডন করা, লিফলেট ও মাইকিং এর মাধ্যমে সাইকোলজিক্যাল অপারেশন পরিচালনা করা এবং আদেশ প্রাপ্তি সাপেক্ষে সামরিক অভিযান পরিচালনা করার জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ প্রদান করা হয় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৫)।***

(চ) আনুমানিক ১০১৫ ঘটিকায় কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড নিজ অফিসে সিও/ওসিদের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করে তার মৌখিক আদেশ প্রদান করেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৫)।***

(ছ) ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডারের পরিকল্পনা মোতাবেক ২ ইস্ট বেঙ্গলকে কামরাঙ্গীরচর এলাকা দিয়ে বিডিআর সদর দপ্তরের পিছনের এলাকায় অবস্থান, ৪ ইস্ট বেঙ্গল এবং ১৭ ইস্ট বেঙ্গলকে বিডিআরের প্রধান গেইট (গেইট নম্বর-৪) এবং ৪ ফিল্ড আর্টিলারিকে নিউ মার্কেট এলাকায় বিডিআরের ৩ নং গেইটে অবস্থান নেয়ার জন্য আদেশ প্রদান করা হয়। ৪৩ স্বতন্ত্র ফিল্ড কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ার্স, ১০২ স্বতন্ত্র ব্রিগেড সিগন্যাল কোম্পানি এবং এডহক ফিল্ড ওয়ার্কশপ কোম্পানিকে ব্রিগেড রিজার্ভ হিসেবে ধানমন্ডি ৪ নং রোড এলাকায় অবস্থান করার আদেশ দেয়া হয়। একই সাথে ইউনিটসমূহকে অতিদ্রুত যাত্রা করার জন্য আদেশ দেয়া হয় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৫)।***

(জ) সেনাদলের গমনাগমণের অগ্রগতি তথা কী সংখ্যক সেনাদল, অস্ত্রশস্ত্র এবং নেতৃস্থানীয় অফিসার পিলখানা এলাকায় সমবেত হচ্ছে তা নির্ধারণ করতঃ সঠিক ও সময়োচিত সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় ধারণা (Assessment of Tps Concentration around Pilkhana) স্পষ্টীকরণের জন্য এমও পরিদপ্তর হতে একজন অফিসার শহীদ জাহাঙ্গীর গেইট এমপি চেক পোস্টে প্রেরণ করা হয় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩১)।***

(ঝ) ১০২০ ঘটিকায় লে. কর্নেল জিয়ার নেতৃত্বে ৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ১০২৫ এ কমান্ডারের নেতৃত্বে হেডকোয়ার্টার্স ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের ছোট দল, ১০৪৫ ঘটিকায় ১৭ ইস্ট বেঙ্গল এর দল, একই সময়ে ২ ইস্ট বেঙ্গলের একটি দল জাহাঙ্গীর গেইট দিয়ে বের হয়। ১২০০ ঘটিকার মধ্যে পুরো ব্রিগেড পিলখানাকে ঘিরে ফেলে ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩১)।***

(ঞ) পিলখানার ৩ নং গেইটে প্রথম পৌছায় লে. কর্নেল জাকির এর নেতৃত্বাধীন র‍্যাব-৩ একটি দল। এ দলটিকে র‍্যাব এডিজি কর্নেল রেজানূর খান ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেননি। সকাল ১০৪৫ থেকে ১১০০ ঘটিকার ৪ ফিল্ড আর্টিলারির একটি দল নিউ মার্কেট এলাকায় পৌঁছায়। ৪ ফিল্ড আর্টিলারির দলটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে একটি দল বটতলার দিক থেকে এবং আরেকটি দল আজিমপুর কলোনির পাশ দিয়ে ৩ নং গেইটের দিকে অগ্রসর হয়। বটতলার দিক থেকে অগ্রসরামান দলটিকে লক্ষ্য করে মর্টার গোলা নিক্ষেপ করা হয়। দুপুর নাগাদ গোলাগুলি চলতে থাকে, মাঝে মাঝে আগুনের ধোঁয়া দেখা যায়। রাত ২২০০ ঘটিকার দিকে ৪ ফিল্ড আর্টিলারি দলটিকে পিছিয়ে আসতে বলা হয়। তারা সায়েন্স ল্যাব পর্যন্ত সরে এসে রাতে অবস্থান করে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৩৪)।*

(ট) একই সময়ে ০৭টি এপিসি সিএমটিডি হতে চপার্স ডেন এলাকায় আনার ব্যবস্থা এবং ৯ পদাতিক ডিভিশন হতে এপিসি চালক আনার ব্যবস্থা করা হয় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩১)।***

(ঠ) জেনারেল মোহাম্মদ আব্দুল মুবীন, তৎকালীন পিএসওডি ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডের সাথে সাথে এডিএ ব্রিগেড থেকেও একটি ইউনিট মুভ করান *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০২)।*

(ড) ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অগ্রবর্তী দলসমূহ পিলখানার চতুর্দিকে অতিদ্রুত অবস্থান গ্রহণ করে। লে. কর্নেল জিয়ার নেতৃত্বে (০৩ জন অফিসার, ০২ জন জেসিও সৈনিক) ৩ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারির দলটি ১০৪৫ থেকে ১০৫৫ ঘটিকার মধ্যে পিলখানা ৩ নং গেইটের কাছাকাছি অবস্থান নেয়। ২ ইস্ট বেঙ্গলের ৪৯ জনের প্রথম দলটি মেজর জাহিদের নেতৃত্বে ও ৫৭ জনের দ্বিতীয় দলটি মেজর কামরুলের নেতৃত্বে ১১২০ ঘটিকায় ১ নং গেইটের কাছে অবস্থান নেয়। ৪৪ জন জনবলসহ মেজর ওয়াকার-উজ-জামানের নেতৃত্বাধীন ১৭ ইস্ট বেঙ্গলের প্রথম দলটি জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালের নিকট আনুমানিক ১০৩৫ ঘটিকায় অবস্থান নেয়। ১০২ জন জনবলসহ লে. কর্নেল আলীমের নেতৃত্বাধীন ১৭ ইস্ট বেঙ্গলের দ্বিতীয় দলটি ১১২০ ঘটিকায় আনাম প্লাজার সম্মুখে অবস্থান নেয়। লে. কর্নেল আলীমের দলটি পৌঁছানোর পূর্বে ১১২ জনবলের মেজর সুমনের নেতৃত্বাধীন ৪ ইস্ট বেঙ্গলের প্রথম দলটি ১১১৫ ঘটিকায় মেডিনোভা হাসপাতালে নিকট উপস্থিত হয়। লে. কর্নেল মাইনুলের নেতৃত্বাধীন ৪ ই বেঙ্গলের মূলদল ১২১০ ঘটিকায় মেডিনোভা হাসপাতলের নিকট পৌঁছায় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩১)।***

(ঢ) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ আনুমানিক ১১২০ ঘটিকায় ৪৬ স্বতন্ত্র ফিল্ড কোম্পানি ইঞ্জিনিয়ার ধানমন্ডি ঈদগাহ ময়দানে পৌঁছা মাত্র প্রবল গোলাগুলির সম্মুখীন হয়। এসময় অধিনায়ক মেজর মোঃ সামছুল আলম, পিএসসির জিপ গাড়িটির ডান পার্শ্বের উইন্ডশিল্ড ছিদ্র হয়ে পিছনে বসা দুইজন সৈনিককে আঘাত করে (নং-১৪৪২১২০ সৈনিক মো. জহিরুল ইসলাম এবং নং-১৪৪৫৫২৬ সৈনিক মো. মনিরুল হাসান)। পরবর্তীতে আহত সৈনিকদের মধ্যে নং-১৪৪২১২০ সৈনিক মো. জহিরুল ইসলাম ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সিএমএইচ ঢাকায় শাহাদৎ বরণ করেন ***(সূত্রঃ সেনা তদন্ত প্রতিবেদন, সাক্ষী নম্বর-১২০)।***

(ণ) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ১১১৫ ঘটিকায় পিএসও, এএফডি সেনাপ্রধানকে জানায় যে সরকার রাজনৈতিক ভাবে সমস্যাটি সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০১)।***

(ত) আনুমানিক ১০৪৫ ঘটিকায় বিএ-৩৫৭২ লে. কর্নেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান, অধিনায়ক ৪ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারি, ০২ জন অফিসার, ০২ জন জেসিও এবং ৮০ জন অন্যান্য পদবির সৈনিক নিয়ে নিউ মার্কেটের নিকট পিলখানার ৩ নং গেইট এলাকায় পৌঁছান। তিনি তার দলকে দুটি উপ-দলে ভাগ করে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন। মেজর জসীম এর নেতৃত্বাধীন উপ-দলটি নিউ মার্কেটের পশ্চিম গেইট দিয়ে অগ্রসর হবার চেষ্টা করতেই ৩ নং গেইট হতে বার্স্ট ফায়ার ও একটি মর্টার গোলা ফায়ার করা হয়। এমতাবস্থায় দুটি উপদলকেই তিনি পিছিয়ে এনে অবস্থান নেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩১)।***

(থ) মেজর সুমনের নেতৃত্বে ৪ ইস্ট বেঙ্গলের একটি দল ১০৩৪ ঘটিকায় পিলখানা ৪ নং গেইট এর ৩০০ গজের মধ্যে পৌঁছায়। ১০৫৫ ঘটিকায় তিনি কমান্ডারের নিকট কার্যকর আদেশ চেয়ে পাননি। তিনি নিজে নিজে একটা প্লাটুন নিয়ে ভিতরে ঢুকতে চাইলে ব্রিঃ জেনারেল হাকিম তাকে এই বলে নিবৃত্ত করেন যে বিচ্ছিন্ন আক্রমণ কোন ভালো ফল

দিবেনা বরং ভিতরের অফিসারদেরকে বিপদে ফেলবে, চেইন অভ্ কমান্ড ভেঙ্গে পড়বে এবং সফল না হলে সম্পূর্ণ দোষ তার উপর পড়বে। এ কথা শুনে মেজর সুমন নিবৃত্ত হন এবং পিছনে সরে আসেন। মেজর সুমন সকাল আনুমানিক ১১৩০ ঘটিকায় ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসকে লিফলেট বিতরণ করতে দেখেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৩ এর ভিডিও বক্তব্য, সংযোজনী-১৮)।***

(দ) ১২০০ ঘটিকার দিকে মেজর মামুন (সিগন্যাল) পিলখানার ভিতর থেকে পালিয়ে মেজর সুমনের অবস্থানে আসে এবং জানায় যে, ১১৪০ ঘটিকার মধ্যে বেশির ভাগ অফিসারকে হত্যা করা হয়েছে। মেজর সুমন তাকে ব্রি. জে. হাকিমের কাছে নিয়ে যান এবং মেজর মামুন সেখানে একটি বর্ণনা দেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৩ এর ভিডিও বক্তব্য সংযোজনী-১৮)।***

(ধ) পিলখানা দরবার হল থেকে পালিয়ে আসা মেজর রেজাউল মোস্তফা মোহাম্মদ আসাদ উদ-দৌলা এর সাথে রাইফেলস স্কয়ারের কাছে আম্বালা ও Voot রেস্টুরেন্ট এলাকায় ডিজিএফআই এর ব্রিগে. জেনারেল মামুন খালেদের দেখা হয়। তিনি পিলখানা ব্যাপারে মেজর আসাদের কাছে কোন কিছু জানতে চান নাই ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৭১)।***

(ন) আনুমানিক ১২০০ ঘটিকায় সেনাপ্রধানের সাথে টেলিফোন এ ব্রি. জেনারেল হাকিমের কথা হয় এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাকিম তাকে পরিস্থিতি অবগত করেন। সেনাপ্রধান তাকে বলেন, 'জনাব তাপস পিলখানা এলাকায় আছেন, তিনি বিদ্রোহীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছেন এবং তাদেরকে মিষ্টি খাইয়ে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন সরকার রাজনৈতিকভাবে বিষয়টি সমাধানের ব্যাবস্থা নিচ্ছেন। রাজনৈতিক উদ্যোগ ব্যর্থ হলে সামরিক অভিযান চালানো হবে ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৫)।***

(প) বেলা আনুমানিক আড়াইটার সময় লালবাগ থানাধীন বেড়িবাঁধ সংলগ্ন সুয়ারেজ লাইনের সুইস গেইটের মুখে এবং কামরাঙ্গীচর থানাধীন বুড়িগঙ্গার একটি শাখার খালে ০২ জন সেনা কর্মকর্তার মৃতদেহ পাওয়া যায় *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০৩ এবং সাক্ষী নম্বর-২৩)।*

(ফ) পিলখানার পূর্বদিকে অবস্থানরত ইউনিটসমূহ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সূর্যাস্ত পর্যন্ত তাদের অবস্থান ধরে রাখে। রাজনৈতিক আলোচনার পথ সুগম করার লক্ষ্যে সেনাপ্রধান ও সিজিএস দু'জনই ব্রিগেডকে ৩ কি. মি. পিছনে অবস্থান গ্রহণ করানোর জন্য ব্রি. জে. হাকিমকে টেলিফোনে আদেশ দেন। সে অনুযায়ী কিছু সংখ্যক সৈন্য সামনে রেখে তিনি ব্রিগেডকে পিছনে এসে পুনঃমোতায়েনের নির্দেশ দেন। আবাহনী ক্লাব মাঠে ব্রিগেডের কৌশলগত সদর স্থাপন করা হয়। সে অনুযায়ী ইউনিটসমূহ পুনঃমোতায়েন হয় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৫)।***

(ব) ২৬ ফেব্রুয়ারি আনুমানিক ভোর ০৫০০ ঘটিকার দিকে পিএসও এএফডি, লে. জেনারেল মুবিন কমান্ডার ১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডকে ফোন করে জানান যে কামরাঙ্গিরচরে কয়েকটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে। তিনি সাথে সাথে ক্যাপ্টেন নূরের নেতৃত্বে নদী পথে একটি রেসকিউ টিম পাঠান। তারা রিপোর্ট করে ছয়টি মৃতদেহ উদ্ধার করে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে পাঠায় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৪)।***

(ভ) দুপুর ১২০০ ঘটিকার দিকে সাতটি এপিসি সিএমটিডি হতে চপার্স ডেন এ নিয়ে এসে অপারেশনের জন্য প্রস্তুত করা হয় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩১)।***

(ম) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ০৭৩০ ঘটিকায় প্রতিটি ২০ জন কমান্ডোর মোট ০৭টি গ্রুপকে বিমানযোগে সিলেট থেকে ঢাকায় আনার প্রক্রিয়া শুরু হয় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩১)।***

(য) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ১২০০ ঘটিকায় প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের জন্য ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ১৪০০ ঘটিকা পর্যন্ত চূড়ান্ত সময় বেঁধে দেন। এরপর সরকার কঠোর হস্তে বিদ্রোহ দমন করবে বলেও তিনি ঘোষণা দেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩১)।***

(র) নবম ডিভিশন থেকে ট্যাংক পাঠানোর জন্যেও অনুরোধ করা হয়েছিল। কিন্তু বলা হয়েছিল যে নবম ডিভিশনকে মোতায়েন করতে হলে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর অনুমোদন লাগবে। তার অনুমোদন ছাড়া সেখান থেকে ট্যাংক মুভ করা সম্ভব না। তারপরেও সিজিএস ট্যাংক পাঠানোর জন্য অনুরোধ করেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।***

(ল) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ বেলা ১৩০০ ঘটিকায় সেনাপ্রধানের সচিবালয়ে সিজিএসসহ অভিযানের সাথে সংশ্লিষ্ট কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড ও অন্যান্য স্থানীয় ব্রিগেড কমান্ডার এর উপস্থিতিতে সকলকে সেনাপ্রধান তাঁর প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩১)।*** অভিযানের দ্রুত সাফল্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ৯ পদাতিক ডিভিশন হতে এক স্কোয়াড্রন ট্যাংক আনুমানিক ১৩১০ ঘটিকায় সাভার থেকে রওয়ানা হয় এবং আনুমানিক ১৬০৫ ঘটিকায় আবাহনী ক্রীড়া কমপেক্সে এর সামনে অবস্থান গ্রহণ করে। আনুমানিক ১৩৩০ ঘটিকায় এমও পরিদপ্তরের অপারেশন রুমে সিজিএস এর নেতৃত্বে আদেশ গ্রুপের সকলের উপস্থিতিতে চূড়ান্ত সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে অপারেশন রেস্টোর অর্ডার ২ নামে পরিকল্পিত এ অভিযানের লিখিত অপারেশন অর্ডার সংশ্লিষ্ট সকলকে ফ্যাক্সের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৫)।*** অপারেশন ১/২০০৯ রেস্টোর অর্ডার-২, ***(সূত্রঃ সংযোজনী-২০)।***

(শ) সেনাসদরে ও গ্রুপ এর ব্রিফিং নির্ধারিত ছিল ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৩০০ ঘটিকা থেকে ১৩৪৫ ঘটিকা পর্যন্ত। সিজিএস প্রথমে রণঘন্টা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এ ১৫০০ ঘটিকা প্রস্তাব করেন। পরে তা ১৬০০ ঘটিকা করা হয়। সেনাপ্রধান নিজেও সে ব্রিফিং এ উপস্থিত হন এবং সিজিএস প্রস্তাবিত ১৬০০ ঘটিকাকেই রণঘন্টা হিসেবে নির্ধারণ করেন। তবে ট্যাংক আসতে বিলম্ব হওয়ায় রণঘন্টা ১৭০০ ঘটিকা নির্ধারণ করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ রণঘন্টা (১৭০০ ঘটিকা) ৫ মিনিট পূর্বে আক্রমণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হলে ডিজিএফআই এর ঢাকা ডিটাচমেন্ট কমান্ডার কর্নেল আলমাস রাইসুল গনি ডিজি ডিজিএফআই এর পক্ষ থেকে আক্রমণ স্থগিত করার অনুরোধ জানান কারণ ১৪ দলের আলোচকরা তখনো আলোচনা চালু রেখেছিলেন। পরবর্তীতে ১৭১০ ঘটিকায় সিজিএস ফোন করে ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডকে আক্রমণ স্থগিত করার নির্দেশ দেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৫)।***

(ষ) ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে মাহবুব আরা গিনি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় গমন করেন তখন বিটিভির জন্য প্রধানমন্ত্রীর একটি ভাষণ রেকর্ড করা হচ্ছিল। সেখানে প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন যে তিনি চাচ্ছেন না সেনাবাহিনী পিলখানায় আক্রমণ করুক। কিন্তু কিছু করার নেই। তাঁর অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেনাবাহিনী আক্রমণ করবে। ভাষণটি রেকর্ড করা হলেও পরে সেটি আর প্রচার করা হয়নি। মাহবুব আরা গিনি সেখানে অবস্থান করে জেনেছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী চাচ্ছিলেন না যে সেনাবাহিনী পিলখানায় আক্রমণ করুক। তাই সেনাবাহিনী আক্রমণ করার পূর্বেই কিছু করার জন্য তারা পুনরায় পিলখানায় যান ***(সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০৮)***

(স) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে রাতেই কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে পিলখানা তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চালানোর জন্য Frag O পিলখানায় মোতায়েনের, আদেশ দেয়া হয়। ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৫, Frag O সংযোজনী-২০)।***

(হ) ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের সম্মুখ দল পিলখানার মধ্যে অনুসন্ধান ও উদ্ধার (Search and Rescue) কার্য পরিচালনার জন্য ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ বেলা ১০৩০ ঘটিকায় এপিসিসহ পিলখানায় প্রবেশ করে এবং র‍্যাব, ডিজিএফআই ও পুলিশের সার্বিক সহযোগিতায় তল্লাশি ও উদ্ধার কাজ শুরু করে ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৫)।***

(ড়) এই সময়ে ৪৬ তম ব্রিগেডের উপর একটি প্যারালাল বা অল্টারনেটিভ কমান্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেনারেল তারেক সিদ্দিক। তিনি ডিজিএফআই এর মাধ্যমে খবর পাচ্ছিলেন এবং তাদের মাধ্যমে ৪৬ তম ব্রিগেডের উপর তিনি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। ডিজিএফআই ৪৬ তম ব্রিগেডের প্রত্যেকটি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছিল এবং তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনে বিরত রাখছিল। এর পাশাপাশি র‍্যাব হেডকোয়ার্টার্স থেকে নিশ্চিত করা হচ্ছিল যেন কেউ সরকারের ইচ্ছার বাইরে যেন কোন অ্যাকশন নিয়ে না ফেলে। সেসময়েই কিছু গণমাধ্যমকর্মী সেনাবাহিনীর অফিসারদের নিয়ে অপপ্রচার চালাতে থাকে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(ঢ়) সেনাপ্রধান যমুনায় থাকা অবস্থায় সিজিএস তাকে অসংখ্যবার টেলিফোন করেও কোনো সিদ্ধান্ত পাননি। প্রত্যেকবারই তিনি অপেক্ষা করতে বলেছেন। এটাই সে সময় রাজনৈতিক নেতারা চাচ্ছিলেন এবং তাদের ইচ্ছাটাই চিফ সিজিএসকে জানাচ্ছিলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(য়) ঘটনার ০৫-০৭ দিন পরে সিজিএস বুঝতে পারেন যে সে সময় ক্ষমতাসীন দলের নেতারা খুব ভীত সন্ত্রস্ত ছিলেন এবং আশঙ্কা করছিলেন যে সশস্ত্রবাহিনী তাদের উৎখাত করতে পারে। সেনাবাহিনীকে অভিযান চালাতে দিলে তারা পিলখানা শান্ত করে যমুনার দিকেও হামলা চালাতে পারে, এই আশঙ্কা তাদের মধ্যে কাজ করছিল। সেই জন্য তারা আগে যমুনাকে সুরক্ষিত করছিল যার জন্য সেখানে বালির বস্তা দিয়ে ভারি অস্ত্রশস্ত্র মোতায়েন করছিল। আর এর মধ্যে রাজনৈতিক নেতারা বিষয়টিকে রাজনৈতিকভাবে সমাধান করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন যার ফলে তাদের কেউ কেউ সাদা পতাকা নিয়ে পিলখানায় গিয়েছিল। রাজনৈতিকভাবে বিষয়টি সমাধানের সিদ্ধান্ত রাজনীতিবিদরা নিজেরাই নিয়েছে, সেনাবাহিনীর সাথে তারা কোন পরামর্শ করেনি। *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।* জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক তার লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেছেন যে, সকাল ১০৩০ ঘটিকায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় পৌছানোর পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে এবং জনাব মির্জা আজমকে ডেকে নিয়ে বিষয়টি তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের দায়িত্ব প্রদান করেন। *(সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০২)।* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, রেকর্ড শাখার পত্র অনুযায়ী ০২ মার্চ ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সংঘটিত হত্যাকান্ডে শাহাদাত বরণকারীদের জন্য গৃহীত একটি শোক প্রস্তাব ব্যতীত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানা সংঘটিত হত্যাকান্ড এবং বিডিআর বিদ্রোহ সংক্রান্তে তৎকালীন মন্তিসভা বৈঠকে কোন উপস্থাপনা, আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি *(সূত্রঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, রেকর্ড শাখা পত্র নং ০৪.০০.০০০০. ৩২২.৩১.০৩৫.২৩.১৬.৩২ তারিখ ১৮ জুন ২০২৫, সংযোজনী-২১)।*

(কক) সেইসাথে সেনাবাহিনীর কিছু রাজনৈতিক পক্ষপাতদুষ্ট অফিসার, যারা সেসময় ক্ষমতাসীন দলের আনুকূল্য পাওয়ার চেষ্টা করছিল, তাদের মধ্যে লেফটেন্যান্ট থেকে শুরু

করে সিনিয়র অফিসাররাও ছিলেন। তারা রাজনৈতিক নেতাদের কাছে সব খবর পাঠাচ্ছিলেন। সেই সাথে জেনারেল তারেক সিদ্দিক ডিজিএফআই এর মাধ্যমে ৪৬ তম ব্রিগেডের উপর পুরো নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিলেন। তিনি নিজে ডিজিএফআই এর অফিসার এবং ৪৬ তম ব্রিগেডের অফিসারদের ফোন করছিলেন এবং নির্দেশ দিচ্ছিলেন। পিলখানায় যা হয়েছে তার জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ব্যর্থতা পূর্ণভাবে দায়ী। ২৪ তারিখ প্রধানমন্ত্রী পিলখানায় গিয়েছিলেন এবং তার আগে সেখানে লিফলেট বিলি করা হয়েছিল - এসবের কিছুই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সেনাবাহিনীকে জানাতে পারেনি। ২৫-২৬ তারিখ পিলখানার ভিতরে কি হচ্ছিল সেটাও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সরাসরি জেনারেল তারেক সিদ্দিককে জানাচ্ছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(খখ) মুন্নী সাহার মতো সাংবাদিকদের মাধ্যমে সেনা অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হচ্ছিল। যুবলীগের মিছিল পিলখানায় প্রবেশ করেছিল এবং সেখান থেকে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়া হচ্ছিল। এর ফলে কিছুক্ষণের জন্য জনমতও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিল। সিজিএস তখন চিন্তিত ছিলেন যে বিডিআর সৈনিকদের বিদ্রোহ সেনাবাহিনীর সৈনিকদের মধ্যে যেন ছড়িয়ে না পড়ে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(গগ) সিজিএস মনে করেন যে বিডিআরের এই বিদ্রোহ এবং হত্যাযজ্ঞ সুপরিকল্পিতভাবে এবং অনেক চিন্তাভাবনা করে, দীর্ঘ প্রস্তুতি নিয়ে ঘটানো হয়েছে। এটি হয়তো আরো অনেক বড় কোন পরিকল্পনার অংশ ছিল। আর এই পুরো ষড়যন্ত্রের সাথে রাষ্ট্রযন্ত্র এবং গোয়েন্দা সংস্থা জড়িত *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(ঘঘ) সিজিএস পরবর্তীতে জানতে পারেন যে মিছিল এবং অ্যাম্বুলেন্স এর মাধ্যমে অপরাধীরা বেরিয়ে গেছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(ঙঙ) সিজিএস ১১ তম ডিভিশনের জিওসির কাছ থেকে জানতে পারেন যে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ করছে। তারা একটি প্যারাট্রুপার বাহিনীও প্রস্তুত রেখেছে এই জন্য যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যদি অভিযান পরিচালনা করে তাহলে তারা শেখ হাসিনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। ডিজিএফআই থেকে এ বিষয়ে কোনো তথ্য সিজিএস পাননি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(চচ) ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ কর্নেল নেয়ামুল ইসলাম ফাতেমী দুইবার মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকের সাথে কথা বলেন। মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিক এর মধ্যে কোন একবার বলেন, 'তাদেরকে (স্টুডেন্ট অফিসার) বলো, ভারতীয় আর্মি রেডি, এয়ারফোর্সও রেডি। বাড়াবাড়ি করলে ঢুকে পড়বে।' ব্রি. জে. মামুন খালেদও তাকে একই কথা বলেন। তবে এফএস দিয়ে সীমান্ত পরিস্থিতি যাচাই করে কর্নেল নেয়ামুল কোনো অস্বাভাবিকতা পাননি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৭)।*

(ছছ) সরকারদলীয় এমপি মির্জা আজম, নানক এবং তাপসের সাথে বিডিআর সৈনিকেরা যোগাযোগ করেছিল। নির্বাচনী প্রচারণার আড়ালে হয়ত তারা বিডিআর সৈনিকদের মধ্যে থাকা অসন্তোষকে উসকে দিয়ে এই হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত করার ষড়যন্ত্র করেছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫ এবং কয়েদি সাক্ষী নম্বর-২৪)।*

(জজ) ডিজিএফআই এর মহাপরিচালকের ভূমিকা এখানে তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন বলেও সিজিএস মনে করেন। বিডিআর হত্যাযজ্ঞের আগে তিনি প্রায়ই গোপনে দেশের বাইরে সফর করতেন, বিশেষ করে প্রথমে তিনি সিঙ্গাপুর যেতেন এবং সেখান থেকে অন্য

কোন দেশে চলে যেতেন। কোন দাপ্তরিক কাজে তাঁর খোঁজ করতে গিয়ে সিজিএস জানতে পারতেন তিনি দেশে নেই *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(ঝঝ) বিডিআরের নিজস্ব কমান্ডেরও কিছু ব্যর্থতা ছিল। সেখানে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছিল। বিডিআরের নিজস্ব গোয়েন্দা বাহিনী এবং নিরাপত্তা বাহিনী ছিল কিন্ত তাদের কোন অ্যাকশন এই ব্যাপারে আমরা দেখতে পাওয়া যায়নি। বিডিআর হাই কমান্ড সম্ভবত যেভাবেই হোক অনুষ্ঠানটা শেষ করতে চাচ্ছিলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(ঞঞ) সেনাবাহিনীর কিছু অফিসার, জুনিয়র থেকে একদম সর্বোচ্চ সিনিয়র পর্যায়ের অফিসার, সরকারকে সব তথ্য দিয়ে দিচ্ছিল এবং সামরিক বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রাখার জন্য কাজ করছিল। এসব অফিসারের মধ্যে আছেন মেজর জেনারেল মাহবুব হায়দার খান, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস, লে. কর্নেল সালেহ, মেজর জিয়া (পরবর্তিতে এনটিএমসির মহাপরিচালক), ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন খালেদ, মেজর জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবর, র‍্যাব এর কর্নেল রেজানূর খান এবং নবম ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আসহাব। ডিজিএফআই এর অফিসারদের যেখানে সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করার কথা, পরামর্শ দেয়ার কথা, সেখানে তারা সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ভূমিকা পালন করছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(টট) পিএসও-এএফডি জেনারেল মুবীন একজন সজ্জন ব্যক্তি। কিন্তু তিনিও জেনারেল তারেক সিদ্দিকের প্যারালাল কমান্ড এর একটি অংশ হয়ে যান। তিনি সরকারের ইচ্ছার বাইরে কিছুই করতে পারেননি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(ঠঠ) পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে লে. জেনারেল মইনুল মনে করেন যে বিডিআর হত্যাকান্ড একটি ষড়যন্ত্রের ফল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৬)।*

(ডড) এছাড়াও বিডিআর বিদ্রোহের ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বে কয়েক সপ্তাহ ধরে বিদ্রোহ সংক্রান্ত লিফলেট বিতরণ করা হয়েছিল। এ ব্যাপারে বিডিআর সদর দপ্তর ও নেতৃত্ব ন্যূনতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশেষ করে দুইটি অস্ত্রাগারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হলে অস্ত্র ও গোলাবারুদ বিদ্রোহীদের হাতে যেত না ও হত্যা কান্ড সংগঠিত হত না। এই দুইটি বিষয়ই ছিল Absolute Command Failure of BDR HQ. *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০)।*

(২) **<u>৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেড</u>**

(ক) ৩৬ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারি আর্টিলারির প্রথম গানগ্রুপ বিএ-৩৭৮১ লে. কর্নেল শাহাজাহান সিরাজ এবং বিএ-৪৩৫৯ মেজর মোঃ মাহবুব সাবেরের নেতৃত্বে ১১০৫ ঘটিকার সময় মিরপুর এমপি চেকপোস্ট থেকে বের হয়ে আনুমানিক ১২০০ ঘটিকায় পিলখানা এলাকায় (ধানমন্ডি ১৫ নং রোড এলাকায়) অবস্থান গ্রহণ করে। অন্য আরেকটি গ্রুপ বিএ-৫৫৪১ মেজর বরকতের নেতৃত্বে আরও ০৬টি গানসহ (১৪.৫ মি. মি.) ১২২৫ ঘটিকার সময় মিরপুর এমপি চেক পোস্ট থেকে বের হয়ে আনুমানিক ১৩১৫ ঘটিকায় পিলখানা এলাকায় (সিটি কলেজ সংলগ্ন ধানমন্ডি ২নং রোড এলাকা) অবস্থান গ্রহণ করে। রেজিমেন্টের অন্যান্য অবশিষ্ট জনবল, অস্ত্র ও সরঞ্জামাদিসহ বিএ-৫৩৫৩ মেজর মোহাম্মদ মাহফুজুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রস্তুতি নিয়ে ইউনিট এলাকায় সেনাসদরের প্রয়োজনীয় নির্দেশের অপেক্ষায় থাকে। বিএ-৩৭৮১ লে. কর্নেল মো. শাহাজাহান সিরাজ সর্বমোট ২০৮ জনবলসহ (অফিসার-০৫ জন, জেসিও-০৩ এবং অন্যান্য পদবির-২০০ জন) ৪৬ স্বতন্ত্র

পদাতিক ব্রিগেডের টাস্ক ফোর্সের অধীনে আন্ডার-কমান্ড হিসেবে অবস্থান নেয়। ২৫ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারির অধিনায়ক বিএ-৩৫৬০ লে. কর্নেল শাম্মি ফিরোজ ঢাকায় এসে আনুমানিক ১২৫৫ ঘটিকায় ০৪ জন অফিসার এবং এক সেকসন অন্যান্য-পদবির সৈনিক নিয়ে ঘটনাস্থলে অবস্থান গ্রহণ করে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩২)।*

(খ) ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে আনুমানিক দুপুর ১৩০০ ঘটিকায় বিডিআর হাসপাতালে পাশ্ববর্তী স্থানে প্রথম গণকবরের সন্ধান পাওয়া যায়। গণকবরের মধ্যে লাশ দর্শনের পর উপস্থিত সকল সৈনিক ও অফিসারদের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনাপূর্ণ মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে দেখা দেয়। এই পর্যায়ে সেনাসদর/এএফডি কর্তৃক ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেডকে গণকবরের মৃতদেহ উত্তোলন, প্রাথমিক সনাক্তকরণ, ও প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করে এসটি ব্যাটালিয়নের সাথে সমন্বয় পূর্বক সিএমএইচে হস্তান্তরের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। উক্ত কাজের জন্য কমান্ডার ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেড, ৩৬ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারিকে দায়িত্ব প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, মরদেহগুলির বেশির ভাগ অর্ধগলিত ও বিকৃত অবস্থায় ছিল বিধায় প্রাথমিক সনাক্তকরণে কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতাল এবং মিডফোর্ড হাসপাপতালের পোস্ট মর্টেম করার ব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, ডিজিএফআই এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় পূর্বক প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা হয়, যাতে করে সবকয়টি মরদেহের (তখন পর্যন্ত ৩৯ টি) পোস্টমর্টেম একই রাতে সম্পাদন করে ঢাকা সিএমএইচ মর্গে স্থানান্তর করা যায়। ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেডের অধীনস্ত ০২ জন ফিল্ড-অফিসার সার্বক্ষণিক হাসপাতালে অবস্থান করে রাত ০৩ ঘটিকার মধ্যে ময়নাতদন্তের কাজ সমাপ্ত করে আনুমানিক ভোর ০৫০০ ঘটিকায় ঢাকা সিএমএইচ কর্তৃপক্ষকে হস্তান্তর করে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩২)।*

(গ) সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পর বিভিন্ন সময়ে পলায়ন করা দুই হাজারেরও অধিক বিভিন্ন পদবির সৈনিক ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখের পর পুনরায় পিলখানায় যোগদান করে। সৈনিক লাইনে তখন ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেড কর্তৃক সার্চ অ্যান্ড রেসকিউ অপারেশন চলছিল তাদেরকে পিলখানার মধ্যে মূল প্যারেড গ্রাউন্ডে বসিয়ে রাখা হয়। এই পর্যায়ে সরকারি অনুমোদনক্রমে নব নিযুক্ত ডিজি বিডিআর কর্তৃক সকল সৈনিকের সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয় যা তখন জরুরি ভাবে স্ক্রল নিউজ হিসাবে সকল টিভি চ্যানেলে দেখানো হচ্ছিল। কমান্ডার ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেডের পরামর্শে সিজিএস (লে. জে. সিনা ইবনে জামালি) নব নিযুক্ত ডিজি বিডিআরকে ছুটি বাতিল করে পুনঃযোগদানকৃত বিডিআর সদস্যদেরকে স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য পরামর্শ দেন। সে অনুযায়ী ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেডের অধীনে বিডিআর সৈনিকদের মেডিক্যাল ইন্সপেকশন পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ইন্সপেকশনের পর তিনশোরও অধিক সম্ভাব্য সন্দেহভাজন খুনি, গোলাগুলিতে অংশগ্রহণকারী, শারীরিক নির্যাতন ও হয়রানির সাথে জড়িত বিডিআর সৈনিকদের বের করা হয়। ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেড থেকে সন্দেহভাজনদের তালিকার (১) এক কপি সেনাসদর, ঢাকা সেনানিবাসে, (২) এক কপি র‍্যাব সদর দপ্তরের তৎকালীন কর্নেল রেজা (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল রেজা) বরাবর, (৩) এক কপি তদন্তকারী কর্মকর্তা মি. আব্দুল কাহহার আখন্দ বরাবর (৪) এক কপি ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেডে সংরক্ষণের জন্য প্রেরণ করা হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩২)।*

(ঘ) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে আনুমানিক ১৬০০ হতে ১৬৩০ ঘটিকার দিকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম ডিজিএফআই এর ডিজিকে ব্যক্তিগতভাবে ফোনে জানান যে পিলখানার ভিতরের নিশ্চিত হত্যাকান্ডের সংবাদ ইতোমধ্যে সবাই জানে। হত্যার সাথে যে সমস্ত বিডিআর সৈনিক জড়িত তাদের সবাই প্রথম সুযোগে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। ডিজি ডিজিএফআইকে তিনি অনুরোধ করেন সেনাপ্রধান ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহকে বলে তাদের পালানো বন্ধ করণ নিশ্চিত করার জন্য।

তার ভাষ্য মতে ডিজি ডিজিএফআই এ বিষয়ে কোন কিছু করেননি। তৎকালীন এডিজি র‍্যাব কর্নেল রেজার (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) সাথে কথোপকথনে সেই দিনই ব্রিগেডিয়ার আনোয়ার জানতে পারেন যে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ রাতে কয়েকটি স্পিড বোটে করে বিডিআরের সৈনিকরা বুড়িগঙ্গা অতিক্রম করে পালিয়ে যাচ্ছিল এবং স্থানীয় জনসাধারণ তাদের পালিয়ে যেতে সহযোগিতা করছিলো। স্থানীয় র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটেলিয়ান (র‍্যাব) এর সৈনিকরা নিজ উদ্যোগে কিছু পলাতক সৈনিকদেরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। মূলকথা হল, পিলখানা হতে বিডিআর সৈনিকদের পালিয়ে যাওয়া বন্ধ করার জন্য সরকার, সেনাবাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ইত্যাদির কেউই কোন প্রচেষ্টা চালায়নি। এমনকি একটি গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানকে ব্যাপারটি অনেক পূর্বেই অবগত করার পরও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আনোয়ারের দৃঢ় বিশ্বাস ডিজিএফআই এই পালানোর পরিকল্পনার কথা আগে থেকেই জানত *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩২)।*

(৩) **<u>১৪ স্বতন্ত্র ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড</u>**

(ক) সেনাসদরের নির্দেশ অনুযায়ী আনুমানিক ১১০০ ঘটিকায় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ২ টি কোম্পানি এবং পোস্তগোলা থেকে একটি কোম্পানি প্রস্তুত করা হয় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৪)।***

(খ) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সকাল ০৫০০ ঘটিকার দিকে পিএসও, এএফডি কামরাঙ্গির চরে মৃতদেহের সন্ধান পাওয়ার খবর ব্রিগেড কমান্ডার কে জানান। কমান্ডার ক্যাপ্টেন নূর এর নেতৃত্বে একটি টিম পাঠান এবং ছয়টি মৃতদেহ উদ্ধার করে সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৪)।***

(গ) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সকাল ০৯০০ ঘটিকার পরে এমআইএসটির বেশ কিছু অফিসার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেডে এসে ১৮ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নে যোগ দেয়। তিন-চারটি পিকআপ নিয়ে তারা বের হতে সক্ষম হয় এবং প্রথমে আবাহনীর মাঠে যায়। আবাহনী মাঠে তারা বিকেল পর্যন্ত অবস্থান করে। সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা আবাহনী মাঠেই ছিল। রাতেও সবাই স্ট্যান্ডবাই ছিল। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে তারা সৈন্যসহ ব্যাটালিয়নে ফেরত যায়। ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুরের দিকে অফিসিয়াল নির্দেশ আসে পিলখানা আক্রমণের জন্য। তারা ৬০-৭০টি গাড়ি নিয়ে বিকেল ১৫৩০ ঘটিকার আগেই আবাহনী মাঠে পৌছায়। উপস্থিত সবাইকে মেজর ওয়াকার-উজ-জামান পরিকল্পনা দিচ্ছিলেন কোন দিক দিয়ে আক্রমণ হবে, কে কোথায় থাকবে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাকিমও উপস্থিত ছিলেন এবং সমন্বয় করছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেড দ্বিতীয় লেয়ারে থাকবে বলে বলা হয়। ধাপে ধাপে কমান্ডো ব্যাটালিয়ন, ট্যাংক এবং অন্যান্য ইউনিটও যোগ দেয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০০)।*

খ। <u>র‍্যাব</u>

(১) আনুমানিক ০৯৩০ ঘটিকায় সিও র‍্যাব-২ লে. কর্নেল শামসুজ্জামান ডিজিএফআই সদর দপ্তরে বসা অবস্থায় প্রথম পিলখানার বিডিআর বিদ্রোহের বিষয়টি জানতে পারেন। অতঃপর তিনি নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করেনঃ

(ক) তার সাথে ৭ জন র‍্যাব সদস্য (গাড়ি চালকসহ) এবং সাতটি এসএমজিসহ (AK-47) দ্রুত বিডিআর সদর দপ্তরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

(খ) নিজ ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব-২) এ ফোন করে সমস্ত পেট্রোলকে পিলখানা ৪ ও ৫ নং গেইটের দিকে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

(গ) র‍্যাব-২ এ কর্মরত সকল বিডিআর সদস্যকে ডিজআর্ম (অস্ত্র ব্যতীত) করার নির্দেশ দেন।

(ঘ) লে. কর্নেল শামসুজ্জামান যখন বিডিআরের ৪ নং গেইটের কাছে পৌঁছান (আনুমানিক ০৯৫০ ঘটিকা) তখনও হত্যাকারীরা পুরোপুরি সংগঠিত হয়নি। উক্ত গেইট-এ মাত্র ২/৩ জন দাঁড়ানো ছিল। অফিসারদেরকে উদ্ধার করার জন্য তিনি পিলখানায় প্রবেশের নিমিত্ত এডিজি র‍্যাব কর্নেল রেজানুর এর কাছে অনুমতি চেয়েও পাননি। অনুমতি না পাওয়াতে তিনি পিলখানার ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হননি। বিডিআরের ৫ নং গেইটে মেজর আমিনের নেতৃত্বে র‍্যাব এর পেট্রোল পার্শ্ববর্তী বাসার ছাদ হতে দরবার হলের সামনে কয়েকটি লাশ দেখে। তারাও ভিতরে ঢুকার অনুমতি পাননি। এডিজি কর্নেল রেজা অনুমতি দেননি

(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬০)। কমিশন সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখতে পায় ৫ নং গেইট হতে দরবার হলের দূরত্ব ৫০ গজের অধিক নয়।

(২) বিএ ২১৮২ মেজর জেনারেল রেজানূর রহমান খান (অব.) ২৫ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে আনুমানিক নয়টা ত্রিশ মিনিটে পিলখানা হতে বিভিন্ন অফিসার এর নিকট হতে ফোন কল পান যেখানে তারা তাকে জানায় যে পিলখানায় বিডিআর সৈনিকরা গন্ডগোল করছে। তিনি তখন একজন অফিসারসহ পিলখানার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথমধ্যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিক ফোনে তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনাতে যেতে বলেন। তিনি ইতোমধ্যে র‍্যাব-২, ৩ ও ১০কে পিলখানায় যেতে বলেন এবং প্রয়োজনে গুলির নির্দেশ দেন। যমুনার কাছাকাছি যাওয়ার পর মহাপরিচালক র‍্যাব তাকে গুলির আদেশ বাতিল করতে এবং সেনাবাহিনী মোতায়েনের বিষয়ে যথাযথ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা নির্দেশ দেন। তিনি যমুনায় প্রবেশ করার পর তৎকালীন ডিজি এসএসএফ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জয়নাল আবেদীন, বিটিআরসির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল জিয়া এবং নিরাপত্তা উপদেষ্টা তাকে গুলি করতে নিষেধ করেন। তিনি তখন পরিচালক অপারেশন লে. কর্নেল সাকলাইনকে গুলি না করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি যমুনাতে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি অবস্থান করেন। তার ভাষ্য মতে তিনি বারংবার র‍্যাবকে পিলখানায় ঢোকার অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। বিডিআর বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি দলটি যমুনাতে প্রবেশ করার সময় তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দীকে (পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট জেনারেল) বেসামরিক পোশাকে যমুনাতে প্রবেশ করতে দেখেন। বিডিআরের সদস্যরা যমুনা থেকে আলোচনা শেষে চলে যাওয়ার পর তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বের হয়ে এসে প্রথমেই তাদের শর্তানুযায়ী র‍্যাব ও অন্যান্য বাহিনীর সদস্যদের তাদের অবস্থান থেকে কিছুটা পিছিয়ে আসার জন্য নির্দেশ দেন। তখন নিরাপত্তা উপদেষ্টা র‍্যাবকে তাদের অবস্থান থেকে পিছনে আসার নির্দেশ দেন। তিনি ডিজির সঙ্গে কথা বলে র‍্যাবকে অবস্থান পরিবর্তন করার নির্দেশ দেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৮)*

(৩) লে. কর্নেল মোঃ সামসুজ্জামান খান আনুমানিক ০৯৩০ ঘটিকা হতে ১০৩০ ঘটিকা পর্যন্ত কর্নেল গুলজার, মেজর হাসান (১৫ লং কোর্স) এবং কর্নেল এমদাদ (৮ম লং কোর্স) এর নিকট হতে মোবাইলে কল পান এবং সবাই র‍্যাব সদস্যদের দ্রুত পিলখানায় প্রবেশের অনুরোধ জানান ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬০)।***

(৪) ১০১৫ ঘটিকায় লে. কর্নেল জাকিরের নেতৃত্বে র‍্যাব-৩ এর একটি দল পিলখানার নিউমার্কেট গেইট (পিলখানার ৩ নং গেইট)-এ পৌঁছায়। পথিমধ্যে কর্নেল রেজা (এডিজি) এ দলটিকে নির্দেশ দেন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে দেয়াল ভেঙ্গে পিলখানায় প্রবেশ করতে। কিন্তু পৌঁছানোর পরই কর্নেল রেজা বলেন র‍্যাব-৩ কে সেনাবাহিনীর অধীনে কাজ করতে হবে। সেনাবাহিনীর আদেশ ছাড়া তারা যেন কিছু না করে। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ কোন এক সময়ে তৎকালীন র‍্যাবের ডিজি লে. কর্নেল জাকিরকে ফোন করে বলেন পরবর্তী দিন পিলখানার দিকে

একটা মিছিল যাবে। মিছিলটি যেন কোন অরাজকতা করতে না পারে সেই বিষয়ে তিনি লে. কর্নেল জাকিরকে নজর রাখতে বলেন। যেহেতু র‍্যাব পিছনে সরে আসে সে জন্য তিনি মিছিলটি চাক্ষুষ দেখেননি ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৮)।***

(৫) সকাল আনুমানিক ১০০০ ঘটিকায় এডিজি র‍্যাব কর্নেল রেজা নূর লে. কর্নেল সাকলায়েনকে টেলিফোনে বলেন, 'তুমি সবাইকে টেলিফোনে জানাও র‍্যাবের কোন সদস্য যেন ভিতরে না ঢোকে। ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৮)।***

(৬) ১০০০ ঘটিকার পরপরই র‍্যাব-২ হতে দুটো প্লাটুন নিয়ে মেজর আমিন ৫ নং গেইট এর কাছে অবস্থান নেয়। ১০৪৫ ঘটিকায় তারা একটি বিল্ডিং এর ছাদ হতে দরবার হলের সামনে কয়েকটি লাশ পড়ে থাকতে দেখে এবং লে. কর্নেল শামসুজ্জামানকে জানায় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬০)।***

(৭) ১১০০ ঘটিকার মধ্যেই বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যরা বিডিআর সদর দপ্তরের অভ্যন্তরে অস্ত্রশস্ত্র (মেশিনগান) বসায় এবং গাড়িতে এলএমজি বসিয়ে চলাচল শুরু করে ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬০)।***
(৮) ২৬ তারিখ রাত ০৯০০ বা ১০০০ ঘটিকার দিকে এসপি মালেকের গাড়িতে করে লে. কর্নেল শামসুজ্জামান, মেজর ফয়সাল ও ক্যাপ্টেন রাজন অস্ত্র ছাড়া পিলখানার ভিতরে ঢোকেন। ভিতরে ঢুকে ২০০ গজ যাওয়ার পরেই এসপি মালেক গাড়ি থামিয়ে দেয় এবং ফেরত যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তারা তিনজন নেমে পড়ে। সামনেই ফায়ার ব্রিগেডের একটা গাড়ি দেখতে পেয়ে গাড়িটি নিয়ে তারা সামনে এগোয়। এদিক ওদিক পড়ে থাকা অস্ত্র থেকে তারা তিনজন তিনটা এসএমজি নিয়ে প্রথমে ডিজির বাসায় যায়। তারা দেখতে পায় যে, পুরো বাসায় ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। তারা ডিজির লাশ খুঁজছিল। দোতলায় উঠার সময় তারা দেখে সিঁড়ি দিয়ে রক্ত নিচ পর্যন্ত চলে এসেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠার পর তারা ডান পাশে একটা বেডরুম দেখতে পায়। দরজা ঠেলে ঢুকতেই একটা লাশের সাথে লে. কর্নেল শামসুজ্জামান ধাক্কা খায়। সাদা সার্ট ও টাই পরা অবস্থায় লাশটা পড়েছিল। সেটা ছিল লে. কর্নেল দেলোয়ারের লাশ। খাট এর পাশে একজন মহিলার লাশ পড়েছিল। পরে তারা জানতে পারে সেটা লে. কর্নেল দেলোয়ারের স্ত্রীর লাশ ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬০)।***

(৯) লাশ পাওয়ার পর তারা পুরো বাসা তন্নতন্ন করে খুঁজে কাজের লোকের রুমে গিয়ে প্রচুর রক্ত দেখতে পায়। তাকে সম্ভবত সেখানেই হত্যা করা হয়েছিল। ডিজির বাসার পিছনের বাগান, ড্রেন ইত্যাদি খুঁজে তারা মর্চুয়ারিতে যায় তখন রাত প্রায় দুটো বা তিনটা হবে। মর্চুয়ারিতে অনেক লাশের মধ্যে সেন্ট্রাল সুবেদার মেজর নুরুল ইসলামের লাশ ছিল। ওখানে মেজর হুমায়ুনের লাশও তারা পায়। ডিজির বাসার কাজের মেয়েটার লাশও সেখানে ছিল। সম্ভবত ক্রশ ফায়ারে নিহত হওয়া দশ বারোজন বিডিআর সৈনিকের লাশও সেখানে ছিল। সেখানে কয়েকজন মেডিকেল এ্যাসিস্ট্যান্ট পাহারায় ছিল। তারা কোনভাবেই তাদেরকে বাকি লাশগুলোর সন্ধান দেয়নি। পরবর্তীতে ইন্টারোগেশনের সময় লে. কর্নেল শামসুজ্জামান জানতে পারে যে, একমাত্র মেজর হুমায়ুনকেই দ্বিতীয় দিন হত্যা করা হয়েছিল। ভোরবেলা তারা পিলখানা থেকে বের হয়ে যায় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬০)।***

(১০) র‍্যাব ইন্টেলিজেন্স প্রায় ৫০০ জন বিডিআর সদস্যের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। এই সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে করতে তারা একটা কোর গ্রুপ খুঁজে পায়। এদের মধ্যে ছিল সিপাহী কাজল, সিপাহী সেলিম, ডিএডি নাসির। এরা কেউ কেউ দরবার হলে ঢুকে অফিসারদের সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতে বলেছে। এরা শেখ সেলিম, ফজলে নূর তাপস, নানক এদের সাথে মিটিং করেছিল। তারা আরো একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম খুঁজে পায়। তিনি হলেন পিলখানা এলাকার ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ এর নেতা তোরাব আলী। তাকে র‍্যাব আটক করে নিয়ে আসার পরে সে এক পর্যায়ে স্বীকার করে যে তার কাছে বিডিআর সৈন্যরা আসত, মিটিং করত। বিডিআর সৈন্যরা যে লিফলেট দেয়ালে দেয়ালে টাঙ্গিয়েছিল সেটাও সে জানত। তার একটি ছেলে ছিল নাম লেদার লিটন। লেদার লিটনের একটি দোকান ছিল পিলখানার সাথেই, সেখানেই লিফলেট গুলো ছাপানো হয়েছিল। তোরাব আলী

প্রথম দিকে একটু অসুস্থতার ভান করলেও, পরবর্তীতে সে তথ্য দেয় যে তার সাথে স্থানীয় এমপি ফজলে নূর তাপস এরও যোগাযোগ ছিল ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬০)।***

(১১) ইন্টারোগেশনের ১১ দিনের পর লে. কর্নেল মোঃ সামসুজ্জামানকে ব্যাটালিয়ন থেকে অব্যাহতি দিয়ে র‌্যাব হেড কোয়ার্টারে সংযুক্ত করা হয় এবং এক সপ্তাহ পরে র‌্যাব থেকে বিদায় দেওয়া হয় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬০)।***

(১২) র‌্যাব যে সব বিডিআর সৈনিককে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল তার মধ্যে একজন ছিল নায়েক শহীদুর রহমান। পরবর্তীতে জেলে গিয়ে নায়েক শহীদের সাথে তোরাব আলীসহ অনেকের সাথেই দেখা হয়। তোরাব আলীর সাথে তার ঘনিষ্ঠতা হওয়ায় তোরাব আলী তাকে বেশকিছু তথ্য দেন যে গুলো নিম্নরূপঃ

(ক) বিডিআর সৈনিকদের সাথে ফজলে নূর তাপসের যোগাযোগ এর মাধ্যম ছিল যুবলীগ এর নেতা জাকির, লেদার লিটন এবং আওয়ামী লীগ এর নেতা তোরাব আলী।

(খ) শেখ সেলিম এবং তাপস অনেকবার তোরাব আলীকে ডেকে বিডিআরের সৈনিকদের অবস্থা এবং দাবি-দাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করেছে। এরপর শেখ সেলিম তোরাব আলীকে দায়িত্ব দিয়েছে বিডিআর সৈনিকদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে আরো খোঁজ নিতে এবং তাদের সাথে বৈঠকের ব্যবস্থা করতে। সেদিন শেখ সেলিমের সাথে তাপসও উপস্থিত ছিল।

(গ) শেখ সেলিমের সাথে বিডিআর সৈনিকদের পরিকল্পনা হয়েছিল মূলত অফিসারদের জিম্মি করার। এরপর সোহেল তাজ এবং শেখ সেলিমের উপস্থিতিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার ২৪ জনের একটি কিলার গ্রুপের সাথে বৈঠক হয়। ফজলে নূর তাপসের উপর দায়িত্ব ছিল কিলাদেরসহ বিডিআর সৈনিকদের নিরাপদে পালানোর সুযোগ করে দেয়ার।

(ঘ) ভারতীয়দের সাথে বৈঠকের পরে পুরো পরিকল্পনা সাজানো হয় এবং সমন্বয় করার জন্য তাপসের বাসায় বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিল নানক, মির্জা আজম, ফজলে নূর তাপস, শেখ সেলিম, লেদার লিটন এবং তোরাব আলী। সেখানে জানানো হয় যে অফিসারদের হত্যা করা হবে।

(ঙ) ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন এর সিও কর্নেল শামস এই বিষয়গুলো জানতেন এবং তিনিও শেখ সেলিম এবং তাপসের সাথে দেখা করার ব্যাপারে সৈনিকদের সহায়তা করেছেন।

(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-২৪)।

(১৩) র‌্যাব এর তৎকালীন ডাইরেক্টর ইন্টেলিজেন্স ব্রি. জে. আব্দুল মজিদ একমাস তদন্ত করে যেসব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পান তা হল বিডিআর সৈনিকদের মধ্যে ক্ষোভ এর বিষয়টি, রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ, কারা কোর গ্রুপ ছিল এসব। আরেকটি তথ্য তারা পান যে সম্ভবত ২৫ তারিখ একটি এ্যাম্বুলেন্স পিলখানায় ঢুকেছিল এবং সেই এ্যাম্বুলেন্স এ করে কোর গ্রুপের কিছু সদস্য বেরিয়ে যায়। এদের মধ্যে একজন সিপাহী সেলিম হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি ছিল বলে একটি তথ্য তারা পায়। সিপাহী সেলিম হলি ফ্যামিলি হাসপাতালেই ভর্তি ছিল এবং সে ছিল কোর কিলার গ্রুপের একজন। সেলিম অনেক বিষয়ে তার দায় অস্বীকার করলেও আরো কয়েকজনের নাম বলছিল। র‌্যাব তাদের আটক করে নিয়ে এসেছিল এবং তারা আবার অনেকে সেলিম এর নাম বলেছিল। এভাবে ক্রস রেফারেন্স এর মাধ্যমে কারা কোত ভেঙ্গে অস্ত্র লুট করেছিল, কারা দরবার হলে প্রবেশ করেছিল এসব তথ্য র‌্যাব পায় এবং পুরো ঘটনার একটা ধারাবাহিক বিবরণ তারা বের করতে পারে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৮)।* অত্র কমিশন র‌্যাব সদর দপ্তর হতে তাদের তৎকালীন তদন্তের ফলাফলের একটি সারাংশ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয় *(সূত্রঃ সংযোজনী-২২)।*

(১৪) সিপাহী সেলিম রেজা দরবার হল থেকে বেরিয়ে একটি মাইক্রোবাসে করে বিডিআর হাসপাতালে যায়। সেখানে সিপাহী মইনুদ্দিন এর সাথে তার দেখা হয়। মইনুদ্দিন সেখানে হাতে গুলি লাগার কারণে চিকিৎসা নিচ্ছিল। সেখানে প্রায় ৩ টা পর্যন্ত তাদের চিকিৎসা চলে *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৪)।*

(১৫) র‍্যাব আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পায় এয়ারপোর্টে অবস্থানরত তাদের ফিল্ড স্টাফ এর কাছ থেকে। সেটি হল দুবাইগামী একটি ফ্লাইটে বিডিআর সৈনিকরা পালিয়ে যাচ্ছে। কোন একজন এয়ার ক্রুর মাধ্যমে র‍্যাব এর এফএস বিষয়টি জানতে পারে। ডাইরেক্টর ইন্টেলিজেন্স র‍্যাব এই তথ্যটি র‍্যাব এর তৎকালীন ডিজি, এডিজি, ডিরেক্টর অপারেশন্স এবং ডিজিএফআই এর ডিজি মোল্লা ফজলে আকবরকে জানান যেন তারা সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের সাথে সমন্বয় করে ফ্লাইটটা আটকাতে সক্ষম হন। কিন্তু এক পর্যায়ে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল থেকে র‍্যাবকে জানানো হয় সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট আদেশ না পেলে তারা কোন ফ্লাইট ০২-০৩ মিনিটের বেশি আটকে রাখতে পারবে না। ডিজিএফআই সহযোগিতা না করায় পরিশেষে ফ্লাইটটি চলে যায় এবং তারা ফ্লাইটে কোন তল্লাশি চালাতে পারেনি। এপ্রিলের শুরুতে লে. কর্নেল আব্দুল মজিদের স্টাফ কলেজে পোস্টিং হয়ে যায় এবং তিনি দায়িত্ব হস্তান্তর করেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৮)।* বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সূত্রে জানা যায় যে, বিমানের ঢাকা থেকে আবুধাবীগামী ফ্লাইট (বিজি-০২৭) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ২৭ মিনিটি এবং তাদের দুবাইগামী ফ্লাইট (বিজি-০৪৭) ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ২৪ মিনিট দেরিতে যাত্রা করে *(সূত্রঃ বিমান বাংলাদেশ পত্র নং ৩০.৩৪.০০০০.০৯২.৪৪.০০১.২৫.২০ তারিখ ২৯ এপ্রিল ২০২৫, সংযোজনী-২৩)।*

গ। <u>ডিজিএফআই</u>

(১) ২০০৮ সালের মে মাসের দিকে ডিজিএফআই এর প্যারামিলিটারি ডেস্কের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার মেজর মুরতাজাকে ডিজিএফআই সদর দপ্তর থেকে ডিজি বিডিআরের স্ত্রী বেগম নাজনীন শাকিলের এবং ডিজির সাবেক জিএসও মেজর ৩৭০২-বিএ (কর্ড) ২-(অবগোলাম মাহবুবুল (. আলম চৌধুরীএর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অবৈধ ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের কিছু অভিযোগ সম্বন্ধে গোপনীয়তার সাথে তদন্তের জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি তদন্তে কিছু অগ্রসর হলে সূত্র মারফত জানতে পারেন যে ডিজি বিডিআর মেজর জেনারেল শাকিলের কাছে রিপোর্ট গেছে যে মেজর মুরতাজা তার বিরুদ্ধে গোয়েন্দা তৎপরতা চালাচ্ছে। এতে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে মেজর মুরতাজাকে তাঁর সামনে হাজির করার নির্দেশ দেন বলে মেজর মুরতাজা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারেন। এ বিষয়টি ডিজিএফআই সদর দপ্তর এ জানানো হলে মেজর মুরতাজাকে তদন্ত স্থগিত করার এবং কিছুদিন বিডিআর সদরদপ্তর পিলখানায় যাতায়াত থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়। মেজর মুরতাজা সে অনুযায়ী তদন্ত কাজ বন্ধ করে পরবর্তী কিছুদিন পিলখানায় যাওয়া বন্ধ রাখেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৮)।*

(২) ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ভেন্যুতে গিয়ে এফএসদের ডিউটি বণ্টন করার সময় মেজর মুরতাজা, জিএসও-২ (প্যারামিলিটারি), ডিজিএফআই ইঙ্গিত পান যে বিডিআরের ভেতরে কিছু অসন্তোষ বিদ্যমান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার ডিটাচমেন্ট কমান্ডার কর্নেল আলমাস রাইসুল গণিকে বিষয়টি জানান। ২২ ফেব্রুয়ারি বিষয়টি অস্পষ্ট থাকলেও ২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি নিশ্চিত হন যে বিডিআর সদস্যরা কিছু লিফলেট বিতরণ করেছে। এ বিষয়ে তিনি মেজর গাজ্জালী, লে. কর্নেল এনশাদ, মেজর শাহনেওয়াজ ও মেজর আসাদ এর সাথে যোগাযোগ করেন কিন্তু কোন সাড়া পাননি। মেজর শাহনেওয়াজ তথ্য শেয়ার করতেও অস্বীকৃতি জানান *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৮)।*

(৩) বিডিআর পিলখানায় সৈনিকদের মাঝে চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষের বিষয়টির কথা জানতে পেরে কর্নেল গনি ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ আনুমানিক ০৮৩০ ঘটিকায় বিডিআর সদর দপ্তরের আরএসইউ এর অধিনায়ক বিএ-১৮৯১ লে. কর্নেল এনশাদ ইবন আমিনকে অবহিত করেন।

পরবর্তীতে বিএ-৪৭২০ মেজর সৈয়দ গোলাম মুরতাজা, আর্টিলারি এবং বিএ-৫৬১৬ মেজর মোহাম্মদ এনায়েত করিম, সিগস্ ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ আনুমানিক ২০৫৫ ঘটিকায় বিডিআর সদর দপ্তরে জিএসও-২ (ইন্ট) বিএ-৩৩৯৬ মেজর মাহমুদুল হাসানের বাসায় সাক্ষাৎ করে। তারা মেজর মাহমুদ এর সাথে কথা বলে বিডিআর সৈনিকদের চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ এবং লিফলেট বিতরণের বিষয়টি অবহিত করেন। এ বিষয়ে মেজর মাহামুদ মন্তব্য করেন যে, লিফলেট বিতরণ ও সৈনিকদের অসন্তোষের বিষয়ে তারা অবহিত আছেন এবং এ বিষয়ে আরএসইউ কর্তৃক যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিডিআর সৈনিকদের এই চাপা ক্ষোভ ও অসন্তোষ এবং লিফলেট বিতরণের বিষয় কর্নেল গনি ২৩ এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ পরিচালক সিআইবি এবং ডিজি ডিজিএফআইকে টেলিফোনে অবগত করেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।***

(৪) বিডিআর সদস্যগণ কর্তৃক লিফলেট বিতরণ এবং বিডিআর সৈনিকদের চাপা ক্ষোভ এবং অসন্তোষের বিষয়টি ঢাকা শাখার অধিনায়ক কর্নেল আলমাস রাইসুল গনি গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে আনুমানিক ০৮৩০ ঘটিকায় বিএ-১৮৯১ লে. কর্নেল এনশাদ ইবন আমিন, জি, আর্টিলারি, অধিনায়ক আরএসইউকে বিষয়টি অবহিত করেন। একইসাথে তিনি ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ২৩০০ ঘটিকায় এবং ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ২৩৩০ ঘটিকায় বিডিআরের সৈনিকদের চাপা ক্ষোভ, অসন্তোষ ও লিফলেটের বিষয়ে পরিচালক সিআইবি এবং ডিজি ডিজিএফআইকে বিষয়টি অবগত করেন বলে জানা যায় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।***

(৫) ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ডিজিএফআই মহাপরিচালক স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্সের কাছে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর পরবর্তীতে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে রাইফেলস সপ্তাহ ২০০৯ উদযাপন উপলক্ষ্যে পিলখানায় গমন প্রসংগে একটি গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রেরণ করে। প্রতিবেদনে উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যক্তি নিরাপত্তা হুমকি স্বরূপ বা উক্ত অনুষ্ঠান বিনষ্টের কোন সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয়নি বলে উল্লেখ করা হয় ***(সূত্রঃ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর পত্র নং-১৩০০/৭০/১১/ডি তারিখ ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, সংযোজনী-২৪)*** ।

(৬) ২৩ বা ২২ ফেব্রুয়ারি ডিজি ডিজিএফআই বিডিআরের লিফলেটের বিষয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেছেন। তবে যেহেতু ডিজিএফআই লিফলেট সংগ্রহ করতে পারেনি তাই লিফলেটের বিষয়বস্তু সমন্ধে প্রধানমন্ত্রীকে জানানো সম্ভব হয়নি। ডিজিএফআই হতে ফেব্রুয়ারি ২৪ প্রধানমন্ত্রীর কুচকাওয়াজ এর জন্যলিখিতভাবে ক্লিয়ারেন্স দিয়েছিলো কিনা- তা ডিজি ডিজিএফআই নিশ্চিত করতে পারেননি ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪)।***

(৭) ২৪ ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কুচকাওয়াজের পূর্বে মেজর মুরতাজা জানতে পারেন যে ডিজি আনসার এটিএম আমিনের গাড়িতে একটি সাবমেশিনগান (SMG) বহন করা হচ্ছে। তিনি নিজে গিয়ে গাড়িটি পরীক্ষা করেন এবং লাল-সবুজ গামছায় মোড়ানো অবস্থায় একটি এসএমজি পান। তারা তৎক্ষণাৎ গাড়িটি সরিয়ে দেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৮)।*

(৮) ২৪ ফেব্রুয়ারি মেজর মুরতাজা জানতে পারেন যে বিডিআর কর্তৃক বিতরণকৃত তিনটি লিফলেট কর্নেল এনশাদ এর কাছে আছে। সেদিন রাতে ১২টা ৫ মিনিটে ডিটাচমেন্ট কমান্ডার কর্নেল আলমাস রাইসুল গণি ফোন করে লিফলেট সম্পর্কে জানতে চান এবং সকালের মধ্যে লিফলেট সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ০৮১৫ ঘটিকায় এফএস এর মাধ্যমে মেজর শাহনেওয়াজের নিকট থেকে লিফলেট সংগ্রহ করা হয় (রাইফেল সিকিউরিটি ইউনিট) *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৮)।*

(৯) সকাল আনুমানিক ০৯১৫ ঘটিকায় পিলখানায় অবস্থানরত ফিল্ড স্টাফ (এফএস) এর মাধ্যমে মেজর মুরতাজা জানতে পারেন যে পিলখানায় গোলাগুলি হচ্ছে। বিষয়টি ডিটাচমেন্ট

কমান্ডার কর্নেল আলমাস রাইসুল গণিকে জানানোর পর পরই ডিটাচমেন্ট কমান্ডার এর সাথে মেজর মুরতাজা পিলখানার দিকে রওনা দেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৮)।*

(১০) আনুমানিক সকাল ৯ টা ১৫ ঢাকা ডিটাচমেন্টের কমান্ডার কর্নেল আলমাস রাইসুল গণি ডিজি ডিজিএফআইকে জানায় যে পিলখানায় বিডিআরে গন্ডগোল ও গোলাগুলির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। ডিজি ডিজিএফআই সময় ক্ষেপণ না করে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে রেড টেলিফোনে স্বল্প সময়ে ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করেন। এর পরপরই ডিজি ডিজিএফআই সামরিক টেলিফোনে তৎকালীন সেনাপ্রধান জে. মঈন ইউ আহমেদ এবং পিএসও, এএফডি লে .জেনা. আব্দুল মুবিন কে এই ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত করেন। তিনি সেনাপ্রধানের সাথে আলাপকালে সত্বর সেনা মোতায়েন করার জন্য অনুরোধ করেন। ডিজি ডিজিএফআই সেনাপ্রধানকে শক্তি বৃদ্ধির জন্য সিলেট সেনানিবাস থেকে এয়ার লিফটিং করে কমান্ডো কোম্পানি আনার সুপারিশও করেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪)।***

(১১) বিএ ২০৬৮ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ খোরশেদ আলম (অব.) ডিজিএফআই সদর দপ্তরে এফএসআই (ফোর্সেস সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্স) ব্যুরোর ডাইরেক্টর হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি এফএসআইবির পরিচালক থাকার সময়ই এনটিএমসি পরীক্ষামূলকভাবে চালু হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ০৯০০ ঘটিকার পরে এনটিএমসি থেকে পিলখানার ঘটনা মনিটরিং শুরু হয়। একজন বিডিআর জেসিও এবং তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছেলের মধ্যে কথোপকথনে ছেলে উদ্বিগ্নভাবে জানতে চাচ্ছিল পিলখানায় কী হচ্ছে? বাবা তাকে বাসায় ফিরতে নিষেধ করেন এবং এক পর্যায়ে বলেন যে ডিজিসহ কয়েজনকে হত্যা করা হয়েছে। এর পরপরই আরো একটা কথোপকথন থেকে জানতে পারি যে ডিজিকে হত্যা করা হয়েছে। এই কথোপকথন গুলো হয় সকাল ১০৩০ থেকে ১১০০ ঘটিকার মধ্যে। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খোরশেদ সঙ্গে সঙ্গে ডিজি ডিজিএফআইকে জানান যে তার কোর্সমেট (ডিজি বিডিআর)কে হত্যা করা হয়েছে। সকাল ০৯০০ ঘটিকার পরে ডিজি বিডিআরেবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দু'বার কথা রেকর্ড হয়। প্রধানমন্ত্রী ডিজিকে বলেন, 'তুমি চিন্তা করোনা, আমি দেখছি' *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৮)।*

(১২) প্যারামিলিটারি ডেস্ক এর জিএসও-২ মেজর মুরতাজা বিডিআর পিলখানায় গোলাগুলির সংবাদ যখন কর্নেল আলমাস রাইসুল গনিকে অবহিত করেন তখন কর্নেল গনির অফিসে র‍্যাব-২ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল শামসুজ্জামান খান ছিলেন। বিষয়টি শোনামাত্র লে. কর্নেল শামসুজ্জামান অফিস ত্যাগ করে চলে যান এবং কর্নেল আলমাস রাইসুল গনি বিষয়টি ডিজি মেজর জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবর (পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট জেনারেল) এবং পরিচালক সিআইবি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শেখ মামুন খালেদ (পরবর্তীতে লেফটেন্যান্ট জেনারেল)কে অবহিত করে মেজর মুরতাজা সহকারে ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেন। তারা র‍্যাংগস ভবনের সামনে পৌছানোর পর জানতে পারেন যে সম্পূর্ণ পিলখানা বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে এবং তারা অবিরাম গুলিবর্ষণ করছে। তিনি মেজর মো. মেফতাহ উল ইসলাম ও ইন্টারন্যাল ডেস্ক এর ডেস্ক ইনচার্জ স্কোয়াড্রন লিডার এম সফিউদ্দিন কামালকে অস্ত্রসহ ঘটনাস্থলের কাছাকাছি এসে তার সাথে যোগাযোগ করার জন্য নির্দেশ দেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।***

(১৩) আনুমানিক ০৯৫০ ঘটিকায় গাড়ি নিয়ে কর্নেল গনি ও মেজর মুরতাজা ধানমন্ডি ২৭ নং হয়ে ০৪/এ রোড পর্যন্ত পৌছান। তখন বিডিআর গেইট হতে বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝিগাতলার দিকে বিদ্রোহীরা থেমে থেমে গুলিবর্ষণ করছিল এবং তারা ০৩ জনকে গুলিবিদ্ধ হতে দেখেন। পিলখানার ভেতরেও প্রচুর গুলিবর্ষণের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। সরেজমিনে পর্যবেক্ষণপূর্বক সার্বিক বিষয়টি কর্নেল গনি ডিজি ডিজিএফআই এবং পরিচালক সিআইবিকে অবহিত করেন। তারপর জনগণের সাথে মিশে আরও সামনে এগিয়ে ঝিগাতলার মোড়ে জাপান-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হসপিটালের দক্ষিণ দিকে বাদামী রংয়ের একটি বহুতল ভবনের ছাদে উঠে পিলখানার অভ্যন্তরের অবস্থা পর্যবেক্ষণের চেষ্টা করেন। পিলখানার ৪ নং গেইট থেকে ঐ বিল্ডিংটির দূরত্ব আনুমানিক ১৫০ গজ। ১০১৫ ঘটিকায় মেজর মেফতা ও স্কোয়াড্রন লিডার সফি ঘটনাস্থলে এসে তাদের সাথে যোগ দেয়। ছাদ

থেকে তারা পিলখানার ভিতরে প্রধান গেইটের গার্ডরুমের ছাদের উপর দুইটি এলএমজি পোস্ট দেখতে পান। বিডিআরের বিদ্রোহীরা উৎসুক দর্শনার্থীদের দিকে বিক্ষিপ্তভাবে গুলি বর্ষণ করতে থাকলে তারা দ্রুত বিল্ডিং থেকে নেমে আসে এবং ঝিগাতলার মোড়ে অবস্থান নেয়। আনুমানিক ১০৩০ ঘটিকায় র‍্যাব-২ এর অফিসারদের সাথে তাদের দেখা হয়। আনুমানিক ১১১৫ ঘটিকায় ১৭ ইস্ট বেঙ্গলের অধিনায়ক লে. কর্নেল আলীম ঝিগাতলা মোড়ে আসেন। তখন মেজর মেফতা, লে. কর্নেল আলীমসহ ১৭ ইস্ট বেঙ্গলের আরো ০৩ জন অফিসারকে ঐ বিল্ডিং এর ছাদে নিয়ে বিডিআরের ৪ নং গেইটে মোতায়েনকৃত অস্ত্রের অবস্থান দেখান ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬ এবং*** *সাক্ষী নম্বর-৮৮)।*

(১৪) ডিজিএফআই এর সিটিআইবিতে কর্মরত মেজর মনিরুল ইসলাম ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল আনুমানিক ০৯০০ ঘটিকার দিকে জানতে পারেন যে বিডিআরে কিছু একটা ঘটছে। ঘটনাটি তিনি সঙ্গে সঙ্গে জিএসও-১ লে. কর্নেল সালেহকে জানান। কিছুক্ষণ পর লে. কর্নেল সালেহ তাকে ঢাকা সেনানিবাসে জাহাঙ্গীর গেইটে যেতে বলেন এবং নির্দেশ দেন সেনানিবাস থেকে কোনো ভারি অস্ত্রশস্ত্র বা যানবাহন বের হয় কি-না তা পর্যবেক্ষণ করতে। এরপর লে. কর্নেল সালেহ তাকে আবার বলেন কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের সাথে যেতে। সকাল ১০২৫ বা ১০৩০ ঘটিকার দিকে তারা বিডিআরের গেইট থেকে প্রায় ৫০০ গজ দূরে পৌঁছান। পৌছেই মেজর মনিরুল তার টিমের অফিসারদেরকে জিগাতলা গেইট, নিউ মার্কেট গেইট এবং জাপান বাংলা মোড়ে পাঠিয়ে দেন। সকাল ১১০০ বা ১১৩০ ঘটিকার দিকে হেলিকপ্টার আকাশে চক্কর দিলে বিদ্রোহীরা ব্যাপক গোলাগুলি চালায়। ব্রিগেডিয়ার হাকিম তখন ডিএমও, সিজিএসসহ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কোনো ইতিবাচক নির্দেশ আসছিল না। নিউ মার্কেট গেইট লক্ষ্য করে মেজর কামরুল ফায়ার করেছিলেন। তিনি লে. কর্নেল আজিজ ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সারওয়ার্দীকে সিভিল ড্রেসে বিডিআর গেইটের দিকে হেঁটে আসতে দেখেন। তাদের সঙ্গে মহিলা এমপি মাহবুব আরা গিনি ছিলেন। মহিলা এমপি ব্রিগেডিয়ার হাকিমের কাছে সাদা পতাকা চাইলে তিনি পকেট থেকে একটি রুমাল বের করে তাকে দেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৫)।*

(১৫) আনুমানিক ১২০০ ঘটিকার দিকে মির্জা আজম, জাহাঙ্গীর কবির নানক প্রমুখ রাজনৈতিক নেতা পিলখানার কাছে আসেন এবং ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন খালেদের নিকট পরিস্থিতি সম্বন্ধে জানতে চান। অতঃপর একটা সাদা পতাকা নিয়ে তারা বিডিআর গেইট এর দিকে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮)।***

(১৬) আনুমানিক ১২১০ ঘটিকায় ১৭ ইস্ট বেংগলের উপ-অধিনায়ক মেজর ওয়াকার-উজ-জামান (বর্তমান সেনাপ্রধান) ঘটনাস্থলে পৌঁছান। মেজর ওয়াকার ঝিগাতলার মোড় হতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে একটি দ্বিতল বাড়ির ছাদ থেকে পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে ছাদে উঠার চেষ্টা করেন। কিন্তু উক্ত বিল্ডিং এর সামনে বিডিআর রেকর্ড অফিসের বহুতল ভবন পর্যবেক্ষণের অন্তরায় হয় বিধায় তাকে স্থান পরিবর্তন করে ঝিগাতলার মোড়ে গেলে পর্যবেক্ষণ ভাল হবে বলে জানানো হয় এবং মেজর ওয়াকার আর উক্ত বাড়ির ছাদে না উঠে ঝিগাতলার মোড়ে চলে আসেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।***

(১৭) পথে কর্নেল মাহমুদুর রহমান চৌধুরী (অবঃ) এর সাথে মেজর মুরতাজার দেখা হয় যিনি একটি পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে কর্মরত ছিলেন। সকাল ১১০০ ঘটিকার দিকে মেজর মুরতাজা জানতে পারেন যে ইঞ্জিনিয়ারস এর একটি টিমের উপরে বিডিআর সদস্যরা গুলিবর্ষণ করেছে এবং একজন সৈনিক নিহত হয়েছে। এ পর্যায়ে পিলখানার বিভিন্ন গেইটে তিনি ডিজিএফআই ফিল্ড স্টাফ প্রেরণ করেন। জিগাতলা মোড়ে পৌঁছে মেজর মুরতাজা মেজর ওয়াকারের নেতৃত্বে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একটি দল দেখতে পান এবং তার সাথে পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন ***(সূত্রঃ*** *সাক্ষী নম্বর-৮৮)।*

(১৮) ব্রিগেডিয়ার হাকিম ডিএমও ও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু কোন নির্দেশ আসেনি। পরে তিনি সিজিএসের সাথে কথা বলার সময় বলেন যে 'দ্রুত অর্ডার না দিলে আমরা নিজেদের উদ্যোগেই ঢুকব' *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৫)*

(১৯) আনুমানিক ১৩২০ ঘটিকায় ডিজি ডিজিএফআই আনাম র‍্যাংগস প্লাজার নিকটে পৌঁছে কর্নেল গনিকে সাক্ষাৎ করার জন্য সংবাদ দেন। কর্নেল গনি এবং মেজর মুরতাজা ঝিগাতলার পেছন দিয়ে বিভিন্ন শাখা সড়ক ব্যবহার করে ডিজির সাথে দেখা করে সার্বিক বিষয় বর্ণনা করে অতি সত্বর এপিসিসহ সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে উদ্ধার তৎপরতা শুরু করার জন্য জোরালো মতামত ব্যক্ত করেন। পরবর্তীতে কর্নেল গনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস ও লে. কর্নেল শাম্মী ফিরোজ (অধিনায়ক, ২৫ এডি রেজিমেন্ট আর্টি.)সহ পুনরায় ঝিগাতলার মোড়ে ফেরত আসেন এবং দেখতে পান মেজর ওয়াকার মাইকের সাহায্যে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করছে ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।***

(২০) ডিজি ডিজিএফআই দুপুর আনুমানিক ১২৩০ ঘটিকার দিকে ধানমন্ডির ২ নং সড়াকে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের নিকট পৌঁছান। ঘটনাস্থলে তিনি দুই একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং কিছু অসামরিক লোকের সমাগম লক্ষ্য করেন। যেহেতু ওই সময়ে ডিজিএফআইতে তার অবস্থান অত্যন্ত স্বল্প সময়ের অর্থাৎ সিঙ্গাপুরে কনফারেন্সে অবস্থানকালীন সময় বাদ দিলে ১২-১৩ দিনের মত ছিল, তাই তাদের সাথে ডিজি ডিজিএফআই এর পরিচয় ছিল না। পরিচালক সিআইবি তাকে জানায় এদের মধ্যে জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজম আছেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪)।***

(২১) ডিজি ডিজিএফআই একটা গলির মধ্যে এক সেকশন সৈনিক এবং একজন অফিসারকে দেখতে পান। তারা জানায় বিডিআরের গুলিতে রাস্তায় একজন সেনা সদস্যের মৃত্যু হয়েছে এবং তারা ৪৬ ব্রিগেডের বিভিন্ন ইউনিটের সদস্য বিভিন্ন স্থানে মোতায়ন হচ্ছে। শক্তি বৃদ্ধির জন্য ডিজি ডিজিএফআই মোবাইল টেলিফোনে সেনাপ্রধানকে একটি এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারি মোতায়নের অনুরোধ করেন এবং সেনাপ্রধান তাতে সম্মত হন। এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারির কামান মোতায়েন নিশ্চিত করে সম্ভবত দুপুর ১৩৩০-১৪০০ ঘটিকার দিকে ডিজি ডিজিএফআই যমুনা এর উদ্দেশ্যে ঘটনাস্থল ত্যাগ করেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪)।***

(২২) যমুনা পৌঁছানোর পর ডিজি ডিজিএফআই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেন। তখন প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার অনেক সদস্য ও কিছু রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও বিভিন্ন সচিবদের সাথে আলোচনারত ছিলেন। কিছুক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রীর সাথে ডিজি ডিজিএফআই এর দেখা করার সুযোগ হলে ডিজি ডিজিএফআই তার প্রাপ্ত তথ্য জানান এবং সামরিক কার্যক্রমের ও অ্যাকশনের গুরুত্ব সম্বন্ধে বলেন। প্রয়োজনে ট্যাংক মোতায়নের কথাও বলেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪)।***

(২৩) জনগণের একাংশকে মেজর মুরতাজা বিদ্রোহীদের পক্ষে সহানুভূতি প্রকাশ করতে দেখেন। নিউ মার্কেট গেইটের পাশে তিনি মিছিল হওয়ার সংবাদ পান এবং সে এলাকায় বিডিআর হতে মর্টার ফায়ার করা হয়েছে বলেও জানতে পারেন। রাইফেল স্কয়ার, আম্বালা হোটেল এলাকায় মেজর মুরতাজা জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, মির্জা আজম, ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল এবং আইজিপি নূর মোহাম্মদকে দেখেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৮)।*

(২৪) আনুমানিক ১৪০০ ঘটিকায় মাহবুব আরা গিনি, এমপি এবং ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল, এমপি ও কিছু সংখ্যক ব্যক্তি ঝিগাতলার মোড়ে আগমন করেন এবং সাদা পতাকা উড়িয়ে ৪ নং গেইটের উদ্দেশ্যে সমঝোতার জন্য গমন করেন। কর্নেল গনি জানতে পারেন যে, ঐ একই সময় এলজিআরডি প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং সংসদ সদস্য মির্জা আজম রাইফেল স্কয়ারের দিক হতে ৪ নং গেইটের দিকে গমন করেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।***

(২৫) বেলা আনুমানিক ১৫৩০ ঘটিকা নাগাদ পিলখানার ১ নং গেইটে ফ্লা. লে. মাহবুব, ৩ নং গেইটে মেজর এনায়েত এবং ৫ নং গেইটে ডিডি আওলাদ অবস্থান নেয়। তারা ১৬০০ ঘটিকা থেকে মেজর মুরতাজার মারফত কর্নেল গনিকে জানায় যে ঐ দুই গেইটের নিকট কিছু স্থানীয় বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ বিডিআর সদস্যদের পক্ষে মিছিল করছে এবং তাদেরকে পানি ও খাবার সরবরাহ করছে। তিনি আরও জানতে পারেন যে, ঐ দুই গেইটের পথে প্রচুর বিডিআর সদস্য বেসামরিক পোষাকে এবং তাদের পরিবার পলায়ন করছে এবং তাদেরকে আটকানোর জন্য ঐ এলাকায় কোন সেনাবাহিনী ও র‍্যাব নেই। তিনি ঐ প্রয়োজনীয়তার কথা পরিচালক, সিআইবিকে অবহিত করেন। আনুমানিক ১৬০০ ঘটিকায় ১৩-১৪ জন বিদ্রোহী বিডিআর জোয়ান ২টি জিপ গাড়িতে করে যমুনার উদ্দেশ্যে গমন করেন বলে কর্নেল গনি জানতে পারেন। তিনি আরও জানতে পারেন যে, সেখানে দীর্ঘক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের তারা জানান যে, প্রধানমন্ত্রী বিদ্রোহীদের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছেন ও অস্ত্র সমর্পণ করতে বলেছেন এবং এর বিনিময়ে কর্মকর্তাদের মুক্তি দেয়া হবে। যমুনায় প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিদ্রোহীদের আলোচনারত অবস্থায়ও পিলখানাতে থেমে থেমে গুলিবর্ষণ হচ্ছিল এবং তারা মাইকে সেনা অফিসারদের অশ্রাব্য গালিগালাজ ও কুৎসা রটনা করছিল। ১৮৩০ ঘটিকায় বিদ্রোহীরা পিলখানায় ফেরত আসে এবং নতুন করে অধিক হারে গুলিবর্ষণ করতে থাকে এবং তাদের দাবি-দাওয়া সংসদের মাধ্যমে যথাশীঘ্র সম্ভব পাশ করতে হবে বলে দাবি করে ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।***

(২৬) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে কারা গিয়েছিল তা এক বন্ধুর মাধ্যমে মেজর মুরতাজা জানার চেষ্টা করেন কিন্তু জানতে পারেন যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে তাদের নাম লিপিবদ্ধ করা হয়নি ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৮)।***

)২৭(বিকাল ১৬০০ ঘটিকার দিকে কিছু সংখ্যক বিডিআরের বিদ্রোহী সদস্যদের নিয়ে জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজম যমুনায় গমন করেন। তারা তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী, কয়েকজন মন্ত্রী পরিষদ সদস্য ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কয়েকজন কর্মকর্তার সাথে আলোচনা করেন। তবে আলোচনা কক্ষে বা আলোচনা কালে ডিজি ডিজিএফআই উপস্থিত ছিলেন না ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৪)।***

(২৮) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ আনুমানিক ১৮০০ ঘটিকায় কর্নেল গনি তার অবস্থান পরিবর্তন করে রাইফেল স্কয়ারের সন্নিকটে হোটেল আম্বালা ইনে র সামনে আসেন এবং পরিচালক সিআইবি ব্রি. জেনা. মামুন খালেদকে সেখানে দেখতে পান। বিডিআর সদর দপ্তরের ৫ নং গেইট দিয়ে এবং হাজারিবাগ এলাকা দিয়ে বেসামরিক পোশাকে বিডিআর সদস্যদের পলায়নের ঘটনা ধারাবাহিক ভাবে তিনি উপস্থিত র‍্যাব অফিসার এবং পরিচালক সিআইবিকে অবহিত করেন। আনুমানিক ২১০০ ঘটিকায় ১৩-১৪ জন বিদ্রোহী হোটেল আম্বালাতে সমঝোতার জন্য আসে। সমঝোতার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন, ব্যারিস্টার তাপস উপস্থিত ছিলেন। অবশেষে রাত প্রায় ০০৩০ ঘটিকায় (২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমঝোতাকারীদল (ব্যারিস্টার তাপস এমপি, এ্যাডভোকেট কামরুল, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মির্জা আজম, আইজি পুলিশ) ৪ নং গেইট দিয়ে পিলখানার ভেতর প্রবেশ করে। উল্লেখ্য যে, বিদ্রোহী প্রতিনিধিদের ০৩ জন ডিএডি, আম্বালা ইনে বৈঠকের পর ভেতরে ফিরে না গিয়ে ঐ আবাসিক হোটেলের ১০৭ নং কক্ষে এই সময় অবস্থান করছিল। রাত প্রায় ০১০০ ঘটিকায় স্বরাষ্টমন্ত্রী, আইজি পুলিশের কন্যাসহ ০৩/০৪ জন কর্মকর্তার পরিবার নিয়ে বেরিয়ে আসেন। ঐ সময়ে রেডক্রিসেন্টের একটি এ্যাম্বুলেন্সে করে ১২-১৩ জন বিডিআরের সদস্যকেও বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। কর্নেল গনি আহত বিডিআর সদস্যগণের সম্ভাব্য গন্তব্য ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালসহ অন্যান্য জায়গা হতে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চালান। সূত্র মারফত জানতে পারেন যে, তারা হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে অবস্থান করছে। তিনি দু'জন অফিসারকে সেখানে প্রেরণ করেন এবং তারা ওখানে পৌঁছে বিডিআর সদস্যদের অবস্থান নিশ্চিত করে। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ওই সময় ডিএডি আব্দুল জলিল এবং ডিএডি কাদের ছিল যারা প্রধানমন্ত্রীর সাথে সমঝোতা বৈঠকের সময় উপস্থিত ছিলেন। চিকিৎসকের সাথে কথা বলে অফিসাররা নিশ্চিত হন যে উল্লিখিত ডিএডি কোনরূপ

শারীরিকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হননি এবং তাদের প্রেসার এবং অন্যান্য শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক ছিল। ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্টতা আড়াল করার উদ্দেশ্যে তারা হাসপাতালে ভর্তি হয় বলে প্রতীয়মান *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।*

)২৯(সন্ধ্যা সম্ভবত ৭টার দিকে তিন বাহিনী প্রধান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সাথে বিডিআর বিদ্রোহের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। এই সময়ে পিএসও, এএফডি লে .জেনা. মুবিনও যমুনা আগমন করেন। লে .জেনা. মুবিন এর মধ্যে বিভিন্ন টিভি থেকে আগত সাংবাদিকদের একটা স্টেটমেন্ট প্রদান করেন। যেখানে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেন বিডিআর বিদ্রোহে যদি কোন হত্যাকান্ড বা অন্যায় সংঘটিত হয়ে থাকে তবে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাধারণ ক্ষমা নয় বরং যথাযথ শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৪)।* **২৮ ফেব্রুয়ারি এটিএন বাংলায় প্রচারিত (২৭ ফেব্রুয়ারি বিটিভি কর্তৃক ধারণ করা) একটি ভিডিও বার্তায় লে. জেনারেল মুবীন বলেনঃ**

(ক) সাধারণ ক্ষমার অর্থ এই নয় যে যারা হত্যা, বিদ্রোহ, অগ্নিকান্ডে জড়িত ছিল তাদেরকে ক্ষমা করা হয়েছে। বিশেষ ট্রাইবুনাল গঠন করে তাদের বিচার হবে।

(খ) যারা শহীদ হয়েছেন যথাযথ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাদের দাফন করা হয়।

(গ) তিন দিনের জাতীয় শোক পালন করা হবে।

(ঘ) বিডিআরের চেইন অভ্ কমান্ড পুনঃস্থাপন করা হবে।

(ঙ) সকলকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে।

(সূত্রঃ ভিডিও ক্লিপ সংযোজনী-১৮)

(৩০) ২৫ ফেব্রুয়ারি বিকেল চারটা থেকে পাঁচটার দিকে বা ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকেলে নিউ মার্কেট গেইট দিয়ে একটি মিছিল ঢোকে। তারা 'বিডিআর জনতা ভাই ভাই' স্লোগান দিতে দিতে ভিতরে প্রবেশ করে। প্রায় ২০-২৫ জন ছিল এ দলে। মাগরিবের আজানের সময় তারা আবার বের হয়ে যায় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৫)।*

(৩১) পরে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সাড়ে সাতটা থেকে আটটার দিকে কয়েকটি এ্যাম্বুলেন্স ভিতরে ঢুকতে দেখেন। ওই এ্যাম্বলেন্সগুলো বিডিআরের এ্যাম্বুলেন্স ছিল না। ঘণ্টা খানেকের মধ্যে সেগুলো ভিআইপি কনভয়ের মতো বের হয়ে যায় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৫)।*

(৩২) ২৫ ফেব্রুয়ারি কোন এক সময় মেজর মনিরুল জেসিওর ছেলে পরিচয় দেওয়া একজনের ফোন রিসিভ করেন। ফোনের অপর প্রান্ত থেকে বলা হয় যে যদি সেনাবাহিনী ভিতরে ঢোকে তাহলে বিদ্রোহীরা মানুষ মেরে ফেলবে এবং ভারতের অনুপ্রবেশ ঘটবে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৫)।*

(৩৩) পঁচিশ ফেব্রুয়ারি বিকালে বা রাতে ডিজিএফআই এর একজন অফিসার লে. কর্নেল সালেহ (সম্ভবত ইঞ্জিনিয়ার্স) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খোরশেদের অফিসে আসেন। এসে সরাসরি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খোরশেদকে বলেন যে তিনি এনটিএমসি মনিটর করবেন। লে. কর্নেল সালেহ জানায় যে তাকে ডিফেন্স এ্যাডভাইজার পাঠিয়েছেন। তার সাথে আর একজন অফিসার এসেছিল। লে. কর্নেল সালেহ'র এনটিএমসির ভিতরে ঢোকার ব্যাপারে ব্রিগেডিয়ার খোরশেদ ডিজি ডিজিএফআইর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি অনুমতি দেন। অতঃপর লে. কর্নেল সালেহ ও তার একজন সঙ্গী এনটিএমসিতে ঢুকে দীর্ঘক্ষণ কাজ করে। কয়েকদিন পর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খোরশেদের বদলি হয়ে যায়। বদলি হয়ে যাওয়ার পূর্বের রাতে রেকর্ডকৃত সব কল একটা সিডিতে রেকর্ড করে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খোরশেদ আলম সেটার একটা কপি ডাইরেক্টর সিটিআইবি ব্রি. জেনা. ইমরুল কায়েসকে দিতে যান। কিন্তু টপ সিক্রেট ডকুমেন্ট বলে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস সেটা রাখতে রাজি হননি। তারপরে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলম একটা চিঠি লিখে সে চিঠির সাথে সিডিটা সংযোজিত করে ডিজির সেক্রেটারিয়েটে দিয়ে চলে যান। কার কাছে দিয়েছিলেন সেটা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আলম সঠিকভাবে মনে করতে পারেননি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৮)।*

(৩৪) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সকাল ১০০০ ঘটিকা থেকে পুনরায় সরকার পক্ষের সাথে বিডিআরের বিদ্রোহী প্রতিনিধিদল হোটেল আম্বালা ইনে র ৩য় তলায় একটি কক্ষে বৈঠক করেন। বিদ্রোহী দলের প্রতিনিধিদের মধ্যে যাদের নাম জানা যায় তারা ছিলেন ডিএডি তৌহিদ, ডিএডি রহিম ও ডিএডি শফিক। এছাড়াও কিছু তরুণ সৈনিক ওয়ারলেস সেট নিয়ে তাদের সাথে এসেছিল, যারা জানালা দিয়ে বিভিন্ন বাহিনীর অবস্থান দেখছিল এবং ভিতরে সংবাদ পাঠাচ্ছিল। এ সময়ে সরকারের পক্ষে আরও উপস্থিত ছিলেন এ্যাড. কামরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার তাপস, এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, মির্জা আজম ও তাদের সহকর্মীবৃন্দ। ঐ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, বিদ্রোহীরা বেলা ১৪০০ ঘটিকার মধ্যে সকল জিম্মিকে মুক্তি দেবে এবং অস্ত্র সমর্পণ করবে। এরপর দুপুর ১৪৩০ ঘটিকা হতে 'বিদ্রোহীরা জিম্মি পরিবারবর্গ এবং যে সব কর্মকর্তা পালিয়ে ছিলেন, তাদের ধীরে ধীরে মুক্তি দেয়া শুরু করে। এ সময় ১৫০০ ঘটিকায় সামরিক অভিযান পরিচালিত হবে বলে জানা যায়। তবে সামরিক অভিযানের পূর্বে আনুমানিক ১৪৪৫ ঘটিকায় মহিলা এমপি মাহাবুব আরা গিনি, ব্যারিস্টার তাপস, জাহাঙ্গীণ কবির নানক ও মির্জা আজম বিডিআরের ৪ নং গেইট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন। এরপর বিভিন্ন ধাপে অফিসার ও পরিবারবর্গকে ছেড়ে দেয়া হয়। সন্ধ্যা ১৮৩০ ঘটিকা নাগাদ বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানায় বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণের জন্য প্রথমে দুই ব্যাটালিয়ন, পরবর্তীতে আরও অনেক পুলিশ সদস্য ঢুকতে শুরু করে। রাত ২২০০ ঘটিকার দিকে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়। পুলিশ সদস্যরা যখন বিডিআর সদর দপ্তর নিয়ন্ত্রণে নেয়, তখন মাত্র ১৩০ জন বিডিআর সদস্য ভিতরে অবস্থান করছিল। ঐ রাতে কর্নেল গনির নির্দেশে ডিজিএফআই, ঢাকা ডেটের মেজর মুরতাজা পিলখানার ভিতরে প্রবেশ করেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।***

(৩৫) ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে ব্রি. জেনা. ইমরুল কায়েসকে বলা হয় সাভার থেকে ট্যাংক আসছে এবং তিনি যেন আমিন বাজারে গিয়ে ট্যাংক ইউনিটের সঙ্গে যোগ দেন। ডিজি ডিজিএফআই তাকে বলেন 'তুমি একজন সিনিয়র অফিসার, প্রয়োজনে ট্যাংক ব্যবহার করতে জানো।' আমিন বাজারে গিয়ে তিনি ট্যাংকের বহর দেখতে পান যার অধিনায়ক ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল নাসিম। ২৬ তারিখ সারাদিন তিনি ট্যাংক বহরের সাথেই ছিলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৭)।*

(৩৬) ১৫০০ ঘটিকায় সামরিক অভিযান পরিচালনা হবে বলে জানা যায়। তবে সামরিক অভিযানের পূর্বে আনুমানিক ১৪৪৫ ঘটিকায় অর্থাৎ ১৫ মিনিট পূর্বে মহিলা এমপি মাহবুব আরা গিনি, ব্যারিস্টার তাপস, জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং মির্জা আজম বিডিআর ৪ নম্বর গেইট দিয়ে প্রবেশ করে। এরপর বেলা ১৫০০ ঘটিকা হতে বিদ্রোহীরা জিম্মি পরিবারবর্গ এবং যেসব কর্মকর্তা পালিয়ে ছিলেন তাদের ধীরে ধীরে মুক্তি দেওয়া শুরু করে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের আত্মীয়-স্বজন ওই সময় অফিসারদের নাম চিরকুট করে লিখে দিচ্ছিল যাতে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। ওই সময় বের হয়ে আসা জীবিত অফিসারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল কামরুজ্জামান, লেফটেন্যান্ট কর্নেল সামস, মেজর জাহিদসহ আরো কয়েকজন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।***

(৩৭) প্রায় ১৫৩০ ঘটিকায় আরো কিছু সংখ্যক সংসদ সদস্য পিলখানায় প্রবেশ করে এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জনাব আব্দুল জলিল, জনাব আসাদুজ্জামান নূর, জনাব রাশেদ খান মেনন। এরপর বিভিন্ন ধাপে অফিসারদের পরিবারবর্গকে ছেড়ে দেওয়া হয়। ইতোমধ্যে পলাতক বিডিআর জওয়ানের কাছ থেকে বিভিন্ন বিল্ডিং এর বিদ্রোহীদের অস্ত্রসহ অবস্থান করার কথা কর্নেল গনি জানতে পারেন। সন্ধা ১৮৩০ ঘটিকা নাগাদ বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানায় বিদ্রোহীদের অস্ত্র সমর্পণের জন্য প্রথমে দুই ব্যাটালিয়ন পুলিশ/এপিবিএন, পরবর্তীতে আরও অনেক পুলিশ সদস্য ঢুকতে শুরু করে। এরপর ধীরে ধীরে পুরো পিলখানা পুলিশের নিয়ন্ত্রণে আসে। রাত ২২০০ ঘটিকার দিকে ফায়ার সার্ভিসের উদ্ধার কার্যক্রম শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, যখন পুলিশ সদস্যরা নিয়ন্ত্রণে নেয়, তখন মাত্র ১৩০ জন বিডিআর সদস্যকে তারা খুঁজে পান বলে কর্নেল গনি জানতে পারেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।***

(৩৮) তিন বা চারজন চাইনিজ নাগরিক পিলখানায় আটকা পড়ে ছিলেন যাদেরকে ২৬ ফেব্রুয়ারি উদ্ধার করে মেজর মুরতাজা থানায় হস্তান্তর করেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৮)।***

(৩৯) ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল হাকিম আজিজ ও মেজর মনির এপিসি নিয়ে ভিতরে ঢোকেন। গেইট থেকে প্রায় দুইশত গজ ভিতরে যাওয়ার পর তারা মেজর জেনারেল (অব.) তারেক সিদ্দিককে দেখেন। মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিক এপিসি নিয়ে ভিতরে ঢোকার কারণে প্রচণ্ড ক্ষোভে ব্রিগেডিয়ার হাকিমকে গালিগালাজ করেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৫)।*

(৪০) ঘটনার পরপরই ডিজিএফআই ঢাকা ডিটাচসেন্টের কমান্ডার হিসেবে কর্নেল গনি বিষয়টা তদন্ত করার চেষ্টা করেন। র‌্যাবের তৎকালীন ডাইরেক্টর ইন্টেলিজেন্স লে. কর্নেল মজিদ, র‌্যাব-২ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল সামসুজ্জামান, লে. কর্নেল মোয়াজ্জেম প্রমুখকে নিয়ে তিনি বসার চেষ্টা করেন। বসার পরে ডাইরেক্টর সিআইবি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন খালেদ তাকে ডেকে তদন্ত বন্ধ করার জন্য বলেন এবং তার পরপরই কর্নেল গনির বদলি হয়ে যায় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।***

(৪১) তথ্য আসে যে শেখ ফজলে নূর তাপস ফোনে নির্দেশ দিয়েছিলেন একটি ছেলেকে মিছিল সংগঠিত করে বিডিআরে প্রবেশ করাতে। ফোন কলটি ডিজিএফআই রেকর্ড করেছিল। পরবর্তীতে হাজারিবাগের একটি বাসা থেকে ছেলেটিকে ধরা হয়। বয়স আনুমানিক ২১-২২ বছর, পাতলা গড়নের, নাম সম্ভবত জুয়েল। মেজর মনির তাকে ধরেন। লে. কর্নেল মোয়াজ্জেম নির্দেশ দিয়েছিলেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য টিএফআইতে নিতে, কিন্তু লে. কর্নেল সালেহ নির্দেশে মেজর মনির তাকে র‌্যাবের কাছে হস্তান্তর করেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৫)।*

(৪২) প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ছেলেটি স্বীকার করে যে তাপসের নির্দেশেই সে মিছিল নিয়ে ভিতরে ঢুকেছিল। প্রথমে তার সঙ্গে বেশি লোক না থাকলেও বের হওয়ার সময় অনেক লোক ছিল। জুয়েল জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেছিল যে মিছিলে যুবলীগের লোকজন অংশ নিয়েছিল। এ তথ্য মেজর মনির লে. কর্নেল সালেহকে জানায়। পরে কর্নেল আলমাস রাইসুল গনি একটি ওভারঅল রিপোর্ট তৈরি করেন যেখানে ফ্যাক্ট, ইনসিডেন্ট ও ফাইন্ডিংস আকারে সবকিছু উল্লেখ করা হয়। সেই লেখাটি সরকারের পক্ষে ছিল না এবং মেজর মনির মনে করেন যে এ রিপোর্ট দেওয়ার পর কর্নেল আলমাস রাইসুল গনির অবস্থান দুর্বল হয়ে যায় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৫)।*

(৪৩) ঘটনার পর একদিন কর্নেল সালেহ অনেকগুলো ছবি নিয়ে এসে মেজর মনিরকে জিজ্ঞেস করেন যে পিলখানার ঘটনার ব্যাপারে মেজর মনিরের অ্যাসেসমেন্ট কী। লে. কর্নেল সালেহ ছবিগুলো দেখিয়ে বলেন ছবিতে সবার মুখ কাপড়ে ঢাকা, কারণ তারা জামাতের সদস্য, দাড়ি লুকোতে মুখ ঢেকেছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৫)।*

(৪৪) ২৭ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন সেনাপ্রধান সেনা সদরের অগ্রযাত্রা বিল্ডিং এ বক্তব্য প্রদান করেন। সেখানে অনেক চেঁচামেচি ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। ০১ মার্চ ২০০৯ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অফিসারদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সেখানেও অফিসারগণ অনেক চেঁচামেচি ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখায় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮)।***

(৪৫) ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, শুক্রবার, দুপুর আনুমানিক ১২০০ ঘটিকার দিকে ডিজিএফআই সিলেট ডিটাচমেন্টের কর্নেল জিএস কর্নেল নেয়ামুল ইসলাম ফাতেমী জানতে পারেন যে SI&Tতে প্রশিক্ষণরত ০২/০৩ শত অফিসারের মধ্যে জুনিয়র অফিসাররা মেস ছেড়ে অস্ত্রাগার ভাঙতে গিয়েছে। তিনি দ্রুত ঘটনাস্থলে যান। গিয়ে দেখেন শতাধিক অফিসার শাবল, হাতুড়ি নিয়ে অস্ত্রাগারের দরজায় হামলা করছে। সেখানে কোনো সেন্ট্রি ছিল না। কর্নেল ফাতেমী সামনে দাঁড়াতেই তারা প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং তাকে 'সরকারের দালাল' ইত্যাদি বলে গালাগাল করতে থাকে। কয়েকজন মারার জন্যও এগিয়ে আসে। তখন তাদের মধ্য থেকেই কিছু সিনিয়র অফিসার এগিয়ে এসে কর্নেল ফাতেমীকে সুরক্ষা দেয়। এরপর তারা মেসে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে

কমান্ড্যান্ট SI&T ব্রিগেডিয়ার মাহফুজকে বসিয়ে রাখা হয়েছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৭)।*

(৪৬) ৫২ পদাতিক ব্রিগেডের তৎকালীন কমান্ডার, ব্রিগেডিয়ার শফিউদ্দিন আসার পর তারা ০৩ জন বসে আলোচনা করেন। পরিস্থিতি ছিল উত্তপ্ত। অফিসাররা একের পর এক ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। অফিসাররা সেনাপ্রধানের সাথে কথা বলতে চায়, সেনাপ্রধানকে তাদের সামনে দেখতে চায়। কর্নেল ফাতেমী তৎকালীন ডাইরেক্টর সিটিআইবি (ডিজিএফআই) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন খালেদকে ফোনে ঘটনা জানান। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন খালেদ কর্নেল ফাতেমীকে মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকের (তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর সামরিক উপদেষ্টা) সাথে কথা বলতে বললে কর্নেল ফাতেমী সঙ্গে সঙ্গে কথা বলেন। মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিক জানান যে, সেনাপ্রধান আসতে পারবেন না। লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (বর্তমান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা) SI&T-এর ছাত্রদের সাথে কথা বলতে আসবেন। বিকেল ৫টার দিকে লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর হেলিকপ্টারে করে SI&T-তে আসেন। ছাত্রদের সাথে মেজর জেনারেল জাহাঙ্গীর ২ ঘন্টা কথা বলে ছাত্রদেরকে শান্ত করেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৭)।*

(৪৭) পহেলা মার্চ সকাল ১১০০ ঘটিকায় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সেনাকুঞ্জে অনুষ্ঠিত একটি দরবারে সেনা অফিসারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। উপস্থিত অফিসারদের অনেকেই উত্তেজিত ও আবেগপ্রবন হয়ে পড়েন। এখানে কিছু সংখ্যক অফিসার চিৎকার চেঁচামেচিও করে। সেনা অফিসাররা বিভিন্ন দাবি-দাওয়া পেশ করেন। এগুলোর মধ্যে ছিল হত্যাকান্ডের তদন্ত, সঠিক বিচার, বিডিআরের নাম পরিবর্তন, শহীদ পরিবারদের পুনর্বাসন ইত্যাদি। সব দাবি দাওয়া যথাযথভাবে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়। পরিশেষে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করে দরবার শেষ করা হয় ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৪)।***

)৪৮(ফেব্রুয়ারি সবগুলো ২৬ এবং ২৫ক্যান্টনমেন্টে অস্থিরতা বিরাজ করছিল। সহকর্মীদের মৃত্যুতে সব অফিসাররা খুব অনুভূতিপ্রবন হয়ে পড়েছিল। এই অস্থিরতা খুবই স্বাভাবিক ছিল। এটা সরকারের প্রতি কোন হুমকি ছিল না ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৪)।***

(৪৯) র‍্যাব বিডিআরের কিছু পলায়নপর সদস্যকে ধরে একটা বাসে এ করে আবাহনী মাঠে নিয়ে আসে। এর কিছুক্ষণ পরেই ডিজি ডিজিএফআই সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিতে বলেন বলে যে অভিযোগ আছে তা ডিজি ডিজিএফআই সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৪)।*** **ক্যাপ্টেন শাহানাজ জাহান (অব.) তৎকালীন** এডজুট্যান্ট ১৮ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন এর ভাষ্য মতে আনুমানিক সন্ধ্যা ১৮০ টা থেকে ১৮৩০ এর দিকে র‍্যাবের ক্যাপ্টেন আশিক একটি পিক আপে করে ০৯/১০ জন পলায়নরত বিডিআর সদস্যকে আবাহনী মাঠে ধরে নিয়ে আসেন যারা হাজারীবাগ সীমানা দেয়াল টপকে পালাচ্ছিল। সেখানে উপস্থিত DG, DGFI অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে ক্যাপ্টেন আশিককে প্রশ্ন করেন কার আদেশে ক্যাপ্টেন আশিক পলায়নরত বিডিআর সদস্যদের ধরে এনেছেন। সাথে সাথেই র‍্যাব তাদেরকে পুলিশের নিকট হস্তান্তর করে ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০১)।***

(৫০) পিলখানা হত্যাকান্ডের পর ঢাকার ডিটাচমেন্ট কমান্ডার কর্নেল আলমাস রাইসুল গনি নিজ উদ্যোগে কিছু রিপোর্ট তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন এবং কিছু কাজও তিনি করেছিলেন। তার এই উদ্যোগের কারণেই তাকে তার কাজ শুরুর তিনচারদ-িন পরেই পোস্টিং আউট করে দেয়া হয় এ বিষয়ে লে .জেনামোল্লা ফজলে আকবর কোন কিছু স্ম .রণ করতে পারেননি। তবে তিনি মনে করতে পারেন যে নতুন সরকার আসার পর অনেককেই ডিজিএফআই থেকে বদলি করা হয়েছিল ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৪)।***

(৫১) /পাঁচজন ক্যাপ্টেনমেজর পদবির অফিসারকে ব্যারিস্টার তাপস হত্যা চেষ্টা মামলায় জড়ানোর বিষয়ে ডিজিএফআই এর কোন ইন্ধন ছিল বলে লে .জেনা. মোল্লা ফজলে আকবর মনে করেন না ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৪)।***

(৫২) ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের বর্ডারে পার্শ্ববর্তী দেশ কর্তৃক সেনা মোতায়েনের কোন তথ্য ডিজিএফআই এর কাছে ছিল না ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৪)।***

(৫৩) ঘটনার পর ডিজিএফআই ঘটনাটি মূল্যায়ন করেছে যেখানে ডিজিএফআই এর প্যারামিলিটারি উইংকে শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে এবং বিডিআরের ভিতরে ডিজিএফআই এর অ্যাক্সেস চাওয়া হয়েছে ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৪)।***

(৫৪) ঘটনার পূর্বে পিলখানা থেকে কোন অস্ত্র হারানোর তথ্য ডিজিএফআই এর কাছে ছিলনা ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৪)।***

(৫৫) বিডিআরের মত এত বড় প্যারামিলিটারি ফোর্স কাভার করার ক্ষমতা ডিজিএফআই এর ছিল না। ডিজিএফআই এর মাত্র ০২ জন অফিসার প্যারামিলিটারি ফোর্সসমূহের দায়িত্বে ছিল ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৪)।***

(৫৬) সেনাবাহিনীতে একটি অংশের এন্টি-ইন্ডিয়ান সেন্টিমেন্ট ছিল। ভারত স্বাধীনতায় সাহায্য করলেও পরবর্তীতে যে সব সুবিধা নিয়েছে, তাতে ক্ষোভ ছিল। বিডিআরের 'ডাল-ভাত কর্মসূচি' নিয়েও বিডিআর সদস্যদের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হয়েছিল, কারণ বিস্তারিত তথ্য সৈনিকরা জানতে পারেনি। ২১-২২ ফেব্রুয়ারি তারিখে ছড়ানো লিফলেটগুলো ইচ্ছেকৃতভাবে উস্কানিমূলক ছিল যাতে সাধারণ সৈনিকগণও ক্ষুব্ধ হয়। বিডিআর সদস্যরা সেনা অফিসারদের কমান্ডে তাদের স্বাধীনতা সীমিত মনে করত এবং বিভিন্ন কার্যকলাপ এর ক্ষেত্রে অফিসারদেরকে তারা অন্তরায় মনে করতে ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮)***

(৫৭) লে. জেনারেল মামুন খালেদ বিশ্বাস করেন কেবল ওয়েলফেয়ার বা ডাল-ভাত কর্মসূচির কারণে বিদ্রোহ হয়নি, হয়তোবা বাইরের উস্কানি ছিল। বিডিআর সদস্যদের আত্মবিশ্বাস, লিফলেটের ভাষা, রাজনৈতিক নেতাদের বাসায় যাওয়া এ সমস্ত ঘটনা উস্কানির প্রমাণ। ৪৬ ব্রিগেড প্রস্তুত ছিল, ট্যাংক এসেছিল, গান প্রস্তুত ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক সিদ্বান্তই কার্যকর হয়। যমুনার বৈঠকেই রাজনৈতিক সমাধান নির্ধারণ হয়েছিল ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮)***

(৫৮) ডিজিএফআই তথ্য পাচ্ছিল যে বিদ্রোহীরা জিগাতলার গেইট দিয়ে বিদ্যুৎ বন্ধ করে পালিয়ে যাচ্ছে এবং সেটা ব্রি. জেনা. মামুন খালেদ ডিজি ডিজিএফআইকে জানান। ডিএডি তৌহিদকে ডিজিএফআই গ্রেফতার করেনি, র‍্যাব গ্রেফতার করেছিল। যদি কেউ বলে আর্মি একশন নেয়নি কারণ ইন্টেলিজেন্স তথ্য দেয়নি এটা ভুল। সবাই জানত ভেতরে কী আছে এবং কী হচ্ছে। লে. জেনা. মামুন খালেদ বিশ্বাস করেন দ্রুত অপারেশন করলে ক্ষয়ক্ষতি কমানো যেত ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮)***

(৫৯) ব্রি. জেনা. ইমরুল কায়েসের ভাষ্য মতে ২৫ বা ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনি ডিজি ডিজিএফআই এর সঙ্গে পিলখানার কাছে এসেছিলেন এবং তার সঙ্গেই ফেরত যান। ২৬ ফেব্রুয়ারি ট্যাংকের সাথে আবার আবাহনী মাঠের কাছে আসেন। তিনি আম্বালা রেস্টুরেন্টেও কখনো ঢোকেননি এবং ব্রি. জেনা. মামুন খালেদের সাথেও তার দেখা হয়নি। তার দায়িত্ব ছিল ট্যাংকের সাথে থেকে অবজার্ভ করা *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৭)।*

(৬০) ব্রি. জেনা. ইমরুল কায়েসের ভাষ্য মতে শুরুতেই ব্যবস্থা নিলে ফল ভিন্ন হতে পারত। তিনি ডিজিকে কয়েকবার বলেছিলেন তাকে ট্যাংকসহ এগোতে দিতে। কিন্তু বারবার ডিজি ডিজিএফআই তাকে থামিয়েছেন। মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস বিশ্বাস করেন যে ট্যাংক ব্যবহার না করা একটি মারাত্মক ভুল ছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৭)।*

(৬১) ২০০৯ সালের ডিসেম্বরের প্রথম তারিখে মেজর মনির ১৬ ইস্ট বেঙ্গলে যোগদান করেন। যোগদানের পর পরই অধিনায়ক তাকে একটি খাম দেন যার ভিতরে মেজর মনিরের চাকরি থেকে টার্মিনেশন ও ডিসমিসাল অর্ডার ছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৫)।*

ঘ। <u>এনএসআই</u>

(১) বিডিআরের ভিতরে এনএসআই এর কোন ফিল্ড স্টাফ (এফএস) ছিল না। অন্য কোন বাহিনীর অভ্যন্তরেও এনএসআই এর কোন এফএস কাজ করে না। বিডিআরের নিজস্ব গোয়েন্দা ইউনিট ছিল এবং বিডিআর অন্য কোন গোয়েন্দা বাহিনীর কার্যক্রম পরিচালিত হতে দিত না। তাই পিলখানার ভিতরে কী হচ্ছে এ সম্পর্কে এনএসআই এর কাছে কোন তথ্য ছিল না। মেজর জেনারেল মনিরুল ইসলামের মতে বিডিআর বিদ্রোহ দমনের জন্য জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল এর বৈঠক আহ্বান না করা একটি মৌলিক ভুল ছিল।কাউন্সিল আহ্বান করলে সেখানে সশস্ত্র বাহিনীর মাধ্যমে বিদ্রোহ দমন করার বিষয়টি জোরালোভাবে উত্থাপিত হত বলে তিনি মনে করেন। তার মতে আর একটি মৌলিক ভুল ছিল বিডিআর বিদ্রোহীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে বিদ্রোহীরা পিলখানার অভ্যন্তরে হত্যাযজ্ঞ চালানোর উৎসাহ, সময় এবং সুযোগ পেয়ে যায়। এরপর রাজনৈতিক ভাবে সমাধানের নামে সময়ক্ষেপণের মাধ্যমে বিদ্রোহটি পুরোপুরি হত্যাযজ্ঞে রূপ নেয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৪)।*

(২) ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে বিডিআর কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের জন্য এনএসআই গোয়েন্দা একটি প্রতিবেদন পাঠায় যেখানে বিডিআর বিদ্রোহের আগাম কোন তথ্য উপাত্ত ছিল না *(সূত্রঃ জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা, সেগুনবাগিচা ঢাকা পত্র নং-গো/২৩৯/৪-২০০৯ (ভি), সংযোজনী-২৫)।*

(৩) বিডিআরের ভিতরে প্রবেশ করা বা তথ্য পাওয়া এনএসআই এর জন্য বন্ধ ছিল। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সামছুল আলম খান তখন ডিরেক্টর ইন্টারনাল ছিলেন। তাকে সরাসরি বলা হয়েছিল বিডিআরের কোনো বিষয় না লিখতে। ডিরেক্টর সিকিউরিটি ছিলেন পুলিশের নাজিবুর রহমান (গোপালগঞ্জের বাসিন্দা)। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পিলখানা ভিজিট উপলক্ষে তিনি নিরাপত্তা রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। কিন্তু নিজের মতামত না দিয়ে কেবল ডিজিএফআই রেফারেন্স করেছিলেন। এটা দুর্বল রিপোর্ট ছিল, যেখানে কোনো কার্যকর তথ্য ছিল না *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩০)।*

(৪) ২৫ ফেব্রুয়ারি সকালে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সামছুল আলম খান শিখা অনির্বাণে রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানকে রিসিভ করতে লাইনে দাঁড়িয়েছিলেন। সকাল ১০০০ ঘটিকার দিকে রাষ্ট্রপতি না আসার খবর পান এবং তাদেরকে অফিসে ফেরার নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি গাড়ি নিয়ে

জাহাঙ্গীর গেইট ক্রস করার পর ভারতের প্রতিনিধি নিরাজ শ্রীবাস্তব তাকে ফোন করে এবং জানতে চায় বিডিআরে কী হচ্ছে, ডিজি বেঁচে আছেন কি-না? ইতোপূর্বে প্রোটোকল মেনে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ সামছুল আলম খান জনাব নিরাজ শ্রীবাস্তবের সাথে পারিবারিক ডিনারেও গিয়েছেন। এক ডিনারে ডিজিএফআই এর দুইজন, এনএসআই এর ইন্টারনাল ও এক্সটার্নাল ডিরেক্টরসহ কয়েকজন ভারতীয় নাগরিকও ছিলেন। সেই ডিনারে নিরাজ শ্রীবাস্তব তাকে জিজ্ঞেস করে চালের ক্রাইসিস সত্ত্বেও মানুষ ক্যান্টনমেন্টমুখী হচ্ছে না কেন? অর্থাৎ আন্দোলনকে তারা ক্যান্টনমেন্টমুখী করতে চাইছিল। নিরাজ শ্রীবাস্তব স্পষ্ট করে বলে ক্যান্টনমেন্ট তো এখনও মঈন ইউ আহমেদ চালাচ্ছেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩০)।*

(৫) পিলখানায় অস্ত্র হারানোর তথ্য এনএসআই এর কাছে ছিল না। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সামছ এর ধারণা সরকার এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। তার বিশ্লেষণ হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী বাবার হত্যার প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন এজন্য আর্মিকে ভাঙ্গা দরকার ছিল। পাশাপাশি ভারতও প্রতিশোধ চেয়েছিল। শুরুতে হয়তো শুধু ডিজিকে সরানোর পরিকল্পনা ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩০)।*

(৬) ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এনএসআই এর এডি জনাব আসাদুজ্জামান পিলখানার বাইরে থেকে ভিতরের খবর সংগ্রহের চেষ্টা করলেও কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করতে পারেননি। বিডিআর বিদ্রোহ তদন্তে জনাব একেএম আসাদুজ্জামানকে Departmental Field Inquiry সেলের সদস্য করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানতে পারেন ফেব্রুয়ারি ২০০৯ প্রথম দিকে বিডিআর জওয়ানরা শেখ সেলিম এমপি, ব্যারিস্টার তাপস, এমপি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুন, জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি প্রমুখের সাথে যোগাযোগ করেছিল এবং শেখ সেলিম তখন আর্মি অফিসারদের প্রতি অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বলেছিলেন, 'জওয়ানরা দাবি আদায়ে দুই একজনকে মেরেও ফেললে সমস্যা নেই'। এছাড়া CID কর্মকর্তা আব্দুল কাহার আকন্দ মার্চ মাসের শেষদিকে (সম্ভবত ২৯ মার্চ) তাদেরকে (এনএসআই টিম) বলেন, 'বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনাকে ইসলামী জঙ্গিবাদীদের দিকে টার্ন করানো যায় কি-না?' *(সূত্রঃ এনএসআই সাক্ষী নং-১)।*

ঙ। <u>পুলিশ (পুলিশ/ডিবি/এসবি)</u>

(১) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সকাল সাড়ে নয়টার কিছু পরে ডিজি র‍্যাব আইজিপিকে ফোন করে জানান, 'বিডিআরে কিছু একটা সমস্যা হচ্ছে। তার বড় মেয়ের স্বামী ক্যাপ্টেন মাযহার, যিনি ডিজি বিডিআরেডিসি ছিলেন, তিনি আইজিপিকে ফোন করে জানান যে একজন বিডিআর সদস্য রাইফেল হাতে নিয়ে দরবার হলে প্রবেশ করেছে। আইজিপি পিলখানার বাইরে আম্বালা ইনে লাকায় অবস্থান করে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০১)*।

(২) রাত সাড়ে বারোটার দিকে বলা হয়, বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করতে চায়। তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুন, প্রতি মন্ত্রী কামরুল ইসলাম এবং আইজিপি নূর মোহাম্মদ পিলখানায় যান। বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমর্পণের একটা নাটক করে *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০১)*।

(৩) এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম, স্বরাষ্টমন্ত্রী সাহারা খাতুন এবং আইজিপি নূর মোহাম্মদ ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে পিলখানার ভিতরে ঢুকেছিলেন। তারা ওখানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে খালি গলায় চিৎকার করে তাদের পরিচয় দিচ্ছিলেন এবং জানাচ্ছিলেন যে তারা পরিবারদেরকে উদ্ধার করতে এসেছেন। যারা বাড়ির ভিতর ছিলেন তাদেরকে বের হয়ে আসতে অনুরোধ করেন। বাড়ির ভিতরে সবাই ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। দরজা জানালা লাগানো ছিল। কয়েকটি ফ্যামিলি বেরিয়ে আসে। আইজিপি নূর মোহাম্মদের মেয়েও বের হয়ে আসেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার দল কিছু ফ্যামিলিকে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। আইজিপি নূর মোহাম্মদ সেখানে গিয়েছিলেন মূলত তার নিজের মেয়েকে উদ্ধার করতে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তার দল কোয়ার্টার গার্ডে গিয়েছিলেন কি-না এ্যাডভোকেট কামরুলের তা স্মরণে নেই।

বিডিআর সদস্যরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এর কাছে কিছু অস্ত্র সমর্পণ করেন। কোয়ার্টার গার্ডে তারা কোন পরিবারের উপস্থিতি টের পাননি। অস্ত্র সমর্পণের বিষয়টি ছিল একটি নাটক *(সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০৪)।*

(৪) আইজিপির মতে এ ঘটনায় ভারতের সংশ্লিষ্টতা থাকতে পারে এবং সরকারের মধ্য থেকেও কেউ জড়িত থাকতে পারে। তার মতে এক বা একাধিক ব্যক্তি/সংগঠন এ ঘটনায় লাভবান হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশের কার্যকর কোনো ভূমিকা ছিল না। র‍্যাব বা পুলিশ কাউকে সরকার থেকে কোনো নির্দেশ দেওয়া হয়নি। হোম মিনিস্টার বা প্রধানমন্ত্রী কাউকে কিছু বলেননি *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০১)*

(৫) ঘটনাস্থলের নিকটে অবস্থনকারী পুলিশ অফিসারদের মাধ্যমে জনাব নাইম আহমেদ, পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, জানতে পারেন যে বিডিআর সদস্যরা বিডিআর কম্পাউন্ডের বিভিন্ন গেইট এবং ভবনের উপরে মেশিন গান এবং অন্যান্য ভারি ও মাঝারি অস্ত্র সস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পজিশন নিয়ে আছে এবং মাঝে মধ্যে এলোপাথারি গুলি বর্ষণ করে যাচ্ছে। তিনি পিলখানা এবং আশেপাশের এলাকাকে বিপজ্জনক এলাকা বিবেচনা করে সার্বিক নিরাপত্তার জন্য ট্রাফিক এবং জন চলাচল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ প্রদান করেন যাতে বিপজ্জনক এলাকার মধ্যে কোন যানবাহন বা লোকজন প্রবেশ করতে না পারে এবং একই সাথে আটকে পরা যানবাহন ও লোকজন সেখান থেকে চলে যেতে পারে। এছাড়া সম্ভাব্য সকল স্থানে লাউড স্পিকারের মাধ্যমে লোকজনদের তাদের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উপদেশ দেন *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০৩)।*

(৬) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিভিন্ন সময়ে পিলখানা হতে বিডিআর সদস্যদের যত্রতত্র গুলি বর্ষণের ফলে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত অবস্থায় ২৭ ব্যক্তি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ০১ জন কত্যর্বরত পুলিশ কনস্টেবল সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি হন। বর্ণিত ২৭ জন ব্যক্তির মধ্যে ০৩ জন মৃত্যুবরণ করেন *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০৩)।*

(৭) দুপুর আনুমানিক দেড়টার দিকে সাদা পতাকা নিয়ে পিলখানার ৪ নম্বর গেইটের সামনে তৎকালীন যুবলীগের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির নানক এবং হুইপ মির্জা আজম গমন করেন এবং বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের সাথে কথা বলেন *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০৩)।*

(৮) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ বেলা আনুমানিক ১৪৩০ ঘটিকায় লালবাগ থানাধীন বেড়িবাঁধ সংলগ্ন সুয়ারেজ লাইনের স্লুইস গেইটের মুখে এবং কামরাঙ্গিচর থানাধীন বুড়িগঙ্গার একটি শাখার খালে ০২ জন সেনা কর্মকর্তার মৃতদেহ পাওয়া যায় *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০৩)।*

(৯) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সকাল আনুমানিক ০৮০০ ঘটিকার সময় লালবাগ থানাধীন বেড়িবাঁধ সংলগ্ন সুয়ারেজ লাইনের স্লুইস গেইটের মুখ হতে ০১ জন সেনা কর্মকর্তার মৃতদেহ এবং কামরাঙ্গিচর থানাধীন স্লুইস গেইটের পশ্চিম পার্শ্ব হতে আরও ০৫ জন সেনা কর্মকর্তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০৩)।*

(১০) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখেও বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যগণ তাদের বিদ্রোহী কর্মকান্ডের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখে এবং ক্ষণে ক্ষণে গুলি বর্ষণ করতে থাকে। তবে বিকেল ৬ টার দিকে ডিএডি তৌহিদের নেতৃত্বে বিডিআর সদস্যরা আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়ে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুনের কাছে কিছু অস্ত্র এবং অস্ত্রগারের চাবি বুঝিয়ে দেন এবং আত্মসমর্পণ করেন। পিলখানার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর পরই পুলিশ অস্ত্রাগারের নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং সেখানে ডিএমপি স্পেশাল আর্মড ফোর্স (SAF) মোতায়েন করে *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০৩)।*

(১১) আত্মসমর্পণকারী বিডিআরের প্রায় ২০০ সদস্যকে নজরদারির মধ্যে রাখা হয় যাতে তারা পালাতে বা পুন:সংগঠিত হতে না পারে। অস্ত্র সম্পর্ণের পূর্বেই বহু বিদ্রোহী সদস্য ইউনিফর্ম খুলে সাদা পোশাকে পালিয়ে যায়। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্ত্র, গোলাবারুদ, গ্রেনেড উদ্ধার করে নিরাপদে অস্ত্রাগারে জমা করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয় যা ছিল একটি জটিল কাজ। রাতে অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার কাজে ফায়ার ব্রিগেডের ফ্লাড লাইট ব্যবহার করা হয়। সারা রাত উদ্ধারের পর পরের দিন (২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯) দিনের আলোতে দেখা যায় তখনও সিংহ ভাগ অস্ত্র-গোলাবারুদ সমগ্র পিলখানা এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কোন রকম বিরতি ছাড়াই অস্ত্র-গোলাবারুদ উদ্ধার কাজ অব্যাহত ভাবে চলতে থাকে। অস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রকারভেদ এবং সংখ্যা অনুযায়ী তালিকা করা হয় *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০৩)।*

(১২) ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সকাল ১০৩০ ঘটিকার সময় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন পিলখানায় আগমন করেন। ঐ দিন বেলা ১২২০ ঘটিকার সময় বিডিআর ১ নং গেইটের অনুমান ১০০ গজ পশ্চিমে ম্যানহোলের ঢাকনা খুলে ০১ জন সেনা কর্মকর্তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় এবং ডেইলি ফার্ম এর নিকট আরও ০১ জন সেনা কর্মকর্তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ১২৪৫ ঘটিকার সময় তল্লাশিকালে বিডিআর হাসপাতালের প্রশাসনিক ভবনের পাশে মর্চুয়ারির পশ্চিম পার্শ্বে ০১ টি গণকবর আবিস্কৃত হয়। উক্ত গণকবর খুঁড়ে মোট ৩৮ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় যার মধ্যে মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ (ডিজি বিডিআর)সহ ২৯ জনের মৃতদেহ সনাক্ত করা হয়। উদ্ধারকৃত সকল মৃতদেহের সুরত হাল প্রতিবেদন তৈরি এবং ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৩)।*

(১৩) ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ মৃতদেহ উদ্ধার কাজ অব্যাহত থাকাকালীন সময়ে ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়নের গ্যারেজ সংলগ্ন মাঠের দক্ষিণ পার্শ্বে ৩ টি গণকবরের মধ্য হতে ১০ জনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত মৃতদেহ গুলোর মধ্যে একটিকে ডিজি বিডিআরের স্ত্রী নাজনীন শাকিল বলে সনাক্ত করা হয়। উদ্ধারকৃত সকল মৃতদেহের সুরত হাল প্রতিবেদন তৈরি এবং ময়না তদন্তের জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে প্রেরণ করা হয় *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০৩)।*

(১৪) ফায়ার সার্ভিসের কন্ট্রোল রুম গণকবরসহ পিলখানার বিভিন্ন এলাকা থেকে সর্বমোট ৫৩ টি লাশ পাওয়ার খবর লিপিবদ্ধ করেছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৩)।*

চ। <u>অন্যান্য সংস্থার কার্যক্রম</u>

(১) **<u>রাষ্ট্রপতির কার্যালয়</u>**। পিলখানায় বিদ্রোহীদের হাতে সেনা অফিসারদের হত্যা ও তাদের পরিবারের নারী ও শিশুদের নির্যাতন প্রতিরোধে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে তৎকালীন সময়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতির সাথে প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয় ও সশস্ত্রবাহিনী বিভাগ থেকে কোন যোগাযোগ করা হয়েছিল কি-না বা মাহমান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কোন পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল কি-না এ সংক্রান্ত কোন তথ্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের জন বিভাগে সংরক্ষিত নেই *(সূত্রঃ রাষ্ট্রপতির কর্যালয় স্মারক নম্বর ০১.০০.০০০০.০০৯.৩৭.০১১.২৩-৩৯১ তারিখ ১৪ অক্টোবর ২০২৫ সংযোজনী-২৬)।*

(২) **<u>মন্ত্রী পরিষদ বিভাগ</u>**। ০২ মার্চ ২০০৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মন্ত্রীসভার বৈঠকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সংঘটিত হত্যাকান্ডে শাহাদাত বরণকারীদের জন্য একটি শোক প্রস্তাব গ্রহণ ব্যতীত ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানায় সংঘটিত হত্যাকান্ড এবং বিডিআর বিদ্রোহ সংক্রান্ত বিষয়ে তৎকালীন মন্ত্রিসভা-বৈঠকে কোন উপস্থাপনা আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি ***(সূত্রঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, রেকর্ড শাখা পত্র নং ০৪.০০.০০০০.৩২২. ৩১.০৩৫.২৩.১৬.৩২ তারিখ ১৮ জুন ২০২৫, সংযোজনী-২১)।***

(৩) **<u>স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়</u>**

(ক) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন সচিব জনাব আব্দুল করিমের ভাষ্য মতে তিনি ডিজিএফআই, এসবি এবং এনএসআইয়ের যেসব রিপোর্ট পেতেন সেগুলোতে বিডিআরের অসন্তোষের বিষয়ে কোন তথ্য ছিল না। ২০০৯ সালে বিডিআরের ঘটনা যখন ঘটে, তখন তিনি অস্ট্রেলিয়ায় একটি অফিশিয়াল মিটিং এ বাংলাদেশের ডেলিগেশন লিডার হিসেবে ছিলেন। বিডিআর সপ্তাহের তারিখ কয়েকবার পরিবর্তন হওয়ায় বিডিআর প্যারেডে তিনি অংশগ্রহণ করতে পারেননি। পিলখানা ঘটনার সংবাদ শুনে তিনি প্রথম Available ফ্লাইটে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ঢাকায় ফিরে আসেন ***(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-২)।***

(খ) ঘটনার আগে বিডিআরের ভেতরে অসন্তোষের কোনো রিপোর্ট তিনি পাননি। ডাল-ভাতের আর্থিক হিসাব জেনারেল শাকিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে দিয়েছিলেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সেটি অনুমোদন করে। প্রফিটের যে অংশ ছিল তা বিতরণের অনুমোদনও দেওয়া হয়েছিল। ইলেকশনের সময় বিডিআরের সদস্যদের টাকা পরিশোধের ব্যাপারেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছিল ***(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-২)।***

(গ) তৎকালীন ডিজির স্ত্রীর অর্থপাচার সম্পর্কে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিজি বিডিআরকে জিজ্ঞাসা করেছিল। প্রচারিত সংবাদটি মিথ্যা বলে তিনি অবহিত করেন। তবে এ সংক্রান্ত কোনো অভিযোগ বা প্রতিবেদন কোনো সংস্থা বা দপ্তর থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পায়নি। ডিজির স্ত্রীর বা অন্য কোনো অফিসারের অনৈতিক জীবন-যাপন সম্পর্কে এনএসআই, ডিজিএফআই, এসবি বা অন্য কোনো দপ্তর/সংস্থা থেকে কখনো কোনো অভিযোগ বা প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি ***(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-২)।***

(ঘ) ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানায় বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা তদন্তে প্রথমে সরকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুনকে আহ্বায়ক করে একটি কেবিনেট পর্যায়ের তদন্ত কমিটি গঠন করে। পরবর্তীতে এই কমিটি বাতিল করে সাবেক সচিব আনিস-উজ-জামান খানকে আহ্বায়ক করে ১২ সদস্যের আরেকটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় ***(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-১)।***

(ঙ) ০১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ থেকে জনাব গোলাম হোসেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অতিরিক্ত সচিব হিসাবে কর্মরত ছিলেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ থেকে এক সপ্তাহের সরকারি কর্মসূচির আওতায় স্বরাষ্ট্র সচিব জনাব মোঃ আবদুল করিম অস্ট্রেলিয়ায় গেলে সচিবের অনুপস্থিতিতে জনাব গোলাম হোসেন সচিবের রুটিন দায়িত্ব পালনের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হন ***(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-১)।***

(চ) ঘটনা চলাকালীন সময়ে জনাব গোলাম হোসেন সরাসরি কেবিনেট সচিব ও প্রধানমন্ত্রীর সচিবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেন। প্রধানমন্ত্রীর সচিবের কাছ থেকে জানতে পারেন যে, পিলখানার বিদ্রোহের বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজেই দেখছেন ***(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-১)।***

(ছ) জনাব গোলাম হোসেন বিভিন্ন বিডিআর স্থাপনায় জওয়ানদের মধ্যে দ্রুত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ার খবর পাচ্ছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে বিডিআর জওয়ানরা নিজেদের মধ্যে সংগঠিত হওয়ায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সমাবেশ করে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা-বিবৃতি দিতে থাকে। একাধিক জওয়ানকে গুলি করে হত্যা করার মিথ্যা খবর রটনা সকাল থেকেই চলছিল। তিনি কর্মরত অফিসারদের প্রয়োজনে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যেতে পরামর্শ দেন। বিকাল

নাগাদ কোন কোন স্টেশন থেকে উত্তেজনার মাত্রা অতিক্রান্ত হবার খবর আসতে থাকে। সন্ধ্যা নাগাদ সাতক্ষীরা, রামুসহ কয়েকটি স্টেশনে জওয়ানদের অস্ত্রাগার লুট করে দলবেঁধে ব্যারাকের বাইরে ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে বেরিয়ে যাবার খবর আসতে থাকে। সন্ধ্যা নামলে বিদ্রোহীরা দল বেঁধে স্থাপনা ত্যাগ করার প্রবণতা বাড়তে পারে মর্মে খবর আসতে থাকে। রাত ২০০০ ঘটিকায় সারাদেশে বিডিআরের ৩৮/৩৯টি স্থাপনার মধ্যে ১৮টি থেকে জওয়ানরা অস্ত্রাগার লুট করে গোলাবারুদ নিয়ে দলে দলে বেরিয়ে যাওয়ার খবর আসে ***(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-১)।***

(জ) পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণের জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কয়েকটি সিদ্ধান্ত শাহাবাগস্থ পুলিশ কন্ট্রোলরুমের মাধ্যমে সকল বিভাগীয় কমিশনার, ডিসি ও এসপিদেরকে জানানো হয়। বিজিবি জওয়ানদের স্থাপনা ত্যাগ করতে না দিতে এবং প্রত্যেকটি স্থাপনায় শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় সম্ভাব্য সকল জরুরি ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ প্রদান করা সম্বলিত একটি জরুরি বার্তা তৈরি করে। রাত ২২০০ ঘটিকার মধ্যে সকল সকল ডিসি ও এসপির নিকট পৌঁছানো হয় ***(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-১)।***

(জ) তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আইএসপিআর এর মাধ্যমে নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচারের **উদ্যোগ নেয়া হলে বিলম্বে হলেও জনসাধারণের নিরপেক্ষ সংবাদ পাওয়ার সুযোগ ঘটতো। তবে, হত্যাকান্ডের শুরু থেকেই ইলেকট্রোনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণহীনভাবে সংবাদ পরিবেশন করতে থাকে। তাদের মধ্যে ন্যূনতম স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণের** (self-censorship) **লক্ষণ ছিল না** ***(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-১)।***

(৪) **<u>তথ্য অধিদপ্তর ও গণমাধ্যমের কার্যক্রম</u>। নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচারের জন্য** সরকার কোনো নির্ভরযোগ্য ব্রিফিং দেয়নি। তথ্য মন্ত্রণালয়, পুলিশ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, আইএসপিআর কেউই কিছু বলেনি। সাংবাদিকরা পুরোপুরি বিভ্রান্ত অবস্থায় কাজ করেছে। পিলখানার ঘটনার কভারেজের দুইটি অংশ। প্রথম দিনে শুধুমাত্র বিদ্রোহীদের বক্তব্য প্রচার, পরদিন ভুক্তভোগীদের বক্তব্য প্রচার। এই দুই ক্ষেত্রে সাংবাদিকতার নীতিমালার, নৈতিকতার বিষয়টি আরো গভীরভাবে অনুসরণ করা উচিত ছিল ***(সূত্রঃ সাংবাদিক সাক্ষী নম্বর-১)।*** সরকারের কোনো মন্ত্রণালয় থেকে কোনো নির্দেশনা সাংবাদিকদের দেয়া হয়নি। বরং সাংবাদিকরা বিভিন্ন সময়ে সরকারের বক্তব্য জানতে চেয়ে ব্যর্থ হয়েছি। মুন্নি সাহার রিপোর্টিংকে ঘিরে জনমত তৈরি হয়েছিল, যেটা পরবর্তীতে ভুল প্রমাণিত হয় ***(সূত্রঃ সাংবাদিক সাক্ষী নম্বর-৩)।*** **২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে এটিএন বাংলার** বার্তা কক্ষে আইএসপিআর একটি প্রেস রিলিজ আসে প্রেস রিলিজ থেকে তারা বুঝতে পারেন যে বিডিআর সদস্যদের কিছু দাবি দাওয়া আছে। ওনাদের দারি-দাওয়া নিয়ে সরকার কথা বলতে রাজি আছে এবং তাদেরকে শান্ত থাকতে বলা হয়। মুন্নি সাহা বিডিআরের একজন জেসিওর মেয়ের সাক্ষাৎকারে উস্কানিমূলক প্রশ্ন করেছিলেন এর উত্তরে তিনি বলেন মহিলা ইন্টারভিউ দেয়ার আগে বারবার এইসব হ্যারাসমেন্টের কথা বলছিলেন। ইন্টারভিউটি অল্পকথায় সংক্ষেপ করার জন্য, ওনার বক্তব্য বলার জন্য তিনি তাকে প্রশ্ন করেছেন। বিডিআর হত্যাকান্ডের বিষয়টি তিনি আগে থেকেই জানতেন কি-না এর জবাবে মুন্নী সাহা বলেন, ‘কে বা কারা এমন ধারণা করেন, তারা কেন করেন তার উত্তর আমি কিভাবে দেবো? আমি জানি যে আমি এ ঘটনাটা কাভার করেছি মাত্র। তাও আকস্মিক। আমি এর বিন্দু বিসর্গ কিছুই জানতাম না। আর অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে এর পরবর্তিতে কী ধরনের sensitivity হতে পারে, সেটাও বুঝিনি। ধারণা তো ধারণা। যারা ধারণা করেন, তারা ভাল বলতে পারবেন। আর আমি ধারণা করি যে যারা এখন এমনটা ধারণা করছেন, তারা হয়তো আমাকে কোনো কারণে অপছন্দ করেন বা ঈর্ষা করেন। এর চেয়ে বেশি কিছু আমার বলার নেই’ *(সূত্রঃ সাংবাদিক সাক্ষী নম্বর-০২)।* এটিএন বাংলার আরো একজন সাংবাদিক জ ই মামুন বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের টেলিফোনে ধারণকৃত সাক্ষাৎকার নিউজ রুম হতে সরাসরি সম্প্রচার করেছেন *(সূত্রঃ এটিএন বাংলার ভিডিও ফুটেজ, সংযোজনী-১৮)* ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বিডিআর হত্যাকান্ডে

তৎকালীন সরকার ও শেখ হাসিনার ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করা হয়। প্রথম আলো প্রকাশিত একই দিনের আরো একটি প্রবন্ধে আসিফ নজরুল (বর্তমান আইন উপদেষ্টা) বিডিআর হত্যাকান্ডে শেখ হাসিনার ভূমিকা প্রশংসা করেন। তিনি প্রবন্ধে লিখেছেন যেসব এমপি বিডিআর বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন তাদের পুরষ্কার স্বরূপ মন্ত্রী সভায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত *(সূত্রঃ প্রথম আলো ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, সংযোজনী-২৭)।* ১২ মার্চ ২০০৯ তারিখে দি ডেইলি স্টার প্রত্রিকায় 'Terror struck back at its buster'. শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে কোন নির্দিষ্ট সূত্র উল্লেখ না করে বলা হয় যে, বিডিআর হত্যাকান্ডে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার সুস্পষ্ট চিহ্ন আছে। প্রতিবেদনে সূত্র উল্লেখ না করে আরো বলা হয় জঙ্গিরা (Terror elements) সাম্প্রতিক বছর গুলোতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিডিআরে অনুপ্রবেশ করেছে *(সূত্রঃ দি ডেইলি স্টার ১২ মার্চ ২০০৯, সংযোজনী-২৮)।*

(৫) **<u>প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়</u>**। বিডিআর বিদ্রোহের তথ্য রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করা হয়নি যা প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়য়ের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে *(রাষ্ট্রপতির কর্যালয় স্মারক নম্বর ০১.০০.০০০০.০০৯. ৩৭.০১১.২৩-৩৯১ তারিখ ১৪ অক্টোবর ২০২৫ সংযোজনী-২৬)।*

(৬) **<u>প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং</u>**। ২৫ বা ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং থেকে সাংবাদ মাধ্যমের জন্য কোন প্রেস রিলিজ দেওয়া হয়নি। ***(সূত্রঃ সাংবাদিক সাক্ষী নম্বর-১)।***

(৭) **<u>ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর</u>**। পিলখানা ঘটনার সংবাদ শোনার পর পরই ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের তৎকালীন ডিজি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবু নাঈম মোঃ শাহিদউল্লাহ পুলিশ সদর দপ্তরে চলে আসেন যাতে করে পুলিশের পক্ষ থেকে পরবর্তী কার্যক্রম কী হচ্ছে তা জেনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৩)।* ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি ও জনবল পিলখানার ভিতরে প্রবেশ করে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬০)।* ২৭ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা পিলখানায় লাশ উদ্ধার সনাক্তকরণ এবং পুলিশ/সেনাবাহিনীর কাছে হস্তান্তর করার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৩)।*

৫০। <u>ঢাকার বাইরে বিদ্রোহ</u>

ক। ২৫ ফেব্রুয়ারির বিডিআর বিদ্রোহের খবর বিডিআরের নিজস্ব রেডিও, বিদ্রোহীদের মোবাইল, তাদের আত্মীয়-স্বজন সর্বোপরি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এর লাইভ প্রচারের কারণে দ্রুত ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বিডিআর সেক্টর, ব্যাটালিয়ন, ক্যাম্প ও ফাঁড়িগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তা ২৬ ফেব্রুয়ারিতেও অব্যাহত থাকে। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি এ দু'দিনে ঢাকার বাইরে মোট ৩৬ টি ক্যাম্প/ব্যাটালিয়ন/সেক্টরে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে ***(সূত্রঃ ২০০৯ সালের জাতীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা-৪১, সংযোজনী-২৯)।***

খ। সেনাবাহিনী আক্রমণ করতে আসছে- এই ধরণের মিথ্যা খবর ছড়িয়ে পড়লে সেনা কর্মকর্তাদের জিম্মি করে জোয়ানরা অস্ত্রাগারের নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং গোলাগুলি শুরু করে। কোন কোন ক্ষেত্রে নিরস্ত্র সেনা অফিসারগণ প্রাণ রক্ষার্থে পালাতে বাধ্য হন। বিদ্রোহীরা বিভিন্ন সড়ক ও মহাসড়কে গাছ কেটে ফেলে ব্যারিকেড তৈরি করে, যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দেয়। আশে-পাশের জনগণকে মাইকিং করে সর্তক করে ***(সূত্রঃ ২০০৯ সালের জাতীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা-৪১)।***

গ। খুলনায় বিডিআর বিদ্রোহীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের পক্ষে স্থানীয় জনগণ মিছিল করে ও শ্লোগান দেয়। সাতকানিয়ায় বিডিআর বাইতুল ইজ্জত ট্রেনিং সেন্টারে গোলাগুলিতে তিন জন বিডিআর সদস্য আহত হয়। টেকনাফেও বিডিআর বিদ্রোহীরা গোলাগুলি করে। নওগাঁয় সেনাবাহিনীর আক্রমণের গুজবে কান না দিতে বিডিআর কর্মকতারা মাইকিং করে। সিলেটের আখালিয়া বিডিআর হেডকোয়ার্টারের সামনে সিলেট-সুনামগঞ্জ সড়কে কয়েকটি গাড়িতে বিদ্রোহীরা অগ্নিসংযোগ করে। রাঙামাটি ও শেরপুরে বিভিন্ন

পর্যটন স্পটে পর্যটকদের গাড়ি প্রবেশে বাঁধা দেওয়া হয় *(সূত্রঃ ২০০৯ সালের জাতীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা-৪১)।*

ঘ। রাজশাহীতে ৩৭ রাইফেল বাট্যালিয়নের বিদ্রোহীরা ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে অনবরত গুলিবর্ষণ করে বিদ্রোহে অংশ নেয়। গুলিতে মফিজ উদ্দিন নামের একজন রিক্সাচালক আহত হয়ে রাজশাহী মেডিকেলে ভর্তি হয়। যশোরে ১১ রাইফেল বাট্যালিয়নে সকালে বিদ্রোহীরা তালা ভেংগে কোতের দখল নেয়। বিদ্রোহীরা ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল হাফিজ ও মেজর মাহবুবকে জিম্মি করে। ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে (২২৩০ ঘটিকা নাগাদ) টেকনাফ ৪২ রাইফেল ব্যাটালিয়নে বিদ্রোহ হয় এবং একতরফা গুলিবর্ষণ গভীর রাত পর্যন্ত চলে। সেনা কর্মকতারা নিরাপদে ক্যাম্প থেকে সরে যেতে সক্ষম হন। পঞ্চগড় ২৫ রাইফেল ব্যাটালিয়নের বিদ্রোহীরা কয়েক শ' রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুঁড়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং পঞ্চগড়-ঢাকা মহাসড়কে যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে দিনাজপুরে বিডিআর হেডকোয়ার্টারে চেইন অভ্ কমান্ড ভেঙ্গে যায়। তারা দিনাজপুর সেক্টরে কর্মরত সহকারী পরিচালক মো. বেলাল হোসেন ও ২ রাইফেল ব্যাটালিয়নে কর্মরত উপ সহকারী পরিচালক মোঃ মোবারক হোসেনকে যথাক্রমে ভারপ্রাপ্ত সেক্টর কমান্ডার ও ভারপ্রাপ্ত ব্যাটালিয়ন কমান্ডার নিয়োগ করে। দিনাজপুরে বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্য থেকে ভারপ্রাপ্ত সেক্টর কমান্ডার ও ব্যাটালিয়ন কমান্ডাবের নাম ঘোষণা করে। দিনাজপুরে বিদ্রোহীরা নিজেদের মধ্য থেকে ভারপ্রাপ্ত সেক্টর কমান্ডার ও ব্যাটালিয়ন কমান্ডারের নাম ঘোষণা করে *(সূত্রঃ ২০০৯ সালের জাতীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা-৪১)।*

ঙ। যশোরের ঝুমঝুমপুরের ২২ ব্যাটালিয়নের বিদ্রোহীরা ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে অস্ত্রগার লুট করে। সাতক্ষীরার কৈখালি সীমান্ত থেকে কুষ্টিয়ার চিলমারি পর্যন্ত ৬১২ কি. মি. সীমান্ত অরক্ষিত রেখে বিদ্রোহীরা সরে আসে। বিদ্রোহীরা ভোমরা স্থল বন্দরে অবস্থান নেয়, বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। নওগাঁয় ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। একই দিন রাত ১২ টায় ১২ রাউন্ড গুলি বর্ষণের মধ্য দিয়ে চুয়াডাঙ্গা ৩৫ রাইফেল ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা বিদ্রোহ করে হাতে অস্ত্র তুলে নেয়। নেত্রকোণা-ময়মনসিংহ মহাসড়ক গাছ ও বালুর বস্তা ফেলে বন্ধ করে দেয় বিদ্রোহীরা। নাইক্ষ্যংছড়িতে ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে দফায় দফায় গোলাগুলির শব্দ শোনা যায়। সেনাবাহিনী বান্দরবন জেলা সদর বিডিআর ক্যাম্প ঘেরাও করে রাখলেও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। ঝিনাইদহ জেলার ৮টি বিডিআর ক্যাম্পের জওয়ানরা পার্শ্ববর্তী এলাকায় যান চলাচল বন্ধ করে দেয়। এখানে সকাল ১০টা থেকে থেমে থেমে গুলি বর্ষণ হতে থাকে। ফেনীর জয়লস্কর বিডিআর ক্যাম্পে কয়েকশ রাউন্ড গোলাগুলি হয়। ফেনী-মাইজদি সড়ক গাছ ফেলে বন্ধ করে দেয়া হয়। রামগড়ে বিডিআর সেক্টরে থেমে থেমে গুলি বর্ষণ হয়েছে। সিলেটে আখালিয়া বিডিআর সদর দপ্তরের জওয়ানরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে ব্যারাকের বাইরে অবস্থান নেয়। কুড়িগ্রাম বিডিআর ক্যাম্পে জওয়ানরা ফাঁকা গুলি বর্ষণের পাশাপাশি ক্রাম্প এলাকার সকল রাস্তা বন্ধ করে দেয়। ২৭ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সিওকে জিম্মি করে। ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় কয়েক রাউন্ড ফাঁকা গুলি বর্ষণ করে বিদ্রোহ ঘোষণা করে সাতক্ষীরার ৪১ ও ৭ রাইফেল ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা। ভোমরা স্থল বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয় *(সূত্রঃ ২০০৯ সালের জাতীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের পৃষ্ঠা-৪১)।*

চ। লে .কর্নেল এ এম মোশারফ হোসেন (অবঃ) এর ভাষ্য মতে সেনাবাহিনীর বান্দরবান রিজিয়ন ও জোন ২৬ ফেব্রুয়ারি নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ড পরিচালনা করেঃ

(১) বান্দরবান শহরে অবস্থিত বিডিআর ক্যাম্প নিয়ন্ত্রণ।

(২) বাইতুল ইজ্জতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা এবং ভিতরে যে দুইজন অফিসার পরিবার ছিল তাদেরকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে।

(৩) নাইক্ষ্যংছড়ি ১৫ রাইফেল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ককে তার আটক অবস্থা থেকে উদ্ধারের ব্যবস্থা করে।

(৪) বলিপাড়া ব্যাটালিয়নের তখন হস্তান্তরফেব্রুয়ারি ২৬ গ্রহণরত দুই জন অধিনায়ক ছিলেন।/ রাত০০০০ ঘটিকার দিকে তাদেরকে উদ্ধার করা সম্ভব

(৫) আমতলী ও হলুদিয়ায় অবস্থানরত বিডিআর সদস্যদেরকে নিরাপত্তা প্রদান করেন।

(৬) বান্দরবান-কেরানীরহাট রাস্তা চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করেন।

(৭) নীলগিরি ক্যাম্পে অবস্থিত বিডিআর সদস্যদের নিস্ক্রিয় ও যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করেন।

(৮) বর্ডার আউট পোস্টে (শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামে) বিওপিতে তরুন সেনা কর্মকর্তাদের আভিযানিক নেতৃত্বের জন্য সংযুক্ত রাখা হত। বান্দরবান জোন তাদেরকেও উদ্ধার করে নিকটস্থ সেনা ক্যাম্পে নিয়ে আসতে পেরেছিল।

(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২৬)।

ছ। বিএ-২৮৩৫ মেজর খান মুহাম্মদ আলাউদ্দিন ২০০৯ সালে রাজনগর, লংগদু এ ১২ রাইফেল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার অভিজ্ঞতা নিম্নরূপঃ

(১) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ঘটনার দিন সকালে প্রায় সাড়ে আটটা-ন'টার সময় বিডিআর রাঙ্গামাটির সেক্টর জিএসও-২ মেজর সোয়েব ফোন করে তাকে জানায় তখনকার সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মোয়াজ্জেম ঢাকা পিলখানা হতে তাকে ফোনে জানিয়েছে যে, পিলখানায় খুব ভয়ানক অবস্থা, সৈনিকরা অফিসারদেরকে হেনস্তা করছে, বাইরে গোলাগুলি হচ্ছে এবং আগুন দেখা যাচ্ছে। মেজর আলাউদ্দিনকে বলা হয় 'টেক কেয়ার অভ্ ইওর আর্মস এন্ড অ্যামুনিশন এন্ড অফিসারস্।'

(২) সকাল ০৯৩০ ঘটিকার দিকে ডিএডি তৌহিদের সাথে একবার মেজর আলাউদ্দিনের যোগাযোগ হয়। ডিএডি তৌহিদ জানিয়েছিলেন তারা কয়েকজন অফিসার মিলে এক বিল্ডিংয়ের ছাদে লুকিয়ে আছে, সেখানে গোলাগুলি ও হেনস্থা হচ্ছে।

(৩) বিকেল তিনটার এদিকে বিষয়টি প্রথম ব্যাটালিয়নে উপস্থিত সকল পদবির সদস্যদের ফলইন করে মেজর আলাউদ্দিন অবগত করান। সবার মাঝে তিনি একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। সবাই তখন বলে সেনাবাহিনীর কোনো টহল ও হেলিকপ্টার যেনো তাদের এলাকায় না আসে। এরপর সবাই টিভি দেখার আবদার করলে মেজর আলাউদ্দিন অনুমতি দেন। টিভিতে পিলখানার বিডিআর সৈনিকদের উদ্ধত কার্যকলাপের ভিডিও দেখে যেভাবে উপস্থিত বেশিরভাগ সৈনিক আনন্দ উল্লাস করছিল, তা অফিসারদের মাঝে ভীতির সঞ্চার করেছিল। রাতের বেলা মেজর আলাউদ্দিন মেস এ ছিলেন এবং অনুভব করছিলেন চারিদিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন ছলচাতুরি ও বিভ্রান্তিকর পদ্ধতি ব্যবহার করে রাত পার করেন এবং সারারাত নানা স্থানে যে সব মুভমেন্ট হচ্ছিল তা লক্ষ্য করেন।

(৪) ২৬ ফেব্রুয়ারি সকালে মেজর আলাউদ্দিন অফিসে বসে থাকাকালীন সময়ে সেনা রিজিয়ন কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার সোহেল ফোন করে মেজর আলাউদ্দিনকে নির্দেশ দেন তিনি যেন ব্যাটালিয়ন ছেড়ে সমস্ত অফিসারদেরকে নিয়ে লংগদু আর্মি ক্যাম্পে চলে যান। এরপর পর পরই মেজর আলাউদ্দিন শুনতে পান যে টিভি রুমে বসা সৈনিকরা অস্ত্র তুলে নেয়ার জন্য কোতের দিকে যাচ্ছে। তিনি মেজর মুহিবকে তাঁর পরিবারকে সামলাতে বলে কোতের দিকে দৌঁড়ে যান। তিনি পৌঁছানোর পূর্বেই কোত এনসিও কোত খুলে অস্ত্র বের করে দেয়ার জন্য রেডি করছিল। মেজর আলাউদ্দিন দরজা বন্ধ করার নির্দেশ দেন। এরমধ্যে সৈনিকরা কোতে মেজর আলাউদ্দিনকে দেখে প্রচন্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, গালাগালি করে এবং তাকে সরানোর চেষ্টা করে। মেজর আলাউদ্দিন দৃঢ়ভাবে বলেন যে তার উপস্থিতিতে সেখানে কিছু করা যাবে না। পরিস্থিতি তখন খুব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেসময় কোতে দায়িত্বরত গার্ড কমান্ডার মেজর আলাউদ্দিনের পক্ষে কথা বলে উগ্র সৈনিকদের নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। এসময় মেজর আলাউদ্দিন খেয়াল করেন যে গার্ড কমান্ডার তার এসএমজিটা টেবিলে রেখে উত্তেজিত সৈনিকদের থামাতে চেষ্টা করছে। তিনি দেরি না করে দ্রুতই এসএমজিটি হাতে নিয়ে লোড করেন এবং উগ্র সৈনিকদের সামনে মাটির দিকে তাক করে দুইটা সর্ট বার্স্ট ফায়ার করেন। তিনি সকলকে হুঁশিয়ার করে বলেন, 'কেউ অস্ত্র নেয়ার জন্য সামনে এগোনের চেষ্টা করলে তাকে আস্ত রাখব না, মেরে ফেলতেও পিছপা হবো না, কাউকেই যেতে দেব না।' এতে তারা ভয় পেয়ে

দূরে সরে যায়। সুবেদার মেজর প্রথমে নীরব থাকলেও পরে সক্রিয় হয়ে সৈনিকদের রোল কলের জন্য নির্ধারিত স্থানে জমায়েত হবার জন্য যেতে বলেন। বেশিরভাগ সৈনিক চলে গেলেও বেশ কয়েকজন তখনও বাকবিতন্ডা করে যাচ্ছিলো। পরে আস্তে আস্তে সবাই চলে যায়। তখন ব্যাটালিয়ন সদরে মোট আনুমানিক ১৫০-২০০ জনের মত সৈন্য হাজির ছিল। এর মধ্যে বেশিরভাগই ছিল ভলিবল টিমের খেলোয়াড়। মারিশ্যায় অবস্থিত ৯ রাইফেল ব্যাটালিয়নের ডিএডি প্যারিস, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের বিডিআর ব্যাটালিয়ন গুলোর সৈনিকদেরকে উত্তেজিত ও উচ্ছৃঙ্খল করার জন্য সবচেয়ে বেশি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছিলো।

(৫) সন্ধ্যার পর প্রায় রাত ৯টার দিকে ওয়্যারলেসে মেজর আলাউদ্দিনকে জানানো হয় রিজিয়ন কমান্ডার তার সাথে কথা বলবেন। সেখানে বিডিআর রাঙ্গামাটি সেক্টরের অন্য চারটি ব্যাটালিয়নের অধিনায়কগণও যুক্ত ছিলেন। ব্রিগেডিয়ার সোহেল সে সময় ডিএডি ও এসএমদের জানান সকল সেনা অফিসারদের ছেড়ে দিতে হবে এবং তখন থেকে তারাই কমান্ড এক্সারসাইজ করবে এবং সৈনিকদের কমান্ড করবেন। এই আদেশ আসার পর হতেই বলা যায় মেজর আলাউদ্দিন ব্যাটালিয়নের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন। এরপর রিজিয়ন কমান্ডার নির্দেশ দেন অফিসার ও তাদের পরিবারদের নিরাপদে নিকটস্থ আর্মি ক্যাম্পে পৌঁছে দিতে। এরপর মেজর আলাউদ্দিন মেসে চলে যান।

(৬) ২৭ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার মেজর আলাউদ্দিন জুমার নামাজ শেষে অপস্ অফিসারের পরিবারসহ লংগদু সেনা ক্যাম্পে চলে যান।

(৭) বিডিআর হত্যা পরিকল্পনায় ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের ডিএডি নাসির মূল নেতৃত্বে দিয়েছিল বলে মেজর আলাউদ্দিন জানতে পারেন। তাকে ঘিরে বিভিন্ন আলোচনা হতো এবং মেজর হাফিজ নামে একজন অফিসারের নামও তিনি শুনতে পান যিনি ডিএডি নাসিরের সঙ্গে প্রায়ই যোগাযোগ ও দেখা করতেন।

(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৭৪)।

৫১। <u>উদ্ধার কার্যক্রম।</u>

ক। <u>বিডিআরে আটককৃত সেনাবাহিনী অফিসার পরিবারবর্গের উদ্ধার</u>।

(১) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ১৩০০ ঘটিকার দিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পিলাখানায় প্রবেশ করেন এবং কয়েকটি জিম্মি পরিবার তাঁর সাথে বের করে আনেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৬)।***

(২) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ আনুমানিক ১৪৪০ ঘটিকায় আটককৃত/জিম্মি অফিসার ও তাদের পরিবারবর্গ ক্রমান্বয়ে বেরিয়ে আসতে থাকেন। এ সময় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তালিকা করে বিভিন্ন অফিসার ও তাদের পরিবারবর্গের নাম বিডিআরের ভিতরে দিতে থাকেন। এ সময় বেশ কিছু অফিসার ও পরিবারবর্গ জিম্মিদশা থেকে মুক্তি পান ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৫)।***

(৩) ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ১৬০০ ঘটিকায় লে. কর্নেল শামসকে সুবেদার ইসমাইলের বাসা থেকে আনতে একটি পিকআপ যায়। তখন এমপি রেজা একটি পাজোরো জিপ নিয়ে ঐখানে আসেন এবং লে. কর্নেল শামস্ ঐ গাড়িতে করে চলে আসেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৬)।***

(৪) **মেজর মনিরুল ইসলামকে জনাব গোলাম রেজা, এমপি দরবার হলের ফলস সিলিং এর উপর থেকে উদ্ধার করেন** ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯২)।***

৫২। **প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ ও আল্টিমেটাম।** ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের পর বিডিআর বিদ্রোহী সদস্যদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন প্রধানমন্ত্রী। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ বিডিআর বিদ্রোহীরা অস্ত্র সমর্পণ না করলে প্রধানমন্ত্রী ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ১৪০০ ঘটিকার মধ্যে বেতার ও টিভিতে বিডিআর বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন। নতুবা কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করার আল্টিমেটাম দেন ***(সূত্রঃ ভিডিও ফুটেজ, সংযোজনী-১৮)।***

৫৩। **বিডিআর সদস্যদের পলায়ন।** অস্ত্র সম্পর্ণের পূর্বেই বহু বিদ্রোহী সদস্য ইউনিফর্ম খুলে সাদা পোশাকে পালিয়ে যায়। আত্মসমর্পণকারী বিডিআরের প্রায় ২০০ সদস্যকে নজরদারির মধ্যে রাখা হয় যাতে তারা পুনঃসংগঠিত না হতে পারে এবং পালাতে না পারে। বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অস্ত্র, গোলাবারুদ, গ্রেনেড উদ্ধার করে নিরাপদে অস্ত্রাগারে জমা করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়, যা ছিল একটি জটিল কাজ *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০৩)।*

৫৪। **ঘটনার পরবর্তী বিষয়সমূহ।**

ক। ২৭ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় প্রবেশের পূর্বে সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে ফোন করে জানান যে, পিলখানার গেইটে পুলিশ এবং জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক থাকবেন তাদের সংগে সমন্বয় করে তল্লাশি এবং উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ব্রিগেডের সম্মুখ দল ২৭ ফ্রেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে আনুমানিক ১০৩০ ঘটিকায় বিডিআর সদর দপ্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ভবিষ্যৎ পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতঃ পূর্বেই একটি উদ্ধার ও তল্লাশি অপারেশন এর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। পিলখানার প্রবেশ পথেই কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড পুলিশের একজন প্রতিনিধি এবং জাহাঙ্গীর কবির নানককে দেখতে পান। কমান্ডারের নিকট পিলখানা এলাকার একটি Eyes Sketch ছিল, যা পিলখানা থেকে পালিয়ে আসা অফিসার মেজর আসাদ, মেজর মাকসুদের সাহায্যে প্রস্তুত করা হয়েছিল। সেই স্কেচে জনাব নানককে বিভিন্ন এলাকার অবস্থান দেখালে তিনি বললেন, হাসপাতালে এলাকায় ২০০ জনের মতো আত্মসমর্পণকৃত বিডিআর সৈনিক আছে। সে বিষয়টি মাথায় রেখে অভিযান পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেন। বিডিআর সদর দপ্তরে প্রবেশের সাথে সাথেই ইউনিটসমূহ পরিকল্পিতভাবে উদ্ধার ও তল্লাশি অপারেশন পরিচালনা করে। তল্লাশি কালে প্রচুর সংখ্যক অস্ত্র, গোলাবারুদ, বিস্ফোরক এবং অন্যান্য সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা হয়। প্রথম দিনেই হাসপাতালের পাশে লাশ ঘরের নিকটবর্তী গণকবর হতে ৩৮টি মৃতদেহসহ মোট ৪১টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়নের এলাকার তিনটি পৃথক গণকবর হতে আরো ১০ টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড প্রায় ১ মাস পিলখানার নিরাপত্তা বিধান, যোগদানকারী বিডিআর সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান, তল্লাশি অভিযান পরিচালনাসহ ডিজি বিডিআরের পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকার সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা শেষে ৪৪ পদাতিক ব্রিগেডের নিকট দায়িত্ব হস্তান্তর করে ঢাকা সেনানিবাসে ফেরত আসে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৫)।*

খ। লাশ উদ্ধার

(১) **সুয়ারেজ/ড্রেন থেকে লাশ উদ্ধার।** পুলিশ কর্তৃক দুইজন সেনা কর্মকর্তার মৃতদেহ ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ বেলা আনুমানিক আড়াইটার সময় লালবাগ থানাধীন বেড়িবাঁধ সংলগ্ন সুয়ারেজ লাইনের সুইস গেইটের মুখে এবং কামরাংগিরচর থানাধীন বুড়িগঙ্গার একটি শাখার খাল থেকে উদ্ধার করে । *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-৩)।* লে. কর্নেল জাহিদ এর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ভোরে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২৬)।* ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সকাল ০৮.৩০ ঘটিকায় কামরাঙ্গিরচর থেকে ৬টি লাশ উদ্ধার করা হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৪)।* ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ পিলখানার সুয়ারেজ লাইন থেকে ০১ টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় ।

(২) **<u>গণকবর আবিষ্কার ও পরবর্তী ব্যবস্থা</u>।** গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ পিলখানা, বিডিআর সদর দপ্তরে সংঘটিত নারকীয় হত্যাকান্ডের পর বিদ্রোহী বিডিআর জওয়ানগণ সেনা কর্মকর্তা ও তাদের পরিবারের মৃতদেহগুলো তিনটি গণকবরে মাটি চাপা দিয়ে গুম করার অপচেষ্টা করে। পরবর্তীতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সেনাবাহিনী প্রবেশের পর ফায়ার ব্রিগেডের সদস্যগণ বিডিআর হাসপাতালের পার্শ্বে মর্গের কাছে একটি গণকবরের সন্ধান পায় ও সেখান থেকে ৩৮টি মৃতদেহ এবং পরদিন ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়নের এমটি গ্যারেজের পার্শ্বে ০৩টি গণকবর হতে মোট ১০টিসহ সর্বমোট ৪৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এছাড়া সুয়ারেজ লাইন থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ০১টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সর্বমোট ৪৯টি মৃতদেহ ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেডের অধীনস্থ ৩৬ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারির তত্ত্বাবধানে ময়না তদন্তের জন্য মিডফোর্ড ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর হাসপাতালের মর্গের নিকট পাওয়া গণকবর হতে প্রাপ্ত ৩৮টি উদ্ধারকৃত মৃতদেহের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ, কর্নেল এলাহী, কর্নেল মোয়াজ্জেম, কর্নেল মশিউর, কর্নেল নকিব, কর্নেল শওকত ইমাম, কর্নেল এমদাদ, লে. কর্নেল ইনশাদ, লে. কর্নেল লুৎফর ও লে. কর্নেল রবিকে ইউনিফর্মে লাগানো জর্জেট, নেমটেগ, র‍্যাংক, নোটবুক এবং মানিব্যাগ দেখে এবং আরো কয়েকজনকে অন্যান্য ভাবে সনাক্ত করা হয়। পিএসও এএফজির নির্দেশে কমান্ডার ৬ এডিএ ব্রিগেড লাশগুলো ময়না তদন্তের দায়িত্ব নেন। পরবর্তীতে মৃতদেহগুলো ময়না তদন্তের নিমিত্ত বিএ-৪৩৫৯ মেজর মো. মাহবুব সাবের এর নেতৃত্বে স্কর্টসহ পর্যায়ক্রমে মিডফোর্ড ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও ময়না তদন্ত পর্যবেক্ষণের জন্য ঐ দিন রাতে বিএ-৫৩৫৩ মেজর মোহম্মদ মাহফুজুল ইসলাম, জি+, আর্টিলারি ঢাকা মেডিকেল কলেজে এবং মেজর মো. মাহবুব সাবের মিডফোর্ড হাসপাতালে অবস্থান করেন। এদিন কমান্ডার ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেড ও অধিনায়ক ৩৬ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারি গণকবরের কাছে উপস্থিত থেকে সার্বিক কার্যক্রম তদারকি করেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়নের এমটি গ্যারেজ এর পার্শ্বে পাওয়া ০৩টি গণকবর হতে মোট ১০ টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তাৎক্ষণিকভাবে মিসেস শাকিল, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাকির, মেজর মোশাররফ ও মেজর মকবুল এর মৃতদেহ সনাক্ত করা হয়। উদ্ধারকৃত মৃতদেহগুলো বিএ-৫৫৪১ মেজর বরকত উল্লাহ চৌধুরী এর নেতৃত্বে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য স্কর্ট করে নেয় হয় এবং মেজর বরকত ঢাকা মেডিকেল কলেজে অবস্থান করে ময়না তদন্তের তদারকি করেন। উল্লেখ্য যে, শহীদ অফিসারবর্গের পরিবারের সদস্যগণ পরবর্তীতে মিডফোর্ড ও ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে তাদের নিকট আত্মীয়ের বেশিরভাগ মৃতদেহ পর্যায়ক্রমে সনাক্ত করেন এবং অবশিষ্ট মৃতদেহ পরবর্তীতে ডিএনএ টেস্টের মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়। গণকবর থেকে উদ্ধারকৃত মৃতদেহের বিস্তারিত বিবরণ ৩৬ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারি পত্র নং ৩৬০৩/২৮/জি তারিখ ০১ মে ২০০৯ ***(সূত্রঃ সেনা তদন্ত প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা নং-৮৩৯)।***

(৩) **<u>মোট উদ্ধারকৃত মৃতদেহ</u>।** ২৫, ২৬, ২৭ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর মধ্যে সর্বমোট ৫৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় (ড্রেন থেকে ১০টি এবং গণকবর থেকে ৪৮টি)।

(৪) **<u>ময়না তদন্ত</u>।** ২৮টি মৃতদেহের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করা হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং অবশিষ্ট ২৯টি মৃতদেহের ময়না তদন্ত সম্পন্ন করা হয় স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে *(সূত্রঃ সেনা সদর এজির শাখা পিএস পরিদপ্তর পত্র নং ২৩.০১.৯০১. ০৩৮.০২.০৬৮.০১.০৯.০৭.২৫/বিডিআর তারিখ ০৯ জুলাই ২০২৫, সংযোজনী-৩০)।*

(৫) **<u>মৃতদেহ সনাক্ত হয়নি</u>।** বিএ-৫১০৮ মেজর আবু সাইদ গাজ্জালি দস্তগির এবং বিএ ৫৯৮৭ মেজর মো. তানভির হায়দার নূরের মৃতদেহ প্রাথমিকভাবে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। তবে সেনাসদরের ভাষ্য অনুযায়ী পরবর্তীতে মৃত অফিসারের স্ত্রীর মাধ্যমে তার মৃতদেহ সনাক্তকরণের পর সিএমএইচ ঢাকা কর্তৃক মৃত্যুর সনদপত্র প্রদান করা হয় *(সূত্রঃ সেনাসদর এজির শাখা পিএস পরিদপ্তর পত্র নং-২৩.০১. ৯০১.০৩৮.০২.০৬৮.০১.২৫.০৩.২৫/৫১০৮/৫৯৮৭ তারিখ ২৫ মার্চ ২০২৫ ও সেনাসদর এজি'র শাখা পিএস পরিদপ্তর পত্র নং ২৩.০১. ৯০১.০৩৮.০২.০৬৮.০১.২৪.*

০৫.২৫/বিডিআর তারিখ ২৪ মে ২০২৫, সংযোজনী-৩১)। বিএ ৫৯৮৭ মেজর মো. তানভির হায়দার নূরের মৃতদেহের অনুকূলে সেনা সদর থেকে তিনটি মৃত্যুসনদ দেয়া হয়েছে *(সূত্রঃ শহীদ পরিবার সাক্ষী নম্বর-১২, সংযোজনী-৩২)।*

(৬) **বিভিন্নভাবে উদ্ধারকৃত মোট মৃতদেহের সংখ্যা।**

(ক) চাকরিরত সেনা অফিসার-৫৭ জন।
(খ) অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসার-০১ জন।
(গ) চাকরিরত সেনা অফিসারের স্ত্রী-০১ জন।
(ঘ) অবসরপ্রাপ্ত সেনা অফিসারের স্ত্রী-০১ জন।
(ঙ) চাকরিরত সেনাবাহিনীর সৈনিক-০১ জন।
(চ) চাকরিরত বিডিআর সদস্য-০৯ জন।
(ছ) বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ-০৪ জন।

(সূত্রঃ মহামান্য আদালতের রায়ের উদ্ধৃতাংশ, সংযোজনী-৩৩)।

(৭) **ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তরের জন্য সেনাসদরের নির্দেশনা।** মরদেহ তত্ত্বাবধানের দায়িত্বটি মূলত লে. জেনা. মুবিনের (পিএসও এএফডি) মাধ্যমে এডি ব্রিগেডকে দেওয়া হয়ছিল। তাঁর নির্দেশনা ছিল নিয়ম অনুযায়ী যা যা করা দরকার সব কিছু সম্পন্ন করে মরদেহগুলি সেনানিবাসে হস্তান্তর করতে হবে। তৎকালীন কমান্ডার ৬ এডিএ ব্রিগেড সেই মোতাবেক আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আপাত দৃষ্টিতে সংবিধান অনুযায়ী যা যা করণীয় সেভাবেই করছিলেন। এমন সময় সেনাসদর মিলিটারি অপারেশন পরিদপ্তরের পরিচালক, ব্রিগে. জেনা. এটিএম জিয়াউল হাসান, সেনাপ্রধানের উদ্ধৃতি দিয়ে জানান যে, সমস্ত মরদেহ সিএমএইচ ঢাকায় হস্তান্তর করতে হবে। ময়নাতদন্ত ও প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা যা প্রয়োজন তা ঢাকা সিএমএইচ সম্পন্ন করবে। এই আদেশটি সাংবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি বিধায় কমান্ডার ৬ এডিএ ব্রিগেড তা প্রত্যাখ্যান করেন। কমান্ডার ৬ এডিএ ব্রিগেড এর বিবেচনায় এটা মনে হয় যে, এই প্রত্যেকটি হত্যাকান্ডের বিচার হতে হবে যার জন্য ময়নাতদন্ত একটি অতি প্রয়োজনীয় আইনি বাধ্যবাধকতা ও বিচার প্রক্রিয়ার উল্লেখযোগ্য মৌলিক কাজ। তাছাড়া, এই হত্যাকান্ডে যেহেতু বিডিআরের সৈনিক জড়িত এবং সেনাবাহিনীর অফিসার ও তাদের পরিবার জড়িত। কাজেই আইনি দৃষ্টিতে বিচারের অধিকতর গ্রহণযোগ্যতার জন্য ময়নাতদন্ত অবশ্যই এই দুই বাহিনী ব্যতীত অন্য কোন তৃতীয় সরকারি হাসপাতালে সম্পন্ন করতে হবে। এক পর্যায়ে, ডিএমও এর অবস্থান ছিল যে, সেনাসদরের সিদ্ধান্ত হলো লাশ সিএমএইচে হস্তান্তর। সেনাসদরের অবস্থান আরোও দৃঢ়ভাবে তুলে ধরার জন্য ডিএমও কমান্ডার ৬ এডিএ ব্রিগেডকে জানান যে, এই নির্দেশের ব্যত্যয় হলে তা হবে সেনাসদরের আদেশের লঙ্ঘন বলে পরিগণিত হবে। কমান্ডার ৬ এডিএ ব্রিগেড এর অবস্থানের দৃঢ়তা দেখে ডিএমও তাঁকে বলেন, 'Brigadier Anwar, you are violating the instructions of the Army Headquarters' সেনাসদরের এই নির্দেশনার পর কমান্ডার ৬ এডিএ ব্রিগেড এর চূড়ান্ত অবস্থান ছিল এই, 'To side with the constitutional rights of my fallen brother, let me violate the instructions of the Army Headquarters' পরবর্তীতে সেনাসদর থেকে এই ব্যাপারে আর কোনো যোগাযোগ করা হয়নি **(সূত্রঃ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ আনোয়ারুল ইসলাম (অবঃ) সাক্ষী নম্বর-৩২)।** ঢাকার তদানীন্তন পুলিশ কমিশনার (এডি আইজিপি নাইম আহমেদ) অল্প সময়ে ময়না তদন্ত শেষ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি পোস্টমর্টেমের জন্য ২৫-৩০ জন পুলিশ অফিসার সাথে সাথে পাঠিয়ে দিয়ে পুরো প্রক্রিয়াটাকেই অনেক ত্বরান্বিত করেন *(সূত্রঃ পুলিশ সাক্ষী নম্বর-০৩)।*

গ। **পলায়নকৃত বিডিআর সদস্যদের পুনঃ যোগদান।**

(১) পালিয়ে যাওয়া সকল বিডিআর সদস্যদের ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটস্থ থানায় বা পিলখানায় যোগদানের জন্য ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সরকার ঘোষণা দেয়। পিলখানা হতে পালিয়ে যাওয়া প্রায় ৭০০০ বিডিআর সদস্যদের পিলখানার ভেতরে ফেরত আনার জন্য সে সময় কোন ধরণের প্রস্তুতি পিলখানায় উপস্থিত কোন কর্তৃপক্ষের নিকটেই ছিল না। যোগদানের তথ্যবলী সংগ্রহ করা জন্য প্রাথমিকভাবে একটি ছক তৈরি করা হয় যা ক্রমান্বয়ে চূড়ান্ত রূপ নেয়। এই তথ্য ছকটি পরবর্তীতে প্রতিটি সদস্যকে যাচাই/বাছাই করতে সাহায্য করে। প্রথম দিন (১ মার্চ ২০০৯) থেকেই সেনাবাহিনীর গুটি কয়েক মেডিক্যাল অফিসার নিজেদের উদ্ভাবনী পদ্ধতিতে পলাতক অবস্থা হতে ফেরত আসা বিডিআর সদস্যদের শরীরে বিভিন্ন আঘাতের প্রকার (যেমন অস্ত্র দিয়ে গুলি ছুড়লে কাঁধে চাপা লাল দাগ, গুলিতে আহতের দাগ ও কাঁটাতারের আঘাতের দাগ ইত্যাদি) যথাযথ ভাবে তালিকাভুক্তি করেন। প্রাথমিক মেডিক্যাল চেকআপের গুরুত্ব বিবেচনা করে ০২ মার্চ মধ্যরাতেই ১০টি মেডিক্যাল টিম পিলখানায় আসে এবং ০২ মার্চ সকাল ১০০০ ঘটিকা হতে পিলখানায় পূর্ণোদ্দমে মেডিক্যাল পরীক্ষা শুরু করে।

(২) বহু সংখ্যক বিডিআর সদস্যের নিরাপত্তার স্বার্থে অতিরিক্ত সেনা সদস্যের প্রয়োজন মেটাতে ০১টি অতিরিক্ত পদাতিক ব্যাটালিয়ান ৩ মার্চ তারিখেই পিলখানায় মোতায়েন করা হয়। ৪ মার্চ তারিখের মধ্যে আনুমানিক ৭০০০ পলাতক সদস্য পিলখানায় যোগদান করে।

(৩) প্রথম দিন থেকেই পলাতক অবস্থা হতে ফেরত আসা সকলকে নিরাপত্তার কারণে পিলখানার প্যারেড মাঠে রাখা হয়। একই সাথে তাদেরকে নিজ নিজ বাসস্থানে রাখার সুবিধার জন্য বিদ্রোহ মামলার আলামত হিসাবে সংরক্ষণ করা ভবনসমূহ সিআইডির সহায়তায় ক্রমান্বয়ে অস্ত্র ও গোলাবরুদ মুক্ত করার কার্যক্রম শুরু করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি ছিল সময়সাপেক্ষ। যাই হোক মার্চ মাসের কিছুটা ঠান্ডার মাঝে বেশ কিছুদিন খোলা মাঠে অবস্থান করলেও ক্রমান্বয়ে সকল বিডিআর সদস্যকে নিরাপদে বিভিন্ন সৈনিকদের বসবাসের ভবনে স্থানান্তর করা হয়।

(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৬)।

ঘ। <u>অপারেশন রেবেল হান্ট</u>। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ সংঘটিত হত্যাকান্ডের পর অসংখ্য বিডিআর জওয়ান অস্ত্র ও গোলাবারুদসহ পিলখানা থেকে পালিয়ে যায়। ০১ মার্চ ২০০৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সেনাকুঞ্জে সেনা অফিসারদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে অফিসারদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে পলাতক বিডিআর সদস্যগণকে ধরে আইনের আওতায় আনতে অপারেশন রেবেল হান্ট শুরুর অনুমতি প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ঐ দিন সেনাসদর, জিএস শাখা, মিলিটারি অপারেশন পরিদপ্তর অপারেশনস্ নির্দেশিকা ০৫/২০০৯ 'অপারেশন রেবেল হান্ট' জারি করা হয় এবং অনতিবিলম্বে দেশব্যাপী 'ইনে ইড অভ্ সিভিল পাওয়ার' এর মাধ্যমে পলাতক বিডিআর জওয়ানদেরকে গ্রেফতার করে ***(সূত্রঃ অপারেশন নির্দেশিকা সংযুক্ত, সংযোজনী-৩৪)।***

ঙ। <u>তদন্ত কার্যক্রম।</u>

(১) দোষী বিডিআর সদস্যদের সনাক্ত করতে (ছবি, ভিডিও ফুটেজ ইত্যাদি দেখে) র‍্যাব কর্তৃপক্ষের অধীনে টিএফআই সেল গঠন করা হয়। র‍্যাব প্রেরিত বিদ্রোহীদের নাম ও তাদের কর্মকান্ড সংযুক্ত করা হলো *(সূত্রঃ সংযোজনী-২২)।*

(২) ০৮ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে কর্নেল নেয়ামুল ইসরাম ফাতেমী পিলখানায় ঢাকা সেক্টর কমান্ডার হিসেবে যোগদান করেন। তার অধীনে ছিল চারটি ব্যাটালিয়ন ১৩, ২৪, ৩৬ ও ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন। অধিনায়কগণ ছিলেন যথাক্রমে; লে. কর্নেল তারিক (৬ লং কোর্স), লে. কর্নেল ফকির মাহবুব (৫ লং কোর্স), লে. কর্নেল আলীম, (১৯ লং কোর্স) এবং লে. কর্নেল আজিজ আহমেদ (৮ লং কোর্স)। তদন্ত চলাকালে লে. কর্নেল আজিজ কর্নেল ফাতেমীর অফিসে এসে প্রশ্ন করতো, 'তুমি এত সিরিয়াস কেন? তুমি ঠিকাদারী নিয়েছো নাকি ইত্যাদি ইত্যাদি। কর্নেল

ফাতেমী আব্দুল কাহার আকন্দকে (পুলিশের বহুল আলোচিত সাবেক এসপি আব্দুল কাহার) কর্নেল আজিজের অফিসে ঘোরাফেরা করতে দেখেন। কর্নেল ফাতেমী বিষয়টি বিডিআরের ডিজি লে. জেনারেল মইনুলকে জানালেও কোন কাজ হয়নি বরং লে. কর্নেল আজিজকে পরবর্তীতে প্রমোশন বোর্ডে পদোন্নতি দিয়ে ঢাকা সেক্টর কমান্ডার করা হয় এবং কর্নেল ফাতেমীকে সিলেট সেক্টরে বদলি করা হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৭)*

(৩) পিলখানায় ডাল-ভাত কর্মসূচির তদন্ত করার দায়িত্ব কর্নেল নেয়ামুল ইসলাম ফাতেমীকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ডাল-ভাতের বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি এজিটেশন টুল মাত্র। সামান্য অস্পষ্টতা ছাড়া বড় কোন গড়মিল তিনি পাননি। এমনকি গুঁড়ো দুধের মতো সামগ্রী পর্যন্ত মানসম্পন্ন ছিল। (৩টি) গাড়ি নিলামে বিক্রির বিষয় ছাড়া কোনো বড় দুর্নীতি তিনি পাননি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৭)*

(৪) মোশাররফ হোসেন কাজল নামের আইনজীবীর মাধ্যমে নিরপরাধ জওয়ানদের ফাঁসানো হয়েছে। ৮০০-৯০০ জনকে জেলে দেয়া হয়, যদিও মূল কিলার গ্রুপ ছিল ২০ জনের মতো। কর্নেল ফাতেমী কাজলের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ করেছিলেন। জনাব কাজল ডিজির সামনেই কর্নেল ফাতেমীর বিরুদ্ধে কথা বলেছে। ডিজি কিছুই বলেননি। কর্নেল ফাতেমী নিজ চোখে দেখেছেন জয়েন্ট ইন্টারোগেশনের নামে আলামত ধ্বংস করা হয়েছে। কর্নেল আজিজ নিজ হাতে ফুটেজ মুছে ফেলে। কর্নেল ফাতেমী প্রায় ৭ হাজার ফোন কল রেকর্ড সংগ্রহ করেছিলেন সবই হারিয়ে যায় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৭)।*

(৫) কর্নেল ফাতেমী মনে করেন রাজনৈতিক নেতৃত্ব পুরো ঘটনা জানতো, হয়তো হত্যার অনুমোদনও দিয়েছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৭)*

৫৫। <u>বিবিধ</u>।

ক। <u>২০০৯ ও ২০১০ সালে পলাতক বিডিআর সদস্যদের বিবরণ</u>। ২০০৯ সালের ২৫, ২৬ ও ২৭ ফেব্রুয়ারি হতে মোট ২৩ জন বিডিআর সদস্য পলাতক/ছুটি ব্যতীত অনুপস্থিত রয়েছেন। ০৪ মার্চ ২০০৯ হতে ২৫ ডিসেম্বর ২০১০ সাল পর্যন্ত আরো ৪১ জন বিডিআর সদস্য পলাতক/ছুটি ব্যতীত অনুপস্থিত গড় হাজির হয়েছেন ***(সূত্রঃ বর্ডার গহার্ড বাংলাদেশ, প্রশাসন শাখা, প্রশাসন পরিদপ্তর, ঢাকা পত্র নং ৪৪.০২.১২০৫. ০০৪.০৫.০০৫.২৫/৯৭ তারিখ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সংযোজনী-৩৫)।***

খ। <u>মার্চ ২০০৯ হতে জুলাই ২০০৯ পর্যন্ত বিডিআর সদস্যদের মৃত্যু</u>। ০৯ মার্চ ২০০৯ হতে ২৩ জুলাই ২০০৯ সাল পর্যন্ত মোট ৩৪ জন বিডিআর সদস্য/বিডিআরে চাকরিরত বেসামরিক সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। এর মধ্যে ১০ জনের মৃত্যুর স্থান এবং ১০ জনের মৃত্যুর কারণ বিডিআরের নথি পত্রে উল্লেখ নেই। যে ২৪ জনের মৃত্যুর কারণ উল্লেখ আছে তাদের মধ্যে ০৩ জন গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে উল্লেখ আছে। যাদের মৃত্যুর স্থান উল্লেখ আছে সেই ২৪ জনের মধ্যে ১০ জন ঢাকায় বাইরে নিজ বাড়িসহ বিভিন্ন স্থানে মৃত্যুবরণ করেছেন ***(সূত্রঃ বর্ডার গহার্ড বাংলাদেশ, প্রশাসন শাখা, প্রশাসন পরিদপ্তর, ঢাকা পত্র নং ৪৪.০২.১২০৫.০০৪.০৫. ০০৫.২৫/৯৭ তারিখ ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫, সংযোজনী-৩৫)।***

গ। মেজর একরামুল হক খান ২০১০ সালে একটি তথ্য পান যে, বিডিআর হত্যার সময় লাশ বিকৃতকরণের জন্য অভিযুক্ত এক প্রাক্তন ল্যান্স নায়েক রবিউল, যিনি বিডিআর হাসপাতালে নার্সিং অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি পলাতক অবস্থায় গোপালগঞ্জের একটি ক্লিনিকে ছদ্মনামে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে চাকরি করছেন। তিনি তার চ্যানেল ব্যবহার করে লোক পাঠান এবং তারা নিশ্চিত করে জানায় যে ছদ্মনামে রবিউল সত্যিই সেখানে কাজ করছে। তার হাতে সরাসরি গ্রেফতারের ক্ষমতা না থাকায় তিনি র‍্যাবের সাথে যোগাযোগ করেন। তখন র‍্যাবের ডিরেক্টর ইন্টেলিজেন্স ছিলেন লেফটেন্যান্ট কর্নেল জিয়াউল আহসান (বর্তমানে বরখাস্ত মেজর জেনারেল)। মেজর

একরাম তাকে জানালে তিনি সম্মতি দেন। কিন্তু হঠাৎ একদিন দুপুরে একটি সাদা মাইক্রোবাস থেকে কিছু লোক এসে রবিউলকে তুলে নিয়ে যায়। ২০১০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। এ নিয়ে পরে লে. কর্নেল জিয়াউল আহসানকে ফোন করলে তিনি মেজর একরামকে বলেন, 'ওকে খুঁজতেছেন কেন? খুঁজবেন না ও সুন্দরবনে মাছের পেটে আছে।' মেজর একরাম প্রশ্ন করলে লে. কর্নেল জিয়া বলেন, 'স্যার, ওরে টুকরা টুকরা করে ফেলে দেওয়া হইছে।' আরও বলেন, লে. কর্নেল জিয়া 'নাম্বার ওয়ান এর আদেশে এই কাজ করেছেন। মেজর একরাম জানতে চাইলে 'নাম্বার ওয়ান' বলতে লে. কর্নেল জিয়া জেনারেল তারেককে বোঝান এবং উল্লেখ করেন যে জেনারেল তারেক এটি প্রধানমন্ত্রীর আদেশেই বলেছেন। কয়েকদিন পর সংবাদপত্রে লে. কর্নেল একরাম দেখেন সুন্দরবনের সরণখোলা নদীতে একটি অজ্ঞাত লাশ পাওয়া গেছে। তার ধারণা সেটি রবিউলের লাশ ছিল।

ঘ। <u>আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর বিডিআরের সেনা অফিসাদের পোস্টিং</u>। ০৬ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর হতে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত মোট ১২ জন অফিসার সেনাবাহিনী হতে বিডিআরে পোস্টিং হয়। তাদের মধ্যে ০৩ জন অফিসার কর্নেল গুলজার উদ্দিন আহমেদ, লে. কর্নেল শাহাদাত হোসেন ও মেজর মাহবুবুর রহমান যথাক্রমে ০৪ ফেব্রুয়ারি, ১৩ ফেব্রুয়ারি ও ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সেনাবাহিনী হতে বিডিআরে যোগদান করেন। কর্নেল গুলজার এবং মেজর মাহবুব ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারির নির্মম হত্যাকান্ডে শাহাদাতবরণ করেন। বাকি ০৯ জন অফিসার ২৬ ফেব্রুয়ারির পর বিভিন্ন সময়ে বিডিআরে যোগদান করেন *(সূত্রঃ সেনাসদর, সামরিক সচিবের শাখা, ঢাকা সেনানিবাস পত্র নং ২৩.০১.৯০১.০৫৭.০৯.০৪০.০১. ২৭.০৩.২৫ তারিখ ২৭ মার্চ ২০২৫, সংযোজনী-৩৬।*

ঙ। <u>পিলখানার অভ্যন্তরে বসবাসরত অফিসারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি বিবরণ</u>। পিলখানার অভ্যন্তরে যে সকল অফিসার মেস এবং পারিবারিক বাসস্থানে অবস্থান করেছিলেন ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিদ্রোহের ঘটনায় তাদের ক্ষয়ক্ষতির তালিকা সংযুক্ত করা হলো ***(সূত্রঃ সেনা তদন্ত প্রতিবেদন, সংযোজনী-৩৭)।***

চ। <u>নিহত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কিত তথ্যাবলী</u>। বিদ্রোহের ঘটনায় নিহত সেনাকর্মকর্তা, তাদের পরিবারের সদস্য, বিডিআর সদস্য এবং বেসামরিক ব্যক্তিদের তালিকা সংযুক্ত করা হলো ***(সূত্রঃ সেনা তদন্ত প্রতিবেদন, সংযোজনী-৩৩)।***

ছ। স্যোসাল মিডিয়ায় অস্ত্রধারী একজনের ছবি নিয়ে আলোচনা আছে যে, ছবিটি কোন বাংলাদেশী কি-না? কমিশন কর্তৃক পর্যলোচনায় প্রমাণিত হয়েছে যে ছবিটি একজন বিডিআর সদস্যের যিনি বর্তমোনে কুমিল্লা কারাগারে বন্দী আছেন যার নাম-শ্রী অসিম কুমার কুন্ডু, বাড়ি মাগুরা। পুলিশ সুপার মাগুরা হতে জানা যে, তারা ০৫ ভাই এবং ০৩ বোন তার মধ্যে ০১ ভাই ও ০১ বোন যথাক্রমে দীর্ঘ ৪০ বছর ও ৩০ বছর ভারতে বসবাস করে *(সূত্রঃ বাংলাদেশ পুলিশ, ডিএসবি মাগুরা স্মারক নং ৪৬৭৩ তারিখ ০৫ নভেম্বর ২০২৫, সংযোজনী-৩৮)।*

জ। **<u>বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ</u>।** ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সন্ধ্যার পর পিলখানার সব আলো নিভে যায় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৬)।* বিদ্যুৎ সরবরাহ কার নির্দেশে কিভাবে বন্ধ হয়েছিল এর কোন সদুত্তর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ দিতে পারেনি *(সূত্রঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ বিভাগ প্রশাসন-১ শাখা স্মারক নং-২৭.০০.০০০০.০৪১.০১.০২৭.১৯-৩৭৯ তারিখ ০৯ মার্চ ২০২৫, সংযোজনী-৩৯)।*

ঝ। জনাব গোলাম রেজা, প্রাক্তন এমপি, তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বিডিআর বিদ্রোহের পর এক সময় শেখ হাসিনাকে বলেন, 'আপনি তো বিডিআরেবং সেনা বাহিনীকে ধ্বংস করে দিলেন।' উত্তরে শেখ হাসিনা বলেন যে, 'তারা আমার পিতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের হত্যা করেনি?' **(সূত্রঃ এইচ এম গোলাম রেজা, প্রাক্তন এমপি, রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০১)।**

ঞ। <u>বিডিআর পিলখানার এর লে আউট প্ল্যান</u>। ***(সংযোজনী-৪০)।***

ট। **<u>প্রধানমন্ত্রী আগমন উপলক্ষ্যে বিডিআর সদর দপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত নিরাপত্তা নির্দেশিকা</u>।** *(সংযোজনী-৪১)।*

ঠ। **<u>২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ মোবাইল কল বিশ্লেষণ</u>।**

(১) বিডিআর বিদ্রোহের অন্যতম ষড়যন্ত্রকারী আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলীর তখনকার ব্যবহৃত মোবাইল ফোনের একটি কল রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সময় বিকেলের দিকে সিঙ্গাপুর থেকে একাধিকবার ফোন আসে। সিঙ্গাপুর এর যে নম্বর থেকে ফোন আসে সেটি হল +৬৫৮১৫৫৫৬৪৮। তোরাব আলী কল দাতার সাথে প্রায় ০৫ মিনিট এর মত কথা বলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সময় সকাল ১১০০ থেকে ১১৩৪ ঘটিকার মধ্যে তোরাব আলীর কাছ থেকে ভারতীয় একটি নম্বর থেকে একাধিকবার কল আসে। নম্বরটি হল +৯১৯৮৬২৬৭৬০৫৮। এই কল দাতার সাথে তোরাব আলী চার মিনিট এর কিছু বেশি সময় ধরে কথা বলেন। ঐ দিনই একই ভারতীয় নম্বর থেকে তোরাব আলীর কাছে বিকাল ১৬১৭ ঘটিকায় আবার কল আসে এবং সেখানে তিনি প্রায় ০১ মিনিট কথা বলেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১৪০০ ঘটিকার দিকে তোরাব আলীর কাছে উপরে উল্লিখিত সিঙ্গাপুর এর নম্বর (+৬৫৮১৫৫৫৬৪৮) থেকে কল আসে এবং সেখানে তিনি ০১ মিনিট এর কিছু বেশি সময় তিনি কথা বলেন। ২৭ ফেব্রুয়ারি একই নম্বর থেকে দুপুর একটায় সিঙ্গাপুর থেকে তার কাছে কল আসে এবং সেখানে তিনি ৪৩ সেকেন্ড কথা বলেন। উল্লেখ্য যে তোরাব আলীর কাছে জানুয়ারি ২০০৯ থেকে ০৬ মার্চ ২০০৯ এর মধ্যে ২৪ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ব্যতীত সিঙ্গাপুর বা ভারত থেকে আর কোন কল আসেনি বা তিনিও সিঙ্গাপুর বা ভারতের কোথাও কল করেননি। তোরাব আলী জীবিত থাকা অবস্থায় তাকে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পূর্বের কোন কমিটি তাদের প্রতিবেদনে কারা তোরাব আলীকে ভারত থেকে এবং সিঙ্গাপুর থেকে কল করেছিল, কি কথা হয়েছিল তা উদঘাটন করেনি *(সূত্রঃ তোরাব আলীর কল রেকর্ড, সংযোজনী-৪২)।*

(২) ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর বিডিআর হত্যাকান্ডের সময় সেনাবাহিনী, এএফডি, ডিজিএফআই, এনএসআই, পুলিশ সদর দপ্তর এবং র‍্যাবের কাছ থেকে উক্ত সংস্থাগুলোকে কর্মরত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের টেলিফোন নম্বর অত্র কমিশন কর্তৃক চাওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়য়ের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নম্বরও চাওয়া হয়। কিন্তু পুলিশ সদর দপ্তর ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান তাদের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের মোবাইল ফোন নম্বর প্রদান করতে পারেনি *(সূত্রঃ জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন পত্র ৬ এপ্রিল ২০২৫/বিডিআরসি/ ১১০/(৫), র‍্যাব ফোর্সেস সদর দপ্তর স্মারক নং র‍্যাব ফোর্সেস হেঃ কোঃ/এডমিন/ পার্সোঃ/৫৭১/২৩৪৪ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২৫, পুলিশ হেডকোয়ার্টস স্মারক নং ৪৪.০১.০০০০.০০৯. ০৭.০০১.২০-০৮ তারিখ ১৩ এপ্রিল ২০২৫, সেনাসদর প্রশাসনিক শাখা পত্র নং ২৩.০১.৯০১.০৫৯.২৫২. ০১.১৭.০৪.২৫ তারিখ ১৭ এপ্রিল ২০২৫, আর্মি স্ট্যাটিক সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন পত্র নং ২৩.০১.৯০১. ২৩৬.০২.০৩২.১০.১৫.০৪.২৫ তারিখ ১৫ এপ্রিল ২০২৫, National Independent Inquiry Commission letter 04 June 2025/09-2025/198 date 04 June 2025, National Independent Inquiry Commission letter 04 June 2025 (addressed to the High Commission of India in Dhaka) 13 August 2025/BDRC/09-2025/252 date 13 August 2025, সংযোজনী-৪৩)।*

(৩) ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ডিজিএফআই এ স্থাপিত ন্যাশনাল মনিটরিং সেন্টার (এনএমসি)র সংস্থাটির প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল খোরশেদ আলম মোবাইল নেটওয়ার্ক মনিটর করেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি বিকেলে বা সন্ধ্যায় লে. কর্নেল সুলতানুজ্জামান সালেহ (পরবর্তীতে মেজর

জেনারেল) মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকের নির্দেশে মনিটরিং সেলের ভিতরে প্রবেশ করে দীর্ঘক্ষণ মনিটরিং এর কাজ করেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৮ এবং সাক্ষী নম্বর-২০)।*

(৪) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে মোবাইল নেটওয়ার্ক মনিটরিং এর সময় ১০৩০ থেকে ১১৩০ ঘটিকার মধ্যে ব্রি. জেনারেল খোরশেদ আলম ডিজির মৃত্যুর সংবাদ পেয়েছিলেন এবং সেই সংবাদ যথাসময়ে ডিজি ডিজিএফআইকে জানিয়েছিলেন করেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২৮)।*

(৫) সিটিসেলের টেকনিক্যাল হেড ছিলেন জনাব তানভীর রানা। তিনি সেই সময় নেটওয়ার্ক বন্ধ করা ও ডাটা মুছে ফেলার নির্দেশ দেন মর্মে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। সম্ভবত অন্য কেউ তাকে এ নির্দেশ দিয়েছিল *(সূত্রঃ বেসরকারি ব্যক্তি সাক্ষী নম্বর-০৭)।* দেশে না থাকায় জনাব তানভীর রানাকে সাক্ষী দেওয়ার জন্য পাওয়া যায়নি।

(৬) ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে দশটা বা এগারোটার মধ্যে নির্দিষ্ট একটি মোবাইল নম্বর তখনও অ্যাক্টিভ ছিল। ধারণা করা হয় কোনো অফিসার সুয়ারেজ/নর্দমা থেকে পরিবারের সাথে কথা বলার সময় তাঁকে সনাক্ত করা হয় *(সূত্রঃ বেসরকারি ব্যক্তি সাক্ষী নম্বর-০৭)।*

(৭) কোন কোন ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্তভাবে মোবাইল মনিটরিং করা হয়েছে এবং কোন কোন সময় মোবাইল নেটওয়ার্ক বন্ধ রাখা হয়েছিল। তবে মোবাইল নেটওয়ার্ক বিক্ষিপ্তভাবে বন্ধ করা সংক্রান্ত কোন তথ্য বিটিআরসি প্রদান করতে পারেনি ***(সূত্রঃ*** *বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন স্মারক নং ১৪.৩২.০০০০.৮০০.১৮.০০১.২৩.৭৯০ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, সংযোজনী-৪৪)।*

(৮) কল রেকর্ড ডিলিট করা হয়েছে। রাজনৈতিক ও বিদেশি যোগাযোগ ডিলিট করা হয়। ২০০৯ সালে গঠিত জাতীয় তদন্ত কমিটি চিঠি দিয়ে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কাছে কল রেকর্ড চেয়েছিল কিন্তু সেনাসদর, ডিজিএফআই এবং বিটিআরসি কেউই তা দেয়নি। সবাই বলেছিল প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতা আছে। সেকেন্ডারি সোর্স থেকে পাওয়া কল রেকর্ডে শুধু বিডিআরেবং র‍্যাব সদস্যদের নম্বর ছিল। রাজনৈতিক বা গোয়েন্দা সংস্থার কোনো নম্বর ছিল না *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২২ এবং বেসরকারি ব্যক্তি সাক্ষী নম্বর-০৭)।*

(৯) বিডিআর বিদ্রোহে তৎকালীন সময়ে তদন্তের সাথে সংশ্লিষ্ট জুনিয়র অফিসারগণ কর্তৃক উদ্ধারকৃত এবং ব্যক্তিগতভাবে সংরক্ষিত সিডিআর থেকে কমিশন নিম্নবর্ণিত তথ্য উদঘাটিত করেছেঃ

ক। ভারত থেকে মোবাইলে কিছু কিছু ফোন নম্বরে বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে।

খ। সিঙ্গাপুর থেকে মোবাইল ফোনে বিদ্রোহীদের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে ।

গ। তৎকালীন লে. কর্নেল শামসের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ রাতে দুই বার পিলখানার বাইরে নিউমার্কেট এলাকায় স্থান পরিবর্তন করেছে।

ঘ। বিদ্রোহীদের সাথে সাহারা খাতুন, ফজলে নূর তাপস, জাহাঙ্গীল কবির নানক, এটিএন বাংলার সাংবাদিক এসএম বাবু এবং অন্যদের সাথে ঘটনার সময় এবং ঘটনার পূর্বে কথা হয়েছে মর্মে স্বীকারোক্তি এবং সাক্ষীদের জবানবন্দী পাওয়া যায়। একই সাথে অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের (জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক) ও বিদ্রোহীদের (ডিএডি তৌহিদ) সাথে যোগাযোগ হয়েছে মর্মে তথ্য পাওয়া গেছে এবং সাবেক ডিজি বিডিআর ও বিডিআরে কর্মরত অফিসারগণ প্রধানমন্ত্রীসহ সরকারের প্রায় সকল পর্যায়ে যোগাযোগ করেছে মর্মে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে।

ঙ। বিদ্রোহীদের মধ্যে সিগন্যাল কন্ট্রোল করার ক্ষেত্রে সম্পৃক্ততা ছিল। ভিতরে এক ধরনের কমান্ড সেন্টার ছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৫)* ।

চ। মোবাইল কল ট্র্যাক করে অফিসারদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করা হয়েছে মর্মে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১১ এবং বেসরিকারি ব্যক্তি সাক্ষী নম্বর-০৭)।*

ছ। সেনা তদন্ত আদালত এবং জাতীয় তদন্ত কমিটি মোবাইল কল রেকর্ড/সিডিআর সংগ্রহ করেনি এবং এই বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করা থেকে বিরত থেকেছে।

৫৬। **নারী ও শিশু নির্যাতন**।

ক। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানায় নারী ও শিশুদের উপর মানসিক ও শারীরিক এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপরে পূর্ববর্তী তদন্ত কমিটিসমূহ গুরুত্বের সাথে আলোকপাত করেনি। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনও এ বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করেনি *(সূত্রঃ বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন স্মারক নং ৫৫.১২.০০০০.১০৪.৩৩.০০১.২০-৫০৮৬ তারিখ ০২ জুলাই ২০২৫, সংযোজনী-৪৫)।*

খ। বাংলাদেশের জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর কার্যালয়ের, সিনিয়র হিউম্যান রাইটস এডভাইজার, এর সহায়তায় অত্র কমিশন ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানায় সংঘটিত নারী ও শিশুদের উপর মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে। প্রতিবেদনটি ইংরেজিতে হুবহু নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ

Key Human Rights Violations (25–26 February 2009)

1. **Enforced Disappearances**

- Military officers, were reportedly taken by armed personnel and never seen again.
- In at least one case, there were attempts to coerce a family member into accepting an unverified body to close the case.
- Despite repeated efforts, families received no formal communication from authorities or inquiry commissions regarding the fate of the missing.

2. **Sexual Violence and Rape**

- Multiple incidents of sexual violence were reported against women, including domestic workers and doctors.
- Survivors describe being assaulted inside their homes and within military and residential compounds.
- Women who attempted to access washrooms were at risk of being assaulted.
- Reports of repeated gang rape by groups of 7-15 men.
- These incidents occurred in a context where perpetrators acted with impunity and survivors remained without redress.

3. **Cruel, Inhuman, and Degrading Treatment**

- Women and children were reportedly beaten, dragged, and humiliated in public.
- Sexualized threats were used as tools of intimidation and domination.
- Children were forcibly separated from their families and referred to in derogatory, ethnically charged terms.
- Female residents were subjected to physical violations using weapons.

4. Intimidation and Threats

- Survivors and family members were threatened against speaking out. Some were warned of potential state retaliation, including imprisonment and loss of entitlements.
- Threats included being labeled as 'collaborators' and facing criminal charges or social ostracization.
- Even years later, individuals who spoke publicly reportedly faced professional repercussions (e.g., cancellation of a military selection).

5. Looting and Property Violations

- Personal belongings, including alcohol and other household items, were looted from homes.
- Doors were broken, and flats forcibly entered during the attacks.

6. Obstruction of Justice and Lack of Accountability

- No official investigation or redress mechanisms were made accessible to survivors.
- Families received no outreach from formal inquiry commissions, and there is no record of justice being pursued for sexual or other forms of violence.
- Media reportedly played a role in inciting hostility during the period, potentially aggravating tensions.

৫৭। **বিদ্রোহ প্রতিহতকারী বিডিআর সদস্য**। বিদ্রোহ প্রতিহত করার চেষ্টার জন্য সেন্ট্রাল সুবেদার মেজর মো. নূরুল হককে সরকার শহীদ ঘোষণা করেছে। এডি খন্দকার আব্দুল আউয়াল এর সুরতহাল এবং ময়না তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, তার মৃত্যু ঘটেছে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে। ধারণা করে নেওয়া যায় যে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্যই তাকে বেয়নেটের আঘাতে হত্যা করা হয়েছে *(সূত্রঃ বিডিআর হত্যাকান্ড মামলায় বিজ্ঞ আদালতে রায়ের উদ্ধৃতাংশ, সংযোজনী-৩৪)।* এছাড়াও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (তৎকালীন লে. কর্নেল) মোঃ শামছুল আলম চৌধুরী স্বচক্ষে দেখেছেন সুবেদার সহকারী আবুল কাশেমকে কিছু হত্যাকারী কর্তৃক গুলি করে হত্যা করতে *(সূত্রঃ সাক্ষ নম্বর-৩৬)*

ঘটনা পরবর্তী বিষয়াবলী

৫৮। **ঘটনার পরবর্তী ও আওয়ামী লীগ নেতাদের কার্যক্রম**।

ক। সেনা তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছিল যে বিডিআরের বিদ্রোহী জওয়ানরা আওয়ামী লীগ এর গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের সাথে হত্যাকান্ডের পূর্বে যোগাযোগ করেছিল। এর প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ এর তৎকালীন মুখপাত্র এবং স্থানীয় সরকার বিষয়ক মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম সেনা তদন্ত প্রতিবেদন এর তীব্র সমালোচনা করেন এবং ঐ প্রতিবেদনকে উদ্দেশ্য প্রণোদিত হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি বিডিআর হত্যাকান্ডে যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধীরা জড়িত ছিল উল্লেখ করে তদন্ত ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করেন। তিনি বলেন, 'সত্যকে আড়াল করতে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এটি করা হয়েছে। এর মূল লক্ষ্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে জড়িত করা। রিপোর্টে মন হচ্ছে বিডিআর ঘটনা নিয়ে ধুম্রজাল ছড়িয়ে আওয়ামী লীগ, প্রকারান্তরে সরকারকে জড়ানোর অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে'। সৈয়দ আশরাফ সেনা তদন্ত প্রতিবেদনের সমালোচনা করে বলেন, 'রিপোর্টে অনেক কিছুই স্থান পায়নি। বিডিআর ঘটনার পিছনে কি মোটিভ ছিল তা রিপোর্টে আসেনি। ঘটনার সঙ্গে যুদ্ধাপরাধী বা স্বাধীনতাবিরোধীরা জড়িত ছিল কি-না তার উল্লেখ নেই। ঐ সময় পিলখানায় সেনা অভিযান চালালে কি পরিমাণ হতাহত হতে পারতো, সাধারণ মানুষের কি অবস্থা হত তারও উল্লেখ নেই' *(সূত্রঃ আমার দেশ ১৮ মে ২০০৯, সংযোজনী-৪৬)।*

খ। পিলখানার হত্যাকান্ডের পরে মতিয়া চৌধুরী পিলখানা হত্যাকান্ডের দায় ইসলামী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর উপর চাপিয়ে তদন্ত ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা চালান। তিনি একটি অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের বলেন, 'ঘটনার সময় অনেকের মুখে ভিন্ন তিন রং এর রুমাল দেখা গেছে, যা দেশের একটি জঙ্গি সংগঠনের পরিচিতি চিহ্ন'। বিডিআর হত্যাকান্ড বিষয়ে সেনা তদন্ত প্রতিবেদনের সমালোচনা করে মতিয়া চৌধুরী বলেন, 'তারা এত কিছু বিশ্লেষণ করল কিন্তু অ্যাশ, ইয়েলো এবং অরেঞ্জ রেড কালারের রুমাল কিভাবে এলো তা বিশ্লেষণ করল না। ঐ খানে যে তিন রং এর রুমাল ব্যবহার হয়েছে তা বাংলাদেশে যেসব জঙ্গিগোষ্ঠী রয়েছে তাদের মধ্যে একটি সংগঠনের তিনটি স্তরের পরিচিতি চিহ্ন' *(সূত্রঃ আমার দেশ ১৮ মে ২০০৯, সংযোজনী-৪৬)।*

গ। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানার অভ্যন্তরে ফজলে নূর তাপসকে যেসব সৈনিকেরা দেখেছেন তাদেরকে নির্যাতন করে তাদের জবানবন্দী থেকে তাপসের নাম বাদ দিতে বাধ্য করা হয়। সিপাহী সাজ্জাদ এবং সিপাহী মুহিত এর সাক্ষ্য অনুযায়ী তাপস নির্যাতনের সময় উপস্থিত ছিলেন *(সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৩ এবং কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১২)।*

ঘ। তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী কর্নেল ফারুক খান দাবি করেছিলেন যে বিডিআর হত্যাকান্ডে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে ***(সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ১৮ মার্চ ২০০৯, সংযোজনী-৪৭)।***

৫৯। <u>জাতীয় তদন্ত কমিটি।</u>

ক। হত্যাকান্ডের পর পরই তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুনকে সভাপতি ও প্রতিমন্ত্রী জনাব কামরুল ইসলামকে সদস্য করে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয় *(সূত্রঃ ভিডিও ক্লীপ, সংযোজনী-১৮),* যা পরবর্তীতে বাস্তবায়িত হয়নি। ০২ মার্চ ২০০৯ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের স্বম (রাজ-২)/গোপ্র-বিবিধ/৪-৫/২০০৯/২০৮ নম্বর স্মারকমূলে সাবেক সচিব জনাব আনিস-উস-জামান খানকে সভাপতি করে ১১ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল রফিকুল ইসলাম, এনডিসি, পিএসসি কে কো-অপ্ট করা হয়। কমিটির সংগঠন ছিলো নিম্নরূপঃ

(১) আনিস-উজ-জামান খান (সভাপতি)।
(২) এয়ার কমোডর এম সানাউল হক, বাংলাদেশ বিমান বাহিনী (সদস্য)।
(৩) কমোডর এম নাসির, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী (সদস্য)।
(৪) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোহাম্মদ হাসান নাসির (সদস্য)।
(৫) নব বিক্রম কিশোর ত্রিপুরা, অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক (সদস্য)।
(৬) মোঃ গোলাম হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (সদস্য)।
(৭) কাজী হাবিবুল আউয়াল, সচিব, আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক, মন্ত্রণালয় (সদস্য)।

(৮) মোহাম্মদ মইন উদ্দীন আবদুল্লাহ, যুগ্মসচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (সদস্য)।
(৯) ব্রি. জেনারেল নূর মোহাম্মদ, জাজ এডভোকেট জেনারেল, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (সদস্য)।
(১০) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ রফিকুল ইসলাম, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী (সদস্য)।
(১১) মোঃ এহছানুল হক, অতিরিক্ত সচিব প্রধামন্ত্রীর কার্যালয় (সদস্য)।
(১২) মেজর জেনারেল মোঃ মইনুল ইসলাম, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস (সদস্য)।

খ। **সুপারিশ**। বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে সংঘটিত একটি নিকৃষ্টতম বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ড। শুধু বিডিআর বা সেনাবাহিনীর মধ্যেই নয়, বরং এর প্রভাবসমূহ বহুমুখী ও সুদূরপ্রসারী। এর ফলে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। জাতি এমন কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর কখনো দেখতে চায় না। দেশ ও জাতির এ ক্রান্তিলগ্নে তাই আজ সরকার তথা প্রতিটি দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠানকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট ও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। এ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে তদন্ত কমিটি সরকারের সদয় বিবেচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত জরুরি ভিত্তিতে নিম্নলিখিত স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী (short and long term) সুপারিশসমূহ প্রস্তাবনা করছে।

(১) **স্বল্পমেয়াদী সুপারিশসমূহ**

(ক) বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনাকে 'মিউটিনি' (mutiny) আখ্যায়িত করে প্রয়োজনীয় প্রজ্ঞাপন জারিপূর্বক সেনাবাহিনীর আইন অনুযায়ী অনতিবিলম্বে 'ফিল্ড জেনারেল কোর্ট মার্শাল' (field general court martial) এর মাধ্যমে দ্রুত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ।

(খ) চোরচালান বন্ধসহ দেশের জাতীয় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে অনতিবিলম্বে সীমান্ত সুরক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) বিডিআর বিদ্রোহে যে সকল সেনা কর্মকর্তা, সেনাসদস্য নিহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাঁদের ও তাঁদের পরিবারবর্গকে যথোপযুক্ত সম্মান ও পুর্নবাসনের ব্যবস্থা করা। একইভাবে কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজর মোঃ নুরুল ইসলাম সহ যারা বিদ্রোহ প্রতিরোধ করতে গিয়ে জীবন বিসর্জনকারী অন্যান্য বিডির সদস্যদের যথোপযুক্ত সম্মান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

(ঘ) এ ধরনের জাতীয় সংকট মোকাবেলার জন্য অবিলম্বে সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি 'জাতীয় সংকট মোকাবেলা কমিটি (National Crisis Management Committee-NCMC)' গঠন।

(ঙ) বিডিআর বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র যথাসময়ে উদঘাটনে ব্যর্থতা এবং বিদ্রোহ দমনে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত প্রদানে ব্যর্থ ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।
(চ) এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে তিন বাহিনীর সমন্বয়ে একটি দ্রুত মোতায়েনযোগ্য বাহিনী গঠন।

(২) **দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশসমূহ**

(ক) বিডিআরকে পুর্নগঠন।

(খ) গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য পুনর্বন্টন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি 'কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সমন্বয় কমিটি (National Intelligence Coordiantion Committee-NICC)' গঠনের মাধ্যমে সকল গোয়েন্দা তথ্য পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(গ) জাতীয় নিরাপত্তা সংহতিকরণে সংকটকালে মিডিয়ার (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া) ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করে প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও আচরণ বিধি (code of conduct) প্রণয়ন।

(ঘ) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে অধীনস্থ সামরিক, আধা-সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসমূহের সমন্বয় বৃদ্ধির জন্য কার্যকর কৌশল নির্ধারণ।

(ঙ) বিদ্রোহ বা মিউটিনি সংশ্লিষ্ট আইনের ধারাসহ বিডিআরসহ অন্যান্য আধা-সামরিক বাহিনীর আইন সংশোধন ও যুগোপযোগী করণ।

(চ) পেশাগত দক্ষতা, প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, শৃংখলা ও নৈতিকতার সর্বোচ্চ মান নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে সামরিক, আধা-সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে অপারেশন ডাল-ভাতের ন্যায় কাজে সম্পৃক্ত না করে যথাসম্ভব নিজ নিজ দায়িত্বে নিয়োজিত রাখা।

(ছ) সামরিক, আধা-সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীতে উপযুক্ত কর্মপরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানসমূহ সময়োপযোগী করণ।

(ঝ) সামরিক, আধা-সামরিক ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মতো প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োগের ক্ষেত্রে যোগ্যতাকে একমাত্র মাপকাঠি হিসাবে বিবেচনায় নিয়ে যে কোন ধরণের তদবির/সুপারিশকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধকরণ।

৬০। **<u>সেনা তদন্ত কমিটি</u>।**

ক। জাতীয় তদন্ত কমিটির পাশাপাশি ০১ মার্চ ২০০৯ তারিখে সেনাবাহিনীর তৎকালীন কোয়ার্টার মাস্টার লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর নেতৃত্বের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীও একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটির সংগঠন ছিলো নিম্নরূপঃ

(১) বিএ-১১৮৭ লে. জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী - সভাপতি।
(২) বিএ-১৯০৩ মেজর জেনারেল আবদুল মতিন।
(৩) বিএ-২১৭৮ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল হোসেন।
(৪) বিএ-২২১২ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাব্বির-উল-করিম।
(৫) বিএ-২২১২ কর্নেল মোঃ আমিনুল ইসলাম।
(৬) বিএ-২৫৪৬ কর্নেল মোহাঃ আব্দুর রাজ্জাক।
(৭) বিএ-২৫৯০ লে. কর্নেল এবিএম আসাদুজ্জামান।
(৮) বিএ-২৮০৭ লে. কর্নেল মোঃ বেলায়েত হোসেন খান।
(৯) বিএ-৩৬৪৬ লে. কর্নেল এ কে এম সামছুল ইসলাম।
(১০) বিএ-৩৮৩৮ লে. কর্নেল সাইদুল আলম।
(১১) বিএ-৩৯৯৭ লে. কর্নেল সাজ্জাদ সিদ্দিক।
(১২) বিএ-২৯১৮ মেজর মোঃ গোলাম রহমান খান।
(১৩) বিএ-১০০৮০২ মেজর মোঃ নূরুল আমিন।
(১৪) বিএ-৪৩৫৯ মেজর মাহবুব সাবের।
(১৫) বিএ-৪৮১৫ মেজর আহমদ আশেক উল-আরেফিন।
(১৬) বিএ-৪৯৪৭ মেজর মোহাম্মদ আজিজুর রউফ।
(১৭) বিএ-৫৫১৪ মেজর তারেক হোসেন ভুইয়া।
(১৮) বিএ-৫৮৮৮ মেজর মোঃ শিমুল মাহমুদ ভূইয়া।
(১৯) বিএ-৬৩৭৭ ক্যাপ্টেন মোঃ আজাদ হোসেন।

(২০) বিএ-৬৫৯৬ ক্যাপ্টেন রেজাউর রহমান।
(২১) বিএ-৬৭০৪ ক্যাপ্টেন তাসনুভা তাবাসসুম।
(২২) বিএ-৬৭৯৬ ক্যাপ্টেন দিল আফসানা খান।
(২৩) বিএ-২২০৯ লে. কর্নেল জুলফিকার আলী হায়দার।

খ। <u>শাস্তি।</u>

(১) বিডিআর বিদ্রোহে নৃশংস হত্যাকান্ড সহ সংঘটিত অন্যান্য সকল অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে সেনা আইনের আওতায় এনে দ্রুত বিচারের মাধ্যমে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের জন্য আদালত জোর সুপারিশ করে।

(২) সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহে অন্যান্য যে সকল বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও বিডিআর সদস্যেদের সংশ্লিষ্টতা পরবর্তীতে উন্মোচিত হবে তাদের ব্যাপারে সেনা আইনের আওতায় দ্রুত বিচার কার্য সমাপ্ত করার জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৩) সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহে জড়িত পলাতক বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও বিডিআর সদস্যদেরকে অনতিবিলম্বে গ্রেফতার করে সেনা আইনে বিচার কার্য সমাপ্ত করার জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৪) ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখের সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহে জড়িত সকল ব্যক্তিকে সনাক্তকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৫) বিডিআর বিদ্রোহের সাথে জড়িত বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ, প্রতিষ্ঠান যাদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য অত্র আদালত কর্তৃক সীমাবদ্ধতার জন্য পাওয়া যায়নি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্টতা যা কি-না প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিডিআর বিদ্রোহের সাথে জড়িত সে ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের জন্য উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত আদালত গঠন করে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৬) বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রাধিকৃত অস্ত্রধারী বাহিনী (সশস্ত্র বাহিনী, এম ও ডি সি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন পুলিশ, বিডিআর, র‍্যাব, কারারক্ষী, আনসার ও ভিডিপি, কোস্ট গার্ড) এবং পরবর্তীতে আইন শৃংখলা রক্ষার নিমিত্ত অস্ত্র প্রাধিকৃত প্রতিষ্ঠিত বাহিনী যদি কোন প্রকার বিদ্রোহে সংশ্লিষ্ট হয় সে ক্ষেত্রে বিদ্রোহের শাস্তি স্বরূপ সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যু দন্ডের বিধান প্রচলনের জন্য আদালত সুপারিশ করে।

গ। <u>পুনর্গঠন।</u>

(১) বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানার অভ্যন্তরে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ রাইফেলসকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপনের নিমিত্ত বাংলাদেশ রাইফেলস এর নাম ও পোষাক পরিবর্তনসহ সার্বিক অবকাঠামোগত পরিবর্তন সাপেক্ষে একটি পর্ষদের মাধ্যমে পুনর্গঠনের জন্য অত্র আদালত সুপারিশ করে।

(২) বাংলাদেশ রাইফেলস এ ডিপার্টমেন্টাল অফিসার পদ বিলুপ্ত করে এবং নতুন করে পৃথক অফিসার শ্রেণী সৃষ্টি না করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে অফিসারদের প্রেষণে নিয়োগ দান এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ন্যায় বাংলাদেশ রাইফেলস এ অনারারি পদোন্নতি প্রদানের জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৩) বাংলাদেশ রাইফেলস আদেশ ১৯৭২ ও বাংলাদেশ রাইফেলস অর্ডিন্যান্স ১৯৭৬ সংশোধন সাপেক্ষে বাংলাদেশ আর্মি এ্যাক্টের আঙ্গিকে নতুন আইন করার জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৪) বাংলাদেশ রাইফেলস এ চাকরির বয়সসীমা ৫৭ বৎসর পর্যন্ত পূর্ব নির্ধারিত না রেখে চাকরির শর্তাবলী সেনাবাহিনীর ন্যায় প্রতিটি পদোন্নতির সাথে চাকরির সীমা বৃদ্ধির জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৫) ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে ঘটনার পূর্ব আলামত ও তথ্য লাভে ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহকে আধুনিক, যুগোপযোগী এবং সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান এবং পুনর্গঠনের জন্য অত্র আদালত সুপারিশ করে।

ঘ। <u>সমন্বয়।</u>

(১) জাতীয় পর্যায়ের দুর্যোগ/সংকট ও বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে স্থায়ী দুর্যোগ/সংকট ব্যবস্থাপনা সেল গঠনের জন্য অত্র আদালত সুপারিশ করে।

(২) বিডিআর বিদ্রোহের ন্যায় জাতীয় পর্যায়ে সংকট উত্তরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জনবল ও সরঞ্জামাদি ঢাকায় প্রস্তুত রাখা এবং আভিযানিক সমন্বয় ও নিয়ন্ত্রণ (Co-ordination and Operational Control) সেনাবাহিনীকে প্রদান করা যেতে পারে।

(৩) জাতীয় পর্যায়ের দুর্যোগ ও বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য দেশের আপামর জনসাধারণের মাঝে সঠিক চিত্র তুলে ধরার জন্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া ব্যবস্থাপনার জন্য জাতীয় পর্যায়ে স্থায়ী সেল গঠনের জন্য অত্র আদালত সুপারিশ করে।

(৪) বিডিআর বিদ্রোহের ন্যায় সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের ক্ষেত্রে সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রয়োজন হলে আরো নিবিড় সমন্বয় সাধন স্বাপেক্ষে সময়োচিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৫) ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানার অভ্যন্তরে বিদ্রোহে নিহত ব্যক্তিদের যাদের লাশ পাওয়া যায় নাই অথবা সনাক্ত করা সম্ভব হয় নাই তাদের সনাক্ত করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৬) বাংলাদেশ রাইফেলস্ সদর দপ্তর পিলখানার অভ্যন্তরে সংঘটিত সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহের ন্যায় জাতীয় পর্যায়ের সংকট/বিপর্যয় মোকাবেলা করার জন্য পরবর্তীতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ঘটনাস্থল এবং এর পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের মোবাইল নেটওয়ার্ক নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত সুপারিশ করে।

ঙ। <u>ক্ষতিপূরণ।</u>

(১) সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহে নিহত এবং আহত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অফিসার ও সদস্যদের বিষয়টিকে সামরিক চাকরিতে আরোপনীয় বিবেচনা করার জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(২) সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়ার এবং বিডিআর বিদ্রোহে নিহত, নিখোঁজ এবং ক্ষতিগ্রস্ত সামরিক অফিসার এবং সেনাসদস্যের পরিবারের পুনর্বাসন ও কল্যাণের যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৩) সার্বিক বিবেচনায় মেজর আবু সাঈদ গাজ্জালী দস্তগীর ও ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দার নূরকে মৃত বিবেচনা করে তাদের বিষয়ে মরণোত্তর সকল প্রশাসনিক কার্যক্রম সম্পন্ন করে উত্তরাধিকারীদের আর্থিক প্রাপ্যতার বিষয়টি নিষ্পন্ন করার জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৪) সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহে যে সকল বিডিআর সদস্য বিদ্রোহ প্রতিরোধে ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের অবদান যথাযথ মূল্যায়ন করার জন্য আদালত সুপারিশ করে।

চ। **বিবিধ।**

(১) বাংলাদেশ রাইফেলস এর ন্যায় সংস্থাকে Mission ও Capabilities এর বাইরে দীর্ঘ মেয়াদী এমন কোন দায়িত্ব না দেয়া যা কি না একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর মনোবল ও আত্মসম্মান বোধ ক্ষুণ্ন করে সে ব্যাপারে আদালত সুপারিশ করে।

(২) আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোন সমস্যা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে কালক্ষেপণ না করে দাপ্তরিক জটিলতা পরিহার করতঃ অনতিবিলম্বে সমস্যা সমাধান করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৩) বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৪) বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানার অভ্যন্তরে সংঘটিত সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রেক্ষিতে বিডিআর সদর দপ্তরের অভ্যন্তর থেকে হারানো অস্ত্র ও গোলাবারুদ সমূহ জরুরি ভিত্তিতে উদ্ধারের জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৫) বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর শহীদ সাবেক মহাপরিচালকের নাম ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট সুবিধা ভোগী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত সুপারিশ করে এবং বিডিআর শপ, দরবার হল লিজ, অপারেশন ডাল ভাত, পুকুর লিজ এবং বিভিন্ন ক্রয় প্রক্রিয়ায় অনিয়মগুলি বাংলাদেশ রাইফেলস কর্তৃক তদন্ত আদালত গঠন করতঃ বিস্তারিত তথ্য উদঘাটন সাপেক্ষে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত সুপারিশ করে।

(৬) একান্ত মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করে পিলখানার বিডিআর বিদ্রোহে শহীদ সেনা কর্মকর্তাদের পরিবারও সন্তানদের আর্থিক সুবিধা (প্লট/ফ্ল্যাট, পেনশন, এককালীন অর্থ প্রদান ইত্যাদি), পত্নীগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী যথোপযুক্ত চাকরির সুবিধা এবং সন্তানদের উন্নত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি সংক্রান্ত বিষয়গুলো যথোপযুক্ত ও সুনির্দিষ্টভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি পর্ষদের মাধ্যমে নির্ধারণ করতঃ আদেশ আকারে প্রকাশ করার জন্য আদালত সুপারিশ করে।

৬১। **তদন্ত কমিটি সমূহের বিষয়ে উদঘাটিত তথ্যাবলি**

ক। **জাতীয় তদন্ত কমিটি**

(১) প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জাতীয় কমিটিকে Commission of Inquiry Act ১৯৫৬ সকল ক্ষমতা প্রদান করা হলেও উক্ত কমিটি উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা থেকে বিরত থেকেছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২২)।*

(২) অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কমিটির সদস্য ব্রি. জেনারেল হাসান নাসিরের প্রস্তাব প্রত্যাখান করা হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২২)।*

(৩) গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ বা প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২২ ও সরকারারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(৪) একাধিক সাক্ষী জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনে সাক্ষ্য প্রদান করেছেন যে তাদের সাক্ষ্য জাতীয় তদন্ত কমিটি কর্তৃক গ্রহণ করা হয়নি কিন্তু তাদের জবানবন্দী তদন্ত প্রতিবেদনে সংযুক্ত করা হয়েছে *(সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০১)।*

(৫) জাতীয় তদন্ত কমিটির সভাপতি জনাব আনিসুজ্জমান খান, নিজেই বলেছেন, তিনি পরিপূর্ণ তদন্ত করতে পারেননি। যাদের সাক্ষ্য প্রমাণ নেয়া দরকার ছিল, তারা সাক্ষ্য দেননি। সে ক্ষেত্রে জনাব আনিসুজ্জমান খানের তদন্ত পরিপূর্ণ হয়নি বলে লে. জেনারেল মইনুল ইসলাম মনে করেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৬)।*

(৬) তথ্য উপস্থাপন এবং যোগ্য সদস্য থাকার পরও মোবাইল সিডিআর সংগ্রহ করতঃ কল রেকর্ড পর্যালোচনা করে দেশী বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের সনাক্ত করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০ এবং সাক্ষী নম্বর-২২)।*

(৭) অনুমান ভিত্তিক মন্তব্যের মাধ্যমে সন্ত্রাসী ও মৌলবাদী সংগঠনের উপর দায় চাপানো হয়েছে *(সূত্রঃ সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-০১ এবং সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(৮) রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের নাম উঠে আসার পরও তাদেরকে তদন্তের আওতায় এনে অপরাধ নির্ণয় করা হয়নি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২২)।*

(৯) প্রতিবেদন গোপনীয় হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে এবং কোন প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দেয়া হয়নি। ফলে সংশ্লিষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ তদন্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের উপর কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেনি।

(১০) কমিটির সদস্য সচিব এককভাবে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করতেন যেখানে সদস্যদের ক্ষমতা সীমিত করা হয়েছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২২, সাক্ষী নম্বর-১০ এবং সরকারি কর্মকর্তা সাক্ষী নম্বর-০৫)।*

(১১) কমিটির সদস্য সচিব তদন্ত বিষয়ে নিয়মিত এইচটি ইমামের সাথে যোগাযোগ রাখতেন বলে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২২)।*

(১২) অনেক গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২২)।*

(১৩) বিভিন্ন ক্ষেত্রে অধিকতর তদন্তের সুপারিশ করে কমিটি নিজেদের দায় এড়িয়ে গেছেন।

(১৪) কমিটি সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ যেমন এনএসআই, ডিজিএফআই, র‍্যাব, সিআইডি ও পুলিশের এসবিকে তাদের সংগৃহীত বিভিন্ন গোয়েন্দা তথ্য ও প্রয়োজনীয় প্রমাণাদি পেশাগত দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে কমিটির নিকট সরবরাহ করার জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু বর্ণিত সংস্থাসমূহ হতে ঈপ্সিত সহযোগিতা পাওয়া যায়নি মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে। তদন্ত কার্যক্রমে অসযোগিতার/বিচারিক কাজে বাধা দেয়ার দায়ে উল্লিখিত সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে/কর্মকর্তাদেরকে দোষী সাব্যস্ত করে কোন সুপারিশ করা হয়নি।

(১৫) তদন্ত কমিটি বিদেশী সংশ্লিষ্টতা এবং বহিরাগতদের বিষয়ে কোন তদন্ত করেনি ।

খ। <u>সেনা তদন্ত আদালতের কার্যক্রম</u>।

(১) সেনাপ্রধান সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তদন্ত আদালতের টার্মস অভ্ রেফারেন্স পরিবর্তন করা হয় যার পক্ষে কোন দালিলিক প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে তদন্ত আদালত পরবর্তীত টার্মস অভ্ রেফারেন্স এর উপর কাজ করেছে যেখানে তদন্ত কার্যক্রম অনেক সীমিত করা হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৩)।*

(২) নির্দেশনা দেয়া হয় তদন্ত কার্যক্রম শুধুমাত্র সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে হবে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৩)।*

(৩) ডিজিএফআই এবং এনএসআই দুই সংস্থা থেকেই স্টেটমেন্ট দিতে অস্বীকৃতি আসে। কমিটিকে জানানো হয়েছিল যেহেতু জাতীয় পর্যায়ে তদন্ত কমিটি আছে সেনাবাহিনীর বাইরে যারা আছেন তারা জাতীয় কমিশনেই স্টেটমেন্ট দেবেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৫)।*

(৪) কিছু কিছু স্টেটমেন্ট জাতীয় তদন্ত কমিটি থেকে সংগ্রহ করা হয় যেখানে তদন্ত আদালতের প্রশ্ন করার সুযোগ ছিল না *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৩)।*

(৪) কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা রাজনৈতিক ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে তদন্ত আদালতের আওতায় আনার অধিকার কমিটিতে দেওয়া হয়নি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৩)।*

(৫) তদন্ত কার্যক্রম চলাকালীন সময় (প্রথম অবস্থায়) হঠাৎ সভাপতি তদন্ত আদালতকে জানায় যে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সাকিবকে তদন্ত আদালত থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। এছাড়া আরও দুইজন জুনিয়ার অফিসারকে পরিবর্তন করা হয়। এর দুই থেকে তিনদিন পর পিএস পরিদপ্তরের পত্রের মাধ্যমে চারজন নতুন অফিসারকে তদন্ত আদালতে যুক্ত করা হয়। যার মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন মেজর জেনারেল মতিন ও সদ্য পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্নেল রাজ্জাক *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৩)।*

(৬) তদন্ত আদালতের সভাপতির সাথে তদন্ত দলের যোগাযোগ কমে যায় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৩)।*

(৭) মেজর জেনারেল মতিন জবানবন্দী নিজেস্ব সুবিধানুযায়ী সংশোধন করতেন, যা অনুপযুক্ত মনে করতেন তা বাদ দিতেন। এতে করে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়ে যেত। এ নিয়ে কমিটিতে বিরোধ সৃষ্টি হয়। ফলে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আনোয়ার তদন্ত আদালত থেকে বাদ পড়েন। মতানৈক্যের কারণে ব্রি. জেনারেল সাবিককেও সরিয়ে দেওয়া হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৩)।*

(৮) জবানবন্দীসমূহ মেজর জেনারেল তারেকের কাছে নিয়ে যেতেন মেজর জেনারেল মতিন এবং মেজর জেনারেল তারেক সেগুলো পর্যালোচনা করতেন (লে. কর্নেল জুলফিকার)। একবার লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর মেজর জেনারেল মতিনকে বলেছিলেন যে, মেজর জেনারেল তারেক তদন্ত আদালাতের কপি চেয়েছেন, দেয়া ঠিক হবে কি-না। উত্তরে মেজর জেনারেল মতিন বলেছিলেন উনি তো অফিসিয়ালি পাবেন আমরা কেন দিব *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৫)।*

(৯) তদন্ত আদালতের নিয়ন্ত্রণ নিতে মেজর জেনারেল মতিন ও কর্নেল রাজ্জাককে নিযুক্তির পর তদন্তের গতিপথ পরিবর্তিত হয়। এছাড়া তদন্ত আদালতের বিভিন্ন জবানবন্দী, উদঘাটিত তথ্যাবলী ও অন্যান্য বিষয় পরিবর্তন, বাদ দেওয়া ইত্যাদির কারণে আসল বিষয়বস্তু তুলে ধরা সম্ভব হয়নি বা উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৩)।*

(১০) ডিজিএফআই থেকে বারংবার তদন্ত আদালত চলার সময় টেলিফোনের মাধ্যমে হুমকি, বিভিন্ন নির্দেশাবলী প্রদানের ফলে তদন্ত আদালতের কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে ও বাঁধাগ্রস্ত করে। এছাড়াও তাদের হুমকির কারণে তদন্ত আদালতের সদস্যদের বিচলিত হতে দেখা যায়। বিশেষ বিশেষ সাক্ষীর ক্ষেত্রে তাদের স্পষ্ট নির্দেশিকা যেমন, লে. কর্নেল শামস এর ক্ষেত্রে পালন করতে হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৩)।*

(১১) ব্রি. জেনা. মামুন খালেদ পরিচালক, সিআইবি জবানবন্দী পেতে বেশ বেগ পেতে হয়। তাকে বারংবার অনুরোধ করার পর সে জবানবন্দী দিতে রাজি হয়। কিন্তু তদন্ত আদালতের কোন প্রশ্নের উত্তর প্রদান করে নাই *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৩)।*

(১২) ডিজিএফআইসহ অন্যান্য সংস্থাগুলির অসহযোগিতা তদন্তকে প্রভাবিত করার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। তাছাড়া, মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিক যেভাবে প্রতি সপ্তাহে অগ্রগতির জানতে চেয়েছিলেন সেটাও প্রভাবিত করার জন্য *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৫)।*

(১৩) যে সমস্ত ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠান তদন্ত কার্যক্রমে সহায়তা করেননি তাদের বিরুদ্ধে অসযোগিতা/বিচারিক কাজে বাঁধার অভিযোগ এনে কোন সুপারিশ করা হয়নি *(সূত্রঃ সেনা তদন্ত প্রতিবেদন)।*

(১৪) মোবাইল সিডিআর সংগ্রহ করার জন্য কাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল তা মেজর জেনারেল মতিনের স্মরণে নেই। তবে তোরাব আলী একাধিকবার বিদেশে যোগাযোগের প্রমাণ ছিলো। কিন্তু বিদেশে কার সাথে কথা বলেছে তা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৫)।*

(১৫) বিদ্রোহীদের আত্মসমর্পণের পর পিলখানায় প্রবেশকারী সেনা অফিসারগণ বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করেছিলেন। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সেনাবাহিনীর তদন্ত আদালতের সভাপতি লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরি উক্ত অফিসারদেরকে সকল আলামত জমা দেয়ার আবেদন জানিয়েছিলে এবং সেই অনুসারে অফিরসারগণ আলামতসমূহ জমা দিয়েছিলেন। সেনাবাহিনীর তদন্ত প্রতিবেদনে উক্ত আলামতের তালিকা বা এই বিষয়ে কোন তথ্য সংযোজন করা হয়নি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৩ এবং সাক্ষী নম্বর-৯৭)।*

(১৬) তদন্ত আদালত বিদেশী সংশ্লিষ্টতা এবং বহিরাগতদের বিষয়ে কোন তদন্ত করেনি। উল্লিখিত উদঘাটিত তথ্য স্পষ্টভাবে ভারতীয় বিএসএফ এর ইন্ধন নিশ্চিত করে কিন্তু তদন্ত আদালত এই বিষয়ে অধকতর তদন্ত এবং কোন সুপারিশ করা থেকে বিরত থেকেছে *(সূত্র সেনা তদন্ত প্রতিবেদন)*

(১৭) ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর হত্যাকান্ডের পর গঠিত সেনা তদন্ত আদালতে সভাপতি লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর ভাষ্যমতেঃ

(ক) তদন্ত কার্যক্রম অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করা এবং সাক্ষীদের অনুপস্থিতি এই দু'টি বিষয়ে তদন্ত আলাদতের সীমাবদ্ধতা ছিলো। বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ এবং গোয়েন্দা সংস্থার কতিপয় কর্মকর্তা এ বিষয়ে সাক্ষী দিতে রাজি হয় নাই। সেনা সদর কর্তৃক গোয়েন্দা সংস্থাসমূহে বারংবার তাগাদা দেয়া সত্ত্বেও কর্মকর্তাদের উপস্থিত করা যায় নাই। সেনাবাহিনীর প্রধানকে অনুরোধের পরেও তারা বিষয়টি সুরাহা করতে পারে নাই। ঐ সময়ে জাতীয় পর্যায়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিলো। গঠিত কমিটিতে অনেকেই সাক্ষ্য প্রদান করেছেন।

(খ) তদন্তের স্বার্থে কললিস্ট যাচাই করার প্রচেষ্টা করা হয়েছে। একজন সিগন্যাল অফিসার এই কললিস্ট যাচাইয়ের দায়িত্বে ছিলেন। প্রযুক্তির সাহায্যে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছেন। দেশে অবস্থানরত মোবাইল ব্যাবহারকারীদের কললিস্ট যাচাই করে তদন্ত করা হয়েছে। বিদেশে অবস্থানরতদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ ছিলো না।

(গ) তদন্তের জন্য পর্যাপ্ত সময় পাওয়া যায়নি। সংশ্লিষ্টদের অধিকাংশের সহযোগিতা না পাওয়ায় সত্য উদঘাটনের স্বার্থে অধিকতর তদন্তের সুপারিশ করা হয়েছে।

(ঘ) তদন্তের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকূলে ছিলো না। অধিকন্তু, এই কোর্ট অভ্ ইনকোয়ারি শহীদ সেনা সদস্যদের পারিবারিক কল্যাণ, পুনর্বাসন, পেনশনসহ মানবিক বিষয়াদির উপর অধিকতর বিষয়ে সুপারিশ করেছিলো।

(ঙ) তৎকালীন সরকার ও সেনা নেতৃত্ব দ্বারা তদন্তে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করা হয়নি। তদন্ত চলাকালে তদন্তের বিষয়ে মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকের সাথে কোন প্রকার কথোপকথন, যোগাযোগ এবং সাক্ষাৎ হয়নি। সাক্ষীর সাক্ষ্য মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিক কর্তৃক স্ক্রিনিং করা হতো কি-না তার জানা নাই।

(চ) তদন্তকালে লে. জেনারেল জাহাঙ্গীরের কাছে কেউ কোন আলামত জমা দেয় নাই। এছাড়া, কোথায় কার কাছে আলামত জমা হয়েছে সে বিষয়ে তার জানা নাই। সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সকল সাক্ষীর জন্য সম বা একই আইন প্রয়োগ করা হয়েছে।

(ছ) মেজর জেনারেল মতিন তদন্ত কার্যক্রমে একজন সদস্য হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। তার নিয়োগের ফলে তদন্তে সহায়তা করায় লে. জেনারেল জাহাঙ্গীরের কাজের চাপ কমে আসে। মেজর জেনারেল আব্দুল মতিন তদন্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করেননি।

(জ) জনাব তাপস, জনাব শেখ সেলিম এবং সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুনের সাথে বিডিআর সদস্যদের দাবি দাওয়া নিয়ে আলোচনা অবশ্যই চাকরি বিধির লঙ্ঘন। সকলকেই আইনের আওতায় আনা উচিত।

(ঝ) সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এবং সকল বিষয় পূর্বে থেকে পর্যবেক্ষণ, মূল্যায়ন 'কাউন্টার মেজার' নেয়া হলে বিডিআর বিদ্রোহ হয়তোবা প্রতিরোধ করা যেত।

(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০৩)।

গ। **<u>জনাব আব্দুল কাহার আকন্দের তদন্ত কার্যক্রম</u>**। কেস ডকেট পর্যালচনা করে এবং অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে জনাব আব্দুল কাহার আকন্দের তদন্ত কার্যক্রমের উপর নিম্নলিখিত বিষয়াদি স্পষ্টিকরণের জন্য ইমেইলের মাধ্যমে যোগাযোগ করা হয় কিন্তু তিনি বিবৃতি প্রেরণ করলেও প্রশ্নের উত্তর দেননিঃ

(১) এজাহারে কোত ও ম্যাগাজিন হতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুণ্ঠনের ঘটনায় কোন অভিযোগ করা হয়নি। বাসা-বাড়ি হতে মালামাল লুণ্ঠনের ঘটনায় সেনা অফিসারগণের অভিযোগ এজাহারের অংশ হিসেবে গণ্য করার জন্য বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করা হয়। কোত ও ম্যাগাজিন হতে অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুণ্ঠনের ঘটনায় কোন অভিযোগ বিজ্ঞ আদালতে প্রেরণ করার প্রমাণ পাওয়া যায়নি ।
(২) তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে শারীরিকভাবে নির্যাতন ও ধর্ষণের অভিযোগ ঘটনা অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়নি।

(৩) লালবাগ থানার মামলা নং-৬৫ তারিখ-২৮/০২/২০০৯খ্রি. এবং নিউমার্কেট থানার মামলা নং-৯ তারিখ-০৬/০৪/২০০৯খ্রি. দু'টি মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা কিন্তু উভয় মামলার জন্য একটি কেস ডকেট সংরক্ষণ করা হয়েছে। নিউমার্কেট থানার মামলায় অভিযোগপত্র দাখিলের মাধ্যমে নিউমার্কেট থানার মামলাটির তদন্ত নিষ্পত্তি করা হয়েছে। কিন্তু লালবাগ থানার মামলাটির তদন্ত নিষ্পত্তি সুস্পষ্ট নয়। যদিও ফৌজদারি কার্যবিধি ১৫৪ ধারা মোতাবেক মামলা রুজু করা হলে ফৌজদারি কার্যবিধি ১৭৩ ধারায় তদন্ত প্রতিবেদন (অভিযোগপত্র/চূড়ান্ত রিপোর্ট) বিজ্ঞ আদালতে দাখিলের মাধ্যমে মামলার তদন্ত নিষ্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিধান রয়েছে।

(৪) প্রসিকিউশন পক্ষের প্রধান কৌশলি জনাব আনিসুল হক বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করেন যে, 'বিডিআর আইনের ১০এ ধারার বিধান লঙ্ঘন করে আসামিগণ জনাব শেখ ফজলে নূর তাপস এমপি, জনাব শেখ সেলিম এমপি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন এমপির সাথে দাবি দাওয়া আদায়ের জন্য বিভিন্ন সময়ে দেখা ও যোগাযোগ করে যা ষড়যন্ত্রের অংশ।' তার বক্তব্য বিজ্ঞ বিচারক রায়ের ৮ম পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া আসামিদের জবানবন্দীতে এবং বিজ্ঞ আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে বর্ণিত ষড়যন্ত্রের অভিযোগ পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে স্বীকার করেছে। জনাব কাহার সাবেক স্বারাষ্ট্র মন্ত্রী এড. সাহারা খাতুন এমপি, জনাব শেখ সেলিম এমপি, জনাব শেখ ফজলে নূর তাপস এমপিগণের সাথে বিদ্রোহীদের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সংক্রান্তে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি থাকা সত্ত্বেও বর্ণিত অভিযোগসমূহ অভিযোগপত্রে উপস্থাপন করেননি এবং সংশ্লিষ্ট কাউকে অভিযোগপত্রে সোপর্দ করেননি।

(৫) বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের স্বীকারোক্তি না থাকা সত্ত্বেও জনাব নাসিরউদ্দিন পিন্টু বিডিআরের সমর্থনে জনতার মিছিলে হাত তালি দেয়া, বিদ্রোহে ও পলায়নে সহায়তার ঘটনায় অভিযোগপত্রে বিস্তারিত উল্লেখ করে তাকে অভিযোগপত্রে সোপর্দ করা হয় যা এক পাক্ষিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তদন্ত।

(৬) আসামি সিপাহী সেলিম রেজা মোবাইল ফোনে সাবেক স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী এডভোকেট সাহারা খাতুন এমপি, জনাব শেখ ফজলে নূর তাপস এমপি, এটিএম বাংলার সাংবাদিক এসএম বাবু এবং অন্যদের সাথে ঘটনার সময় ও পূর্বে কথা বলেছে মর্মে স্বীকারোক্তি প্রাদান করেছে, যা সংশ্লিষ্ট সাক্ষীগণের জবানবন্দীতে সমর্থিত। ডিজি বিডিআর মেজর জেনারেল জনাব শাকিল আহমেদসহ তৎকালীন বিডিআরে কর্মরত সিনিয়র সেনা কর্মকর্তাগণ তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী ও সরকারের অন্যান্য কর্তাব্যক্তিগণের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করে তাৎক্ষণিক সেনা অভিযানের অনুরোধ করেছিলেন। তাদের কথোপকথনের সত্যতা যাচাইসহ সংশ্লিষ্ট সকলের মোবাইল ফোন সিডিআর সংগ্রহ করে প্রযুক্তিগত সাক্ষ্য-প্রমাণ অভিযোগপত্রে উপস্থাপন করা হয়নি ।

(৭) বিদ্রোহের প্রাথমিক অবস্থায় বিদ্রোহীরা দুর্বল ছিল। একজন বিদ্রোহীকে সেনা অফিসারগণ আটক করতে সক্ষম হয়েছিল। সেনা অফিসারগণের অনুরোধে র‍্যাব-৩ এর একটি টিম পিলখানায় প্রবেশের অপেক্ষায় ছিল। সেনা অফিসারগণ পিলখানার অবস্থা জানিয়ে তাৎক্ষণিক উদ্ধার অভিযান পরিচালনার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও সরকারের কর্তাব্যক্তিগণকে বারবার অনুরোধ করেছিল। বিদ্রোহের প্রায় এক ঘন্টা পর বিদ্রোহীরা সেনা অফিসারগণকে খুন করে। এ দীর্ঘ সময়ে কেন উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করার ব্যবস্থা করা হয়নি, এ প্রশ্নের জবাবে প্রাসঙ্গিক তদন্ত করা হয়নি ।

(৮) যারা সেনা অফিসারগণকে খুন কারার, ঘটনার আলমত ধ্বংস করার এবং পলায়নের সুযোগ দিয়েছে তাদের বিষয়ে তদন্ত করা হয়নি ।

(৯) তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনা নিয়ন্ত্রণে নেতৃত্ব দিয়েছেন। তদন্তকালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার জবানবন্দি লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

(১০) আসামি সিপাহী মো. সেলিম রেজাসহ একাধিক আসামি স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীতে জনাব শেখ সেলিম এমপির সাথে দেখা ও যোগাযোগের বিষয় স্বীকার করেছে। তদন্তকালে এ বিষয়ে জনাব শেখ সেলিম এমপিকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তার জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা হয়নি ।

(১১) তদন্তকালে শহীদ ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দার নূরসহ অসনাক্তকৃত মৃতদেহ সানাক্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

৬২। **<u>সেনাপ্রধানের অফিসার এ্যাড্রেস</u>।** ২৮ ফেব্রুয়ারি সেনাসদরের অগ্রযাত্রা হলে তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ অফিসারদেরকে এ্যাড্রেস করেন। অফিসার এ্যাড্রেসের সময় বেশ কিছু অফিসার সেনা অভিযান পরিচালনা না করার জন্য এবং অফিসারদের জীবন বাঁচানোর জন্য কোন পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।*** ০১ মার্চ বিকালে সেনাকুঞ্জে পুনরায় সেনাপ্রধান অফিসারদের সাথে কথা বলেন যেখানে অফিসাররা প্রধানমন্ত্রীকে আনার দাবি তোলেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।***

৬৩। **<u>অফিসারদের সাথে প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময়</u>।** ০২ মার্চ ২০০৯ তারিখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অফিসারদের সাথে কথা বলার জন্য সেনাকুঞ্জে আসেন। প্রধানমন্ত্রীর সামনেও বেশ কিছু অফিসার তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং বেশ কিছু দাবি দাওয়া তুলে ধরেন যার অন্যতম ছিল অপারেশন রেবেল হান্ট পরিচালনা করা। প্রধানমন্ত্রী অপারেশন রেবেল হান্ট পরিচালনা করতে সম্মতি প্রদান করেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০৫)।***

৬৪। **<u>ঘটনার অব্যবহিত পরে পেশ ইমামের অস্বাভাবিক মৃত্যু</u>**।

ক। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ইমাম সাহেব পরিবাবরসহ পিলখানা ত্যাগ করেন। ২৮ শে ফেব্রুয়ারি তারিখ তিনি আবহানী মাঠে যোগ দেন এবং ১ মার্চ সন্ধ্যা ৬টায় তাকে পিলখানায় ঢোকানো হয়। কিন্তু পরিবারদের ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়নি। ১০ মার্চ ২০০৯ তারিখ বেলা ১১০০ থেকে ১২৪৫ ঘটিকা পর্যন্ত তার স্ত্রীর সাথে ইমাম সাহেবের ফোনে কথা হয়। ঐ সময় পর্যন্ত তিনি সুস্থই ছিলেন। তাঁকে কী কী জিজ্ঞাসাবাদ করা হত তা তিনি স্ত্রীকে বলতেন। তিনি বলেছেন যে সেনাবাহিনীর লোকজন এবং আব্দুল কাহার আকন্দ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তিনি বিডিআর অফিসাররা যে প্রধানমন্ত্রীর কাছে সাহায্য চেয়েছে, হিন্দি এবং ইংলিশে কথা শুনেছেন এগুলো তিনি বলেছেন। তখন তাকে বলা হয়েছে যে তার কোন কথা বলার প্রয়োজন নাই, তাঁকে শুধু একটি কাগজে স্বাক্ষর করতে হবে। তাঁকে প্রচন্ড ভয়ভীতি দেখানো হয়েছে। বিশেষ করে তিনি বলেছেন যে অন্য বিডিআর সদস্যদের যেভাবে নির্যাতন করা হয়েছিল সেটি তাঁকে সরাসরি দেখানো হয়েছে। এক দিন তাকে দেখানো হয়েছিল কিভাবে বিডিআর সৈনিকদের লিঙ্গাতে ইলেক্ট্রিক শক দেয়া হচ্ছে। এসব দেখিয়ে তাঁকে বলা হত তারা যে কাগজ দিয়েছে সেখানে স্বাক্ষর করতে, তা না হলে তাঁর অবস্থা ঐ সৈনিকদের মতই হবে ***(সূত্রঃ বিডিআর সাক্ষী নম্বর-০৩)।***

খ। ১০ মার্চ ২০০৯ তারিখে ২টায় আব্দুল কাহার আকন্দ ইমাম সাহেবকে দরবার হলে ডেকে নেন এবং জবানবন্দী পরিবর্তন করা এবং রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকেন এবং ভয় ভীতি দেখাতে থাকেন। হঠাৎ ইমাম সাহেব ঘামতে শুরু করেন। তা দেখে আব্দুল কাহার আকন্দ বলেন, ইমাম সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে তাড়াতাড়ি বিডিআর হাসপাতালে নিয়ে যাও।' তিনি তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন বিডিআর হাসপাতালে তাকে কী চিকিৎসা দিয়েছে? তিনি বলেছেন তাকে শুধু ইনজেকশন ও স্যালাইন দিয়েছে। সন্ধ্যা ৬টায় তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় ***(সূত্রঃ বিডিআর সাক্ষী নম্বর-০৩)।***

গ। তার স্বামী তাকে বলেছেন জবানবন্দি চেঞ্জ করার জন্য এবং রাজস্বাক্ষী হওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি চাপ দিয়েছে আব্দুল কাহার আকন্দ। ১০ মার্চ সন্ধ্যা ৬ টার দিকে ইমাম সাহেব কল দিয়ে তার স্ত্রীকে বলেন যে ইমাম সাহেবকে অ্যাম্বুলেন্স এ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তিনি ৩০ মিনিটের মধ্যে তার ছোট ভাইকে নিয়ে ঢাকা মেডিকেলে যান। সেখানে ইমাম সাহেবের সাথে তার বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়। ইমাম সাহেবকে কী জিজ্ঞাসাবাদ করেছে, আব্দুল কাহার আকন্দ কীভাবে স্বাক্ষর নেয়ার জন্য চাপ দিচ্ছে সেসব কথাও বলেন। তিনি এক পর্যায়ে বলেন, 'আব্দুল কাহার আকন্দ একজন ইবলিস শয়তান' ***(সূত্রঃ বিডিআর সাক্ষী নম্বর-০৩)।***

ঘ। হাসপাতালে শুয়েও তিনি বলেছেন যে, তিনি কখনোই মিথ্যা সাক্ষী দেবেন না। যা তিনি দেখেন নি, তা তিনি বলবেন না। পরের দিনই ১১ মার্চ বেলা ১০টা ৪৫ মিনিটে হঠাৎ করেই তিনি মারা যান। এরপর সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানেই তাঁর ময়নাতদন্ত করা হয়। প্রশ্নোত্তরে কামরুন নাহার শিরিন বলেছেন যে তিনি বলেছেন যে ইমাম সাহেবকে কোন অত্যাচার করা হয়নি। তবে তাঁকে রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য এবং আব্দুল কাহার আকন্দের কথামত জবানবন্দী দেয়ার জন্য চাপ দেওয়া হয়েছে ***(সূত্রঃ বিডিআর সাক্ষী নম্বর-০৩)।***

৬৫। **মামলা রুজু।** পুলিশ পরিদর্শক নবজ্যোতি খিসা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা লালবাগ থানা ডিএমপি ঢাকা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ১৩০০ ঘটিকার পর পুলিশ কমিশনারের আদেশে এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ২৩০০ ঘটিকায় বিডিআর সদর দপ্তরে সংঘটিত নারকীয় হত্যাকান্ড, অগ্নি সংযোগ, লুটতরাজ ও অসংখ্য অপরাধমূলক ঘটনাবলীর বিষয়ে লালবাগ থানায় একটি এজাহার দায়ের করেন এবং লালবাগ থানার মামলা নং ৬৪ তারিখ ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ দন্ডবিধির ধারা ১২০বি/১২১/১২১-এ/১৪৭/১৪৯/৩৩৩/৩৫৩/৩৪২/৩৪৩/ ৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭/৩০২/৩৪৬/৪২৭/৩৮০/৩৮২/২০১/১১৪/১০৯/৩৪ ও বিস্ফোরক দ্রব্যাদি আইনের ৩/৪ ধারা মতে রুজু করা হয় ***(সূত্রঃ এজাহারের কপি, সংযোজনী-৪৮)।***

৬৬। **মামলার অগ্রগতি।**

বিচারিক আদালত ও আপিল আদালতে সাজার বিবরণী

সাজার প্রকার	বিচারিক আদালতের রায় (৫ নভেম্বর ২০১৩)	আপিল আদালতের রায় (২৬ ও ২৭ নভেম্বর ২০১৭)							
		বহাল	সাজা কমিয়ে	সাজা বাড়িয়ে	খালাস	মৃত্যু	অন্যান্য সাজা কমিয়ে	অন্যান্য সাজা বাড়িয়ে	মোট সাজা
মৃত্যুদন্ড	১৫২ জন	১৩৯ জন	৮ জন (যাবজ্জীবন)	-	৪ জন	১ জন	-	-	১৩৯ জন
যাবজ্জীবন কারাদন্ড	১৬০ জন	১৪৬ জন	-	-	১২ জন	২ জন	৮ জন (মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত)	৩১ জন (খালাস প্রাপ্ত)	১৮৫ জন
বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড	২৫৬ জন	২২৪ জন	-	---	২৯ জন	৩ জন	-	৪ জন (খালাস প্রাপ্ত)	২২৮ জন
খালাস	২৭৮ জন	২৩৮ জন	-	৩১+৪=৩৫ জন (যাবজ্জীবন+বিভিন্ন মেয়াদ)	৪৫ জন	৫ জন	-	-	২৮৩ জন
রায়ের পূর্বে মৃত্যু	০৪ জন	-	-	-	-	১১ জন	-	-	১৫ জন
সর্বমোট	৮৫০ জন								৮৫০ জন

(সূত্রঃ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, প্রশাসন শাখা, আইন পরিদপ্তর পত্র নং-৪৪.০২.১২০৫.০০৪.০৩.০৬.২৫/১৬৭ তারিখ ১৬ মার্চ ২০২৫ ও বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, প্রশাসন শাখা, আইন পরিদপ্তর পত্র নং ৪৪.০২.১২০৫.০০৪.০৩.০৬.২৫/৩৭০ তারিখ ১৬ নভেম্বর ২০২৫, সংযোজনী-৪৯ ও বিচারিক আদালতের রায়)।

৬৭। **বিডিআর পুনর্গঠন।** বিডিআর পুনর্গঠন করতে গিয়ে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়িত হয়েছেঃ

ক। বাংলাদেশ রাইফেলস এর পরিবর্তে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ নামকরণ।

খ। বর্ডার গার্ড আইন-২০১০ প্রণয়ন।

গ। ইউনিফর্ম পরিবর্তন।

ঘ। র‍্যাংক ব্যাজ পরিবর্তন।

ঙ। বিজিবির সাংগঠনিক কাঠামোতে জনবল বৃদ্ধির মাধ্যমে রিজিয়ন, সেক্টর ব্যাটালিয়ন সৃজনের মাধ্যমে কমান্ড কাঠামো পরির্তন।

চ। গোয়েন্দা কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজিরির সাংগঠনিক কাঠামাতে রিজিনাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো (আরআইবি)।

ছ। বিজিবিতে দুইটি হেলিকপ্টার, রায়ট কন্ট্রোল আইটেম, এপিসি, এটিভি সংযোজনের মাধ্যমে ত্রি-মাত্রিক বাহিনীতে রূপান্তরকরণ।

জ। বিডিআর বিদ্রোহের শহীদ সকল সেনা কর্মকর্তা/সদস্য ও তাদের পরিবারর্গকে যথোপযুক্ত সম্মান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও বিডিআর বিদ্রোহের শহীদ কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজর মোঃ নূরুল ইসলামসহ সেনা কর্মকর্তা ও অন্যান্য শহীদের নামে বিজিবির স্থাপনাসমূহের নামকরণ করা হয়েছে।

(সূত্রঃ সদর দপ্তর বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, প্রশাসন শাখা, প্রশাসন পরিদপ্তর পত্র নং-৪৪.০২.১২০৫.০০৪.০৫.০০৫. ২৫/৫১২ তারিখ ২৩ জুন ২০২৫, সংযোজনী-৫০)।

৬৮। **<u>অফিসারদের চাকরিচ্যুতি।</u>** ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ও ০১ মার্চ ২০০৯ তারিখে সেনাপ্রধানের অফিসার এ্যাড্রেস ও ০২ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর অফিসার এ্যাড্রেসের সময় যে সকল অফিসার ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন বিভিন্ন সংস্থা বিশেষ করে ডিজিএফআই এবং এএসইউ তাদের নাম সংগ্রহ হরে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৩৫)।* গোয়েন্দা তথ্যের উপর ভিত্তি করে ০৬ জন অফিসারকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০১)।*

৬৯। **<u>তথাকথিত তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনা</u>।**

ক। বিডিআর হত্যাকান্ড পরবর্তী সময়ে অনেক সেনা অফিসারকে সেনাবাহিনী ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছে। যেসব অফিসার সৎ, দেশপ্রেমিক ছিলেন, যারাই বিডিআর হত্যাকান্ড নিয়ে সরব হয়েছেন তাদের সবাইকে সেনাবাহিনী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১৮ এবং সাক্ষী নম্বর-১৪) ।*

খ। তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায় অভিযুক্ত করে ডিজিএফআই অফিসারদেরকে আটক করে এবং আটক প্রক্রিয়া মৌখিক আদেশে সম্পন্ন করা হয়েছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৩০, সাক্ষী নম্বর-১২৮, সাক্ষী নম্বর-৯৯, সাক্ষী নম্বর-১০০ এবং সাক্ষী নম্বর-৯৮)।* যেখানে সেনা আইন অনুসৃত হয়নি। বিডিআর বিদ্রোহ সংক্রান্ত বিষয়ে এই পাঁচজন অফিসারের সম্পৃক্ততাঃ

(১) ক্যাপ্টেন রেজাউল করিম ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সকালে র‍্যাব-৩ এর অফিসার হিসেবে নিউমার্কেট গেইট লক্ষ্য করে বিদ্রোহীদের গুলি ছোঁড়েন এবং পরিস্থিতির আলোকে আদেশ অমান্য করে অভিযান চালানোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যার প্রেক্ষিতে তাকে স্ট্যান্ড রিলিজ করা হয়। ঘটনা পরবর্তী সময়ে পিলখানার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং আলামত সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের কাজ করেছেন। এই দায়িত্ব পালনকালে তিনি পিলখানা থেকে উদ্ধারকৃত অধিকাংশ আলামতের তালিকা তৈরি করেন। ডিজিএফআই মেজর রেজাকে পিলখানা থেকে ধরে নিয়ে যায়। পিলখানা হত্যাকান্ডের সুবিচারের দাবিতে সোচ্চার হওয়া ছাড়াও, পাঁচজন অফিসার ক্যাপ্টেন রেজাউল করিম এবং ক্যাপ্টেন খন্দকার রাজীব হোসেন (বরখাস্ত) (উভয়েই ১ প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন কর্তৃক নিযুক্ত), মেজর হেলাল, বিডিআর মহাপরিচালকের সচিবালয়ের জেনারেল স্টাফ অফিসার-২ (সমন্বয়ক)); ক্যাপ্টেন সুবায়েল বিন রফিক ডিজির এডিসি এবং ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ফুয়াদ খান, বিডিআর সদর দপ্তরের জেনারেল স্টাফ অফিসার-৩ (অপারেশন) হিসেবে পিলখানায় তদন্ত, তদন্ত সহযোগিতা এবং সমন্বয়ের কাজে নিয়োজিত ছিল। এই অফিসারদেরকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া এবং তাদের কাছে জমাকৃত প্রমাণসমূহ নষ্ট করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে এই মামলার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করা হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৭)।*

(২) আওয়ামী লীগের একটি উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে ইসলামী জঙ্গিবাদ বিদ্যমান এই ধারণা প্রতিষ্ঠা করা। সেই উদ্দেশ্যে এই পাঁচজন অফিসারই প্রথম সেনাসদস্য, যাদের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় গুম করা হয়। তাদের এই মামলায় অন্তর্ভুক্ত করে এমন একটি দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করা হয়, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ কখনও তাদের বিরুদ্ধে নিজের কণ্ঠ উঁচু করতে সাহস না পায় এবং বিনা দ্বিধায় বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, আমলা বা বিশিষ্ট নাগরিককে যে কোন সময় গুম বা খুন করতে পারে, যা ব্যপকভাবে সমাজের উপর ফ্যাসিজম প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশ আর্মিকে এই ঘটনার মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে ভীত ও নিস্ক্রিয় করে দেওয়া হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৭)।*

(৩) রেসকিউ অপারেশনের ব্যাপারে কারো কোন ধরনের নির্দেশনা নেই এবং এই সংক্রান্ত কোন রকম উদ্যোগ দেখা না যাওয়া এবং পিলখানা থেকে সহকর্মীদের সাহায্য প্রার্থনার প্রেক্ষিতে

২৬ ফেব্রুয়ারি অনুমতি ব্যতিরেকে অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র নিয়ে, কোর্সমেট ক্যাপ্টেন ফুয়াদসহ পিলখানায় বিপদাপন্ন অফিসারদের উদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীতে জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দরবারে তাদের সাথে কথা বলে দলমত নির্বিশেষে হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবি করেছিলেন। এ ছাড়া ব্যক্তি উদ্যোগে পিলখানা হত্যাকান্ড তদন্তে সেনাবাহিনীর তদন্ত আদালতকে বিভিন্ন রকম সহায়তা করার চেষ্টা করেন। ডিজিএফআই ক্যাপ্টেন রাজিবকে ইউনিট এলাকা থেকে ধরে নিয়ে যায় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৮)।*

(৪) পিলখানা হতে সেনা অফিসারদের রেসকিউ অপারেশনের ব্যাপারে কোন ধরনের নির্দেশনার না পাওয়ায় এবং এই সংক্রান্ত কোন রকম উদ্যোগ পরিলক্ষিত না হওয়ায় এবং পিলখানা থেকে সহকর্মীদের সাহায্য প্রার্থনার প্রেক্ষিতে পিলখানা থেকে অফিসারদেরকে উদ্ধার করার জন্য এমআইএসটি থেকে বের হয়ে যাওয়া, অন্য অফিসারদেরকে উৎসাহিত করা, ১৮ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়নে গিয়ে নিজে নিজে সামরিক অপারেশন এর উদ্দেশ্যে পিলখানার উদ্দেশ্যে যাওয়া, সেনা প্রধানকে প্রশ্ন করা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দরবারে আসার দাবি জানানো, ৪৬ পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল হাকিম আজিজকে বিভিন্ন ফোরামে প্রশ্ন করা, টেকনাফে এমপি বদির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়া ইত্যাদি কারণে ক্যাপ্টেন ফুয়াদ অনেকের বিরাগভাজন হন। তার পিলখানার আর্মি কন্ট্রোল রুমে দায়িত্ব পালনকালে তিনি খেয়াল করেন যে তদন্তে কিছু বের হলে সেটা স্ক্রিনিং করেন গোয়ন্দা সংস্থার লে. কর্নেল (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর আল মুস্তাহিদুর রহমান। লে. কর্নেল মুস্তাহিদ ক্যাপ্টেন ফুয়াদকে একাধিক বার বলেন কোন কিছু পেলে সেটা যেন তদন্ত কমিটিকে দেয়ার আগে লে. কর্নেল মুস্তাহিদের অনুমতি নেয়া হয় যা ক্যাপ্টেন ফুয়াদ উপেক্ষা করেছিলেন এবং তিনি বুঝতে পারেন তিনি গোয়ন্দা সংস্থার রোষানলে পড়েছিলেন। ডিজিএফআই থেকে ফোন করে ক্যাপ্টেন ফুয়াদকে ডিজিএফআই যেতে বলে এবং ডিজিএফআই তাকে আটক করে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০০)।*

(৫) পিলখানা থেকে সহকর্মীদের সাহায্য প্রার্থনা এবং সেনা অভিযানের শুরু না হওয়ার প্রেক্ষিতে এমআইএসটি থেকে বের হয়ে ক্যাপ্টেন সুবায়েল ১৪ ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রিগেডে গমন করেন । ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডে থেকে আবাহনী মাঠে যেয়ে উদ্ধার অভিযান চালানোর জন্য অস্ত্র সংগ্রহ করেন। খাগড়াছড়িতে ৩০ রাইফেল ব্যাটালিয়নে বদলি হয় এবং সেখানে পুকুর থেকে প্রায় আড়াইশো বক্স গোলাবারুদ উদ্ধার করেন ও তদন্তে যুক্ত হন। তদন্ত স্থগিত করে তাকে পিলখানায় বদলি করা হয় । ভারপ্রাপ্ত এডিসির দায়িত্ব পালনের সুবাদে তিনি গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর তথ্য সম্পর্কে জানতে পারেন। তাঁর দায়িত্বের ব্যস্ততা ও ডিজির অনুমোদন ছাড়া পিলখানা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না। তৎকালীন ডিজি বিডিআরের নির্দেশে ছলচাতুরির মাধ্যমে তৎকালীন সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আজিজ আহমেদ (পরবর্তীতে সেনাপ্রধান) ক্যাপ্টেন সুবায়েলকে ডিজিএফআই এ রেখে আসেন এবং ডিজিএফআই তাঁকে আটক করে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৯)।*

(৬) **বিডিআরের** তৎকালীন ডিজির জিএসও-২ (কর্ড) বিএ-৫৫৯০ মেজর হেলাল মোহাম্মদ খানের সাথে কমিশন যোগাযোগ করতে পারেনি। তিনি তার পদাধিকার বলে পিলখানার তদন্ত সম্পর্কিত সকল তথ্য সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তৎকালীন ডিজি বিডিআরের নির্দেশে ছলনার মাধ্যমে তৎকালীন কর্নেল আজিজ মেজর হেলালকে ডিজিএফআই এ রেখে আসেন এবং ডিজিএফআই তাকে আটক করে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৯)।*

গ। <u>তাপস হত্যাচেষ্টা মামলার সূত্রপাত</u>

(১) তৎকালীন ডিজি ডিজিএফআই এর নির্দেশে তৎকালীন পরিচালক সিটিআইবি ব্রি. জেনারেল ইমরুল কায়েস তাপস হত্যাচেষ্টা মামলা পুলিশের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। জনাব মনিরুল ও অন্য একজন পুলিশ অফিসার পরিচালক সিটিআইবির সাথে দেখা করেন, তারা তাপস

হত্যাচেষ্টার বিবরণ দেন এবং জানান যে তারা পূর্ব হতেই বিষয়টি নিয়ে monitor করছিলেন এবং ঘটনার পূর্বেই বিষয়টি ফাঁস হয়ে যায় এবং ঘটনাটি ঘটেনি ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৭)।***

(২) পরিচালক সিটিআইবি তাপস হত্যা চেষ্টা সংক্রান্ত বিষয়টি তৎকালীন লে. কর্নেল সালেহ (জি-১)কে সর্বপ্রথম অবহিত করেন এবং উনি তাঁকে জানান যে ৫/৬ টি টেলিফোন নম্বর ডিবি পুলিশ কর্তৃক উদঘাটন করে কিছু সেনা অফিসারের নম্বর হিসাবে সনাক্ত করা হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২০)*।

ঘ। <u>ডিজিএফআই কর্তৃক তাপস হত্যাচেষ্টা মামলায় অফিসার আটক এবং প্রাথমিক তদন্তের ফলাফল</u>। তপস হত্যাচেষ্টা মামলায় অফিসারদের আটক মৌখিকভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে **(সূত্রঃ লে. কর্নেল মোঃ আনোয়ার হোসেন (অবঃ) সাক্ষী নম্বর-১২৮)**। ডিজিএফআই আটক অবস্থায় অফিসারদেরকে Joint Interrogation Cell (JIC) এ নিয়ে যেয়ে নির্যাতন করে স্বীকারোক্তি আদায় করার চেষ্টা করে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৮, সাক্ষী নম্বর-৯৯, সাক্ষী নম্বর-৯৭ এবং সাক্ষী নম্বর-১০০)*। Joint Interrogation Cell (JIC) এ নিয়ে গিয়ে নির্যাতনের বিষয়ে মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস এবং মেজর জেনারেল সালেহ অস্বীকার করলেও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমামুল হুদার সাক্ষ্যের ভিডিও রেকর্ডিং থেকে জানা যায় যে ডিজিএফআই কর্তৃক অফিসারদেরকে তদন্ত আদালতের সম্মুখে হাজির করার পর তাঁর মনে হয়েছে অফিসারগণ Shattered ছিলেন যা নির্যাতনের ফলে হতে পারে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০৪ সাক্ষ্যের ভিডিও রেকর্ডিং, সংযোজনী-১৮)* ।

ঙ। <u>ঘটনাকালীন সময়ে অফিসারদের অবস্থান</u>

(১) <u>ক্যাপ্টেন রাজিব</u>। প্রায় তিন মাস ইউনিট প্রশিক্ষণে থেকে ২০ অক্টোবর ২০০৯ তিনি সিলেট থেকে ঢাকা আসেন। ২১ অক্টোবর ২০০৯ তারিখ তিনি দিনে অফিসে এবং সন্ধ্যায় রোলকলে উপস্থিত ছিলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৮ এবং সাক্ষী নম্বর-১২৮)*

(২) <u>ক্যাপ্টেন রেজাউল, ক্যাপ্টেন ফুয়াদ, ক্যাপ্টেন সুবায়েল এবং মেজর হেলাল</u>। বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে পিলখানায় নিজ নিজ দায়িত্বে কাজ করেছেন। ক্যাপ্টেন সুবায়েল এবং মেজর হেলাল ডিজির পারসনাল স্টাফ ছিলেন এবং ডিজির অনুমতি ব্যতীত তাদের পক্ষে পিলখানা ত্যাগ করা সম্ভব ছিল না *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৫)।*

চ। <u>সেনাবাহিনীর তদন্ত প্রতিবেদন এবং কোর্ট মার্শাল</u>

(১) ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদার নেতৃত্বে একটি তদন্ত আদালত গঠন করা হয়। কাজের শুরুতেই ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা আদালতের সদস্যদেরকে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২১ এবং সাক্ষী নম্বর-১১৬)* ব্রিফিং নেয়ার জন্য ডিজিএফআই নিয়ে যান এবং ডিজিএফআই এ কর্মরত ব্রি. জেনারেল ইমরুল এবং লে. কর্নেল সালেহ তদন্ত আদালতের সদস্যদেরকে ব্রিফ করেন এবং পটভূমি ব্যাখ্যা করেন। তাদের ব্রিফ অনুযায়ী জনাব তাপসের উপর বোমা হামলায় সেনাবাহিনীর কয়েকজন অফিসারের নাম এসেছে। বিষয়টি তদন্ত করতে হবে। লে. কর্নেল সালেহ এটাও উল্লেখ করেছিলেন যে পুলিশের ডিবি বিষয়টিকে নিয়ে আগে থেকেই কাজ শুরু করেছিল। তদন্ত আদালতকে ডিজিএফআই থেকে একটি মোবাইল যোগাযোগের নকশা দেয়া হয়। যে মোবাইল সিম এই মামলায় ব্যবহৃত হয়েছিল সেই সিমগুলোর মালিকানা তদন্ত আদালত নিশ্চিত করেনি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২১)।* প্রথম তদন্তে কোনো কিছু প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি এবং ব্রি. জেনারেল শাহাব মনে করেন উক্ত অফিসারগণ এই ঘটনার সাথে জড়িত নন। এই পর্যায়ে ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা তদন্ত আদালতের অন্য সদস্য ব্রি. জেনারেল শাহাবকে নির্দেশ দিয়েছিলেন অভিযুক্ত অফিসারদেরকে না জানিয়ে তাদেরকে এআইসিতে হস্তান্তরের জন্য। ব্রি. জেনারেল শাহাব আদালতের অন্য একজন সদস্যকে সাথে দিতে বললে ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ব্রি. জেনারেল শাহাব ৪৬ ব্রিগেডের তৎকালীন ডিকিউ এর সহায়তায় একটি মাইক্রোবাসে করে সন্ধ্যায় অভিযুক্ত

অফিসারদেরকে এআইসিতে হস্তান্তর করেন। এআইসিতে হস্তান্তরের বিষয়টি ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা এবং মেজর জেনারেল সালেহ অস্বীকার করলেও তদন্ত আদালতের সদস্য ব্রি. জেনারেল মাহমুদ এবং মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস এআইসির কথা তাদের জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছেন। ব্রি. জেনারেল শাহাবের সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা তদন্ত আদালতের জিজ্ঞাসাবাদের মাঝে মাঝেই কারো সাথে কথা বলার কথা বলে উঠে যেতেন যদিও ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা কমিশনে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করেছেন। ব্রি. জেনারেল শাহাবের ভাষ্য অনুযায়ী তদন্তে কিছু পাওয়া যায়নি এবং ডিজিএফআই কর্তৃক সরবরাহকৃত মোবাইল তথ্য/নকশা অভিযোগ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল না *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১৬)।*

(২) তদন্ত আদালত প্রথম তদন্তে অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি। অফিসারদেরকে এআইসিতে প্রেরণের পর তদন্ত আদালতে নতুন সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অফিসারদেরকে এআইসিতে প্রায় একমাস রেখে প্রবলভাবে নির্যাতন করা হয় এবং সাদা কাগজে স্বাক্ষর করানো পর আবার তাদেরকে তদন্ত আদালতের সম্মুখে হাজির করা হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৮, সাক্ষী নম্বর-৯৯, সাক্ষী নম্বর-৯৭ এবং সাক্ষী নম্বর-১০০)।* স্বাক্ষরিত সাদা কাগজে ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী টাইপ করে নিয়ে অভিযুক্ত অফিসাদেরকে বলেছিলেন অপরাধ স্বীকার করে স্বাক্ষর না দিলে তাদেরকে পুনরায় এআইসিতে প্রেরণ করা হবে এবং এআইসিতে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে মর্মে একটি গাড়ি অভিযুক্ত অফিসারদেরকে দেখানো হয় *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৮)।*

(৩) কোর্ট মার্শালের প্রসিকিউটর ছিলেন তদন্ত আদালতের সদস্য ব্রি. জেনারেল মাহমুদ এবং সামারি অভ্ এভিডেন্স রেকর্ড করেছেন তদন্ত আদালতের অন্য সদস্য ব্রি. জেনারেল মাহবুব সারওয়ার। উভয় সদস্যই তদন্ত আদালতে যখন যোগদান করেন তখন তদন্ত আদালতের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২২ এবং সাক্ষী নম্বর-১২৭)।* ডিজিএফআইতে অফিসাদের অবস্থানকালীন সময়ে অফিসারদের পরিবারদের ব্ল্যাকমেইল এবং লাঞ্ছিত করা হয়েছে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৩০)।*

ছ। <u>তদন্তের আলামতসমূহ</u>

(১) তদন্তে মোবাইল যোগাযোগের নকশা, এক্সপ্লোসিভ ও ডেটনেটর এবং অস্ত্র ও গুলি আলামত হিসেবে উল্লেখ আছে। প্রথম আলামত পুলিশ কর্তৃক সরবরাহকৃত মোবাইল যোগাযোগের নকশা যা ডিজিএফআইকে হস্তান্তরিত করা হয় এবং ডিজিএফআই তা তদন্ত আদালতকে হস্তান্তর করে। ডিজিএফআই থেকে প্রদত্ত আলামত অভিযোগ প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল না *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১৬)।*

(২) ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা এবং ব্রি. জেনারেল মোস্তাফার বক্তব্য অনুযায়ী তারা অভিযোগ প্রমাণের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ, ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং উপস্থাপিত আলামত বিশ্লেষণ করেছেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২১ এবং সাক্ষী নম্বর-১০৪)।* তদন্ত আদালতের অন্য সদস্য ব্রি. জেনারেল মাহমুদ এবং ব্রি. জেনারেল মাহবুব ঘটনা স্থল পরিদর্শন করেননি বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং ব্রি. জেনারেল শাহাব ঘটনা স্থল পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করেননি। এখানে তিনটি ঘটনা স্থল আছেঃ

(ক) <u>বোমা বিস্ফোরণ স্থান</u>। পুলিশ কর্মকর্তা জনাব মুনিরুল, যিনি ডিজিএফআইতে অভিযোগ জানিয়েছিলেন, তার বক্তব্য অনুযায়ী ঘটনা ঘটেনি ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৭)।*** তদন্ত আদালতের সভাপতি ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা ও ব্রি. জেনারেল মোস্তফা ঘটনানস্থল পরিদর্শনের কথা জবানবন্দীতে উল্লেখ করেছেন যদিও তদন্ত আদালতের অন্য সদস্য ঘটনা স্থল পরিদর্শনের কথা অস্বীকার করেছেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১১৬)।*

(খ) <u>ঘটনা ঘটানোর জন্য বিস্ফোরক সংগ্রহের স্থান</u>। তদন্ত আদালতের সদস্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদ সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ক্যাপ্টেন রাজিব সিলেটে অবস্থিত প্যারাকমান্ডো বয়াটালিয়নের প্রশিক্ষণের সময় আইইডি, বিস্ফোরক, ডেটনেটিং কর্ড, ইলেক্ট্রিক ডেটনেটর ইত্যাদি প্রশিক্ষণকালীন সময় সরিয়ে রাখতেন। তিনি আরও বলেন উক্ত অফিসার অতিরিক্ত খরচ দেখিয়ে মিথ্যা প্রতিবেদন তৈরি করতেন এবং অতিরিক্ত বিস্ফোরক লুকিয়ে রাখতেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২২)।* প্যারাকমান্ডো ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক সাক্ষ্য দিয়েছেন যে এই জাতীয় ঘটনা অবাস্তব এবং অসম্ভব। এই বিষয়ে একাধিকবার তদন্ত হয়েছে কিন্তু কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি এবং এককভাবে কারো পক্ষে এই কাজ করা সম্ভব না কারণ এনসিও, জেসিও ও অফিসারের সমন্বিত অংশগ্রহণে এই জাতীয় কাজ করা হয়। কারো অগোচরে এককভাবে কারো পক্ষে কিছু করা সম্ভব হলে সব ইউনিটেই এই জাতীয় ঘটনা ঘটবে বা ঘটার কথা। তিনি আরও বলেন তদন্ত আদালতের কোনো সদস্য এই বিষয়ে কখনও ইউনিট পরিদর্শন করেনি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২৮)।*

(গ) <u>ঘটনা ঘটানোর জন্য লুকানো এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র উদ্ধার</u>। ১৬ ইসিবি কালাপানি মিরপুর ১২ ক্যাম্প এলাকা থেকে এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র উদ্ধারের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে । উক্ত এক ট্রাঙ্ক তৎকালীন লে. কর্নেল সালেহ উদ্ধার করেছিলেন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৭)।*** অধিনায়ক ১৬ ইসিবি এবং ইউনিটের সংশ্লিষ্ট অফিসারগণের বক্তব্য নিম্নরূপঃ

(i) ইউনিটের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভেদ করে সকলের অগোচরে এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র ও গোলাবারুদ কোন ব্যক্তি ইউনিট এলাকায় রেখে গেলেও বিষয়টি ইউনিটের সার্ভেইলেন্সে ধরা পড়ার কথা। যদি কোন ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ উক্ত এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র ও গোলাবারুদ ইউনিট এলাকা থেকে উদ্ধারও করে থাকতো তবে এটি ইউনিটে একটি বিশাল আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়াতো। এমন কিছুই ঘটেনি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২৩)।*

(ii) কবে, কখন, কার উপস্থিতিতে, কোথা থেকে এবং কারা এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র ও গোলাবারুদ ইউনিট এলাকা থেকে উদ্ধার করেছিল এই বিষয়ে ইউনিট অধিনায়ক এবং ক্যাম্প কমান্ডারকে কিছুই জানানো হয়নি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২৩, সাক্ষী নম্বর-১২৪ এবং সাক্ষী নম্বর-১২৫)।*

(iii) তদন্ত আদালত বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করেনি। অপরাধস্থলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ, প্রমাণ সংরক্ষণ, তদন্ত ও বিচারের জন্য ক্রাইম সিনের ইন্টেগ্রিটি নিশ্চিত করার জন্য কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাদের উচিত ছিল ক্রাইম সিনের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করা, এলাকার নকশা তৈরি করা, একটি পরিধি স্থাপন এবং প্রতিটি পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা যাতে আঙুলের ছাপ, ডিএনএ এবং Physical evidence রক্ষা করা যায়। সকল ক্ষেত্রে ইউনিটকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন ছিল। এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের স্থানটি ইউনিটের কাউকে দেখানো হয়নি বা জানানো হয়নি। এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের ঘটনাটি একটি অবাস্তব ঘটনা তাই এই বিষয়ে কোনো ইনসিডেন্ট রিপোর্ট/কোর্ট অব ইনকোয়েরি ইনিশিয়েট করার প্রয়োজন হয়নি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২৩)।*

(iv) তদন্ত আদালত ইউনিট এলাকা থেকে এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের বিষয়ে ইউনিট অধিনায়ককে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অধিনায়ক ঐ সময় দেশে ছিলেন না এবং বিষয়টি অবাস্তব প্রতীয়মান হবার কারণে অধিনায়ক এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধারের বিষয়টি বিশ্বাস করেননি। ফলশ্রুতিতে তৎকালীন ইইনসি যথাযথ তদন্ত ছাড়া অধিনায়ককে সতর্ক করে যা অধিনায়ক তাঁর প্রতি অন্যায় হিসেবে বিবেচনার করেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১২৩)।*

জ। <u>তদন্ত আদালত কর্তৃক অভিযোগ প্রমাণের ভিত্তি</u>

(১) তদন্ত আদালত শুধুমাত্র স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর উপর ভিত্তি করে অভিযোগ প্রমাণ করেছে। অফিসারদেরকে এআইসিতে প্রায় একমাস রেখে প্রবলভাবে নির্যাতন করা হয় এবং সাদা কাগজে স্বাক্ষর করানো পর আবার তাদেরকে তদন্ত আদালতের সম্মুখে হাজির করা হয়। স্বাক্ষরিত সাদা কাগজে ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা তাদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী টাইপ করে নিয়ে অভিযুক্ত অফিসাদেরকে বলেছিলেন অপরাধ স্বীকার করে স্বাক্ষর না দিলে তাদেরকে পুনরায় এআইসিতে প্রেরণ করা হবে এবং এআইসিতে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে মর্মে একটি গাড়ি অভিযুক্ত অফিসারদেরকে দেখানো হতো *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৮)।*

(২) শুধু স্বীকারোক্তর প্রেক্ষিতে সামারি অভ্ এভিডেন্স রেকর্ড করা হয়েছে এবং প্রসিকিউটর বিচারিক কাজ সম্পন্ন করেছেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০৪ এবং সাক্ষী নম্বর-১২১)।* তদন্ত আদালতের সভাপতি তাঁর বক্তব্যে বলেছেন তিনি শুধু Circumstantial Evidence এর উপর ভিত্তি করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির সুপারিশ করেছিলেন। তদন্ত আদালত মূল অভিযোগকারী জনাব ফজলে নূর তাপসের জবানবন্দী গ্রহণ প্রয়োজন মনে করেনি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০৪)।* ডিজিএফআইও মূল অভিযোগকারী জনাব ফজলে নূর তাপসের জবানবন্দী গ্রহণ প্রয়োজন মনে করেনি ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৭)।***

ঝ। <u>কেন এই পাঁচজন অফিসারকে লক্ষবস্তু বানানো হলো</u>। **দেশ প্রেমিক** এই পাঁচজন জুনিয়র অফিসার বিডিআর বিদ্রোহ দমন, সঠিক তদন্ত, আলামত সংগ্রহসহ অনেক তথ্য জেনে গিয়েছিলেন ও সকল ক্ষেত্রে সোচ্চার ছিলেন। সাক্ষ্য পাওয়া গেছে জনাব তাপসের আজীবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই মামলা সাজানো হয়েছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০০)।* তাপস হত্যাচেষ্টার মামলা সম্পূর্ণ মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে সাজানো ঘটনা যা সেনাবাহিনীতে ত্রাস সৃষ্টি করার জন্য সাজানো হয়েছিল যাতে করে বিডিআর বিদ্রোহে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নিয়ে সেনাবাহিনীতে কোনো অফিসার কথা না বলে। এতে প্রাক্তন ডিজি, ডিজিএফআই ও ডিরেক্টর যথাক্রমে মেজর জেনারেল ফজলে আকবর ও বিগ্রেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস, লে. কর্নেল সালেহসহ তৎকালীন ঢাকা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল আজিজের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৬)।*** ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য এই মামলা করা হয়েছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৭৭)।*

ঞ। <u>ডিজি বিডিআরের ঘটনা সম্পর্কে মন্তব্য</u>। ডিজি বিডিআর লে. জেনারেল মইনুল পিলখানায় অফিসারদেরকে কনফারেন্সে সতর্ক করে বলেছিলেন যে ক্যাপ্টেন সুবায়েল এবং মেজর হেলাল অপরিচিত নম্বর থেকে মোবাইল কল রিসিভ করে ফেঁসে গেছে। সকল অফিসারকে অপরিচিত মোবাইল কল রিসিভভ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৫)।*

ট। <u>ডিজিএফআই কর্তৃক অফিসারগণের আটক, আইনী সহায়তা এবং পরিবারের অবস্থা</u>। অফিসারদেরকে সেনা আইন অনুসরণ করে আটক করা হয়নি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৮, সাক্ষী নম্বর-৯৯, সাক্ষী নম্বর-৯৭, সাক্ষী নম্বর-১০০ এবং সাক্ষী নম্বর-১৩০)।* আটককৃত অফিসারদের পরিবারেরকে কোন খবর দেয়া হয়নি এবং তাদের পরিবারের কোনো খোঁজ খবরও নেয়া হয়নি। মেজর জেনারেল রেজানূর (তৎকালীন কমান্ডার ৪৬ ব্রিগেড) ক্যাপ্টেন রেজার স্ত্রীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন স্বীকারোক্তি দেয়া না হলে ছাড়া পাবে না *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৮, সাক্ষী নম্বর-৯৯, সাক্ষী নম্বর-৯৭ এবং সাক্ষী নম্বর-১০০)।*

ঠ। <u>তাপস হত্যা চেষ্টা মামলায় পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন</u>। মামলায় বাদী জনাব ফজলে নূর তাপস কোন সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপনে ব্যর্থ হয়েছেন বিধায় পুলিশ তাপস হত্যাচেষ্টা মামলায় চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত মামলায় কোন সামরিক অফিসারের নাম ছিল না *(সূত্রঃ পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন, সংযোজনী-৫১)।*

৭০। **<u>অন্যান্য অফিসারদেরকে হয়রানি</u>।** ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ১১০০ ঘটিকায় অভিযান পরিচালনা করতে উদ্যত হওয়া এবং পরবর্তীতে ২৭ ফেব্রুয়ারি একটি মিডিয়া ব্রিফিং এ অংশ নিয়ে কিছু সত্য ঘটনা প্রকাশ করে দেয়ায় মেজন সুমনকে ডিজিএফআই অফিসে নিয়ে নির্যাতন করা হয়। পরবর্তীতে হয়রানি চলমান থাকলে তিনি চাকরি হতে ইস্তফা দিয়ে বিদেশে পাড়ি জমাতে বাধ্য হন ***(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৮৩)।***

৭১। অত্র কমিশন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দৈনিক সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন দেয় এবং পুলিশকে নির্দেশ দেয় তাদেরকে কমিশনের সামনে হাজির করতে কিন্তু তা সম্ভব হয়নিঃ

ক। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা
খ। মেজর জেনারেল তারেক আহমেদ সিদ্দিক (অব.), প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা
গ। জনাব ফজলে নূর তাপস, সাবেক মেয়র ঢাকা দক্ষিন সিটি কর্পরেশন
ঘ। জনাব শেখ ফজলুল করিম সেলিম, গোপালগঞ্জ-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য
ঙ। জনাব আফম বাহাউদ্দিন নাছিম, ঢাকা - ৮ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য
চ। জনাব হাসান মাহমুদ খন্দকার, সাবেক ডিজি র‍্যাব
ছ। জনাব মনিরুল ইসলাম, সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি
জ। জনাব ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল, সাবেক সংসদ সদস্য নেত্রকোনা-৫
ঝ। জনাব লিটন ওরফে লেদার লিটন, পিতা জনাব তোরাব আলী
ঞ। জনাব আনিস-উজ-জামান খান (সাবেক অতিরিক্ত সচিব, সভাপতি জাতীয় তদন্ত কমিটি-বিডিআর হত্যাযজ্ঞ)
ট। মেজর জেনারেল টিএম জোবায়ের (অব.) সাবেক ডিজি এনএসআই
ঠ। জনাব আব্দুল আজিজ, সাবেক মন্ত্রী পরিষদ সচিব
ড। মেজর গোলাম মাহবুবুল আলম চৌধুরী-সাবেক ডিজি বিডিআরের জিএসও-২ (কর্ড)।

(সূত্রঃ জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন স্মারক নং-বিডিআরসি/০৬-২০২৫/২২৭ তারিখ ১০ জুলাই ২০২৫, সংযোজনী-৫২)।

৭২। **<u>বিদেশী সংশ্লিষ্টতা</u>**

ক। ২০০৮ সালের জুন মাসে, আনুমানিক ১ থেকে ৬ বা ৮ তারিখের মধ্যে, মেজর নাসির নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অফিসার বরিশালে ডিজিএফআই এর লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুস সালামের সাথে ফোনে যোগাযোগ করেন এবং লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুস সালামের সাথে দেখা করে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং এরই ধারাবাহিকতায় মেজর নাসির লে. কর্নেল সালামের সাথে দেখা করেন এবং দুইটি বই উপহার দিয়ে নিম্নলিখিত তথ্য দিয়েছিলেনঃ

'মেজর নাসির জানান যে তিনি সম্প্রতি বিদেশ থেকে ফিরেছেন। একই এয়ারক্রাফটে তিনি আওয়ামী লীগের কিছু শীর্ষ নেতাকে দেখেছেন যারা ভারতের বারাসাতে 'র' এর সঙ্গে বৈঠক করে ফিরছিলেন। সেখানে আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহসহ আরও কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান যে তারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি বড় ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা করেছে। তাদের বক্তব্য ছিল, আগামী ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে সেনাবাহিনী যেন নৈতিকভাবে দাঁড়াতে না পারে, সেইভাবে আঘাত হানার পরিকল্পনা তারা করছে'। লে. কর্নেল সালাম সঙ্গে সঙ্গে ডিজিএফআই এর ডিরেক্টর সিআইবি ব্রিগেডিয়ার বারীকে অবহিত করেছিলেন কিন্তু তিনি বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে তিনি উল্টো লে. কর্নেল সালামকে তিরস্কার করেছিলেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৭)।*

খ। ২০০৮ সালের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি মেজর (অব.) নাসির উদ্দিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে তিনি কলকাতা যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং ইন্ডিয়ান হাই কমিশনে টুরিস্ট ভিসার জন্য আবেদন করেন। প্রথমবার সেখানে গেলে মেজর নাসিরকে তার ভিসার জন্য ডিফেন্স উইং এ যোগাযোগ করতে বলা হয়। পরের দিন মেজর নাসির হাই কমিশনে আবার যান, রিসেপশনে ১৫-২০ মিনিট অপেক্ষা করেন। তারপর তাকে বলা হয় আগে জনাব নিরাজ শ্রীবাস্তব এর সঙ্গে দেখা করতে হবে। প্রথম

সাক্ষাৎটি ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ। দিল্লি থেকে আসা তরুণ কর্মকর্তা মেজর নাসিরকে বিস্কুট ও কফি অফার করেন, মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে অর্ধঘণ্টা আলোচনা করেন এবং মেজর নাসিরকে পরের দিন আসতে বলেন। দ্বিতীয় দিন তিনি কিছুটা গম্ভীর হয়ে বলেন বাংলাদেশের মানুষ আবেগ প্রবণ এবং পাকিস্তানের দর্শন অনুসরণ করে। তিনি বলেন বাংলাদেশের আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্সের ডকট্রিন পাকিস্তানের সঙ্গে একই। এরপর তিনি মেজর নাসিরকে Padua সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। মেজর নাসির বলেন যে তিনি আমেরিকায় অবস্থান করার কারণে কিছু জানেন না। নিরাজ শ্রীবাস্তব বলেন Padua-তে বিডিআর ১৬-১৭ জন বিএসএফ সদস্যকে হত্যা করেছে। এটি ছিল একটি গুরুতর উস্কানিমূলক ঘটনা। তিনি বলেন, 'Padua will not go unchallenged and unpunished.' ২০০৮ সালে আরেকবার এক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কূটনীতিকের সঙ্গে মেজর নাসিরের দেখা হয় তিনি মাসটি স্মরণ করতে পারেননি তবে ঘটনাগুলো সবই ২০০৮ সালের মধ্যে হয়েছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯৫)।* পরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়য়ের মাধ্যমে জানা যায় Mr. Niraj Srivastava ২০০৬ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনে Minister পদবিতে নিয়োজিত ছিলেন *(সূত্রঃ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পত্র নং ১৯.০০.০০০০.৭৩০.২৮.৩৭.২৫-২৩১৯ তারিখ ২২ অক্টোবর ২০২৫, সংযোজনী-৫৩)।*

গ। ঘটনাপূর্ব ষড়যন্ত্রে জনাব তানজিম আহমেদ সোহেল তাজ এবং জনাব শেখ সেলিমের উপস্থিতিতে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' এর ২৪ জনের একটি কিলার গ্রুপের সাথে বৈঠক হয়। নায়েক শহীদুর রহমান তার ঘনিষ্ঠ তোরাব আলীর (অন্যতম মূল ষড়যন্ত্রকারী, পরে জেলখানায় মৃত) বরাতে বলেন

'ভারতীয়দের সাথে বৈঠকের পরে পুরো পরিকল্পনা সাজানো হয় এবং সমন্বয় করার জন্য শেখ ফজলে নূর তাপসের বাসায় বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিল নানক, মির্জা আজম, ফজলে নূর তাপস, শেখ সেলিম, লেদার লিটন এবং তোরাব আলী। সেখানে যখন জানানো হয় যে অফিসারদের হত্যা করা হবে, তখন তোরাব আলী সেখানে আপত্তি করে। সে বলে যে অফিসারদের হত্যা করা যাবে না। তখন শেখ সেলিম তাকে মুরুব্বি সম্বোধন করে বলেন, 'আপনার তো বয়স হয়েছে। আপনার আর এর মধ্যে থাকার দরকার নাই। আপনার ছেলে (লেদার লিটন) আমাদের সাথে থাকলেই হবে' (*সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-৩০*)।

ঘ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সকাল পৌনে ১০টা থেকে ১০ টায় পিলখানা এলাকায় সাবেক এমপি মোর্শেদ, শেখ সেলিম কিছু RAW সদস্যদের উপস্থিতি দেখা যায়। এই 'র' সদস্যগণ সাক্ষী এমপি গোলাম রেজার রাজনৈতিক যোগাযোগ এর কারণে তাঁর পূর্ব পরিচিত ছিল। সাবেক এমপি গোলাম রেজা তাঁর সাক্ষ্যে বলেনঃ

'এরপর আমি দ্রুত নর্দান মেডিকেল কলেজের দিকে যাই। সেখানে আলাউদ্দিন নাসিম, সাবেক এমপি মোর্শেদ, শেখ সেলিম এবং RAW-এর চার-পাঁচ জনকে দেখলাম যাদের আমি আগে থেকেই চিনতাম' (*সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০১*)

ঙ। ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দার নূরের স্ত্রী তাসনুভা মাহা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর ক্যাপ্টেন তানভীরের সাথে মোবাইলে কথা বলার সময় ক্যাপ্টেন তানভীর তাকে পিলখানার ভিতরে ভারতীয় সংস্থা National Security Guard (NSG) of India এর নাম বলেন। বেগম তাসনুভার ভাষ্য অনুযায়ীঃ

'২৫ তারিখ তানভীর এর সাথে যখন আমার শেষ কথা হচ্ছে তখন আমি ছিলাম খাটের নিচে। বাচ্চাদের নিয়ে তখন আমি লুকিয়ে ছিলাম, সেখান থেকে আমি আবার ওয়ার্ডরোবের মধ্যে লুকাই, কারণ বুঝতে পারছিলাম পাশেই কোথাও বিডিআর সদস্যরা ঘোরেফেরা করছে। তানভীর এর সাথে শেষ ফোনালাপে তানভীর আমাকে বলে যে লীগ এর নেতারা অন্য পোশাকে এসেছে। ওর মুখে আমি এনএসজি নিয়ে কিছু কথা শুনেছি। কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না যে এনএসজি কি ও আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছিল। আমি দুইবার তাকে জিজ্ঞেস করেছি যে এনএসজি কি? তখন এক পর্যায়ে সে বেশ বিরক্ত হয়ে বলে, Indians! Indians'

এছাড়াও বেগম তাসনুভা মাহা বলেন যে তিনি চুল বড় তিনজনকে বিডিআরের টি শার্ট ও স্যান্ডেল পরা অবস্থায় দেখেছেন যারা তাঁকে হিন্দিতে গালাগালি করেছে এবং তাঁর সন্তানদেরকে 'পাকিস্তানি লাডলা' বলেছে *(সূত্রঃ শহীদ পরিবার সাক্ষী নম্বর-১২)।*

চ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পিলখানার ভিতরে বিভিন্ন সময় হিন্দিতে, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে বাংলা ভাষায়, বাংলা নয় এমন ভাষা এবং ইংরেজিতে কথা বলতে শোনা গেছে। নায়েক শহীদুর, সিপাহী সেলিম, পিলখানা কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম মরহুম সিদ্দিকুর রহমান, সিপাহী শাহাদাত, সাক্ষী তাসনুভা মাহা (শহীদ ক্যাপ্টেন তানভীর এর স্ত্রী) সিপাহী আব্দুল মতিন স্বচক্ষে হিন্দি ভাষী এবং বাংলা নয় এমন ভাষাভাষী বহিরাগত ব্যক্তিদের বিডিআরের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় ২৫ তারিখ হত্যাকান্ড চলাকালীন সময়ে এবং তার অব্যবহিত পরে পিলখানার অভ্যন্তরে দেখেছেনঃ

(১) **<u>নায়েক শহীদুর এর ভাষ্যমতে</u>**

'তখন সকাল প্রায় ১০১৫ থেকে ১০৩০ এর মত বাজে। দেখি তিন নম্বর গেইট এর দিকে ৫-৬ জন ব্যক্তি বিডিআর সৈনিকের পোশাক পরা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমাকে দেখে বলল 'ইধার আও'। তাদের বলার ভাষাটা ছিল কমান্ড ভয়েস এর মত। আমি হতচকিত হয়ে যাই। আমি তাদেরকে গালি দিয়ে বলি, 'একটা গন্ডগোল হইসে, আর তোরা ভাষাও বদলায় ফেলসিস। আমার র‍্যাংক চোখে পড়ে না তোদের!' তখন তারা নিজেরা কিছু কথা বলাবলি করছিল এবং সেগুলো হিন্দি ভাষাতেই বলাবলি করছিল। এদের মধ্যে অন্তত একজন বাঙালি ছিল। আমি বলতে শুনি, একজন আমাকে দেখিয়ে বলল, 'হি ইজ এ ভেরি ক্লেভার ম্যান' (*সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-৩০*)।

(২) **<u>সিপাহী সেলিশ বলেন</u>**

'আমি গুলি করলেও সেগুলি তাদের গায়ে লাগেনি। এরপর আমি গড়িয়ে গড়িয়ে পাশের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় যাই এবং সেখানে সেই অস্ত্রধারীদের দেখতে পাই। সেখানে দেখি যে তাদের মুখ বাঁধা থাকলেও তাদের চুল সিভিলিয়ানদের মত লম্বা, বিডিআর কাটিং না এবং তারা হিন্দিতে কথা বলছে। সেখানে প্রায় এরকম ৮-১০ জন অস্ত্রধারী ব্যক্তি ছিল' (*সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-২০*)।

(৩) হেফাজতে মৃত্যুবরণকারী পিলখানা মসজিদের ইমাম সিদ্দিকুর রহমানের স্ত্রী কামরুন নাহার শিরিন তাঁর স্বামীর বরাতে বলেন,

'আমাকে আমার স্বামী বলেছেন এরকম সময় উত্তর দিক থেকে একটি গাড়ি (পিকআপ) এসে দরবার পশ্চিম গেইটে দাঁড়িয়েছে। ঐ গাড়ি থেকে প্রচুর সৈনিক অস্ত্রসহ নামে। এইসব সৈনিকদের হিন্দিতে এবং ইংলিশে কথা বলতে আমার স্বামী শুনেছেন। তারা অন্যান্য সৈনিকদের গুলি করার জন্য কমান্ড করছিল। হিন্দি এবং ইংলিশে ঐ সৈনিকেরা কি কি বলেছে সেটাও তিনি আমাকে বলেছিলেন কিন্তু এখন আমার মনে নেই' (*সূত্রঃ বিডিআর সাক্ষী নম্বর-০৩*)।

(৪) **<u>সিপাহী শাহাদাতের দেওয়া তথ্য মতে</u>**

'২৫ তারিখ সকাল আনুমানিক ১০৩০ থেকে ১১৩০ এর মধ্যে আমি তিনজন ব্যক্তিকে ঐ পথ ধরে দেয়াল টপকে পিলখানার বাইরে চলে যেতে দেখি। এদের পরনে বিডিআরের পোশাক পরিহিত থাকলেও পায়ে বুট জুতা ছিল না। প্যারেড এবং বিডিআর সপ্তাহ উপলক্ষ্যে আমাদের সবার চুল জিরো সাইজ করা থাকলেও এদের চুল সিভিলিয়ান দের মত ছিল। তবে এদের মুখ বাঁধা ছিল। যেটি আমার আরো দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তা হল তারা এমন একটি ভাষায় কথা বলছিল যেটি মাঝে মাঝে আমার হিন্দি মনে হয়েছে আবার মনে হয়েছে ঠিক হিন্দিও না। সেটি যে বাংলা ভাষা না আমি নিশ্চিত। হিন্দি ভাষা আমি বলতে না পারলেও বুঝতে পারি। তারা একটি অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতে

বলতে চলে গেল। মনে হচ্ছিল হিন্দি আবার হিন্দিও না এমন ভাষাতেও তারা কথা বলেছে' (সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-২১)।

(৫) **<u>সিপাহী আব্দুল মতিন বলেন</u>**

'মিছিলটি 'জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান করে এবং আনুমানিক ১০০ থেকে ১৫০ জনের মতো লোকসংখ্যা ছিল। মিছিলের সঙ্গে মিশে দুজন ব্যক্তি উচ্চস্বরে 'জয় হিন্দ' বলছিলেন। ওই দুইজনের গায়ে বিডিআর পোশাক ছিল এবং তাদের হাতে এসএমজি অস্ত্র লক্ষ্য করলাম। তাদের পোশাক কেমোফ্লেজ গেজি ছিল এবং তাদের চেহারা ও ভাষা থেকে আমি বুঝলাম তারা স্থানীয় নয়, কারণ তারা হিন্দি ভাষায় কথা বলছিল' (সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-২৪)।

ছ। লে. কর্নেল তাসনিম, মেজর মুনির, সিপাহী আইয়ুব হিন্দি ভাষা, পশ্চিমবঙ্গের টানে বাংলা ভাষা এবং বাংলা বা হিন্দি নয় অপরিচিত ভাষার কথোপকথন শুনেছেনঃ

(১) **<u>লে. কর্নেল তাসনিম বলেন</u>**

'পরে রাত সাড়ে সাতটায় একটি পিকআপে দন্ডায়মান দুজন লোক সিগন্যাল সেক্টর অফিসের সামনে মেগাফোনে সৈনিকদের উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। তাদের চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা, ভাষা পশ্চিমবঙ্গের মতো। তারা বলছিল, 'আর্মির বিরুদ্ধে লড়বো, ঐক্যবদ্ধ থাকো।' উল্লেখ্য বিডিআর সপ্তাহ উপলক্ষ্যে শতভাগ বিডিআর সদস্যের চুল কাটা নিশ্চিত করা হয়েছিল' (সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫৪)।

(২) **<u>মেজর সৈয়দ মনিরুল আলম বলেন</u>**

'রাতে দরবার হলের ফলস, সিলিং এ লুকিয়ে থাকা অবস্থায় আমি নিজ কানে এমন ভাষা শুনেছি যা বাংলা, হিন্দি বা চাইনিজ ছিল না সম্ভবত চাকমা, তবে আমি নিশ্চিত না। এটা সাবকন্টিনেন্টেরও কোন ভাষা হতে পারে' (সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৯২)।

(৩) **<u>সিপাহী আইয়ুব বলেন</u>**

'আমি স্মল আর্মস কোয়ালিফাইড, অস্ত্র-শস্ত্র সম্পর্কে আমার খুব ভাল ধারণা ছিল। তাই তৎক্ষণাত আমি ওদের অস্ত্র দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি যে এখানে বহিরাগত লোকজনও আছে। প্রচন্ড গোলাগুলি করতে করতে দরবার হল ঘিরে ফেলেছিল। আমি দূর থেকে তাদের কিছু কথাও শুনেছিলাম। সেগুলো বাংলা ছিল কিন্তু আমার মনে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের দিকের বাংলা টানে তারা কথা বলছিল' (সূত্রঃ কয়েদি সাক্ষী নম্বর-১৭)।

জ। ক্যাপ্টেন শাহনাজ ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে ১৮ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন এর পক্ষ হতে Search and Rescue Operation এ অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পিলখানা দরবার হলের নিকট একটি ব্যবহার করা সাব মেশিন গানে (এস এম জি) নজলের সাথে গেরিলা বাহিনীর স্টাইলে বাঁধা একটি বিদেশি স্লিং দেখেন। স্লিংটি ছিল সেনাবাহিনীর মত জলপাই রঙের এবং তার উপর Dark Olive রঙের উপর বড় ইংরেজি হরফে 'TIGER' লিখা। তার জানামতে এ ধরনের স্লিং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অথবা বিডিআর ব্যবহার করে না। গঠন, স্লিং এর পুরুত্ব এবং স্লিংটি বাঁধার কৌশল দেখে তার কাছে মনে হয়েছিল এটি অন্য কোন বিদেশি উৎসের হতে পারে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১০১)।*

ঝ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে জনাব গোলাম রেজা (প্রাক্তন এমপি) পিলখানার ভিতরে ও বাইরে কিছু লোককে দৌঁড়া দৌঁড়ি করতে দেখেন কিছু মানুষ ছোট ছোট টিনের ঘরে লাইফ জ্যাকেটগুলো খুলে রেখে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দেখে এমপি গোলাম রেজার মনে হয়েছিল তারা দেশের কেউ নয় *(সূত্রঃ রাজনৈতিক সাক্ষী নম্বর-০১)।*

ঞ। তোরাব আলীর মোবাইল ফোনে ভারত এবং সিঙ্গাপুরে একাধিকবার যোগাযোগ করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতীয় হাই কমিশনে উক্ত টেলিফোনের গ্রাহকদের পরিচয় জানার জন্য চিঠি লিখা হয়েছিল কিন্তু উত্তর পাওয়া যায়নি (প্রাপ্ত সিডিআর মোবাইল রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। মোবাইল ফোন ব্যবহাকারী সমন্ধে ডিজিএফআই হতে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করে অর্থবহ কোন কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি *(সূত্রঃ সংযোজনী-৫৪)।*

ট। বিডিআর সদস্যদের সাথে বিএসএফ এর যোগাযোগ হয়েছে এবং সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করলে বিএসএফ এর সহায়তায় ভারতে চলে যাবার প্রতিশ্রুতি ছিল *(সূত্রঃ সেনা তদন্ত প্রতিবেদন, পৃষ্ঠা নম্বর-৭৬৯)।*

ঠ। ভারত বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালাবে বলে এসআইএন্ডটির শিক্ষার্থদেরকে মেজর জেনারেল তারেক এবং লে. জেনারেল মামুন খালেদ কর্তৃক হুমকি দেয়া হয়েছিল *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৪৭)।*

ড। তৎকালীন সিজিএস লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিনা ইবনে জামালী ১১ ডিভিশনের জিওসির কাছ থেকে এই মর্মে একটি তথ্য পান যে, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ করছে। তারা একটি প্যারাট্রুপার বাহিনীও প্রস্তুত রেখেছে এই জন্য যে আমাদের সেনাবাহিনী যদি অভিযান পরিচালনা করে তাহলে তারা শেখ হাসিনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৫)।* মেজর জেনালে মুহম্মদ ফেরদৌস মিয়া, জিওসি ১১ পদাতিক ডিভিশন এর ভাষ্য মতে সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সেনা সমাবেশের তথ্য FIU সম্ভবত এনএসআই এবং ডিজিএফআই কাছ থেকে শুনেছিল। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য সমাবেশের তথ্য তিনি যদি শুনে থাকেন, তবে অবশ্যই তিনি সেটা সেনাসদরে জানিয়েছিলেন। তবে বিষয়টি তিনি নিশ্চিত করতে পারেননি *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-১৩)।*

ঢ। তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) মঈন ইউ আহমেদের ভাষ্যমতে, 'আমি 'উড়া' 'উড়া' খবর পাচ্ছিলাম যে if anything goes wrong, এরকমটি হতে পারে (সশস্ত্র বাহিনী সরকারের সিদ্ধান্তের বাইরে গেলে ভারত বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালাবে)। যদি তারা (ভারতীয় বাহিনী) আসতো তাহলে ১৯৭১ এর পরে যেমন ফেরত চলে গিয়েছিল, এবার এলে আর ফিরে যেত না। এবার ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশ এর অভ্যন্তরে অভিযান চালালে Things would have been different। গবেষক অভিনাশ পালিওয়াল ও তাঁর প্রবন্ধে এটাই বলেছেন। এটা আমাদের জন্য would have been very very bad। তিনি দুটো আর্টিকেল লিখেছেন এই বিষয়ে, দুটোই আমার কাছে আছে' *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-০১)।*

ণ। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অভ্ লন্ডন এর বিখ্যাত স্কুল অভ্ আফ্রিকান অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ (এসওএএস) এর শিক্ষক অভিনাশ পালিওয়াল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক ২০২৪ সালে প্রকাশিত 'India's Near East: A New History' গ্রন্থের ২৮৬ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

The recently elected prime minister Hasina, who also held the defence portfolio, felt threatened and couldn't count on the army's support. 'She asked India for help … and that's why we were there', awaiting orders and 'preparing for all eventualities when we touch down in Dhaka', remembers Sandhu.

'Shortly after the killings began, Hasina called her closest ally in New Delhi, top Congress leader and recently appointed finance minister Pranab Mukherjee. Upon hearing what was going on, Mukherjee promised 'to be responsive'. The 'SOS' from Dhaka triggered the mobilisation of paratroopers, and prompted foreign secretary Shivshankar Menon to urgently engage with American, British, Japanese, and Chinese envoys to lobby support for Hasina'.

'Apart from Kalaikunda, paratroopers were mobilised in Jorhat and Agartala. If the order came, Indian troops would enter Bangladesh from all three sides. The aim was to secure the Zia International Airport (renamed Hazrat Shahjalal International Airport) and the Tejgaon airport. Subsequently, the paratroopers would wrest control of Ganabhaban, prime minister's residence, and evacuate Hasina to safety. The Brigade commander overseeing the operation began distributing 'first line' ammunition meant for use during active combat'.

ত। অভিনাশ পালিওয়াল বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তীর উদ্ধৃতি দিয়ে একই পৃষ্ঠায় লিখেছেন,

'Pinak Ranjan Chakravarty, India's high commissioner to Dhaka (2007–10) who has family origins in Bangladesh and called Hasina 'Aapa' (elder sister) out of respect, says that 'we did put some forces on alert, and conveyed to Hasina that we're worried about her safety'.

থ। বাংলাদেশ এর তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) মঈন ইউ আহমেদ জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের সম্মুখে তাঁর প্রদত্ত সাক্ষ্যে অভিনাষ পালিওয়াল এর উপরে বর্ণিত উদ্ধৃতিগুলো দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এই উক্তিগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

দ। অভিনাষ পালিওয়াল একই গ্রন্থের ২৮৭ পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোঃ তৌহিদ হোসেন এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন,

'I was told by those who were closer to power that Gen. Moeen was asked not to use force otherwise Indian] paratroopers will drop in Dhaka within one hour', says Touhid Hussain, then Bangladesh's foreign secretary'.

এই বিষয়ে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন কর্তৃক প্রেরিত লিখিত প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মোঃ তৌহিদ হোসেন নিম্নে উল্লিখিত উত্তর প্রদান করেন,

'the sentence that is quoted in Paliwal's book is correct. While the BDR killing took place, I was attending a SAARC meeting in Colombo. Few months later, when I was already shunted out to Foreign Service Academy, I asked casually someone close to power, why the army chief did not take steps to save his officers. He said what I told Paliwal.

ধ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানায় বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পরপরই শেখ হাসিনা ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী প্রণব মুখার্জিকে ফোন করেন এবং তার সরকারের কাছে আন্তর্জাতিক সহায়তা চান। শেখ হাসিনাকে প্রণব মুখার্জি আশ্বাস দেন যে তাকে (শেখ হাসিনাকে) সব ধরনের সহায়তা করা হবে। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শিবশংকর মেনন শেখ হাসিনা সরকারের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য যুক্তরাজ্য, চীন এবং জাপান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন *(সূত্রঃ দ্য হিন্দু (ভারতীয়) ২২ নভেম্বর ২০২১ এবং আমাদের দেশ ২৮ মার্চ ২০১১, সংযোজনী-৫৫)।*

ন। বাংলাদেশ পুলিশ ইমিগ্রেশন প্রশাসন শাখার তথ্য অনুযায়ী ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় পাসপোর্টধারী এবং বিদেশী পাসপোর্টধারী ভারতীয় নাগরিকের বাংলাদেশ আগমন এবং বহির্গমনের তথ্য নিম্নরূপঃ

(১) ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ভারতীয় পাসপোর্টধারী এবং বিদেশী পাসপোর্টধারী ভারতীয় নাগরিকের বাংলাদেশ আগমনঃ ৮২৭ জন আগমন করেছে, তার মধ্যে ৬৫ জনের বহির্গমনের তথ্য পাওয়া যায়নি।

(২) ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ভারিতীয় পাসপোর্টধারী এবং বিদেশী পাসপোর্টধারী ভারতীয় নাগরিকের বাংলাদেশ থেকে বহির্গমনঃ ১২২১ জন বহির্গমন করেছে তার মধ্যে ৫৭ জনের আগমনের তথ্য পাওয়া যায়নি *(সূত্রঃ বাংলাদেশ পুলিশ ইমিগ্রেশন প্রশাসন শাখা স্পেশাল ব্রাঞ্চ স্মারক নং ৪৪.০১.০০০০.০৮৬.০০৪.২৫/১৩১১ তারিখ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, সংযোজনী-৫৬)।*

প। সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশি দেশের সহায়তায় বিডিআরকে পুনর্গঠণ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ বলেনঃ

'একবিংশ শতাব্দিতে যাতে আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী গড়ে তোলা যায় সে লক্ষ্যে সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বিডিআরকে পুনর্গঠন করে তাদের প্রশিক্ষণসহ উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবেশী দেশগুলোর সহায়তা নেয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, বন্ধুপ্রতিম দেশের সহায়তা নিতে কোন সমস্যা নেই' (সূত্রঃ দৈনিক যুগান্তর ৬ মে ২০০৯ এবং bdnews24.com uploaded on 5 May 2009).

ফ। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা-এগারোটার দিকে পিলখানার গেইট খুলে যায় এবং ভেতর থেকে কয়েকটা মাইক্রোবাস বেরিয়ে আম্বালা পার হয়ে চলে যায়। লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজ (অব.) ভেবেছিলেন তার আটকে পড়া ফ্যামিলি ওই মাইক্রবাসে চলে যাচ্ছে। দ্বিতীয় মাইক্রোবাসটি বের হওয়ার সাথে সাথে লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজ মাইক্রোবাসের দরজা ধরে হেচকা টান দিয়ে খুলে ফেলেন এবং মাইক্রোবাসটির ভেতরে আলো জ্বলে উঠে। ভিতরে ছয়-সাতজন লোককে দেখতে পান তিনি। তাদের মাথা ওড়না বা চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল। লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজ তার স্ত্রী এবং বাচ্চার নাম ধরে ডাকাডাকি করতে থাকেন এবং মাইক্রোর ভেতরের পিছনের প্রথম সিটে ট্র্যাক স্যুট পরা জলপাই বা ধুসর কালারের গেঞ্জি গায়ে একজন মোটা গোফের লোককে বসা অবস্থায় দেখেন। দরজা খোলার সাথে সাথে ঐ লোক লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন 'হু'? আবারো জিজ্ঞেস করেন 'হু'? এরপর জিজ্ঞেস করেন 'হু আর ইউ'? এরপর তিনবার চিৎকার করে বলেন 'ক্লোজ' 'ক্লোজ' 'ক্লোজ'। মুখ ঢাকা অবস্থায়ও লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজ দুজনকে দেখে বুঝতে পারেন তারা পুরুষ লোক এবং বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং তার মনে হয়েছিল তিনি কোনো মিলিটারি পারসন। মাইক্রোবাসের গ্লাস কালো ছিল। লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজ সেকেন্ড বা থার্ড মাইক্রোবাসটাকে ধরেছিলেন। তার আগে আরও একটা বা দুটি মাইক্রোবাস চলে গেছে। গাড়িগুলো দশটা বা সাড়ে দশটা বা এগারোটার দিকে বের হয়েছে। গাড়ির লোকজনকে অন্তত বাংলাদেশী লোক বলে লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজ এর মনে হয় নাই *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-৬৬)।*

ব। ১৬ মার্চ ২০০৯ এ India Today তে প্রকাশিত 'More than a Mutiny' নামক এক প্রবন্ধে জনাব সৌরভ শুকলা লেখেন যে, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ ভারত শেখ হাসিনাকে উদ্ধার করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। ত্রিপুরায় একটি সম্মুখবর্তী বিমান বাহিনী ঘাটিতে দুটি এবং কলকাতায় একটি কামান্ডো প্লাটুন সেজন্য প্রস্তুত রাখা হয় *(সূত্রঃ সংযোজনী-৫৭)।*

৭৩। <u>ডিজি এনএসআই, ডিজি ডিজিএফআই ও ডিজি বিজিবি'র সাথে কমিশনের মত বিনিময়।</u> ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে কমিশনের অস্থায়ী কার্যালয়ে ডিজি এনএসআই ডিজি ডিজিএফআই ও ডিজি বিজিবির সাথে কমিশনের এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বাহিনী ও সংস্থা সমূহের প্রধানগণ কিছু সুপারিশ তুলে ধরেন যা নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

ক। <u>বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)</u>।

(১) বিজিবি সদস্যদের পুলিশের ন্যায় জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে প্রেরণ করা হলে বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্রোহের ন্যায় অপরাধ সংঘটনে নিরুৎসাহিত হবে।

(২) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল বাহিনীর বেতন কাঠামো ও পদমর্যাদায় সমতা আনয়ন করা যেতে পারে।

(৩) বিজিবি সদস্যদের পরিবারের চিকিৎসা এবং শিক্ষার মান ও আওতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(৪) পার্বত্য চট্টগ্রামে বিজিবি ক্যাম্প ও বিওপিতে রসদ সরবরাহ এবং রোগী স্থানান্তর ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের জন্য বিজিবি এয়ার উইং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

(৫) সকল বিজিবি ক্যাম্প ও বিওপিতে পাকা আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

(৬) **বিজিবির বিভাগীয় কর্মকর্তাদের মধ্যে যোগ্যতা সম্পন্ন নেতৃত্বের বিকাশ ঘটানোর প্রয়াসে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারেঃ**

(ক) সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে দশ বছর চাকরি সম্পন্ন ইউনিফর্মধারী বিজিবি সদস্যদের মধ্য হতে লিখিত, মৌখিক ও ডাক্তারি পরীক্ষার ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতঃ আইএসএসবি কর্তৃক সংক্ষিপ্ত মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন শেষে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে স্বল্প মেয়াদী (তিন মাস) প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(খ) উপরোল্লেখিত প্রশিক্ষণ শেষে বিজিটিসিএন্ডসিতে ছয় অথবা নয় মাস ব্যাপী কোর্স শেষে পাসিং আউট প্যারেডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা প্রথম শ্রেণীর অফিসার (এডি) হিসেবে বিজিবি'র বিভিন্ন ইউনিটে যোগদান করতে পারে।

(গ) ইউনিটে দুই বছর চাকরি সমাপনান্তে তাদেরকে বিজিবির বিভিন্ন সদর দপ্তরে নিয়োগ করা যেতে পারে।

(ঘ) ক্রমান্বয়ে তারা সহকারী পরিচালক হতে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে সিনিয়র সহকারী পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক ও পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

(ঙ) উল্লেখ্য যে, অতিরিক্ত পরিচালক ও পরিচালক পদবিধারীগণকে ইউনিটের উপ-অধিনায়ক ও অধিনায়ক এবং সদর দপ্তরসমূহে উপযুক্ত পদসমূহে পদায়ন করা যেতে পারে।

খ। <u>ডিজিএফআই</u>। ২০০৯ সালের বিডিআর বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে নতুন নামে বিজিবির কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে নতুন নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক রূপ পেলেও সাম্প্রতিক সময়ে বাহিনীর মধ্যে বিদ্যমান কর্মপরিবেশ পদোন্নতি ও কল্যাণ সংক্রান্ত অসন্তোষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অতএব, বিদ্যমান অসন্তোষসমূহ দূরীকরণ এবং অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা ও বাহিনীর স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারেঃ

(১) **<u>অভিযোগ ও অসন্তোষ নিরসনে বিশেষ দৃষ্টি</u>।** বিদ্যমান অসন্তোষ ও অভিযোগসমূহ নির্ণয়ে গোয়েন্দা নজরদারির পাশাপাশি একটি কমিটি গঠনের মাধ্যমে তা নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র অভ্যন্তরীণ সেল গঠনের মাধ্যমে অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম চালু করা।

(২) **<u>যোগ্য নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণ</u>।** ইউনিট পর্যায়ে দক্ষ, মানবিক ও অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব তৈরি করা। কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত 'Leadership Ethics and Moral

Management' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রভাবলয় ও গ্রুপিং প্রতিরোধে অফিসার থেকে শুরু করে সকল সদস্যদের নিয়মিত Rotation এর ব্যবস্থা করা।

(৩) **শৃংখলার কঠোর প্রয়োগ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।** বাহিনীর সকল স্তরে যে কোন অনিয়ম অসদাচরণ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে দ্রুত বিচার নিশ্চিত করা। বিজিবি এ্যাক্ট ও আচরণ বিধির বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা।

(৪) **কল্যাণমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং মনোবল ও নৈতিকতার উন্নয়ন।** পদোন্নতি ও পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতা ভিত্তিক নীতি অনুসরণ করার পাশাপাশি সবার জন্য উন্নত রেশন, বাসস্থান, চিকিৎসা ও পারিবারিক সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণ। মানসিক ও নৈতিক সহায়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় ও দক্ষ কাউন্সিলর নিয়োগের পাশাপাশি বিশেষ ক্ষেত্রে 'স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ও সাইকোলজিক্যাল ইভালুয়েশন প্রোগ্রাম' চালু করা যেতে পারে।

(৫) **প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা বৃদ্ধি।** বাহিনীর সদস্যদের জাতীয় উন্নয়ন, ত্রান ও উদ্ধার কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা। Esprit de Corps ও দেশপ্রেমের চেতনা জোরদার করতে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ।

(৬) **গোয়েন্দা তৎপরতা।** বিজিবির নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স উইং আরো শক্তিশালী, বিস্তৃত ও সময়োপযোগী করা। নিজস্ব ইন্টেলিজেন্স এর পাশাপাশি ডিজিএফআই এর গোয়েন্দা কার্যক্রম একটি সমন্বয় সেলের মাধ্যমে বাড়ানো যেতে পারে যেন যে কোন অসন্তোষ, অব্যবস্থাপনা বা অনিয়ম যথাসময়ে চিহ্নিত করা যায়।

(৭) **গুজব ও অপপ্রচার দমন।** যেকোনো অপপ্রচার কিংবা গুজব দমনের লক্ষ্যে ডিজিটাল মনিটরিং এর পাশাপাশি নিয়মিত সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন চালু রাখা যেতে পারে।

(৮) **সংকট ব্যবস্থাপনা ও উন্মুক্ত সংলাপ কাঠামো।** সম্ভাব্য কোন অসন্তোষের আভাস পেলে তাৎক্ষণিক সংলাপের মাধ্যমে সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, যেমন crisis Management Committee রাখা যেতে পারে।

(৯) **চেইন অভ্ কমান্ড।** সকল স্তরের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। স্বচ্ছতার ভিত্তিতে চেইন অভ্ কমান্ড এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন কোন অপতথ্য, অব্যবস্থাপনা বা অনিয়ম থেকে কোন স্তরে ক্ষোভের জন্ম না নেয়।

(১০) **অন্যান্য।** বিজিবির বিভিন্ন স্তর হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া যেতে পারেঃ

(ক) নতুন পে স্কেলে সবার সাথে সমন্বয়।
(খ) পার্বত্য চট্টগ্রামে দায়িত্ব পালনকালে প্রণোদনার ব্যবস্থা রাখা।

গ। **এনএসআই**।

(১) বিজিবির নিজস্ব গোয়েন্দা সক্ষমতা বৃদ্ধি করা উচিত। বিজিবি ইতোমধ্যেই তাদের গোয়েন্দা সংস্থাটিকে সংস্কার করেছে। তবে তার সাথে আধুনিক প্রযুক্তি যুক্ত করতে হবে। সংস্থাটির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত চোরাচালানকারীসহ সীমান্তে শত্রুদের সম্পর্কে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা।

এছাড়াও বাহিনীর অভ্যন্তরীণ অসন্তোষ ও অন্যান্য বিষয়ের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করে কমান্ড চ্যানেলকে দ্রুত জানানো।

(২) এনএসআই এবং ডিজিএফআই এর সঙ্গে বিজিবির গোয়েন্দা তথ্য ভাগ করে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স সবগুলো সংস্থারই সমান উদ্বেগের বিষয় হওয়া উচিত।

(৩) বিজিবির নিজস্ব ডিপার্টমেন্টাল অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বিজিবি মূলত তিনটি স্তরে নিয়োগ করতে পারেঃ

(ক) জাতীয় বেতন স্কেলে নবম গ্রেডে 'সহকারী পরিচালক' হিসেবে সরাসরি নিয়োগ করে অতিরিক্ত পরিচালক পর্যন্ত পদোন্নতি। পরিচালক এবং তদূর্ধ্ব পদসমূহ সেনা বাহিনীর হতে আগত অফিসাররা পূরণ করবে। নিচের পদগুলিতেও সেনাবাহিনী হতে আগত অফিসাররা বিজিবির ডিপার্টমেন্টাল অফিসারদের সাথে সমানভাবে থাকবে। বিজিবির নিয়োগকৃত অফিসাররা বিএমএতে ১ বছরের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করবে।

(খ) শতকরা ৩৩ ভাগ সহকারী পরিচালকের পদ ১০ম গ্রেড হতে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

(গ) সৈনিক হিসাবে যোগ দিয়ে তার সামর্থ অনুযায়ী যে কোন সৈনিক সহকারী পরিচালক পর্যন্ত প্রাতিষ্ঠানিক পরীক্ষার মাধ্যমে পদোন্নতি পেতে পারবে।

(৪) বিজিবির সব স্তরের সৈনিকদেরকে জাতিসংঘ মিশনেও পাঠানো ব্যবস্থা করা।

৭৪। <u>বিডিআর হত্যাকান্ড শহীদ অফিসার এবং অন্যান্য পদবির পরিবারবর্গকে প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাসমূহের সারাংশ</u>

ক। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সকল পরিবারকে (সর্বমোট ৬১টি পরিবার) ১০ লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

খ। সকল শহীদ পরিবার পেনশন কম্যুটেশন সুবিধা পেয়েছেন।

গ। সেনাবাহিনী কল্যাণ তহবিল হতে সকল পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা করে অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

ঘ। সেনাবাহিনীর পরিবার নিরাপত্তা প্রকল্প তহবিল হতে সকল পরিবারকে ৮ লক্ষ টাকা (সৈনিক পরিবার ২ লক্ষ ৫০ হাজার মাত্র) টাকা প্রদান করা হয়েছে।

ঙ। বিডিআর তহবিল হতে সকল পরিবার (সৈনিক পরিবার ব্যতীত) ৫০ হাজার টাকা করে অনুদান পেয়েছেন। সৈনিক পরিবার স্যাপার্স কল্যাণ হতে ৩ হাজার টাকা পেয়েছেন।

চ। অফিসার পরিবার কল্যাণ তহবিল হতে সকল পরিবার পদবি অনুযায়ী নির্ধারিত হারে (পিতা/মাতা, স্ত্রী ও সন্তান) ভাতা পাচ্ছেন।

ছ। ব্যাংকার্স এ্যাসোসিয়েশন অভ্ বাংলাদেশ কর্তৃক প্রত্যেক পরিবারকে (সৈনিক পরিবার ব্যতীত) মাসিক ৪০ হাজার টাকা করে (বাৎসরিক ৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা) ১০ বছর পর্যন্ত মোট ৪৮ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। সৈনিক পরিবারকে সেনাবাহিনী কল্যাণ তহবিল হতে মাসিক ১০ হাজার টাকা করে (বাৎসরিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা) মোট ১০ বছর পর্যন্ত ১২ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

জ। ৫৬টি পরিবারকে ২ লক্ষ টাকার ট্রাস্ট ব্যাংক মিউচুয়াল ফান্ড প্লেসমেন্ট শেয়ার গ্রহণ করেছেন।

ঝ। প্রত্যেক পরিবার সিএসডি হতে এককালীন ২১ হাজার ৩ শত টাকার নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং সিএসডি ডিসকাউন্ট কার্ড পেয়েছেন।

ঞ। শহীদ পরিবারের ৪ জন সদস্য ভর্তি/টিউশন ফি ব্যতীত বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছেন।

ট। সেনাবাহিনীর অধীনস্থ বিভিন্ন স্কুল/কলেজে অধ্যয়নরত শহীদ পরিবারের মোট ৪০ জন শিশুর ভর্তি/ টিউশন ফি মওকুফ করা হয়েছে।

ঠ। সেনাবাহিনীর অধীনস্থ নয় এমন স্কুল/কলেজে অধ্যয়নরত (পিটারপেন, রাজউক, রেডিসেনিস্যাল মডেল স্কুল, শাহীন স্কুল) শহীদ পরিবারের ৩২ জন শিশুরও ভর্তি/টিউশন ফি মওকুফ করা হয়েছে।

ড। শহীদ পরিবারের মোট ০৯ জন ছেলে/মেয়েকে বিভিন্ন ক্যাডেট কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ঢ। ২০০৯ সাল হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মেয়াদে ৪৬টি আগ্রহী শহীদ পরিবারকে বিভিন্ন সেনানিবাসে সরকারি বাসস্থানে অবস্থানের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

ণ। মোট ৩১ জন শহীদ পরিবারের সদস্যকে বিভিন্ন চাকরি দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে ০৩ জন বিদেশে চাকরি পেয়েছেন (০২ জন লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশন এবং ০১ জন অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থিত বাংলাদেশ হাই কমিশন)।

ত। সকল শহীদ পরিবার সিএমএইচ এ বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছেন।

থ। মোট ৬১টি পরিবারের মধ্যে (০১ জন অবসরপ্রাপ্তসহ) ১২ জন অফিসার পূর্বেই ডিওএইচএস/ রাজউকের প্লট পেয়েছিলেন। বাকি ৪৯ (০১ জন সৈনিকসহ) জনকে চাকরির দৈর্ঘ্য বিবেচনায় নিম্নলিখিতভাবে প্লট/ফ্ল্যাট প্রদান করা হয়েছেঃ

(১) ৩৮টি শহীদ পরিবারকে ডিওএইচএস মিরপুর, মহাখালী ও চট্টগ্রামে প্লট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(২) ০৬টি শহীদ পরিবারকে ডিওএইচএস মিরপুরে ০২টি করে ফ্ল্যাট প্রদান করা হয়েছে (১৮ বছর চাকরির পূর্ণ না হওয়ায় প্লট প্রাপ্ত হন নাই)।

(৩) ০৪টি শহীদ পরিবার যারা পুনঃবিবাহ করেছেন তাদেরকে ডিওএইচএস মিরপুরে ০১টি ফ্ল্যাট প্রদান করা হয়েছে।

(৪) সৈনিক পরিবারকে সাভার খেজুরটেক সেনাপল্লী আবাসন প্রকল্পে ০১টি ফ্ল্যাট প্রদান করা হয়েছে।

দ। সকল শহীদ পরিবারকে এএইচএস-এ প্লট (সৈনিক পরিবার ব্যতীত) প্রদান করা হয়েছে, যা ডিওএইচএস এ প্লট প্রাপ্তির অতিরিক্ত।

ধ। সকল শহীদ পরিবারের সেনানিবাসস্থ বাসায় অবস্থানকালে সামরিক টেলিফোন সংযোগ প্রদান করা হয়েছি

ন। ১৫টি শহীদ পরিবারের হাউজ বিল্ডিং লোন (মূলসহ) মওকুফ করা হয়েছে।

প। সেনানিবাসে অবস্থানরত সকল শহীদ পরিবারকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত দুগ্ধ কার্ড এবং ঘি প্রদান করা হয়েছে।

ফ। ০৩টি শহীদ পরিবারের কম্পিউটার লোন মওকুফ করা হয়েছে।

ব। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য ০৫ (পাঁচ) জন শহীদ অফিসারের পিতা/মাতাকে সেনাবাহিনী কল্যাণ তহবিল হতে ২০১৬ সালে ১৫ লক্ষ টাকা করে প্রদান করা হয়েছে।

(সূত্রঃ সেনাসদর, এজির শাখা, পিএস পরিদপ্তর পত্র নং ২৩.০১.৯০১.০৩৮.০২.০৬৮.০১.০৩.০৭.২৫/বিডিআর তারিখ ০৩ জুলাই ২০২৫, সংযোজনী-৫৮)।

৭৫। **<u>কমিশন সদস্য কর্তৃক বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার ও কলেজ পরির্দশন</u>**। ১২-১৩ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের ০৪ সদস্যের একটি দল বান্দরবানের বায়তুল ইজ্জতে অবস্থিত বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার ও কলেজ পরির্দশন এবং সকল স্তরের কর্মকর্তা ও বিডিআর সদস্যদের সাথে মত বিনিময় করেন। পরির্দশন হতে প্রাপ্ত উল্লেখ্যযোগ্য বিষয় সমূহ নিম্নরূপঃ

ক। বিজিবিতে ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে অফিসার সংকট নিরসনে সেনাবাহিনী থেকে পর্যাপ্ত সংখ্যক অফিসার পদায়ন করা প্রয়োজন।

খ। বিজিবির সদস্যগণ সীমান্তে চোরাচালান বিরোধী কার্যক্রম এবং অবৈধ অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে যেন সততার সাথে দায়িত্বপালন করতে পারেন সেজন্য প্রশিক্ষণ শিক্ষাক্রমে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচি অন্তর্ভুক্ত করা।

গ। বিডিআর হত্যাযজ্ঞের সঠিক ইতিহাস তুলে ধরে বিজিবির সৈনিক ও কর্মকর্তাদের মধ্যে দেশপ্রেম, আনুগত্য, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং শৃঙ্খলার প্রতি প্রেষণা সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

ঘ। বিডিআর সৈনিকরা জেসিও/এনসিও হতে সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি পাওয়ার পরে তাদের বেতন ও অন্যান্য সুবিধাদি কমে যায়। ফলে তারা অনেকেই অর্থকষ্টে পতিত ও মনঃক্ষুণ্ন হন যেমন- একজন হাবিলদার আনুমানিক সর্বমোট ৪৫,০০০ টাকা বেতন-ভাতা পেলেও একজন সহকারী পরিচালক পান ২৭,০০০ টাকা। এছাড়া বিজিবির পে স্কেল ও অন্যান্য বাহিনীর (সেনা, নৌ, বিমান, পুলিশ এবং কোস্ট গার্ড) তুলনায় কম রয়েছে। পরবর্তী পে স্কেলে এধরণের বৈষম্য সমন্বয় করার জন্য সুপারিশসহ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

ঙ। দুর্গম এলাকায় চাকরিরত অফিসারদের পরিবার সন্তানের লেখা-পড়াসহ যৌক্তিক কারণে অন্যত্র বসবাস করলে বাড়ি ভাড়া কর্তন না করা।

চ। দুর্গম এলাকায় কর্তব্যরত বিজিবির ইউনিটগুলোর সাথে বেসামরিক প্রশাসন এবং বিভিন্ন সরকারি সেবামূলক সংস্থার সমন্বয় বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া।

ছ। দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় ভূমির কনট্যুর অনুযায়ী ১ মাইলের জন্য প্রকৃতপক্ষে দ্বিগুণ বা ততোধিক পথ পাড়ি দিতে হয়।। পাহাড় বেয়ে যাওয়ার জন্য টহল এর এবং অন্যান্য সরকারি কাজে নিযুক্ত বিজিবি সদস্যদের ভ্রমণভাতা বাবদ যে দূরত্ব হিসাব করা হয় তা সঠিক এবং বাস্তব সম্মত নয়। এছাড়াও চোরাচালানকৃত মালামাল উদ্ধার এবং সীমান্তে অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধের জন্য বিজিবি সদস্যদের মামলায় হাজিরা দেয়ার জন্যও ভ্রমণ খরচ হয়ে থাকে। এই বিষয়ে বিজিবি কর্তৃপক্ষ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে।

৭৬। **<u>সিসিটিভি প্রসঙ্গ</u>**। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসান নাসির ও মেজর মেহেদির ভিডিও সাক্ষাৎকার অনুযায়ী পিলখানায় মোট ১২৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপিত ছিল যা ২০০৯ সালে বিডিআরে চাকরিরত কেউই নিশ্চিত করতে পারেননি। মেজর মেহেদির ভাষ্যে যে ঠিকাদারের মাধ্যমে এই সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করেছিলেন বলে জানিয়েছিলেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কমিশন মোট ০৯টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের সত্যতা পায়। দালিলিকভাবেও ০৯টি ক্যামেরা স্থাপনের প্রমাণ পাওয়া গেছে যা আলামত হিসেবে জনাব আব্দুল কাহার আকন্দ সংরক্ষণ করেছেন *(সূত্রঃ সাক্ষী নম্বর-২২, সাক্ষী নম্বর-৯৩ এর ভিডিও সাক্ষাৎকার ও বেসরকারি ব্যক্তি সাক্ষী-০৬)।*

ঘটনার বিশ্লেষণ ও কমিশনের মতামত

ঘটনার প্রকৃতি ও স্বরূপ

৭৭। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সংঘটিত এই ঘটনা বাংলাদেশের তথা বিশ্বের ইতিহাসের অন্যতম নৃশংস হত্যাকান্ড। বিডিআর বিদ্রোহের আড়ালে এটা ছিল এক পরিকল্পিত হত্যাকান্ড যেখানে ৫৭ জন চাকরিরত কর্মকর্তা, ০১ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, ০১ জন চাকরিরত কর্মকর্তার স্ত্রী, ০১ জন অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার স্ত্রী, ০১ জন চাকরিরত সেনাবাহিনীর সৈনিক, ০৯ জন বিডিআর সদস্য এবং ০৪ জন বেসামরিক ব্যক্তিসহ মোট ৭৪ জনকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। অফিসারদের পরিবারসমূহের নারী ও শিশুদের প্রতি চালানো হয় অমানবিক মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন। অফিসারদের পারিবারিক বাসস্থান ও মেসে হামলা চালিয়ে লুট করা হয় অর্থ, স্বর্ণালঙ্কার ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। অফিসারদের বাসভবন ও গাড়িতে করা হয় অগ্নিসংযোগ। হত্যাযজ্ঞের বীভৎসতা এবং বেঁচে ফেরা অফিসার ও অফিসারদের পরিবারবর্গের উপর অত্যাচারের মাত্রা ইতিহাসের যে কোন বর্বরতাকেই হার মানায়।

৭৮। ঘটনাটিকে শুধুমাত্র কিছু দাবি আদায়ের জন্য একটি বিদ্রোহ হিসেবে পরিগণিত করার অবকাশ নেই। ঘটনার ব্যাপ্তি, বর্বরতার মাত্রা এবং কর্মকান্ডের ক্ষিপ্রতা কোনভাবেই তা সমর্থন করে না। বরং যে ক্ষিপ্রতায় অফিসারদের প্রথম দলকে হত্যা করা হয়েছে, বাসভবনে ও মেসে হামলা চালানো হয়েছে এবং পরবর্তীতে অবশিষ্ট অফিসারদেরকে খুঁজে খুঁজে হত্যা করা হয়েছে, তাতে এটা সন্দেহাতীত যে অত্যন্ত সু-পরিকল্পিতভাবে সম্পূর্ণ ঘটনাটি ঘটানো হয়েছে।

৭৯। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে লিফলেটে বর্ণিত সামান্য কিছু দাবি দাওয়ার কারণে সৃষ্ট কোন বিদ্রোহ এটা ছিল না। বরং এটা ছিল দীর্ঘদিনের পরিকল্পিত একটি হত্যাযজ্ঞ যা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সময় নিয়ে পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। হত্যাযজ্ঞের কুশীলবরা সাধারণ কিছু অসন্তোষকে অত্যন্ত চতুরতার সাথে ব্যবহার করে বেশ কিছু সংখ্যক সাধারণ বিডিআর সদস্যকে উদ্বুদ্ধ করে হত্যাযজ্ঞে, অত্যাচারে, অগ্নিসংযোগে এবং লুটতরাজে কাজে লাগিয়েছে।

৮০। শুধুমাত্র ডালভাত কর্মসূচির মত ছোটখাটো কিছু অসন্তোষকে কেন্দ্র করে এতবড় হত্যাযজ্ঞ চালানো এবং বিডিআরের তৎকালীন ডিজিসহ ৫৭ জন চাকরিরত অফিসার ও অন্যান্য ১৭ জনকে হত্যা করে নিজেদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়া শুধু অস্বাভাবিকই নয়, বরং অসম্ভব একটি বিষয়। যিনি দাবি পূরণ করতে সক্ষম, তাকেই হত্যা করে নিজেদেরকে মৃত্যু ঝুঁকির মধ্যে ফেলা অযৌক্তিক। অতএব, এ হত্যাকান্ডের পিছনে নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র ছিল যার শিকড় বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

৮১। **উদঘাটিত তথ্যানুযায়ী হত্যাকান্ডের বহু পূর্ব হতেই বিপথগামী বিডিআর সদস্যদের সাথে আওয়ামী লীগের কিছু নেতার যোগযোগ ও বৈঠক শুরু হয়। স্থানীয় আওয়ামী নেতা তোরাব আলীর মাধ্যমে বিডিআর সদস্যরা ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন ও জনাব শেখ সেলিমের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করে। একাধিক বৈঠকের মাধ্যমে বিপথগামী বিডিআর সদস্যরা আওয়ামী লীগের এসব নেতাকে তাদের দাবি দাওয়ার বিষয়গুলো জানায়। আওয়ামী লীগ নেতারা দাবি দাওয়ার বিষয়টি বিডিআরের তৎকালীন ডিজি মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদকে না জানিয়ে বিডিআর সদস্যদের ষড়যন্ত্রের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।**

হত্যাকান্ডের বাহ্যিক কারণসমূহ

৮২। **অফিসার-জওয়ান সম্পর্ক।** প্রেষণে কর্মরত সেনা কর্মকর্তা ও বিডিআর সদস্যদের মধ্যে বাহ্যত সম্পর্ক ভালো মনে হলেও ভেতরে ভেতরে বিডিআর সদস্যগণ সেনাবাহিনী হতে আগত কর্মকর্তাগণের ব্যাপারে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতো। বিডিআর সদস্যদের প্রচারিত বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত লিফলেট দু'টিতে এর আভাস পাওয়া যায়। সীমান্ত এবং সদর দপ্তরের বাইরের ব্যাটালিয়নগুলোতে যথারীতি মাসিক দরবার অনুষ্ঠানের রেওয়াজ প্রচলিত আছে দীর্ঘদিন থেকে। এ সকল দরবারে জওয়ান ও কনিষ্ঠ কর্মকর্তারা তাদের অভাব-অভিযোগ অধিনায়কের নিকট সরাসরি উপস্থাপন করতে পারেন। অপরদিকে, বিডিআর সপ্তাহ উপলক্ষে সদর দপ্তরে বছরে একবার দরবার অনুষ্ঠিত হওয়ার রেওয়াজ আছে। ইতোপূর্বে সরকার প্রধান ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ দরবার নেওয়ার দৃষ্টান্ত আছে।

সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারাই বিডিআর জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করে থাকে। সীমান্তে বিডিআরের কৃতিত্ব সেনা অফিসারদের কমান্ড, শৃঙ্খলা ও প্রশিক্ষণের ফসল। ঢাকার বাইরের ইউনিটগুলোতে অফিসার-জওয়ানরা একসাথে খেলা-ধূলা করে।

৮৩। হত্যাকান্ডের আগের প্রায় ২ বছর বিডিআর সদস্যরা ডাল-ভাত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। অফিসারের সংখ্যা কম পূর্ব হতেই অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে যোগাযোগ কম ছিল। ডাল-ভাত কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর তা আরো কমতে থাকে এবং হত্যাকান্ডের অব্যবহিত পূর্বের দিনগুলোতে এই সম্পর্ক একেবারে তলানিতে এসে পৌঁছায়। ফলস্বরূপ বিডিআরের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্য দীর্ঘদিন ধরে বিদ্রোহের নামে হত্যাকান্ডের পরিকল্পনা করলেও অফিসাররা তার বিন্দু বিসর্গও জানতে পারেনি। জনাব ফজলে নূর তাপস ২০০৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে একাধিকবার পিলখানা কেন্দ্রীয় মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে এসেছেন এবং নামাজ শেষে কিছু বিডিআর সদস্যের সাথে একাধিকবার বৈঠক করেছেন। পিলখানার ভিতরে তিনি নির্বাচনী প্রচারণাও চালিয়েছেন। কিছু বিডিআর সদস্য সরকারি গাড়ি নিয়ে জনাব শেখ সেলিমের বাসায় এবং তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসায় একাধিকবার গেছেন, তাদের দাবি দাওয়া লিখিতভাবে পেশ করেছেন এবং ষড়যন্ত্রের বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছেন। অথচ পিলখানায় অবস্থানকারী অফিসাররা এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ ছিলেন। অফিসার ও জওয়ান বা নেতৃত্বদানকারী ও অনুসরণকারীদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্কের উপরই একটি সুশৃঙ্খল বাহিনীর ভিত গড়ে উঠে। এই সম্পর্কে যখন চির ধরে তখন অনুসরণকারীদেরকে খুব সহজেই নেতৃত্বদানকারীদের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তোলা সম্ভব। বিডিআরের ক্ষেত্রে এটাই ঘটেছে। ষড়যন্ত্রকারীরা ডাল-ভাত কর্মসূচি হতে নিজস্ব হিসাব মত টাকা না পাওয়ার মত তুচ্ছ একটি কারণ এবং অন্যান্য কিছু কিছু কারণকে ব্যবহার করে অফিসারদের প্রতি খেপিয়ে তোলে। বিডিআর জওয়ানদের সাথে অফিসারদের নিবিড় সম্পর্ক বজায় থাকলে এবং পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থাবান হলে বিডিআরের সাধারণ সদস্যদেরকে এভাবে খেপিয়ে তোলা ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব হতো না। ষড়যন্ত্রকারীরা নিজেরা একটার পর একটা মিটিং করেছে এবং একাধিকবার একাধিক আওয়ামী লীগ নেতার সাথে সাক্ষাৎ করেছে অথচ অফিসাররা এ বিষয়ে সামান্যতম আভাসও পায়নি। বিডিআরের সদস্যদের দ্বারা লিফলেট প্রস্তুত, প্রিন্টিং এবং বিতরণের বিষয়েও তারা আগাম কোন তথ্য পাননি। নিম্নবর্ণিত কারণসমূহ অফিসার ও জওয়াদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে না উঠার পিছনে কাজ করেছেঃ

ক। <u>অফিসার স্বল্পতা।</u> প্রতিটি ব্যাটালিয়নে ০৫ জন অফিসার প্রাধিকৃত থাকলেও প্রতিটি ব্যাটালিয়নে গড়ে মাত্র ০২ থেকে ০৩ জন অফিসার উপস্থিত ছিল। পিলখানায় অবস্থিত ব্যাটালিয়নসমূহে কিছু অফিসার ডাল ভাত কর্মসূচিতে সংযুক্ত ছিলেন। এত অল্প সংখ্যক অফিসারের পক্ষে ব্যাটালিয়নের ৮০০ জন সদস্যের সাথে যোগযোগ রক্ষা করা প্রায় অসম্ভব ছিল।

খ। <u>মাত্রাতিরিক্ত ডিউটি।</u> ‘অপারেশন ডাল-ভাত’ ও ‘অপারেশন আলোর সন্ধানে’সহ অন্যান্য কর্মকান্ডে বিডিআর কর্মকর্তা ও অন্যান্য সদস্যরা দীর্ঘ সময় মাত্রাতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কর্মকর্তা ও অধীনস্তদের মধ্যে বিশাল দূরত্বের সৃষ্টি হয়। ফলে ষড়যন্ত্রকারীরা অতি সহজেই অধীনস্তদেরকে কর্মকর্তাদের সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা প্রদানে সক্ষম হয়।

গ। <u>সহানুভুতিসূচক পোস্টিং (Posting on Compassionate Ground)</u>। বিডিআর সদর দপ্তর ঢাকায় অসংখ্য অফিসারের পোস্টিং ছিল সহানুভুতিসূচক। কেউ পরিবারের সদস্যদের অসুস্থতার কারণে আবার কেউ নিজস্ব অসুস্থতার কারণে পিলখানায় পোস্টিং পেয়েছিলেন। সহানুভুতি সূচক পোস্টিং পাওয়া এসব অফিসার সংগত কারণেই নিজস্ব কাজে অসম্ভব ব্যস্ত থাকতেন। ফলে সৈনিকদের সাথে তাদের যোগাযোগ কমে যায়।

ঘ। <u>অফিস সময়ের পর পিলখানায় অফিসারদের অনুপস্থিতি।</u> বেশির ভাগ অফিসার অফিস সময়ের পর বিভিন্ন ব্যক্তিগত কাজে পিলখানার বাইরে চলে যেতেন। ফলে সৈনিকদের সাথে অনানুষ্ঠানিক যোগাযোগ কমে গিয়েছিল।

ঙ। **<u>ডিএডিদের উপর মাত্রাতিরিক্ত নির্ভরশীলতা।</u>** **ডিএডিরা যেহেতু সৈনিকদের কাছাকাছি থাকতেন, সেহেতু তাদের সাথে সৈনিকদের এমনিতেই নিবিড় যোগাযোগ ছিল। অফিসার স্বল্পতা এবং পিলখানায় অফিসারদের অনুপস্থিতির কারণে ডিএডিদের উপরে কমান্ড চ্যানেলের নির্ভরশীলতা বেড়ে যায়। ডিএডিরা এ পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে।**

৮৪। **<u>অপারেশন ডাল-ভাত কর্মসূচি</u>।**

ক। **<u>সৈনিকসুলভ আচরণের অবক্ষয়।</u>** 'অপারেশ ডাল-ভাত' কর্মসূচির কাজের প্রকৃতি এবং মান বিডিআর সদস্যদের পেশার সাথে সম্পূর্ণভাবে বেমানান হওয়ায় তাদের সৈনিক সুলভ মনোভাব ও আচরণের চরম অবক্ষয় ঘটে।

খ। **<u>খালি/একাধিক ফরমে স্বাক্ষর গ্রহণ বনাম শাস্তি।</u>** অপারেশন ডাল-ভাত কার্যক্রমের জন্য বিডিআরে কর্মরত সকল সদস্য ডিএ প্রাপ্য ছিলেন এবং তা পেয়েছেন। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের কাছ থেকে খালি ফরমে বা একাধিক ফরমে স্বাক্ষর নেয়া হয় যা তাদের মাঝে প্রথমে সন্দেহ ও পরবর্তীতে ক্ষোভের সৃষ্টি করে। অপরদিকে এ **অপ্রচলিত** কর্মসূচিতে, যেখানে প্রচুর আর্থিক লেনদেন জড়িত ছিল, অসংখ্য বিডিআর সদস্য আর্থিক অনিয়মের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ফলে তাদেরকে বিভিন্ন মাত্রায় শাস্তি প্রদান করা হয়। শাস্তির বিষয়টি বিডিআর সদস্যদের মধ্যে বিডিআর কর্তৃপক্ষ তথা অফিসারদের উপর ক্ষোভের সৃষ্টি করে।

গ। **<u>দীর্ঘ সময় দায়িত্ব পালন ও ছুটির সমস্যা।</u>** অপারেশন ডাল-ভাতসহ অন্যান্য কর্মকান্ডে কর্মকর্তা ও বিডিআর সদস্যরা একনাগাড়ে দীর্ঘদিন নিয়োজিত থাকায় স্বভাবতই বিডিআর সদস্যদের ছুটির সমস্যা সৃষ্টি হয়। ছুটি না পাওয়ায় বিডিআর সদস্যদের সাথে হতাশা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

ঘ। **<u>বিডিআরের দোকান।</u>** অপারেশন ডাল-ভাত বিডিআর সদস্যদের সার্বিক মানের উপরে প্রভাব ফেলে। এরপর তাদেরকে বিডিআরে দোকান পরিচালনার কাজে ব্যবহার করা হয়। এসব দোকান পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় নিয়মনীতি প্রণয়ন করা হয়নি। ডাল-ভাতের স্টলগুলোতে প্রথমদিকে জাল টাকা এবং পরিমাপের ঘাটতি মওকুফ করা হলেও এক পর্যায়ে স্টলগুলোতে নিয়োজিত সৈনিকদের উপর এসবের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়।

৮৫। **<u>অন্যান্য বিষয়ে সৈনিকদের ক্ষোভ।</u>**

ক। **<u>সেনাসদস্যদের সুযোগ-সুবিধার সাথে নিজেদের সুযোগ-সুবিধার তুলনা</u>।** সেনাসদস্যদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা যেমন বেতন, রেশন, জাতিসংঘ মিশনে নিয়োগ, দুইমাস বাৎসরিক ছুটি ইত্যাদির সাথে নিজেদের সুযোগ-সুবিধার তুলনামূলক বিচারে বিডিআর সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করে এলেও বিষয়গুলো তাদের কাছে স্পষ্টীকরণের কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ কারণটিকেও ষড়যন্ত্রকারীরা বিদ্রোহের পক্ষে কার্যকরভাবে ব্যবহার করেছে এবং প্রচারিত লিফলেটে বিষয়গুলো ফলাও করে উল্লেখ করা হয়েছে।

গ। **<u>বিডিআর সমস্যাবলী সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের দীর্ঘসূত্রিতা।</u>** বিডিআরের সমস্যাবলী বিভিন্ন সময়ে স্বরাষ্ট্র ও অর্থ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হলেও দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই যথা সময়ে সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়নি। সিদ্ধান্ত না পাওয়াকে হত্যাকান্ডের পরিকল্পনাকারীরা সাধারণ সৈনিকদের মাঝে বিডিআর কর্তৃপক্ষের নিস্ক্রিয়তা হিসেবে প্রচার চালিয়ে তাদেরকে প্ররোচিত করেছে।

ঘ। ইতোপূর্বে বিডিআরে বিভিন্ন ক্ষোভ এর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তিনটা বিদ্রোহ হয়। বিদ্রোহ তিনটিতে বিডিআর সদস্যদের বেশ কিছু ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এই তিন বিদ্রোহের কুশীলবদের একদিকে যেমন সঠিক শাস্তি দেয়া হয়নি তেমনি ভবিষ্যতে এসব বিদ্রোহ এড়ানোর জন্য বিডিআরের আইনটিকেও সংস্কার

করা হয়নি। তাদের ক্ষোভগুলো নিরসনের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাও করা হয়নি। পরবর্তী সময়ে বিডিআর সদস্যদের আরও কিছু ক্ষোভ জন্মে। ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে যে সব ক্ষোভ জমেছিল তার একটি আভাস লিফলেট এ পাওয়া যায়। লিফলেটে বর্ণিত ক্ষোভসমূহের একটি তালিকা নিচে দেয়া হলোঃ

(১) বাংলাদেশ রাইফেলস একটি স্বাধীন দেশের পরাধীন অবহেলিত বাহিনী।

(২) এই বাহিনীতে সেনাবাহিনীর অফিসাররা কমান্ড করতে এসে পাজেরো, নিশান পেট্রোল বিলাস বহুল গাড়ি ও বিলাসবহুল কোয়ার্টার ব্যবহার করে।

(৩) বেতন বৈষম্যের নেত্রী খালেদা জিয়া দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়ে পুলিশ বিডিআরের বেতন এক কোটায় এবং সেনাবাহিনীর বেতন অন্য কোটায় দেওয়ার ব্যবস্থা করেন।

(৪) প্রধানমন্ত্রীর কাছে একটি মাত্র দাবি বিডিআর থেকে সেনাবাহিনীর অফিসার তুলে নেওয়া হোক।

(৫) সেনাবাহিনীর অফিসাররা কোন রকম জবাবদিহিতা ছাড়া যা মন চায় তাই করে।

(৬) ইউনিটের সৈনিক মেসে সৈনিকের প্রাপ্য খাবার দেওয়া হয় না। মেস কমান্ডার মাসের শেষে ৪ লক্ষ টাকা ব্যালেন্স না দেখালে তার প্রমোশন বন্ধ থাকে।

(৭) ডিজি এবং ঢাকা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মুজিবুল হক ডাল ভাতের মালামাল স্টক করে দাম বাড়িয়ে অনেক টাকা আত্মসাত করেছেন। প্রায় ৬০০ কোটি টাকা মেজর মাহবুবের নেতৃত্বে বিদেশে পাচার করার সময় জিয়া বিমান বন্দরে ধরা পড়ে।

(৮) অফিসাররা ইজতেমা ডিউটিতে সৈনিকের নাস্তার বাজেটের টাকা খেয়ে ফেলেছেন।

(৯) ডিজি মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ, সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মুজিবুল হক এবং ডিজির স্ত্রীর ব্যাংক একাউন্ড তদন্ত করা প্রয়োজন।

(১০) ডাল ভাতের টাকা দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার গাড়ি কিনে সে গাড়ি আবার নিজেরাই নিলামে ৮ লক্ষ টাকার গাড়ি ১ লক্ষ টাকায় নিয়েছে।

(১১) বিডিআর বাহিনীতে ওদের দেখতে চাইনা। প্রয়োজনে আন্দোলনের মাধ্যমে কুকুরের ন্যায় সরাব।

এছাড়াও আরও যে সব ক্ষোভ বিরাজ করছিল সেগুলো নিম্নরূপঃ

(১) দরবার হল ভাড়া দেওয়ার সময় কিছুটা স্বজনপ্রীতি ছিল। Open Tender নীতিমালা অনুসৃত হয় নাই। ২০০৬ সাল হতে দরবার হল মেজর আকরাম হোসেন মুর্শেদী নামে তৎকালীন ডিজির এক কোর্সমেটকে লীজ দেয়া হয়। ফলে ব্যবহারকারীরা এবং বিডিআর প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ বিষয়টি নিয়েও বিডিআর সদস্যদের মাঝে ক্ষোভ ছিল।

(২) জানুয়ারি ২০০৯ হতে পিলখানার অভ্যন্তরে বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ রাইফেলস পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ এবং বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ রাইফেলস কলেজের সাথে পরিচালিত ইংলিশ সেকশন সমূহকে এক করে ন্যাশনাল কারিকুলামেরে একটি ইংলিশ ভার্সন স্কুল পরিচালনার উদ্যোগ নেয়া হয়। তৎকালীন ডিজি বিডিআরের স্ত্রী বেগম নাজনীন আহমেদে উক্ত স্কুলের উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োজিত হন। স্বভাবতই এই স্কুলের বেতন বেশি ছিল এবং বিডিআর সদস্যরা তাদের সন্তানদের সেখানে ভর্তি করতে অপারগ ছিল, যা তাদের মধ্যে বেশ ক্ষোভের সন্চার করেছিল।

(৩) ডাল-ভাত কর্মসূচি এবং বিডিআর দোকানসমূহে পরিমাপের ঘাটতি ও জাল টাকার দায় কর্মরত বিডিআর সৈনিকদের উপর চাপানোর ফলে তাদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়।

৮৬। <u>বিডিআর কমান্ড চ্যানেলের অনিয়ম সমূহ</u>।

ক। <u>কিছু স্টাফ অফিসারের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ</u>। উদঘাটিত তথ্যাবলী অনুযায়ী মেজর মাহবুব এর সাথে তৎকালীন ডিজি বিডিআর মেজর জেনারেল শাকিলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মেজর মাহবুব যেহেতু ডিজি বিডিআরের ব্যক্তিগত স্টাফ অফিসার (জিএসও-২ কর্ড) হিসেবে কাজ করতেন, সেহেতু বিডিআরের

সব কিছুর উপর তার একটি প্রচ্ছন্ন নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় যা অন্যান্য স্টাফ অফিসার থেকে বিডিআরের সৈনিক পর্যন্ত কেউই পছন্দ করতেন না। মেজর মাহবুবের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ ও স্বেচ্ছাচারিতার কথা সেনাসদর পর্যন্ত পৌঁছায় বলে সেনাসদর থেকে তার বিদেশ ভ্রমণের ব্যাপারে আপত্তি করা হয়েছিল। মেজর মাহবুবের বিদেশ ভ্রমণে সেনা সদর কর্তৃক নিরাপত্তা ছাড়পত্র দিতে অস্বীকার করায় কর্নেল এ্যাডমিনের সুপারিশে ডিজি নিজে সিজিএস এর সাথে কথা বলে তার নিরাপত্তা ছাড়পত্র আনানোর ব্যবস্থা করেন। মেজর মাহবুবের সাথে ডিজির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক এবং সেই সুবাদে মেজর মাহবুবের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ বিডিআর সৈনিকদের অসন্তোষের একটি কারণ ছিল।

খ। <u>অভিজ্ঞতা ও সক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও ডালভাত এর মত কর্মসূচি হাতে নেয়া</u>। ২০০৭ সালে জনমানুষের কাছে উচিৎ মূল্যে খাদ্য সামগ্রী পৌঁছে দেয়ার জন্য ডাল ভাত কর্মসূচি নামে একটি কর্মসূচি তৎকালীন সরকার গ্রহণ করে এবং এর সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিডিআরের উপর অর্পণ করা হয়। উদ্যোগটি মহৎ হলেও এ বিষয়ে বিডিআরের অভিজ্ঞতা বা সক্ষমতা কোনটিই ছিলনা। System Loss **কিভাবে পূরণ করা হবে বা বিডিআরের দৈনন্দিন কর্মসূচি পালনের পর অতিরিক্ত দায়িত্ব কিভাবে পালন করা হবে। এ বিষয়ে তাদের সম্যক ধারণা না থাকায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে** Sytem Loss**-এর দায় কর্তব্যরত সৈনিকদের উপর চাপানো হয়। অপরদিকে, এই অপ্রচলিত কর্মসূচির মধ্যে আর্থিক লেনদেনের বিষয় সরাসরি সংশ্লিষ্ট থাকায় অনেক বিডিআর সদস্য বিভিন্ন অপারাধের সাথে জড়িয়ে পড়ে। ফলে অনেক বিডিআর সদস্যকে চাকরিচ্যুতিসহ বিভিন্ন ধরনের শাস্তি ভোগ করতে হয়। বিডিআর, যার মূল দায়িত্ব ছিল সীমান্ত রক্ষা এবং সীমান্তে চোরাচালান বন্ধ করা সেরকম একটি বাহিনীকে এরূপ কাজে নিয়োজিত করার পূর্বে কমান্ড চ্যানেলের একাধিক বার ভাবা উচিৎ ছিল। ডাল-ভাত কর্মসূচিকে ঘিরে সৈনিকদের মধ্যে নানা রকম ধারণার সৃষ্টি হয়। তাদের ডেইলি এলাউন্স (ডিএ) পাওয়ার নিয়মটি তাদেরকে স্পষ্টভাবে না জানানোর ফলে তারা ডিএ পাওয়ার যে হিসেব করেছিল তার থেকে কম ডিএ পাওয়ার ফলে তাদের মধ্যে অসন্তোষ জন্মে।**

গ। <u>কমান্ড দায়িত্বে অবহেলা</u>। অনেক অফিসার যেহেতু সহানুভূতিসূচক বদলি হিসেবে পিলখানায় কর্মরত ছিলেন, সেহেতু তারা নিজ সমস্যা নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকতেন এবং অধীনস্তদের সাথে তাদের যোগাযোগ অনেক কমে গিয়েছিল। তাদের অভাব অভিযোগ বলার জন্য সৈনিকদের সুযোগ অনেক কমে যায়। এ বিষয়টির ব্যাপারে বিডিআরের তৎকালীন কমান্ড নিষ্ক্রিয় ছিল।

ঘ। <u>যে কোন প্রকারেই হোক বিডিআর সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত</u>। ২০০৯ সালের ফেব্রুয়ারি/মার্চের মধ্যে বিডিআর সপ্তাহ পালনের জন্য বিডিআরের তৎকালীন কমান্ড দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। বিডিআর সদস্যদের মাঝে অসন্তোষের বিষয়াদি এবং সেনা অফিসারদের প্রতি ষড়যন্ত্রকারীদের হুমকির বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে অবগত থাকার পরও ঝুঁকিকে কোনরূপ গুরুত্ব না দিয়ে বিডিআরের উর্ধ্বতন কমান্ড বিডিআর সপ্তাহ বাতিলের কোন প্রচেষ্টা হাতে নেননি, বরং যে কোন প্রকারেই হোক না কেন বিডিআর সপ্তাহ পালন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

৮৭। <u>বিডিআর কর্মকর্তাদের দুর্নীতি</u>। বিডিআর সপ্তাহের কিছুদিন পূর্বে ডিজিএফআই-এর ঢাকা ডিটাচমেন্ট কমান্ডার কর্নেল আলমাস রাইসুল গনি ডিজিএফআই-এর প্যারা মিলিটারি ডেসকের অফিসার মেজর মুরতাজাকে বিডিআর সদর দপ্তরের (ডিজি ও তার স্ত্রী) বিভিন্ন দুর্নীতে সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার জন্য নিয়োগ করেন। অর্থাৎ বিডিআর সদর দপ্তরের দুর্নীতি র গুজব সম্পর্কে ডিজিএফআই অবগত ছিল। তবে উদ্দেশ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় মেজর মুরতাজাতার তদন্ত এগিয়ে নিতে পারেননি। ডালভাত এর ব্যাপারে সৈনিকদের মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে অফিসাররা বিভিন্ন দুর্নীতি করেছে (লিফলেট দ্রষ্টব্য)। বিডিআর দরবার হল ডিজির কোর্সমেট মেজর আকরাম (অব.) কে লিজ দেয়া নিয়েও বিডিআর সদস্যদের অসন্তোষ ছিল। এসব অসন্তোষ বিডিআর বিদ্রোহের বাহ্যিক কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

<u>হত্যাকান্ডের প্রকৃত কারণ</u>

৮৮। <u>হত্যাকান্ডের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও কারণ</u>। যেকোনো সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কিছু দাবি দাওয়া থাকা এবং সামান্য অসন্তোষ বিরাজ করা স্বাভাবিক ঘটনা। বিডিআর সদস্যদেরও কিছু দাবি-দাওয়া ও

অসন্তোষ ছিল। তবে একথা অনস্বীকার্য যে পূর্ববর্তী স্তবকসমূহে বর্ণিত কারণসমূহের উপর ভিত্তি করে ইতিহাসের জঘন্যতম একটি হত্যাকান্ড ঘটানো শুধু অস্বাভাবিকই নয়, বরং অসম্ভব একটি বিষয়। সাধারণ বিডিআর সদস্যদের মাঝে অসন্তোষ ও ক্ষোভ সৃষ্টির কাজে এই কারণগুলোকে নিয়ামক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র। এ কারণগুলোকে উপলক্ষ্য করে ষড়যন্ত্রকারীগণ নেপথ্যে থেকে পরিকল্পনা মাফিক কার্য সমাধা করেছে। সুতরাং সাধারণ কিছু অসন্তোষ ও ক্ষোভের আড়ালে এখানে ছিল এক হীন ষড়যন্ত্র। ষড়যন্ত্রকারীরা নিম্নবর্ণিত কারণে এই জঘন্যতম ঘটনা ঘটিয়েছিলঃ

ক। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হতে শুরু করে পরবর্তীকালে দেশের প্রতিটি দুর্যোগময় মুহূর্তে দেশ ও জনগণের পাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। দেশের প্রতিটি দুঃসময়ে সেনাবাহিনী ঢাল হিসেবে জনগণের পাশে দাঁড়িয়ে জনগণকে রক্ষা করেছে। সুতরাং দেশ ও জাতির জন্য সেনাবাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে এক অপরিহার্য অঙ্গ। এই সেনাবাহিনীকে পঙ্গু করে দেয়ার অর্থ দেশকে পঙ্গু করে দেয়া। ষড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল সেনাবাহিনীর চৌকষ অফিসারদেরকে হত্যার মাধ্যমে সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে পুরো সেনাবাহিনীকে পঙ্গু করে দিতে।

খ। পাদুয়া ও রৌমারির সীমান্ত সংঘর্ষে যে বিডিআর তাদের শৌষ, বীর্য, পেশাগত দক্ষতা ও দেশপ্রেম দেখিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের শক্ত হাতে প্রতিহত করেছিলেন, তাদেরকে একটি পঙ্গু, বশংবদ ও আজ্ঞাবহনকারী বাহিনীতে পরিণত করা, বাহিনীটিকে নেতৃত্ব শূন্য করে তার কমান্ড চ্যানেল ভেঙ্গে দেওয়া যেন ভবিষ্যতে বাহিনীটির সদস্যরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। বিডিআর যেন একটি অকার্যকর মেরুদন্ডহীন বাহিনীতে পরিণত হয়।

গ। সেনা অফিসারদের চৌকষ নেতৃত্ব এবং উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রশিক্ষণদান ক্ষমতাই ছিল বিডিআর সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা ও উঁচু মনোবলের প্রধান উৎস। এই নৃশংস হত্যাকান্ডের মাধ্যমে সেনা অফিসারদেরকে বিডিআরে যাওয়া হতে নিরুৎসাহিত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

ঘ। বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করাও ষড়যন্তকারীদের একটি উদ্দেশ্য ছিল। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদশে সেনাবাহিনী দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত সুনামের সাথে কাজ করে আসছে। সেনাসদস্যদের কর্মদক্ষতা, কর্মস্পৃহা ও পেশাদারিত্ব বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে। বিশ্ব শান্তি রক্ষায় সেনা সদস্যদের আত্মত্যাগ শুধু সেনাবাহিনীরই নয়, বরং পুরো দেশের মর্যাদা বিশ্বের দরবারে এক সুমহান উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা চেয়েছিল সেনাবাহিনী তথা দেশের মর্যাদা ভুলুন্ঠিত হোক। বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ যেন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে।

ঙ। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে আঘাত করাও ষড়যন্তকারীদের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

চ। বাংলাদেশকে বহির্বিশ্বে একটি অস্থিতিশীল রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি দেয়া।

ছ। বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক বাহিনীগুলোকে বহির্বিশ্বে উচ্ছৃঙ্খল ও অবাধ্য শক্তি হিসেবে প্রতীয়মান করা।

জ। হত্যাকান্ড পরবর্তী সময়ে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের আড়ালে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে বিদেশী শক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা।

৮৯। <u>ষড়যন্ত্র ও আওয়ামী লীগ সংশ্লিষ্টতা</u>। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর নৃশংসে হত্যাকান্ড নিঃসন্দেহ এক দীর্ঘমেয়াদী ষড়যন্ত্রের ফল। এই ষড়যন্ত্রে রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যায়ে আওয়ামী লীগের ব্যক্তিবর্গ, মিডিয়া ব্যক্তিবর্গ এবং বিডিআর সৈনিক পর্যন্ত অনেকেই জড়িত ছিলেন। নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করে যে ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর বিডিআর আর হত্যাকান্ড একটি দীর্ঘমেয়াদী ষড়যন্ত্রের ফল এবং এই ষড়যন্ত্রে তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সবপর্যায়ের আওয়ামী লীগ ব্যক্তিবর্গ সরাসরিভাবে সম্পৃক্ত ছিলঃ

ক। ঘটনার পূর্বে বিডিআর সদস্যরা নিম্নবর্ণিত আওয়ামী লীগ ব্যক্তিবর্গের সাথে বর্ণিত তারিখ অনুযায়ী বৈঠক করেঃ

(১) ২০০৮ সালের নির্বাচনের পূর্বে ব্যারিস্টার তাপসের সাথে জুম্মার নামাজের দিন মসজিদে।

(২) ২০০৮ সালের নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমাদানের আগের দিন ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস দরবার হলে মাঠের পাশে জনসভা করে।

(৩) এর কিছুদিন পর ১০-১৫ জন বিডিআর সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা ও অবসরপ্রাপ্ত বিডিআর সদস্য তোরাব আলীর ছেলে লেদার লিটনের নেতৃত্বে ব্যারিস্টার তাপসের চেম্বারে দেখা করে।

(৪) ২০ জানুয়ারি ২০০৯ তারিখ ২০-২২ জন বিডিআর সদস্য শেখ সেলিমের বনানীর বাসায় সাক্ষাৎ করেন। তিনি বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে গ্রিন সিগন্যাল নিবেন বলে জানান। তিনি অফিসারদেরকে জিম্মি করতে বলেন এবং পরবর্তী করণীয় তারা করবেন বলেও জানান। ২২-২৩ ফেব্রুয়ারি শেখ সেলিম সিপাহী মইনকে জানায় যে প্রধানমন্ত্রীর গ্রিন সিগন্যাল পাওয়া গেছে।

(৫) একই দিনে জনাব সোহেল তাজের নেতৃত্বে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন এবং শেখ সেলিমের কিছু লোকজন নিয়ে বিডিআর সংক্রান্ত আর একটি সভা হয়।

(৬) বিডিআর হত্যাকান্ডের কিছুদিন আগে ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসের অফিসে এক সভায় শেখ সেলিম, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মির্জা আজম এবং আরো কিছু আওয়ামী লীগ নেতার উপস্থিতিতে হত্যা পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

খ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ঘটনা শুরুর দিন দেশ যখন চরম অনিশ্চয়তার মুখে পতিত, তখন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীসহ শীর্ষ রাজনৈতিবিদরা ছিলেন সম্পূর্ণ নির্ভার। পরিস্থিতি জাতীয় নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতার প্রতি চরম হুমকি হয়ে দাঁড়ালেও জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল, এমনকি মন্ত্রী সভার কোন বৈঠক পর্যন্ত ডাকা হয়নি। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তার নিজস্ব সিদ্ধান্তে জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজমকে সমস্যাটির রাজনৈতিক সমাধানের নাটক চালিয়ে যাবার দায়িত্ব দেন।

গ। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদ্বয় জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক ও জনাব মির্জা আজম ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২ টার পরে পূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে সাদা পতাকা নিয়ে পিলখানায় গেইট দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেন। বিডিআর সদস্যরাও তাদের প্রতি কোন গুলি ছুঁড়েনি। সাদা পতাকাটি একটি পূর্ব নির্ধারিত সংকেত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। তৎকালীন এমপি জনাব ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল ও মাহবুব আরা গিনি সাদা পতাকা হাতে ভিন্ন দিক থেকে এসে তাদের সাথে যোগ দেন।

ঘ। জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক ও জনাব মির্জা আজমের সাথে ২৫ ফেব্রুয়ারি আনুমানিক ১৪০০ ঘটিকার ডিজির বাসভবনের সামনে জনাব গোলাম রেজা (প্রাক্তন এমপি)র দেখা হয় এবং তিনি তাদেরকে ডিজির বাসার ভিতর নিয়ে লাশ দেখান। জনাব গোলাম রেজার সাথে তারা দরবার হলে গিয়েও লাশ দেখেন, কিন্তু বিডিআর সদস্যদের নিয়ে যমুনায় যাবার পর বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে গোপন করে যান।

ঙ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ দুপুর নাগাদ নায়েক শেখ মোঃ শহীদুর রহমান (মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামি) জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানককে বিডিআরের তিন নম্বর গেটের কাছে দেখেন। সেখানে তখন ব্যাপক লোক সমাগম হচ্ছিল এবং এর কিছুক্ষণ পরে লেদার লিটন এর নেতৃত্বে একাধিক মিছিল পিলখানায় প্রবেশ করে। এসব মিছিলের সাথে মিশে পূর্বপরিকল্পিতভাবে হত্যাকারীরা অনেকে পালিয়ে যায়।

চ। ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুর ২ টার দিকে সিপাহী শেখ মো. আইয়ুব আলী (মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামি) দেখতে পান যে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বুলেট প্রুফ জিপ গাড়িতে করে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন পুরো পিলখানায় ঘুরে বেরাচ্ছেন। তিনি প্যারেড গ্রাউন্ডের কাছে বিদ্রোহীদের সাথে কথা বলছেন। সিপাহী আইয়ুব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলতে শোনেন 'তোমরা আমার সন্তানের মত। তোমাদের কিচ্ছু হবে না। ডিএডি তৌহিদকে ডিজির দায়িত্ব দেয়া হয়েছে' ইত্যাদি। সাহারা খাতুন ছাড়াও জনাব মির্জা আজম এবং জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানককে সিপাহী আইয়ুব ভিতরে দেখেছেন। সিপাহী আইয়ুব তাদেরকে দেখেছেন প্যারেড গ্রাউন্ডে এবং সদর ব্যাটালিয়নের কাছে। বিশেষ করে সাহারা খাতুন প্রধানমন্ত্রীর জিপ গাড়িতে করে

পুরো পিলখানা ঘুরছিলেন, নিয়ন্ত্রণ করছিলেন এবং সৈনিকদের উসকিয়ে দিচ্ছিলেন বলে সিপাহী আইয়ুবের মনে হয়েছে।

ছ। ডিএডি তৌহিদের জবানবন্দী হতে এটা স্পষ্ট যে, এরকম ভয়াবহ পরিস্থিতিতেও প্রধানমন্ত্রী ও তার ঘনিষ্ঠ নেতারা এ বিষয়ে উদ্বিগ্ন না হয়ে নির্বাচনী গল্পে মশগুল ছিলেন।

জ। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এরকম এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানকে তার কার্যালয়ে ডেকে বসিয়ে রাখেন যেন সেনাবাহিনী কোন অভিযান পরিচালনা করতে না পারে।

ঝ। মাহবুব আরা গিনি ২৬ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় গিয়ে দেখেন যে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দলের সিনিয়র নেতাদের সাথে কথা বলছেন। শেখ হাসিনা চাচ্ছিলেন না যে সেনাবাহিনী অভিযান করুক। সিনিয়র নেতাদের শেখ হাসিনা বলছিলেন যে 'দেখো আমি তো চাচ্ছি না যে সেনাবাহিনী অভিযান পরিচালনা করুক, কিন্তু এরা যদি এখনো অস্ত্র সমর্পণ না করে, তাহলে তো সেনাবাহিনী অভিযান চালাবেই।'

ঞ। ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকালে সেনাবাহিনী তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী যখন আক্রমণ চালাতে প্রস্তুত তখন পুনরায় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা আম্বালা ইনে হত্যাকারীদের সাথে আলোচনার নামে সময় ক্ষেপণ করে।

ট। ২৫ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি মধ্যবর্তি রাতে তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন এবং জনাব কামরুল ইসলাম আইজিপি জনাব নূর মোহাম্মদসহ পিলখানায় প্রবেশ করে অস্ত্র সমর্পণের একটি নাটক করেন। তারা কিছু পরিবারকে নিয়ে পিলখানা ত্যাগ করার সাথে সাথেই হত্যাকারীরা পুনরায় অস্ত্র তুলে নেয়। এর ফলে বিদ্রোহী ও হত্যাকারীরা হত্যা, লাশ গুম, আলামত ধ্বংস, নারী ও শিশু নির্যাতন, লুটপাটসহ সব ধরণের অপরাধ সংঘটনের এবং পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়।

ঠ। ঘটনার পর যে দু'টি তদন্ত কমিটি হয়েছিল সে দু'টোর কোনটিকেই আওয়ামী লীগ ব্যক্তিবর্গের সংশ্লিষ্টতাকে আমলে নিতে দেয়া হয়নি।

ড। পুরো ঘটনাটিতে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ চরম নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় দিলেও ঘটনার পরে কারো বিরুদ্ধেই কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, বরং গোয়েন্দা সংস্থার শীর্ষ পদে অবস্থানকারী ব্যক্তিদেরকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

৯০। <u>বিদেশী সংশ্লিষ্টতা</u>

ক। ২০০৮ সালের জুন মাসে বিএ-১১৮৩৮ মেজর নাসির উদ্দিন বরিশালে ডিজিএফআই এর লেফটেন্যান্ট কর্নেল আব্দুস সালামের সাথে দেখা করে জানান যে তিনি সম্প্রতি বিদেশ থেকে ফিরেছেন। একই এয়ারক্রাফটে তিনি আওয়ামী লীগের কিছু শীর্ষ নেতাকে দেখেছেন যারা ভারতের বারাসাতে "র"-এর সঙ্গে বৈঠক করে ফিরছিলেন। সেখানে আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহসহ আরও কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি জানান যে তারা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে একটি বড় ষড়যন্ত্র পরিকল্পনা করেছে। তাদের বক্তব্য ছিল, পরবর্তী ১২ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে সেনাবাহিনী যেন নৈতিকভাবে দাঁড়াতে না পারে, সেইভাবে আঘাত হানার পরিকল্পনা তারা করছে"।

খ। ২০০৮ সালের জানুয়ারি বা ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি মেজর (অবঃ) নাসির উদ্দিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে দেশে ফিরে টুরিস্ট ভিসার জন্য ভারতীয় হাই কমিশনে গেলে জনাব নিরাজ শ্রীবাস্তব-এর সঙ্গে তার দেখা হয়। জনাব নিরাজ শ্রীবাস্তব মেজর নাসিরকে বলেন যে, বাংলাদেশের মানুষ অত্যন্ত আবেগপ্রবণ এবং পাকিস্তানের দর্শন অনুসরণ করে। নিরাজ শ্রীবাস্তব বলেন বাংলাদেশের আর্মি, নেভি ও এয়ার ফোর্সের

ডকট্রিন পাকিস্তানের সঙ্গে একই। এরপর তিনি মেজর নাসিরকে Padua সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন এবং বলেন যে, 'Padua-তে বিডিআর ১৬-১৭ জন বিএসএফ সদস্যকে হত্যা করেছে। এটি ছিল একটি গুরুতর উস্কানিমূলক ঘটনা।' তিনি বলেন, "Padua will not go unchallenged and unpunished." পরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়য়ের মাধ্যমে জানা যায় Mr. Niraj Srivastava ২০০৬ থেকে ২০০৯ পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনে Minister পদবিতে নিয়োজিত ছিলেন।

গ। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামি নায়েক মোঃ শহীদুর রহমান তার ঘনিষ্ঠ তোরাব আলীর (অন্যতম মূল ষড়যন্ত্রকারী, পরে জেলখানায় মৃত) বরাতে বলেন যে, 'ভারতীয়দের সাথে বৈঠকের পরে পুরো পরিকল্পনা সাজানো হয় এবং সমন্বয় করার জন্য শেখ ফজলে নূর তাপসের বাসায় বৈঠক হয়। সেখানে উপস্থিত ছিল নানক, মির্জা আজম, ফজলে নূর তাপস, শেখ সেলিম, লেদার লিটন এবং তোরাব আলী। সেখানে যখন জানানো হয় যে অফিসারদের হত্যা করা হবে, তখন তোরাব আলী সেখানে আপত্তি করে। সে বলে যে অফিসারদের হত্যা করা যাবে না।'

ঘ। জনাব গোলাম রেজা এমপি ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সকাল পৌনে ১০টা থেকে ১০ টার মধ্যে পিলখানা এলাকায় নর্দার্ন মেডিকেল কলেজের কাছে জনাব আলাউদ্দিন নাসিম, সাবেক এমপি মোর্শেদ, শেখ সেলিম এবং RAW-এর চার-পাঁচ জনকে দেখেন যাদের তিনি আগে থেকেই চিনতেন।

ঙ। ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দার নূরের স্ত্রী তাসনুভা মাহা ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর ক্যাপ্টেন তানভীরের সাথে মোবাইলে কথা বলার সময় ক্যাপ্টেন তানভীর তাকে পিলখানার ভিতরে ভারতীয় সংস্থা National Security Guard (NSG) এর উপস্থিতির কথা বলেন। এ ছাড়াও তাসনুভা মাহা বলেন যে তিনি চুল বড় তিনজনকে বিডিআরের টি শার্ট ও স্যান্ডেল পরা অবস্থায় দেখেছেন যারা তাঁকে হিন্দিতে গালাগালি করেছে এবং তাঁর সন্তানদেরকে 'পাকিস্তানি লাডলা' বলেছে।

চ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পিলখানার ভিতরে বিভিন্ন সময় হিন্দিতে, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণে বাংলা ভাষায়, বাংলা নয় এমন ভাষা এবং ইংরেজিতে কথা বলতে শোনা গেছে। নায়েক শহীদ, সিপাহী সেলিম, পিলখানা কেন্দ্রীয় মসজিদের ইমাম মরহুম সিদ্দিকুর রহমান, সিপাহী শাহাদাত, সাক্ষী তাসনুভা মাহা (শহীদ ক্যাপ্টেন তানভীর এর স্ত্রী) সিপাহী আব্দুল মতিন স্বচক্ষে হিন্দি ভাষী এবং বাংলা নয় এমন ভাষাভাষী বহিরাগত ব্যক্তিদের বিডিআরের ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় ২৫ তারিখ হত্যাকান্ড চলাকালীন সময়ে এবং তার অব্যবহিত পরে পিলখানার অভ্যন্তরে দেখেছেন।

ছ। লে. কর্নেল তাসনিম, মেজর মুনির, সিপাহী আইয়ুব হিন্দি ভাষা, পশ্চিমবঙ্গের টানে বাংলা ভাষা এবং বাংলা বা হিন্দি নয় অপরিচিত ভাষার কথোপকথন শুনেছেন।

জ। ক্যাপ্টেন শাহনাজ ২৭ ফেব্রুয়ারি সকালে ১৮ ইঞ্জিনিয়ার ব্যাটালিয়ন এর পক্ষ হতে Search and Rescue Operation এ অংশগ্রহণ করতে গিয়ে পিলখানা দরবার হলের নিকট একটি ব্যবহার করা সাব মেশিন গানে (এসএমজি) নজলের সাথে গেরিলা বাহিনীর স্টাইলে বাঁধা একটি বিদেশি স্লিং দেখেন। স্লিংটি ছিল সেনাবাহিনীর মত জলপাই রঙের এবং তার উপর Dark Olive রঙের উপর বড় ইংরেজি হরফে TIGER লিখা। তার জানামতে এ ধরনের স্লিং বাংলাদেশ সেনাবাহিনী অথবা বিডিআর ব্যবহার করে না। গঠন, স্লিং এর পুরুত্ব এবং স্লিংটি বাঁধার কৌশল দেখে তার কাছে মনে হয়েছিল এটি অন্য কোন বিদেশি উৎসের হতে পারে।

ঝ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে জনাব গোলাম রেজা (প্রাক্তন এমপি) পিলখানার ভিতরে ও বাইরে কিছু লোককে দৌড়া দৌড়ি করতে দেখেন, কিছু মানুষ ছোট ছোট টিনের ঘরে লাইফ জ্যাকেটগুলো খুলে রেখে পালিয়ে যাচ্ছিল। তাদের দেখে এমপি গোলাম রেজার মনে হয়েছিল তারা দেশের কেউ নয়।

ঞ। তোরাব আলীর মোবাইল ফোনে ভারত এবং সিঙ্গাপুরে একাধিকবার যোগাযোগ করা হয়। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতীয় হাই কমিশনে উক্ত টেলিফোনের গ্রাহকদের পরিচয় জানার জন্য চিঠি লিখা হয়েছিল কিন্তু উত্তর পাওয়া যায়নি (প্রাপ্ত সিডিআর মোবাইল রিপোর্ট দ্রষ্টব্য)। মোবাইল ফোন ব্যবহাকারী সমন্ধে ডিজিএফআই হতে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করে অর্থবহ কোন কিছু উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

ট। বিডিআর সদস্যদের সাথে বিএসএফ এর যোগাযোগ হয়েছে এবং সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করলে বিএসএফ-এর সহায়তায় ভারতে চলে যাবার প্রতিশ্রুতি ছিল।

ঠ। ভারত বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালাবে বলে এসআইএন্ডটির শিক্ষার্থীদেরকে মেজর জেনারেল তারেক এবং লে. জেনারেল মামুন খালেদ কর্তৃক হুমকি দেয়া হয়েছিল।

ড। তৎকালীন সিজিএস লেফটেন্যান্ট জেনারেল সিনা ইবনে জামালী ১১ ডিভিশনের জিওসির কাছ থেকে এই মর্মে একটি তথ্য পান যে, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে সৈন্যসমাবেশ করছে। তারা একটি প্যারাট্রুপার বাহিনীও প্রস্তুত রেখেছে এই জন্য যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যদি অভিযান পরিচালনা করে তাহলে তারা শেখ হাসিনাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে।

ঢ। তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল (অব) মঈন ইউ আহমেদের ভাষ্যমতে, সশস্ত্র বাহিনী সরকারের সিদ্ধান্তের বাইরে গেলে ভারত বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালাবে বলে তিনি সংবাদ পাচ্ছিলেন।

ণ। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানায় বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পরপরই শেখ হাসিনা ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জিকে ফোন করেন এবং তার সরকারের কাছে আন্তর্জাতিক সহায়তা চান। শেখ হাসিনাকে প্রণব মুখার্জি আশ্বাস দেন যে তাকে (শেখ হাসিনাকে) সব ধরনের সহায়তা করা হবে। ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শিবশংকর মেনন শেখ হাসিনার সরকারের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য যুক্তরাজ্য, চীন এবং জাপান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

ত। যুক্তরাজ্যের ইউনিভার্সিটি অভ্ লন্ডন এর বিখ্যাত স্কুল অভ্ আফ্রিকান অ্যান্ড ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ (এসওএএস) এর শিক্ষক অভিনাশ পালিওয়াল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস কর্তৃক ২০২৪ সালে প্রকাশিত "India's Near East: A New History" গ্রন্থের ২৮৬ নম্বর পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "The recently elected prime minister Hasina, who also held the defence portfolio, felt threatened and couldn't count on the army's support. 'She asked India for help … and that's why we were there', awaiting orders and 'preparing for all eventualities when we touch down in Dhaka', remembers Sandhu."

"Shortly after the killings began, Hasina called her closest ally in New Delhi, top Congress leader and recently appointed finance minister Pranab Mukherjee. Upon hearing what was going on, Mukherjee promised 'to be responsive'. The 'SOS' from Dhaka triggered the mobilisation of paratroopers, and prompted foreign secretary Shivshankar Menon to urgently engage with American, British, Japanese, and Chinese envoys to lobby support for Hasina ".

"Apart from Kalaikunda, paratroopers were mobilised in Jorhat and Agartala. If the order came, Indian troops would enter Bangladesh from all three sides. The aim was to secure the Zia International Airport (renamed Hazrat Shahjalal International Airport) and the Tejgaon airport. Subsequently, the paratroopers would wrest control of Ganabhaban, prime minister's residence, and evacuate Hasina to safety. The Brigade

commander overseeing the operation began distributing 'first line' ammunition meant for use during active combat."

থ। অভিনাশ পালিওয়াল বাংলাদেশে নিযুক্ত তৎকালীন ভারতীয় হাইকমিশনার পিনাক রঞ্জন চক্রবর্তীর উদ্ধৃতি দিয়ে একই পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "Pinak Ranjan Chakravarty, India's high commissioner to Dhaka (*2007–10)* who has family origins in Bangladesh and called Hasina 'Aapa' (elder sister) out of respect, says that 'we did put some forces on alert, and conveyed to Hasina that we're worried about her safety".

দ। বাংলাদেশ এর তৎকালীন সেনাপ্রধান জেনারেল (অব.) মঈন ইউ আহমেদ জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশনের সম্মুখে তাঁর প্রদত্ত সাক্ষ্যে অভিনাশ পালিওয়াল এর উপরে বর্ণিত উদ্ধৃতিগুলো দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এই উক্তিগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

ধ। অভিনাশ পালিওয়াল একই গ্রন্থের ২৮৭ পৃষ্ঠায় বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব, বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, "I was told by those who were closer to power that Gen. Moeen was asked not to use force otherwise [Indian] paratroopers will drop in Dhaka within one hour', says Touhid Hussain, then Bangladesh's foreign secretary." এই বিষয়ে জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন কর্তৃক প্রেরিত লিখিত প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন উক্ত তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

ন। বাংলাদেশ পুলিশ ইমিগ্রেশন প্রশাসন শাখার তথ্য অনুযায়ী ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত সময়ে ভারিতীয় পাসপোর্টধারী এবং বিদেশী পাসপোর্টধারী ভারতীয় নাগরিকের বাংলাদেশ আগমন এবং বহির্গমনের তথ্য নিম্নরূপঃ

(১) ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ভারতীয় পাসপোর্টধারী এবং বিদেশী পাসপোর্টধারী ভারতীয় নাগরিকের বাংলাদেশ আগমনঃ ৮২৭ জন আগমন করেছে তার মধ্যে ৬৫ জনের বহির্গমনের তথ্য পাওয়া যায়নি।

(২) ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ ভারিতীয় পাসপোর্টধারী এবং বিদেশী পাসপোর্টধারী ভারতীয় নাগরিকের বাংলাদেশ থেকে বহির্গমন ১২২১ জন বহির্গমন করেছে তার মধ্যে ৫৭ জনের আগমনের তথ্য পাওয়া যায়নি।

প। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সন্ধ্যায় র‍্যাব এর গোয়েন্দা বিভাগ তথ্য পায় যে দুবাইগামী বিমানে বিডিআর সদস্যরা/সন্দেহভাজন ব্যক্তিরা পালিয়ে যাচ্ছে। তবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সহেযোগিতা না পাওয়ায় ফ্লাইটটি আটকাতে পারেনি।

ফ। সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ বন্ধু প্রতিম প্রতিবেশী দেশের সহায়তায় বিডিআরকে পুনর্গঠন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। প্রতিমন্ত্রী সোহেল তাজ বলেন,'একবিংশ শতাব্দীতে যাতে আধুনিক সীমান্তরক্ষী বাহিনী গড়ে তোলা যায়, সে লক্ষ্যে সরকার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বিডিআরকে পুনর্গঠন করে তাদের প্রশিক্ষণসহ উন্নয়ন কর্মকান্ডে প্রতিবেশী দেশগুলোর সহায়তা নেয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, বন্ধুপ্রতিম দেশের সহায়তা নিতে কোন সমস্যা নেই।'

ব। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা-এগারোটার দিকে পিলখানার গেইট খুলে যায় এবং ভেতর থেকে কয়েকটা মাইক্রোবাস বেরিয়ে আম্বালা পার হয়ে চলে যায়। লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজ (অব.) ভেবেছিলেন তার আটকে পড়া ফ্যামিলি ওই মাইক্রবাসে চলে যাচ্ছে । দ্বিতীয় মাইক্রোবাসটি

বের হওয়ার সাথে সাথে লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজ মাইক্রোবাসের দরজা ধরে হেঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেলেন এবং মাইক্রোবাসটির ভেতরে আলো জ্বলে উঠে। ভিতরে ছয়-সাতজন লোককে দেখতে পান। তাদের মাথা ওড়না বা চাদর দিয়ে মোড়ানো ছিল। লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজ তার স্ত্রী এবং বাচ্চার নাম ধরে ডাকাডাকি করতে থাকেন এবং মাইক্রোর ভেতরের পিছনের প্রথম সিটে ট্র্যাক স্যুট পরা জলপাই বা ধুসর কালারের গেঞ্জি গায়ে একজন মোটা গোফের লোককে বসা অবস্থায় দেখেন। দরজা খোলার সাথে সাথে ঐ লোক লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলেন 'হু'? আবারো জিজ্ঞেস করেন 'হু'? এরপর জিজ্ঞেস করেন 'হু আর ইউ'? এরপর তিনবার চিৎকার করে বলেন 'ক্লোজ' 'ক্লোজ' 'ক্লোজ'। মুখ ঢাকা অবস্থায়ও লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজ দু'জনকে দেখে বুঝতে পারেন তারা পুরুষ লোক এবং বেশ সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং তার মনে হয়েছিল তিনি কোনো মিলিটারি পারসন। মাইক্রোবাসের গ্লাস কালো ছিল। লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজ সেকেন্ড বা থার্ড মাইক্রোবাসটাকে ধরেছিলেন। তার আগে আরও একটা বা দু'টি মাইক্রোবাস চলে গেছে। গাড়িগুলো দশটা বা এগারোটার দিকে বের হয়েছে। গাড়ির লোকজনকে অন্তত বাংলাদেশী লোক বলে লে. কর্নেল রওশনুল ফিরোজ এর মনে হয় নাই।

৯১। <u>বিডিআর হত্যাকান্ডের সাথে ভারতের নিবিড় সম্পর্ক</u>। নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ হতে এটা নিশ্চিত যে ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর বিডিআর হ্যাকান্ডের সাথে ভারতের নিবিড় সম্পর্ক ছিলঃ

ক। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সংঘটিত হত্যাকান্ডের প্রধান কারণ গুলো ছিলঃ

(১) বিডিআরকে নেতৃত্বশূন্য করে একটি মেরুদন্ডহীন অকার্যকর বাহিনীতে পরিণত করা।

(২) বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব/নৈতিকতা ভেঙ্গে দিয়ে পুরো বাহিনীকে দুর্বল করে ফেলা।

(৩) শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী যে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে, সেটা ভূলুন্ঠিত করা।

(৪) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বে আঘাত করা।

(৫) সামরিক বাহিনী এবং বিডিআরকে ভারত নির্ভরশীল করে তোলা।

উপরের প্রত্যেকটি বিষয়ের সুবিধাভোগী ভারত। ৯০ নম্বর স্তবকে সন্নিবেশিত বিষয় সমূহ হতে প্রমাণ হয় যে, ভারত এ ঘটনার সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত ছিল।

খ ২০০১ সালের ১৬-১৮ এপ্রিল ভারতের বিএসএফ পদুয়া রৌমারি সংঘর্ষে যুদ্ধে বিডিআরের নিকট সম্পূর্ণরূপে পর্যদস্ত হয়। বিডিআরের কাছে বিএসএফের পর্যদস্ত হওয়াকে ভারত কখনোই মেনে নিতে পারেনি।

গ। মেজর নাসির (অব.) তার ভিসার জন্য ভারতীয় দূতাবাসে গেলে ভারতীয় দূতাবাসের তৎকালীন কর্মকর্তা নিরাজ শ্রীবাস্তব তাকে বলেছিলেন "Padua will not go Unchallenged and unpunished".

ঙ। অবিনাশ পালিওয়াল India New East বইয়ে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব জনাব তৌহিদ হোসেনকে রবাত দিয়ে লিখেছেন যে, জেনারেল মঈন ইউ আহমেদকে কোন রকমের সেনা অভিযান চালাতে নিষেধ করা হয়। অন্যথায়, এক ঘন্টার মধ্যে ঢাকায় ভারতীয় ছত্রী সেনা নামানোর ভয় দেখানো হয়। অর্থাৎ ভারত জেনারেল মঈনকে সামরিক শক্তি ব্যবহার থেকে বিরত রাখে। হত্যাকান্ড শুরু হওয়ার পরবর্তী সময়ে শেখ হাসিনা তার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি জনাব প্রনব মুখার্জিকে টেলিফোন করেন। কানাইকুন্ড ছাড়াও জোরহাট ও আগরতলায় ছত্রীসেনা প্রস্তুত রাখা হয়েছিল। ২৭ ফেব্রুয়ারিতে ভারত বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপ করে ফেলেছিল প্রায় ।

ঘ। ১৬ মার্চ ২০০৯-এ India Today-তে প্রকাশিত "More than a Mutiny" নামক এক প্রবন্ধে জনাব সৌরভ শুকলা লেখেন যে, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯-এ ভারত শেখ হাসিনাকে উদ্ধার করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে। ত্রিপুরায় একটি সম্মুখবর্তী বিমান বাহিনী ঘাঁটিতে দুটি এবং কলকাতায় একটি কমান্ডো প্লাটুন সেজন্য প্রস্তুত রাখা হয়।

চ। উপরিউক্ত তথ্যসমূহ হতে এটা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে বিডিআর হত্যাকান্ডের সাথে ভারতের এক নিবিড় সম্পর্ক ছিল।

৯২। গোয়েন্দা সংস্থাসমুহের নিষ্ক্রিয়তা

ক। দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য গোয়েন্দা তথ্য একটি অত্যাবশ্যকীয় নিয়ামক। আলোচ্য ক্ষেত্রে দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো সীমাহীন ব্যর্থতার পরিচয় দেয়ায় সেনাবাহিনীও অপারেশনের সময় দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। অপর দিকে, সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ে নীতি নির্ধারণী বা কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে, বিদ্রোহীদের সাথে দফায় দফায় আলোচনায় বসার ক্ষেত্রে সর্বোপরি সরকার প্রধানের সাথে কথিত বিদ্রোহী নেতাদের সাথে বৈঠকের পূর্বে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ হতে কোন তথ্য চাওয়া হয়নি। ডিজি ডিজিএফআই এবং ডিজি এনএসআই যমুনায় উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও তাদের কোন পরামর্শ গ্রহণ করা হয়নি। ফলে ঘটনা শুরু হওয়ার পরপরই কোন হত্যাকান্ড হয়েছিল কি-না বা হয়ে থাকলে কতজনকে হত্যা করা হয়েছিল এবং কাউকে জিম্মি করা হয়ে থাকলে তাদেরকে কোথায় কী অবস্থায় রাখা হয়েছিল ইত্যাদি তথ্য না জেনেই বা জানার চেষ্টা না করেই আলোচনা শুরু করা হয়েছিল।

খ। ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারিতে বিডিআর বিদ্রোহ উপলক্ষে পিলখানায় ৩৬ ঘন্টাব্যাপী পৈশাচিক হত্যাযজ্ঞ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগ ও শ্লীলতাহানির ঘটনা ঘটেছে। ঘটনার পূর্বাপর পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, এটি একটি অত্যন্ত পরিকল্পিত ঘটনা ছিল। দেশের প্রধান গোয়েন্দা সংস্থাগুলো এ বিষয়ে সরকারকে কোন আগাম সতর্ক বার্তা দিয়েছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। যদিও ডিজিএফআই এর মহাপরিচালক দাবি করেছেন যে লিফলেটের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে তিনি ২২ বা ২৩ ফেব্রুয়ারি জানিয়েছিলেন।

গ। বিদ্রোহের পরপরই কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেছিল কী-না, যাদের জিম্মি করা হয়েছে তাদের কোথায় ও কী অবস্থায় রাখা হয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে সংগৃহীত তথ্য সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থা কর্তৃক সরকার প্রধান এবং সশস্ত্র বাহিনীর নিকট অবশ্যই উপস্থাপনীয় ছিল। কিন্তু তা করা হয়নি বা এধরনের চেষ্টার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ঘ। জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা মহাপরিচালকের দপ্তর থেকে প্রধানমন্ত্রীর পিলখানা সফর উপলক্ষে একটি প্রতিবেদন ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে এসএসএফ-এর নিকট পাঠানো হয়। এই প্রতিবেদনে বলা হয় যে, 'আওয়ামী লীগ তার নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনীতি, সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোতে গুণগত পরিবর্তনসহ জঙ্গি দমনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করায় জেএমবি ও হরকাতুল জিহাদের মত জঙ্গি সংগঠনসমূহ সংক্ষুব্ধ বলে ধারণা করা যায়। তাছাড়া, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃক বিপুল পরিমাণ অস্ত্র/গুলি/বিস্ফোরক উদ্ধার করা সত্ত্বেও সন্ত্রাসী ও জঙ্গি সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও যোগাযোগ এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে নিত্য নতুন পন্থা অবলম্বন করায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির গমনাগমন ঝুঁকিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান, বিধায় নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা সমীচীন।'

ঙ। সরকার প্রধানের পিলখানা আগমন উপলক্ষ্যে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর ২২ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে একটি প্রতিবেদন মহাপরিচালক, স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)-এর নিকট পাঠায়। এই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, 'বিডিআর সদর দপ্তরে অভ্যন্তরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা সুদৃঢ়। উক্ত অনুষ্ঠানে ব্যক্তি নিরাপত্তার প্রতি হুমকি স্বরূপ/উক্ত অনুষ্ঠান বিনষ্টের কোন প্রকার ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হয় নাই। তবে সম্প্রতি জামাত-ই-ইসলাম বাংলাদেশের দু'জন সদস্য যুদ্ধাপরাধের দায়ে গ্রেফতার হওয়ায় উক্ত সংগঠন কর্তৃক অথবা সমমনা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের যোগসাজসে যেকোন ধরণের অনাকাঙ্খিত ঘটনার বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।'

চ। উভয় গোয়েন্দা সংস্থাই বিডিআরের অসন্তোষ ও লিফলেটে প্রদত্ত হুমকিকে উপেক্ষা করে জঙ্গি সংশ্লিষ্টতার ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিষয়ে তাদের গোয়েন্দা প্রতিবেদনে আলোকপাত করেছে।

ছ। ২৫ ফেব্রুয়ারি বিডিআর বিদ্রোহ সম্পর্কে এসবি, এনএসআই ও ডিজিএফআই এর লিখিত ও ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসাবাদে প্রদত্ত বক্তব্য পর্যালোচনায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পরিলক্ষিত হয়ঃ

(১) আরএসইউ বিতরণকৃত লিফলেট যথা সময়ে উদ্ধার করে কর্তৃপক্ষের নজরে আনলেও উর্ধ্বতন কমান্ড বিষয়টি হালকাভাবে গ্রহণ এবং গোপন করেন। সাধারণ অফিসাদেরকেও বিষয়টি জানানো হয়নি।

(২) লিফলেটের হুমকি ব্যতীত কোন সংস্থার কাছে ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের বিডিআর বিদ্রোহ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট আগাম তথ্য ছিল না।

(৩) ২১ ফেব্রুয়ারি এ বিষয়ে আভাস পেলেও ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ডিজিএফআই নিশ্চিত হয় যে বিডিআর সদস্য কর্তৃক একটি লিফলেট বিলি করা হয়েছে। কিন্তু ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল পর্যন্ত তারা লিফলেটটি সংগ্রহ করার জন্য পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

(৪) লিফলেটটিতে সেনা কর্মকর্তাদেরকে 'কুকুরের মত সরাবো' মর্মে যে হুমকি দেয়া হয়েছে তা সকল গোয়েন্দা প্রতিবেদন/কার্যক্রমে উপেক্ষিত হয়েছে।

(৫) এনএসআই, এসবি ও ডিজিএফআই-এর পিলখানার ভিতরে কোন গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক না থাকাতে তারা ঘটনার পূর্বে বা চলাকালীন সময়ে সরকারকে প্রয়োজনীয় তথ্য দিতে ব্যর্থ হয়েছে বলে তারা দাবি করেছে যা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

(৬) কোন সংস্থাই ঝুঁকি নিয়ে হলেও নিজস্ব সোর্সের মাধ্যমে ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানার ভিতরের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়নি।

জ। উপরে বর্ণিত পরিস্থিতিসমূহ জাতীয় দুর্যোগকালে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের অদক্ষতা, অপেশাদারিত্ব ও অমার্জনীয় ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরেছে।

ঝ। <u>আরএসইউ (রাইফেলস্ সিকিউরিটি ইউনিট)</u>। আরএসইউ বিডিআরের নিজস্ব একমাত্র গোয়েন্দা সংস্থা। বিডিআরের নিরাপত্তার মূল দায়িত্ব ছিল এই সংস্থাটির উপর। অফিসার ব্যতীত আরএসইউ ইউনিটের অধিকাংশ সদস্য এই ষড়যন্ত্র ও হত্যাকান্ডের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল, যার ফলে এই হত্যাকান্ড পরিকল্পনার কোন সংবাদই বিডিআরের কমান্ড চ্যানেল জানতে পারেনি। আরএসইউতে যেসব অফিসার নিযুক্ত ছিলেন সম্ভবত তাদের নিজস্ব কোন সোর্স ছিলনা ফলে আরএসইউ-এর ফিল্ড লেভেল থেকে কোন সংবাদ না আসায় তারা কিছুই আঁচ করতে পারেননি। যে হত্যাকান্ডের পরিকল্পনা অন্তত: দুইমাস পূর্বে ১৭/১৮ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে শুরু হয়, তা দীর্ঘ দুইমাসেও আরএসইউ-এর অফিসাররা তাদের নিজস্ব সোর্সের মাধ্যমে জানতে না পারাটা তাদের চরম অদক্ষতা ও অপেশাদারিত্ব প্রমান। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে দরবার শুরু হওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পূর্বে কোত দখল হয়ে গেলেও এর সামান্যতম ইঙ্গিতও আরএসইউ-এর অধিনায়ক বা অন্যান্য অফিসাররা পাননি। এ ঘটনা থেকে নিঃসন্দেহে মন্তব্য করা যায় যে আরএসইউ এর নেতৃত্বে যারা ছিলেন তারা সঠিকভাবে তাদের দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন।

ঞ। <u>ডিজিএফআই</u>।

(১) ডিজিএফআই মূলত সশস্ত্র বাহিনীসমূহের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত গোয়েন্দা সংস্থা হলেও জাতীয় রাজনীতিতে এবং অন্যান্য বিষয়ে সংস্থাটির প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে প্রবল। সংস্থাটির সদর দপ্তরে প্যারা মিলিটারি বাহিনীসমূহের জন্য একটি ডেস্ক রয়েছে যেটির মূল দায়িত্ব ছিল বিডিআরের মত সকল প্যারামিলিটারি বাহিনীসমূহ হতে তথ্য সংগ্রহ ও তা প্রসেস করা। ডিজিএফআই বিডিআর

সদস্যদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত লিফলেট সম্পর্কে জ্ঞাত হলেও এই লিফলেট এর ব্যাপারে করণীয় সম্পর্কে বিডিআরকে কোন কার্যকর উপদেশ প্রদান করেনি বা অধিকতর তথ্যও সংগ্রহের উদ্যোগও গ্রহণ করেনি। এই হত্যাকান্ডের পরিকল্পনা সম্পর্কে ডিজিএফআই কোন ধরণের আগাম সর্তক বার্তা দিতে তো পারেইনি এমনকি ঘটনার দিন ডিজিএফআই-এর একজন ফিল্ড স্টাফ পিলখানার ভিতরে থাকলেও দরবারের পূর্বে কোত ও ম্যাগাজিন ভাঙ্গার কোন সংবাদ সে পায়নি। ফলে বিডিআর নেতৃত্বের কাছে তা পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। ডিজিএফআই-এর এমন গোয়েন্দা ব্যর্থতা শুধু অমার্জনীয়ই নয় বরং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ঘটনা চলাকালে সিআইবি, ডিজিএফআই-এর ডাইরেক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন খালেদ পুরোটা সময় পিলখানার ৪ নং গেটের নিকট আম্বালা রেস্টুরেন্টে **আওয়ামী লীগ** নেতাদের সঙ্গে ছিলেন। **আওয়ামী লীগ** নেতারা (জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক, মির্জা আজম, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুন ও অন্যান্য **আওয়ামী লীগ** নেতা) রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের নামে যখন সময় ক্ষেপণ করছিলেন, তখন তিনি তাদের সাথেই ছিলেন। এ সময় গেইট দিয়ে অনেক চলাচল হলেও (যেমন, বিডিআরের প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে কারা যমুনায় গমন করেছে, বিভিন্ন এ্যাম্বুলেন্স পিলখানার ভিতরে কারা যাওয়া-আসা করেছে এবং কাদের নেতৃত্বে বিভিন্ন মিছিল হয়েছে। এ বিষয়ে কমিশনকে কোন তথ্য দিতে পারেনি।

(২) অপরদিকে, ডিজিএফআই-এর আরেকজন ডাইরেক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সাভার থেকে আগত ট্যাংকসমূকে গাবতলীতে থামানোর চেষ্টা করেন, তবে তারা থামেনি। পিলখানার নিকটে এসে ট্যাংকসমূহ লাইনআপ করার সময় তিনি আবার ট্যাংকগুলোকে থামানোর চেষ্টা করেন। ট্যাংকসমূহ যতক্ষণ পিলখানার নিকটবর্তী এলাকায় ছিল ততক্ষণ তিনি সেসব ট্যাংকের সাথেই ছিলেন। তিনি একজন ভূতপূর্ব ট্যাংকার। তার মত একজন সিনিয়র অফিসারের ট্যাংকের সঙ্গে থাকাটা অস্বাভাবিক। তিনি তার সাক্ষ্যে বলেছেন যে, তিনি ট্যাংকের অপারেশনে নিয়োজিত হওয়াকে গাইড করার জন্য ছিলেন। এটা কোন মতেই তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না। কিন্তু ৯ পদাতিক ডিভিশনের ৯ বেঙ্গল ল্যান্সারের অধিনায়কের ভাষ্য মতে ট্যাংকের Employment গাইড করার মত কোন কাজ তিনি করেননি এবং সেটার কোন প্রয়োজনও ছিল না।

(৩) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস ডিজিএফআই এর প্রতিনিধি হিসাবে ট্যাংকের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন এবং ট্যাংকসমূহ যাতে সহজে ব্যবহার না করা যায় তা নিশ্চিত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন।

(৪) র‍্যাব বেশ কিছু পলায়নরত বিডিআর সদস্যকে গ্রেফতার করে একটি বাসে করে আবাহনী মাঠে নিয়ে আসে। তৎকালীন ডিজি, ডিজিএফআই তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য র‍্যাবের অফিসারদেরকে ভর্ৎসনা করেন এবং বিডিআর সদস্যদেরকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন।

(৫) পরবর্তীতে ব্যারিস্টার তাপস কথিত হত্যাচেষ্টা ঘটনায় পাঁচজন অফিসারকে ফাঁসানোর ক্ষেত্রে ডিজিএফআই এর সক্রিয় ইন্ধন আছে বলে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। অভিযুক্ত পাঁচজন অফিসারই সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ডিজিএফআই তাদেরকে চাকরিরত অবস্থায় তুলে নিয়ে যায় এবং নির্মমভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করে। এই মামলায় ফাঁসিয়ে একটি প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে তাদেরকে পাঁচ বছর কারাদন্ড দেওয়া হয়। জেল থেকে বের হওয়ার পরও ডিজিএফআই এবং পুলিশ তাদেরকে অব্যাহত ভাবে হয়রানি করতে থাকে।

(৬) ডিজিএফআই-এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানা ও তার আশেপাশের পরিস্থিতি, বিশেষ করে সেনাবাহিনীর কার্যক্রম ক্রমাগতভাবে মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিককে অবহিত করছিলেন।

(৭) লে. কর্নেল সুলতানুজ্জামান সালেহ ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় অন্য একজন অফিসারকে নিয়ে NTMC-তে গিয়ে টেলিফোন মনিটরিং এর কাজ করেন যা তিনি মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিকের নির্দেশে করেছিলেন বলে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে।

(৮) ডিজিএফআই-এর এহেন কর্মকান্ড পুরো বিডিআর হত্যাকান্ড ঘটনায় তাদেরকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। তৎকালীন ডিজি ডিজিএফআই লে. জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবর, ডাইরেক্টর সিআইবি তৎকালীন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মামুন খালেদ, সিটিআইবির ডাইরেক্টর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমরুল কায়েস এবং পরবর্তীতে লে. কর্নেল সালেহ বিভিন্নভাবে ঘটনা প্রবাহকে ভিন্নখাতে পরিচালনার চেষ্টা করেছেন।

ট। <u>এনএসআই</u>। ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স বা জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা সংজ্ঞাগত ভাবে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সংস্থা হলেও এর কোনো কার্যক্রম প্যারামিলিটারি ফোর্সসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিলনা বলে এনএসআই এর তৎকালীন ডিজি তার সাক্ষ্যে দাবি করেছেন। ফলে হত্যাকান্ডের পরিকল্পনার বিষয়ে তারা অবগত ছিল না। ঘটনার পূর্বের দিন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি হিসেবে আসার জন্য এনএসআই নির্দ্বিধায় ছাড়পত্র প্রদান করে। ২০০৯ সালে গঠিত জাতীয় কমিটির প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে, এনএসআই ষড়যন্ত্রকারীদের বিলিকৃত লিফলেটটি হাতে পেয়েছিল। অত্র কমিশনে এনএসআইয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, লিফলেটটি তারা পাননি। বিডিআরের মত একটি প্যারামিলিটারি ফোর্সে এরকম একটি হত্যাকান্ডের পরিকল্পনা হবে এবং এনএসআই এ বিষয়ে কোন আগাম তথ্য পাবে না এটা কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ঠ। <u>স্পেশাল ব্রাঞ্চ (এসবি)</u>। এই ঘটনায় পুলিশের কার্যকর কোন ভূমিকা ছিলনা। এসবি এ বিষয়ে কোন আগাম তথ্য প্রদান করতে পারেনি।

৯৩। <u>লিফলেটে প্রদত্ত হুমকিকে অবহেলা</u>। ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে যে লিফলেটটি বিডিআর সদর দপ্তরের ভিতর পাওয়া যায় তাতে সেনাবাহিনী হতে আগত অফিসারদের প্রতি সরাসরি হুমকি ছিল। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ একই লিফলেট ফার্মগেইট হতে উদ্ধার করা হয়। তবে বিডিআরের কমান্ড চ্যানেল লিফলেটটিতে প্রদত্ত স্পষ্ট হুমকিকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়। ২৩ ফেব্রুয়ারি কর্নেল মাহমুদুর রহমান চৌধুরী তার রিপোর্টারের কাছ থেকে প্রাপ্ত একটি লিফলেট নিয়ে বিডিআরের তৎকালীন ঢাকা সেক্টর কমান্ডার কর্নেল মুজিবুল হকের বাসায় যান। কর্নেল মুজিব লিফলেটটি ছুঁড়ে মেরে বলেন 'এরা কিছু জানেনা।' তারা লিফলেট প্রদত্ত হুমকিকে অবজ্ঞা করে কোন ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হতে বিরত থাকে। বিডিআরের তৎকালীন ডিজি এবং অন্যান্য অফিসাররা যেকোন মূল্যে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠান আয়োজন করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রথমে একটি কাউন্টার লিফলেট প্রচারের পরিকল্পনা করলেও পরবর্তীতে সে পরিকল্পনা পরিত্যাগ করে ডিজি দরবারের মধ্যে সবকিছু বিশদভাবে বর্ণনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। লিফলেটের ভাষা থেকে একটা জিনিস স্পষ্ট যে এর পরিকল্পনা, প্রিন্টিং ও বিতরণকারীরা অত্যন্ত সুসংগঠিত এবং সংকল্পবদ্ধ ছিল। ডিজিএফআই কর্মকর্তা মেজর মুরতাজা ২৩ ফেব্রুয়ারি অধিনায়ক আরএসইউ মেজর গাঙ্গালী, মেজর শাহনেওয়াজ ও মেজর আসাদকে লিফলেটের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বিডিআরের কমান্ড চ্যানেল এর গুরুত্ব এবং এর মাধ্যমে প্রেরিত হুমকি সম্বলিত বার্তা বাকি কাউকে জানানোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন এবং সাধারণ অফিসারদেরকে বিষয়টি জানানোই হয়নি।

<u>হত্যাকান্ড প্রতিরোধে ব্যর্থতার কারণ</u>

৯৪। <u>সামরিক অভিযান না চালিয়ে রাজনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধানের সিদ্ধান্ত</u>। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানায় যা ঘটেছিল তা সম্পূর্ণভাবেই ছিল একটি সামরিক বিষয় এবং সামরিক অভিযানের মাধ্যমেই তা সমাধান করার অপরিহার্য ছিল। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে সামরিক এ বিষয়ে ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই উদ্দেশ্যমূলক ভাবে রাজনৈতিক সমাধানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাটি সমাধানের দায়িত্ব দেয়া হয় এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অনভিজ্ঞ কয়েকজন অর্বাচীন আওয়ামী নেতাদের। আওয়ামী নেতৃত্ব নিজেরাই যেহেতু এই

ষড়যন্ত্রের অংশ ছিলেন সেহেতু রাজনৈতিক সমাধানের নামে সময়ক্ষেপণ করে তারা এই হত্যাযজ্ঞ সম্পন্ন করার সুযোগ করে দিয়েছেন। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সামরিক অভিযান বারংবার বারিত করা হয়েছে। বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পর হতেই অফিসার হত্যার বিষয়ে তথ্য থাকলেও ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১৪৩০ ঘটিকার মধ্যে লালবাগ থানাধীন বেড়িবাঁধ সংলগ্ন সুয়ারেজ লাইনের স্লুইস গেটের মুখে দু'জন সেনা অফিসারের মৃতদেহ উদ্ধারের মাধ্যমে অফিসার হত্যার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে যায়। এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার পরও হত্যাকারীদের যে দল যমুনায় গিয়ে বৈঠক করে তাদেরকে অফিসার হত্যার ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি, বরং তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। রাজনৈতিক সমাধানের দোহাই দিয়ে সেনাবাহিনী ও র‍্যাবকে তাদের অবস্থান থেকে দূরে সরে যাবার নির্দেশ দেয়া হয় এবং মধ্যরাতে অস্ত্র সমর্পণের নাটকের মাধ্যমে অবশিষ্ট অফিসারদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করা এবং তাদের পরিবারসমূহের উপর অত্যাচার চালানের সুযোগ করে দেয়া হয়। রাজনৈতিক ভাবে সমস্যা সমাধানের এ সিদ্ধান্তটিই এ হত্যাকান্ড রোধ করতে না পাবার প্রধানতম কারণ হিসেবে বিবেচ্য।

৯৫। <u>সামরিক ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিস্ক্রিয়তা (সেনাবাহিনী, র‍্যাব ও পুলিশ)</u>।

ক। <u>সেনাবাহিনী</u>

(১) সেনা সদরের জিএসপিসি মিটিংয়ে অংশগ্রহণরত সেনাপ্রধান আনুমানিক ০৯৩০ ঘটিকায় পিলখানার ঘটনার বিষয়ে অবগত হন। বিষয়টি অবগত হয়েই তিনি ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে পিলখানায় যাওয়ার আদেশ দেন। আদেশ মোতবেক ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের একটি দল মেজর সুমনের নেতৃত্বে ১০৪৫ ঘটিকায় এবং অপর দলটি মেজর ওয়াকারের (পরবর্তীতে জেনারেল ও সেনাপ্রধান) নেতৃত্বে হালকা অস্ত্র নিয়ে ১১০০ ঘটিকায় পিলখানার কাছে পৌঁছে। তাদের কাউকেই ভিতরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয়নি। এই দুই দলের যেকোন দলই তৎক্ষণাৎ পিলখানার ভিতরে প্রবেশ করলে এই নৃশংস হত্যাকান্ড ঘটানো সম্ভব হতো না। এই দু'টি দল পিলখানার নিকটে আসার পর ভিতরে প্রবেশের পরিস্থিতি অনুকূলে ছিল। তার প্রমাণ মেজর ওয়াকারের দলের সামনেই কর্নেল মাহমুদুর রহমান চৌধুরী এবং চ্যানেল আই-এর একজন ফটোগ্রাফার প্রাচীর অতিক্রম করে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় ভিতরে ঢোকে। বিডিআর সদস্যরা পরবর্তীতে তাদেরকে ঘিরে ধরে এবং দেয়াল টপকিয়ে ফেরত পাঠায়।

(২) সেনাসদরের মৌখিক নির্দেশে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে পিলখানায় মোতায়েন করা হয়। আপাত দৃষ্টিতে এই মোতায়েনের উদ্দেশ্যে ছিল বিডিআর-এ নিয়োজিত সেনা অফিসারদেরকে উদ্ধারের জন্য সেনা অভিযান পরিচালনা করা। ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক বিগ্রেডের সদস্যরা সে অভিযান পরিচালনার জন্য মানসিকভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত ছিলেন। ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে মোতায়েনের পর থেকেই একটি প্যারালাল কমান্ডের সৃষ্টি করা হয় যেখানে মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিক এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে তৎকালীন পিএসও এএফডি লে. জেনারেল আব্দুল মুবীন মৌখিক নির্দেশনা দিতে থাকেন। লে. জেনারেল আব্দুল মুবীনের ভাষ্য মতে তিনি মেজর ওয়াকার-উজ-জামানকে (তৎকালীন ১৭ ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক, পরবর্তীতে সেনা প্রধান) বলেছিলেন পিলখানার গেইটের নিকট ধানমন্ডির একটি বিল্ডিং এর উপরে উঠে গেইট লক্ষ্য করে কয়েকটি রকেট লঞ্চার নিয়ে একাধিক শেল ফায়ার করতে। জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান তার কমিশনে প্রদত্ত মৌখিক সাক্ষ্যে বলেছেন যে, তিনি তার কমান্ড চ্যানেলের কাউকে না পেয়ে মেজর জেনারেল তারিক সিদ্দিককে ফোন করেন এবং মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিক তাকে ভিতরে ঢুকতে নিষেধ করেন। রাজনৈতিক সমাধানের নামে অযথা সময় ক্ষেপণ চলতে থাকে এবং এই সুযোগে বিডিআর সদস্যরা তাদের হত্যাকান্ড ও অন্যান্য পৈশাচিক কর্মকান্ড সহজেই সমাধা করার সুযোগ পায়। ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের কামান্ডর এই পরিস্থিতিতে তার কমান্ডে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। তার ব্রিগেডকে মোতায়েন করা হয়েছিল পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য। অথচ তিনি সেনা অভিযানের নির্দেশ পাননি অযুহাতে সম্পূর্ণভাবে অকার্যকর অবস্থায় সময় ক্ষেপণ করেছেন। বিডিআর সিপাহীদের গুলি বর্ষণে তার ব্রিগেডের একজন সৈনিক নিহত হলে তিনি আত্নরক্ষার খাতিরে হলেও গুলি বর্ষণ ও আক্রমণের মাধ্যমে সেটার প্রত্যুত্তর দিতে পারতেন। বাস্তবতা হলো

তিনি তা করেননি বরং যারা পিলখানায় প্রবেশের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাদেরকে যে কোন ধরণের আক্রমণ করা হতে বিরত রাখেন।

(৩) সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল পিলখানায় গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের। অপারেশনের নাম দেয়া হয়েছিল 'অপারেশন রেস্টোর অর্ডার' অর্থাৎ পিলখানায় স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা। ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডের প্রথম দলটি ১৭ ইস্ট বেঙ্গলের উপ-অধিনায়ক মেজর ওয়াকারের নেতৃত্বে আনুমানিক ১০৫০ ঘটিকায় পিলখানার ৪ নং গেইট এর দৃষ্টি সীমার মধ্যে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই গুলিবর্ষণের শিকার হয়। তারাও গুলি বর্ষণের কোন উত্তর দেয়নি। ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রি. জে. আব্দুল হাকীম আজীজ তার জবান বন্দীতে বলেছেন আক্রান্ত না হলে তাকে গুলিবর্ষণ করতে নিষেধ করা হয়েছিল। ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অধীনস্ত ইঞ্জিনিয়ারর্স কোম্পানির একটি দল পিলখানার ৪ নং গেইট এর কাছে পৌঁছালে গুলিবর্ষণের শিকার হয় এবং তাতে দু'জন সৈনিক গুলিবিদ্ধ হয় (একজন পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করেন)। অর্থাৎ ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডের একটি দল সন্দেহাতীত ভাবে আক্রান্ত হয়েছিল। তার পরেও ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডের কমান্ডার পিলখানার বিডিআর সদস্যদের উপর গুলিবর্ষণের কোন আদেশ দেননি বা তথাকথিত বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কোন সামরিক অভিযান পরিচালনা করেননি। তিনি পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষায় সময় ক্ষেপণ করেছেন।

(৪) পিলখানার ৩ নং গেইটে প্রথম পৌছায় লে. কর্নেল জাকির এর নেতৃত্বাধীন র‍্যাব-৩ একটি দল। এ দলটিকে র‍্যাব এডিজি কর্নেল রেজানূর খান ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেননি। সকাল ১০৪৫ থেকে ১১০০ ঘটিকার ৪ ফিল্ড আর্টিলারির একটি দল নিউ মার্কেট এলাকায় পৌঁছায়। ৪ ফিল্ড আর্টিলারির দলটি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে-একটি দল বটতলার দিক থেকে এবং আরেকটি দল আজিমপুর কলোনির পাশ দিয়ে ৩ নং গেইটের দিকে অগ্রসর হয়। বটতলার দিক থেকে অগ্রসরায়মান দলটিকে লক্ষ্য করে মর্টার গোলা নিক্ষেপ করা হয়। দুপুর নাগাদ গোলাগুলি চলতে থাকে, মাঝে মাঝে আগুনের ধোঁয়া দেখা যায়। রাত ২২০০ ঘটিকার দিকে ৪ ফিল্ড আর্টিলারি দলটিকে পিছেয়ে আসতে বলা হয় তারা সায়েন্স ল্যাব পর্যন্ত সরে এসে রাতে অবস্থান করে।

(৫) সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ ১২০০ ঘটিকায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন যমুনায় যান এবং সেখানে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করেন যখন সেনাসদরে তার উপস্থিতি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ছিল। তার অনুপস্থিতিতে ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডের কমান্ডার একটি প্যারালাল কমান্ডের ফাঁদে পড়েন। সুযোগ বুঝে মে. জে. তারেক সরাসরি তাকে অপারেশন না চালানোর আদেশ দিতে থাকে। ফলে হত্যাকারীরা নির্বিঘ্নে হত্যাযজ্ঞ চালানোর সুযোগ পেয়ে যায়।

(৬) বিকাল ১৬০০ ঘটিকার পরে সেনাবাহিনীকে পিলখানার দৃষ্টি সীমার বাইরে আবাহনী মাঠে সমবেত হওয়ার আদেশ দিলে হত্যাকারীরা তাদের অবশিষ্ট হত্যাযজ্ঞ, আলামত ধ্বংস, লাশ গুম, নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচার ইত্যাদি অপরাধসমূহ সংঘটন করার ও পালিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় সুযোগটি পেয়ে যায়।

(৭) অবস্থা পর্যালোচনা করে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাকিম সেখানে উপস্থিত **আওয়ামী লীগ** ব্যক্তিবর্গের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, পুরো পরিস্থিতির উপর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাকিম কোন রকমের নিয়ন্ত্রণই প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি। পুরো পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ব্যারিস্টার তাপস, জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক ও জনাব মির্জা আজমদের হাতে। পিলখানার চারিদিকে কোনরকমের কোনো কর্ডন কার্যকর করতেও ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেড কোনরূপ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি।

(৮) পিলখানায় সে সময় কে ভিতরে প্রবেশ করেছে কে বের হয়েছে তার কোন নিয়ন্ত্রণ সেনাবাহিনীর হাতে ছিলনা। পিলখানায় বিভিন্ন সময়ে যেসব এ্যাম্বুলেন্স ভিতরে ঢুকেছে এবং যে সব

এ্যাম্বুলেন্স বের হয়ে গেছে সেগুলো কেউ চেক করেনি এবং সেগুলোতে করে কারা ভিতরে ঢুকেছে বা বের হয়ে গেছে তার কোন রেকর্ড কারো কাছে নেই। এসব অনিয়ন্ত্রিত এ্যাম্বুলেন্স করে হত্যাকারীদের পিলখানার বাইরে বের হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এসব গাড়ির সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল ব্যারিস্টার তাপস, জাহাঙ্গীর কবির নানক, সাহারা খাতুন ও মির্জা আজমদের হাতে।

(৯) সেনাপ্রধান প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন যমুনায় গিয়ে অপেক্ষমান থাকার সময় অপারেশন পরিচালনার দায়িত্ব স্বাভাবিক ভাবেই সিজিএস এর উপর বর্তায়। তৎকালীন সিজিএস লে. জেনারেল সিনা ইবনে জামালী এ বিষয়ে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখেননি। প্রকৃতপক্ষে সেনাপ্রধান ও ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের মধ্যে সমন্বয় করার দায়িত্বও ছিল সিজিএস এর। এ বিষয়েও তিনি কার্যকর ভূমিকা রেখেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

(১০) ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের অধীনস্ত ব্যাটালিয়নের অধিনায়কগণ ব্রিগেড কমান্ডারের নির্দেশের জন্য অসহায় ভাবে দুই দিন অতিবাহিত করেছেন কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানের নামে সময় ক্ষেপণ ছাড়া আর কিছুই হয়নি। তাদের এই নির্লিপ্ততার সুযোগে ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের ষড়যন্ত্র পুরোপুরি বাস্তবায়ন করে।

(১১) ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ০৬০০ ঘটিকায় অপারেশন 'রেস্টোর অর্ডার'-এর অপারেশন অর্ডার বের হলেও সে অপারেশন অর্ডার কার্যকর করার কোন উদ্যোগ সেনাসদর গ্রহণ করেনি।

(১২) ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকাল ১৬০০ ঘটিকার পর বিডিআরের বেশিরভাগ সদস্য পালিয়ে গিয়ে পিলখানা সম্পূর্ণ খালি করে দিলেও অযৌক্তিক কারণে সেনাবাহিনী সেদিন পিলখানায় প্রবেশ না করে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অপেক্ষা করে। এই বিলম্বকে পুঁজি করে হত্যাকারীরা লাশগুমসহ বিভিন্ন আলামত ধ্বংস করার সুযোগ পায়।

(১৩) এরূপ অভিযানে ট্যাংক একটি অত্যন্ত কার্যকর যুদ্ধাস্ত্র। মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে সাভার ক্যান্টনমেন্টে এবং রাজেন্দ্রপুর সেনানিবাসে ট্যাংক মজুত থাকলেও সেগুলোকে ঢাকায় আনার কোন উদ্যোগ সেনা সদর গ্রহণ করেনি। ২৬ ফেব্রুয়ারিও ট্যাংক ঢাকা শহরে আনতে আনতে বিকেল গড়িয়ে যায়। ততক্ষণে বিডিআর হত্যাকান্ডের প্রায় পরিসমাপ্তি ঘটে গেছে।

(১৪) ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে র‍্যাবের কিছু সদস্য বিডিআরের পলায়নরত বেশ কিছু সদস্যকে গ্রেফতার করে আবাহনী মাঠে নিয়ে আসে, যাদের মধ্যে একাধিক হত্যাকারী ছিল। সেনাবাহিনীর দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্রিগেড এসব বিডিআর সদস্যকে গ্রেফতার করে দালিলিকভাবে পুলিশ বা র‍্যাবের হাতে সোপর্দ করেন।

(১৫) প্রকৃতপক্ষে, ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানা এলাকার চতুর্পার্শ্বে সেনাবাহিনীর কমান্ড কন্ট্রোল সম্পূর্ণভাবেই ভেঙ্গে পড়ছিল যা একটি পেশাদার সেনাবাহিনীর কাছ থেকে কোন মতেই কাম্য নয়। তৎকালীন সেনাবহিনী প্রধান এবং ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডের কমান্ডারের কমান্ড ব্যর্থতাকেই এর জন্য দায়ী করা যেতে পারে।

(১৬) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (পরবর্তীতে লে. জেনারেল) চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী এবং লে. কর্নেল (পরবর্তীতে জেনারেল ও সেনাপ্রধান) আজিজ আহমেদ এর কর্মকান্ডঃ

(ক) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (পরবর্তীতে লে. জেনারেল) চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী এবং লে. কর্নেল (পরবর্তীতে জেনারেল ও সেনাপ্রধান) আজিজ আহমেদ ২০০৯ সালে যথাক্রমে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে কোর্স মেম্বার এবং সেনাসদর এজি শাখা পিপিএন্ডএ ডাইরেক্টরেটে কর্মরত ছিলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে দুপুর ১২০০ ঘটিকায় পরে

তাদেরকে পিলখানা ৪ নং গেইটের বাইরে তৎকালীন এমপি মাহবুব আরা গিনি এবং ওয়ারেসাত হোসেন বেলালের সাথে দেখা যায়। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সারওয়ার্দী এর ভাষ্য মতে তার মেয়ে নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুলে কোচিং এর জন্য গিয়েছিল। স্কুলের একজন শিক্ষকের টেলিফোন পেয়ে তিনি তার মেয়েকে আনার জন্য রিক্সা ও স্কুটার যোগে সাত মসজিদ রোডে পৌঁছান। সেখানে লে. কর্নেল আজিজকে দেখতে পান। পরবর্তীতে এমপি মাহবুব আরা গিনি এবং ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল গাড়ি নিয়ে এলে তিনি সে গাড়িতে উঠে পড়েন। পিলখানার নিকট থেকে তিনি সিএনজি নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় যান। যমুনায় গিয়ে বিডিআর বিদ্রোহী প্রতিনিধি দলের ডিএডিদের সঙ্গে তিনি কথা বলেন।

(খ) জেনারেল আজিজের ভাষ্য মতে লে. জেনারেল সারওয়ার্দীর অনুরোধে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বেলা ১১ টার দিকে ব্রিগেডিয়ার সারওয়ার্দীকে নিয়ে তিনি পিলখানার দিকে রওয়না দেন। জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের পাশের এমপি হোস্টেলের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তৎকালীন এমপি মাহবুব আরা গিনি এবং ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল তার গাড়িতে ওঠেন। সাত মসজিদ রোডে ঢোকার পর এমপি দুই জন গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে পিলখানার গেইট এর দিকে চলে যান এবং সিটি কলেজের দিক থেকে যে রাস্তাটি এসেছে সেদিক থেকে আরো ০২ জন এসে তাদের সাথে যোগ দেন। পরবর্তীতে জেনারেল আজিজ এবং লে. জেনারেল সারওয়ার্দীকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় নামিয়ে দিয়ে তারা বাড়িতে ফেরত যান।

(গ) তৎকালীন এমপি মাহবুব আরা গিনির ভাষ্য মতে সংসদ থেকে পিলখানায় যাওয়ার পথে ধানমন্ডি ২৭ নম্বরের কোনায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সারওয়ার্দীকে তারা তাদের গাড়িতে তুলে নেন। ধানমন্ডি ১৫ নম্বর এর কাছে মাহবুব আরা গিনি গাড়ি আটকান লে. কর্নেল আজিজ যিনি পরবর্তীতে সেনাপ্রধান হয়েছিলেন।

(ঘ) তিন জনের বক্তব্যই পরস্পর সাংঘর্ষিক। তবে লে. জেনারেল সারওয়ার্দী তার মেয়ের কোচিং এর বিষয়ে যে তথ্য দিয়েছেন তা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। কারণ বিজিবি সদর দপ্তর হতে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, সেইদিন স্কুল এবং কোচিং বন্ধ ছিল। যে শিক্ষক তাকে ফোন করেছিলেন তার নাম এবং টেলিফোন নম্বর কোনটাই তিনি দিতে পারেননি।

(ঙ) এনডিসির একজন কোর্স মেম্বার এবং সেনাসদরের চাকরিরত একজন অফিসারের বেসমারিক পোশাকে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানা বা যমুনায় যাওয়া নিতান্তই একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার। তাদের বক্তব্য হতে এটুকু স্পষ্ট যে লে. জেনারেল সারওয়ার্দীর সাথে তৎকালীন এমপি ওয়ারেসাত হোসেন বেলালের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো। সুতরাং সন্দেহ নেই যে, **আওয়ামী লীগের** ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে লে. জেনারেল সারওয়ার্দী ও জেনারেল আজিজ অবগত ছিলেন।

চ। বিডিআর হত্যাকান্ডের অব্যবহিত পরেই প্রথমে ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক এবং তার পর লে. কর্নেল আজিজ পদোন্নতি পেয়ে বিডিআরে ঢাকা সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেন। তদন্ত চলার সময় তিনি পুলিশের বহুল আলোচিত সাবেক এসপি আব্দুল কাহার আকন্দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন এবং তদন্ত প্রভাবিত করতেন। আলামত ধ্বংসের ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে। পরবর্তীতে সেনাপ্রধান হওয়া পরে তিনি সেনাবাহিনীর অসংখ্য চৌকষ অফিসারকে বিদেশী নাগরিকত্বের অজুহাতে চাকরিচ্যুত করেছেন।

ছ। মেজর একরাম এর ভাষ্য অনুযায়ী বিডিআর হত্যাকান্ডের তদন্ত ভিন্নখাতে নেয়া হয়েছিল এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের আদেশেই সেটি ঘটেছিল। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক, যিনি তখন চিফ প্রসিকিউটর ছিলেন, দিক নির্দেশনা দিতেন। কর্নেল আজিজ, ঢাকা সেক্টর কমান্ডার এদের কাজ সমন্বয় করতেন।

(১৭) ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে যে সব সেনা কর্মকর্তা পিলখানায় বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের দ্বারা আক্রান্ত অফিসার ও তাদের পরিবারকে উদ্ধার ও রক্ষায় দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েও নিষ্ক্রিয় থেকে ঘটনার রাজনৈতিক সমাধান-প্রহসনে সহায়তা করেছেন, হত্যাকান্ডের ঘটনাস্থল যথাযথভাবে পরিবেষ্টন না করে অপরাধীদের পিলখানা থেকে বিভিন্ন গাড়িতে বের হয়ে যেতে এবং নিজ সামরিক কমান্ডের বাইরে গিয়ে প্যারালাল কমান্ডের নির্দেশ অনুসারে করেছেন ষড়যন্ত্রকারীদের সেনা অফিসার হত্যার নীল-নকশায় সহায়তা করেছেন এবং একই প্যারালাল কমান্ডের নির্দেশে হত্যাকান্ডের ঘটনাস্থল থেকে সেনাবাহিনীকে তিন কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নিয়ে বিদ্রোহী-হত্যাকারী বিডিআর সদস্যদের পালিয়ে যেতে সহায়তা করছেন, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত অবৈধ সাধারণ ক্ষমার অজুহাতে পলাতক ও পলায়নপর বিডিআর-অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেননি তাঁরা সবাই শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন।

খ। **<u>পুলিশ ও র‍্যাব ফোর্সেস</u>**

(১) ঘটনা শুরুর কয়েক মিনিটের মধ্যেই আনুমানিক ১০১৫ ঘটিকায় লে. কর্নেল শামসুজ্জামানের নেতৃত্বে র‍্যাব-২ এর একটি দল ০৭ টি এসএমজিসহ পিলখানার ৪ নং গেইট এর নিকট পৌঁছায়। হত্যাকারীর তখনও সংগঠিত হতে পারেনি এবং গেইট এ মাত্র ২/৩ বিডিআর সদস্য দাঁড়ানো ছিল। সকাল ১০০০ ঘটিকার পরপরই র‍্যাব-২ এর দুটো প্লাটুন নিয়ে মেজর আমিন ৫ নং গেইট এর কাছে অবস্থান নেয়। দুটো দলের কোনটিকেই কর্নেল (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) ডিজি র‍্যাব জনাব হাসান মাহমুদ খন্দকার ও এডিজি র‍্যাব কর্নেল (পরবর্তীতে মেজর জেনারেল) রেজানূর ভিতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেননি। ৫ নং গেইট থেকে দরবার হলের দূরুত্ব আনুমানিক ৫০ গজ। র‍্যাবের এ দুটি দল অনুমতি পেলে বা অনুমতির অপেক্ষা না করে ভিতরে প্রবেশ করলেই হত্যাকারী আনুমানিক ১০৪০ ঘটিকায় যে নৃশংস হত্যাকান্ড মেতে উঠেছিল তাও যেমন সম্ভব হতো না তেমনি পরবর্তী হত্যাকান্ডগুলো যেমন দরবার হলের পিছনে লুকিয়ে থাকা অফিসারদের হত্যা করাও সম্ভব হতোনা। ১০৪৫ ঘটিকার পরপরই ৫ নং গেটের কাছের দলটি নিকটবর্তী বাসার ছাদ থেকে দরবার হলের সামনে লাশ পড়ে থাকতে দেখে যা পিলখানা বাইরে থেকে দেখা প্রথম লাশ।

(২) ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি মেজর জেনারেল রেজানূর খান একই পোশাকে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাস ভবন যমুনায় অবস্থান করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারি রাত্রে তাকে যমুনা থেকে ফেরত যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

(৩) অপরদিকে, আনুমানিক ১০১৫ ঘটিকায় লে. কর্নেল জাকিরের নেতৃত্বে র‍্যাব-৩ এর যে দলটি ৩ নং গেইটে পৌঁছেছিল তারাও কালক্ষেপণ না করে আক্রমণ করলে ঘটনা অন্যরকম হতো। পরবর্তীতে বিডিআর সদস্যদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও র‍্যাব-৩ পাল্টা গুলিবর্ষণ করেনি। র‍্যাব-৩ এর অধিনায়ক স্বীকার করেছেন যে প্রথমে তাকে আদেশ দেয়া হয়েছিল ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দরবার হলে সীমানা প্রচারের অংশ ভেঙ্গে পিলখানায় প্রবেশ করতে। কিন্তু অবস্থানে পৌঁছানোর পরপরই তাকে কোনরূপ আক্রমণ করতে নিষেধ করা হয়। সেনাবাহিনী আসার পরে আর্টিলারি রেজিমেন্টের অধিনায়ক লে. কর্নেল (পরবর্তীতে জেনারেল) জিয়া লে. কর্নেল জাকিরকে পিছনে চলে যেতে এবং সেনাবাহিনীর নির্দেশ ছাড়া কোন কিছু না করতে অনুরোধ করেন।

(৪) অধিনায়ককে অবগত করা ছাড়াই র‍্যাব-৩ এর ফাইটিং কোম্পানিগুলোর মধ্যে একটি কোম্পানিকে কর্নেল রেজানূর খান যমুনায় মোতায়েন করার আদেশ দিয়েছিলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি র‍্যাব-৩ অধিনায়ককে ডিজি র‍্যাব জানান যে, পরবর্তী দিন পিলখানার দিকে একটা মিছিল যাবে। মিছিলটি যেন কোন অরাজকতা করতে না পারে। পিছনে সরে আসায় মিছিলটি হয়েছিল কিনা লে. কর্নেল জাকির তা জানতে পারেননি।

(৫) উপরিউক্ত বক্তব্য হতে এটা স্পষ্ট যে, র‍্যাবের অগ্রগামী দলগুলো সময়মত আক্রমণ পরিচালনা করলে বিডিআর হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হতো না। কিন্তু র‍্যাবের ডিজি জনাব হাসান মাহমুদ খন্দকার এবং এডিজি মেজর জেনারেল রেজানূর খান তাদেরকে পিলখানায় প্রবেশের বা গুলি চালানোর অনুমতি দেননি। যদিও মেজর জেনারেল রেজানূর এজন্য মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিক ও মেজর জেনারেল জয়নুল আবেদীন (তৎকালীন ডিজি এসএসএফ)-কে দায়ী করেছেন। র‍্যাবের অগ্রগামী দলগুলো অনুমতির অপেক্ষা না করে তাদের আইন অনুযায়ী আক্রমণ চালালেও এ হত্যাকান্ড সংঘটিত হতো না।

(৬) ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে যে সব পুলিশ/র‍্যাব কর্মকর্তা পিলখানায় বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের দ্বারা আক্রান্ত সেনা অফিসার ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জীবন, সম্ভ্রম ও সম্পদ রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েও নিষ্ক্রিয় থেকে ঘটনার রাজনৈতিক সমাধান-প্রহসনে সহায়তা করেছন, হত্যাকান্ডের ঘটনাস্থল যথাযথভাবে পরিবেষ্টন না করে অপরাধীদের পিলখানা থেকে বিভিন্ন গাড়িতে বের হয়ে যেতে এবং পুলিশকে বিদ্রোহী-হত্যাকারী বিডিআর সদস্যদের দাবি মতো দূরে সরিয়ে নিয়ে তাদের পালিয়ে যেতে সহায়তা করছেন, তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত কথিত ‘সাধারণ ক্ষমার অজুহাতে পলাতক ও পলায়নপর বিডিআর-অপরাধীদের গ্রেপ্তার করেননি, তাদের সবার বিরুদ্ধে প্রচলিত আইনে ব্যবস্থা নেওয়া য়ায়। রমনা বিভগের ডিসি, এডিসি, ধানমন্ডি, নিউ মার্কেট, হাজারিবাগ থানার ওসি ও পিআইগণ, লালবাগ বিভগের ডিসি, এডিসি, লালবাগ ও কামরাঙ্গির চর থানার ওসি ও পিআইগণ এবং র‍্যাব-২ এর অধিনায়ক, উপাধিনায়ক, সংশ্লিষ্ট কোম্পানি কমান্ডারগণ ও পেট্রোল দল এবং অন্যান্য দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার এর আওতাভুক্ত হবেন।

৯৬। <u>প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার নেতিবাচক ভূমিকা।</u>

ক। আধুনিক যুগে মিডিয়ার প্রভাব অপরিসীম। সংগত কারণেই অন্য যে কোন মিডিয়ার চেয়ে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রভাব ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

খ। ঘটনা চলাকালীন সময়ে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়া অনেকটা একতরফাভাবে লাইভ প্রোগ্রাম, টক-শো ইত্যাদির মাধ্যমে সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক অপপ্রচার চালিয়েছে। বিদ্রোহীরা বিদ্রোহ চলাকালে ইলকট্রনিক মিডিয়ার প্রচারের জন্য একাধিক চিরকুট সাংবাদিকদের মাঝে হস্তান্তর করে। এসমস্ত চিরকুটে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বাস্তবতা বিবর্জিত অনেক অপপ্রচার ও কুৎসা ছিল, যা মিডিয়াসমূহ তাৎক্ষণিকভাবে কোনো যাচাই-বাছাই ছাড়াই অবিবেচকের মতো প্রচার করে। এর প্রভাবে দেশ, জাতি ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সেনাবাহিনীর মতো একটি গৌরবোজ্জ্বল প্রতিষ্ঠানের সুনাম বিনষ্ট হয় এবং একই সাথে জনমনে বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি করা হয়। এ ধরনের অনুষ্ঠানসমূহ ডাল-ভাত কর্মসূচি, বিডিআর সদস্যদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য না জেনেই ঢালাওভাবে পক্ষপাতমূলক বক্তব্য প্রদানের মাধ্যমে উত্তেজনা বৃদ্ধিতে ইন্ধন জুগিয়েছে। কোন খবরের সত্যতা যাচাই-বাছাই না করেই (যেমন, ডিএডি তৌহিদকে ডিজি হিসাবে সরকার নিয়োগ দিয়েছে মর্মে খবর প্রচার)-তা প্রচার করেছে। জাতীয় সংহতি ও নিরাপত্তার জন্য ক্ষতিকারক এসব অপপ্রচারে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির উপর কি ধরনের ভয়ানক নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে সে বিষয়টি মিডিয়াসমূহ মোটেই আমলে নেয়নি। কোন কোন ক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ প্রচারের নামে কোন নিয়ম-নীতি-আইনের প্রতি ন্যূনতম সম্মান প্রদর্শন করা হয়নি।

গ। কোন কোন ক্ষেত্রে মিডিয়ার ক্ষমাহীন দায়িত্বহীনতা ও অতি আগ্রহ জনমনে প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে দেশপ্রেম, শালীনতাবোধ উপেক্ষা করে প্রচারের মাধ্যমে বিদ্রোহের উস্কানি দ্রুত পিলখানার বাইরে ছড়িয়ে দিতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছে। মিডিয়ার সার্বিক কার্যক্রম জনমনে বিদ্রোহীদের পক্ষে সমমর্মিতা সৃষ্টি করতে সহায়ক হয়েছিল। মিডিয়ার এ সকল কর্মকান্ড উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল বলে প্রতীয়মান। মিডিয়ার নেতিবাচক প্রচারণা জনগণকে সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উস্কে দিয়েছিল, এবং তাতে বিদ্রোহীরা সফলতাও পেয়েছিল। বিশেষ করে মুন্নী সাহা নামে একজন সাংবাদিকের প্রচারণা সম্পূর্ণভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল যা ষড়যন্ত্রের অংশ। এটিএন বাংলার জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল, জনাব জহিরুল

ইসলাম মামুন এবং মুন্নী সাহার প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে এই প্রচারণা চালালো হয়। ঘটনা পরবর্তীতেও বিভিন্ন গণমাধ্যমে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার 'রাজনৈতিক সমাধানের' পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করে সম্পাদকীয় এবং প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সম্পাদকীয় এবং আসিফ নজরুল কর্তৃক লিখিত 'বিডিআর বিদ্রোহ: কিছু জ্বলন্ত প্রশ্ন' উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ১২ মার্চ ২০০৯ তারিখে দি ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত 'Terror struck back at its buster' শীর্ষক প্রতিবেদনে বিডিআর হত্যাকান্ড জঙ্গি-সন্ত্রাসীদের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে এসব জঙ্গি-সন্ত্রাসী নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিডিআরে অনুপ্রবেশ করেছিল। প্রতিবেদনে এহেন দাবির স্বপক্ষে কোন সূত্র বা প্রমাণ উল্লেখ করা হয়নি। এই প্রতিবেদনটি একাধিক ভারতীয় মূল ধারার গণমাধ্যমে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। বিডিআর হত্যাকান্ডের প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা দিয়ে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার দেশি বিদেশী ষড়যন্ত্রে এ ধরনের প্রতিবেদন সমর্থন যুগিয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর তথ্য সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রত্যেকেরই মিডিয়ার দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্ষমতা থাকলেও কেউই কার্যকর ভূমিকা পালন করেনি।

৯৭। <u>ঘটনার সময় দরবার হলে অফিসারদের সিদ্ধান্তহীনতা</u>। ডিজির দরবারে বক্তৃতা চলাকালে সিপাহী মইনুদ্দিন একটি অস্ত্র নিয়ে দরবার হলে প্রবেশের পর ডিজির দিকে তাক করে এবং কাজল নামের অপর সৈনিক আর একটি অস্ত্র নিয়ে প্রবেশ করে। মইনুদ্দিন অস্ত্র ফেলে দিয়ে বেহুশ হওয়ার ভান করে পড়ে থাকলে গুলিসহ একটি এবং মতান্তরে দু'টি অস্ত্র অফিসারদের এর নিকট ছিল। মেজর আব্দুল হাকিম আজীজ একটি অস্ত্র নিয়ে ফায়ার করার অনুমতি চাইলে ডিজি অনুমতি দেননি। অস্ত্র ও গুলিসহ দু'একজন সৈনিক দরবার হলের ভিতর প্রবেশ করে অফিসারদেরকে স্টোরের পিছন হতে বের হয়ে আসার আদেশ দেয়ার সময়ও তাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে ফায়ার করা যেতো। কিন্তু ডিজির অনুমতি না থাকায় সম্ভবত অফিসাররা সে চেষ্টাও করেননি। সিপাহী মইনুদ্দিন অস্ত্র নিয়ে দরবার হলে ঢোকার পর সব বিডিআর সদস্যর দৌড়ে দরবার হল হতে বের হয়ে যাবার পর বেশ কিছুক্ষণ একটি অরাজক অবস্থা চলতে থাকে। সে মুহূর্তে কিছু অফিসার নিকটবর্তী ৫ নং গেইট দিয়ে দৌড়ে বের হয়ে যাওয়ার পক্ষে মত দিলেও ডিজি এবং কিছু অফিসার তাতে সায় দেননি। ফলে তাদের বাঁচার শেষ সুযোগ টুকুও হাত ছাড়া হয়ে যায়।

<u>নির্বিঘ্নে হত্যাকান্ড সম্পন্ন করে হত্যাকারীদের সহজে পালিয়ে যেতে পারার কারণ</u>

৯৮। <u>গোয়েন্দা তৎপরতার অভাব</u>। বিডিআর সদস্যরা কখন কোন দিক দিয়ে পালিয়ে যেতে পারে এরকম কোন তথ্য এনএসআই, ডিজিএফআই, র‍্যাব ও এসবি **দিতে পারেনি। ২৫ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি অসংখ্য বিডিআর সদস্যকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দিক দিয়ে পালিয়ে যেতে দেখেও গোয়েন্দা সংস্থা কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।**

৯৯। <u>সেনাবাহিনী পুলিশ ও র‍্যাব কর্তৃক পিলখানা কর্ডন না করা</u>। পুলিশ, র‍্যাব, এবং সেনাবাহিনীর অবস্থান গেইট ভিত্তিক হওয়ার প্রকৃত অর্থে পিলখানা এলাকা কোন সময়ই কার্যকর কর্ডনের অধীনে ছিল না। সেনা বাহিনীর উপস্থিতি হত্যাকারীদের জন্য হুমকি হওয়ায় তারা পাল্টা হুমকি দিয়ে সেনাবাহিনীকে দূরে রাখতে প্রধানমন্ত্রীকে রাজি করাতে সমর্থ হয়। প্রধানমন্ত্রী সেনাবাহিনীকে পিলখানার দৃষ্টিসীমার বাইরে আবাহনী মাঠে সমবেত হওয়ার নির্দেশ দিলে সেনাপ্রধান পিলখানার গেইটসমূহ হতে সেনাবাহিনীর পেট্রোলসমূহকে পিছনে সরে আসতে নির্দেশ দেয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে পুরো এলাকা কর্ডনের আওতায় রাখা অত্যন্ত জরুরি কাজ ছিল। দুঃখজনকভাবে এ বিষয়টির উপর সেনাবাহিনী, র‍্যাব বা পুলিশ কেউই নজর দেয়নি। সেনাবাহিনী সরে যাওয়ার পূর্বে তাদের উচিৎ ছিল পুলিশ ও র‍্যাবকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে যাওয়া। অপরদিকে, পিলখানার ভৌগলিক অবস্থান, ঘনবসতি ইত্যাদির অজুহাতে পুলিশ ও র‍্যাব কোনরূপ কর্ডনের ব্যবস্থা নেয়নি যা ছিল পুলিশের মৌলিক কর্তব্যের প্রতি অবহেলা। ফলশ্রুতিতে হত্যাকারীরা দেয়াল টপকে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে গেইট গুলো ব্যবহার করে সহজেই পালিয়ে যেতে পেরেছিল। উপরন্তু, সন্ধ্যায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে হত্যাকারীরা পিলখানার ভিতরে বিভিন্ন অপকর্ম করে এবং পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। পিলখানা কর্ডন না করা আইন-শৃংখলা বাহিনীর চরম দায়িত্বহীনতা ও অপেশাদারিত্বের পরিচয়।

১০০। **বিদ্যুৎ বিভাগের দায়িত্বহীনতা**। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সন্ধ্যা ২০০০ ঘটিকার পর পিলখানার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়, যার সুবাদে হত্যাকারীরা অবশিষ্ট হত্যাকান্ড, লাশ গুম, আলামত ধ্বংস, নারী ও শিশুদের প্রতি অত্যাচার সম্পন্ন করার সুযোগ পায়। বিদ্যুৎ সরবরাহ কার আদেশে কিভাবে বন্ধ হয়েছিল এর কোন সদুত্তর বিদ্যুৎ বিভাগ দিতে পারেনি।

১০১। **স্পেশাল সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ) এর দায়িত্বহীনতা**। প্রধানমন্ত্রীর অফিস বা বাসস্থানে প্রবেশকারীদের সম্পূর্ণ পরিচয় লিপিবদ্ধ করা এসএসএফের নিয়ন্ত্রণাধীন এসবির অন্যতম দায়িত্ব। বিডিআর বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি দলে যারা গিয়েছিলেন তাদের কারো পরিচয়ই রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনার গেইটে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। এক্ষেত্রে এসএসএফ এবং এসবি চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছে।

১০২। চরম সমন্বয়হীনতা। ঘটনা ঘটার সাথে সাথেই সেনাবাহিনীর ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডকে পিলখানায় মোতায়েনের নির্দেশ দেয়া হয় এবং ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডের অধীনস্ত ১৭ ইস্ট বেঙ্গলের একটি কোম্পানি অত্যন্ত স্বল্প সময়ের মধ্যে পিলখানার কাছে পৌঁছায়। ব্রিগেড কমান্ডারসহ ব্রিগেডের অন্যান্য ইউনিটও ১২০০ ঘটিকার মধ্যেই পিলখানার নিকটে পৌঁছায়। কিন্তু ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেড পিলখানা এলাকায় নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেনি। গোয়েন্দা সংস্থাগুলো র‍্যাব ও পুলিশ সবাই যে যার মত কাজ করেছে। কারো সাথে কারো কোন সমন্বয় ছিলনা। এ রকম একটি অপারেশনের ক্ষেত্রে অন্য সকল বাহিনীকে সেনাবাহিনীর অপারেশনাল কমান্ডে আরোপ করা উচিত ছিল যা প্রধানমন্ত্রী করেননি। সর্বোপরি **আওয়ামী লীগ** নেতৃবৃন্দ সামরিক বাহিনীর সাথে কোন রকম সমন্বয় না করে পিলখানা থেকে হত্যাকারীদেরকে যমুনায় নিয়ে গেছেন এবং ফিরে এসেছে। পিলখানা থেকে বেশ কিছু এ্যাম্বুলেন্সে করে অনেক মানুষকে বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। আহত মানুষের ছদ্মবেশে হত্যাকারীরা পালিয়ে গেছে কি-না তা দেখার মতও কেউ ছিলনা। এরূপ চরম সমন্বয়হীনতা হত্যাকারীদেরকে তাদের কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে তাদের পরিকল্পনা মাফিক লাশ গুম করতে, আলামত ধ্বংস করতে এবং পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছে।

১০৩। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে বিদ্রোহীদের সংশ্লিষ্টতা। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পূর্ণ সমর্থন থাকায় হত্যাকারীরা তাদের পরিকল্পনা মতো হত্যাকান্ড সম্পন্ন করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। স্থানীয় আওমালী নেতা যেমন; সুবে. (অব.) তোরাব আলী, তোরাব আলীর ছেলে লেদার লিটন ও জাকির প্রমুখ বেশ কিছু মিছিল আয়োজন করতে সমর্থ হয়, যেগুলো পিলখানার ভিতরে ঢোকে এবং তাদের সাথে বেশ কিছু হত্যাকারীকে নিয়ে বের হয়ে যায়।

১০৪। হত্যাকারীদের বিশদ পরিকল্পনা। হত্যাকারীদের পরিকল্পনা ছিল বিশদ। তারা দরবারের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে অস্ত্রাগার ও ম্যাগাজিন (গোলাবারুদ রাখার স্থান)-এ হামলা চালিয়ে অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে এবং দরবারে হট্টগোল শুরু হওয়ার অব্যবহিত পরেই অস্ত্র ও গোলাবারুদ নিয়ে অফিসারদেরকে হত্যা করার জন্য সমবেত হয়। একই সাথে তারা ডিজির বাংলো এবং অফিসারদের বাসস্থানেও হামলা চালায়। ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে তারা অস্ত্রগার এবং ম্যাগাজিন লুট, বেশিরভাগ অফিসারকে হত্যা, লাশ গুম, আলামত ধ্বংস, নারী ও শিশুদেরকে জিম্মি করে নির্যাতন, সম্পদ লুট, অগ্নিসংযোগ এবং ভাংচুর করতে সক্ষম হয়।

হত্যাকান্ড ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটনকারী

১০৫। হত্যাকান্ড ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটনকারী হিসেবে বেশ কিছু বিডিআর সদস্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ ঘটনার অব্যবহিত পরে যে মামলা রুজু করা হয় তার চলমান বিচারকার্যে ইতোমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশন কর্তৃক সাজা প্রদান করা হয়েছে। সাজা প্রাপ্তদের পরিসংখ্যান নিম্নরূপঃ

ক। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায়। ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, বিজ্ঞ অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ, তৃতীয় আদালত, ঢাকা গত ০৫/১১/২০১৩ খ্রি. অত্র মামলার রায় ঘোষণা করেন। রায়ে বিজ্ঞ আদালত ১৫২ জন আসামিকে মৃত্যুদন্ড, ১৬০ জন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ২৫৬ জন আসামিকে অন্যান্য মেয়াদে কারাদন্ড, মোট ৫৬৮ জনকে সাজা প্রদান করেন। রায়ে বিজ্ঞ আদালত ২৭৮ জন আসামিকে খালাস প্রদান করেন। বিচারকালীন ৪ জন আসামী মৃত্যুবরণ করেন।

খ। **বিজ্ঞ আপিল আদালতের রায়**

(১) **মৃত্যুদন্ড।** সিআইডি হতে প্রাপ্ত বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায়ের কপি এবং বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর স্মারক নং-৪৪.০২.১২০৫.০০৪. ০৩.০৬.২৫/৩৭০ তারিখ-১৬/১১/২০২৫ খ্রি. মূলে প্রাপ্ত তথ্য বিবরণী পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ১৫২ জন আসামির মধ্যে বিজ্ঞ আপিল আদালত ১৩৯ জন আসামির মৃত্যুদন্ড বহাল রাখেন, ০৮ জন আসামিকে সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন এবং ০৪ জন আসামিকে খালাস প্রদান করেন। আপিল আদেশের পূর্বেই মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ০১ জন আসামি মৃত্যুবরণ করেন।

(২) **যাবজ্জীবন কারাদন্ড।** বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত ১৬০ জন আসামির মধ্যে বিজ্ঞ আপিল আদালত ১৪৬ জন আসামির সাজা বহাল রাখেন এবং ১২ জন আসামিকে খালাস প্রদান করেন। বিচারিক আদালতে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত ০৮ জন আসামিকে আপিল আদালত সাজা কমিয়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ৩১ জন খালাস প্রাপ্ত আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করা হয়। আপিল আদালত সর্বমোট (১৪৬+৮+৩১)=১৮৫ জন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রদান করেন। আপিল আদেশের পূর্বেই যাবজ্জীবন কারাদন্ডপ্রাপ্ত ০২ জন আসামি মৃত্যুবরণ করেন।

(৩) **অন্যান্য মেয়াদে কারাদন্ড।** বিজ্ঞ বিচাররিক আদালত ২৫৬ জন আসামিকে অন্যান্য মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করেন। বিজ্ঞ আপিল আদালত ২২৪ জন আসামির অন্যান্য মেয়াদে সাজা বহাল রাখেন, ৪৫ জন আসামিকে খালাস প্রদান করেন। বিচারিক আদালতে খালাস প্রাপ্ত ৪ জন আসামির প্রত্যেককে ৭ বছর কারাদন্ড প্রদান করেন। আপিল আদালত সর্বমোট (২২৪+৪)=২২৮ জন আসামিকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান করেন। আপিল আদেশের পূর্বেই বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ডপ্রাপ্ত ৩ জন আসামি মৃত্যুবরণ করেন।

(৪) **খালাস প্রদান।** বিজ্ঞ বিচারিক আদালত ২৭৮ জন আসামিকে খালাস প্রদান করেন। বিজ্ঞ আপিল আদালত ২৩৮ জন আসামির খালাস আদেশ বহাল রাখেন, ৩১ জন আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং ৪ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে করাদন্ড প্রদান করেন। পক্ষান্তরে, বিচারিক আদালত কর্তৃক মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত ৪ জন, যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্ত ১২ জন এবং বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রাপ্ত ২৯ জন, মোট (৪+১২+২৯)= ৪৫ জন আসামিকে আপিল আদালত খালাস প্রদান করেছেন। আপিল আদালত সর্বমোট (২৩৮+৪৫)=২৮৩ জন আসামিকে খালাস প্রদান করেছেন।

১০৬। তবে এ ঘটনা সংঘটনের জন্য যারা ষড়যন্ত্র ও পরিকল্পনায় ছিলেন এবং যারা সহায়তা করেছেন তাদের সকলকে বিচারের আওতায় আনা হয়নি। ঘটনার দিন বিশেষ করে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া বিডিআরে কর্মরত সেনা অফিসারদের বিরুদ্ধে অবাঞ্চিতভাবে বিষোদগার করতে থাকে যা হত্যাকারী বিডিআর সদস্যদেরকে সেনা অফিসারদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে হত্যা করতে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করেছে। ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপারে কমিশনের মতামতের ৯৬ নম্বর স্তবকে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১০৭। পূর্ববর্তী তদন্তসমূহে এবং চলমান তদন্তের বেশ কিছু বিডিআর সদস্যকে ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারী হিসেবে নিম্নবর্ণিত বিডিআর সদস্যদের নাম বার বার এসেছেঃ

ক। ডিএডি তৌহিদ-এমটিও সদর ব্যাটালিয়ন।
খ। ডিএডি জলিল-বিডিআর হাসপাতালের কোয়ার্টার মাষ্টার।
গ। ডিএডি নাসির।
ঘ। সিপাহী সেলিম-৪৪ রাইলেফ ব্যাটালিয়ন।
ঙ। সিপাহী মঈন-১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়ন।
চ। সিপাহী কাজল-৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন।

ছ। ল্যাঃ নাঃ একরাম-২৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন।
জ। সিপাহী মাসুদ-১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়ন।
ঝ। সিভিল জাকির (অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার কাঞ্চন এর ছেলে)।
ঞ। সিপাহী রেজাউল-সদর ব্যাটালিয়ন আরপি।
ট। সিপাহী মেহেদী-৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন।
ঠ। সিপাহী রুবেল- ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন।
ড। সিপাহী আতাউর- সদর ব্যাটালিয়ন।
ঢ। হাবিলদার মনির-রেকর্ড উইং।
ণ। ল্যাঃ নাঃ তারেক-২৪ রাইফেল ব্যাটালিয়ন।
ত। সিপাহী সাজ্জাদ-১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়ন।

১০৮। তবে হত্যাকারী হিসেবে মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড ও অন্যান্য মেয়াদে সাজা প্রাপ্ত বিডিআর সদস্য ছাড়াও কিছু বহিরাগত ও ভিন দেশী মানুষের কথা বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্যে এসেছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর মধ্যে ভারতের পাসপোর্টধারী এবং বিদেশী পাসপোর্টধারী ৮২৭ জন আগামনকারীর মধ্যে ৬৫ জনের বহির্গমনের তথ্য পাওয়া যায়নি। অপরদিকে, একই সময়ে ১২২১ জন বহির্গমনকারীর মধ্যে ৫৭ জনের আগমনের তথ্য পাওয়া যায়নি। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিডিআর হত্যাকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত বলে প্রতীয়মান হয়।

<u>হত্যাকান্ডে সহায়তাকারী</u>

১০৯। হত্যাকান্ডে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিরা ছাড়াও আরও কিছু ব্যক্তিত্ব হত্যাকান্ডের বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে অবগত থেকে হত্যাকারীদেরকে প্রত্যক্ষভাবে হত্যাকান্ডে ইন্ধন যুগিয়েছে এবং কিছু ব্যক্তিত্ব পরোক্ষভাবে হত্যাকান্ডে সহায়তা করেছে। এদের মধ্যে বিডিআর হত্যাকান্ড ছাড়াও কিছু ব্যক্তিত্ব আছেন যারা ব্যারিস্টার তাপস হত্যা চেষ্টা ঘটনায় অন্যায় ভাবে কিছু সামরিক অফিসারকে ফাঁসিয়েছেন এবং তাদের উপর অমানবিক অত্যাচার করেছেন। এদের মধ্যে যেমন আওয়ামী লীগ ব্যক্তিত্ব আছেন তেমনি আছেন সশস্ত্র বাহিনী, বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থা এবং পুলিশ বাহিনীর প্রাক্তন সদস্য।

১১০। <u>আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ</u>

ক। <u>শেখ হাসিনা</u>। সাক্ষ্য মতে শেখ হাসিনার গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার পরেই হত্যা-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শুরু হয়। শেখ হাসিনা তথাকথিত বিদ্রোহ শুরু হওয়ার পরপরই তা জানতে পারেন। ডিজি বিডিআর নিজে তার সাথে মোবাইল ফোনে কথা বলেন এবং তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি সামরিক সাহয্য প্রেরণের আশ্বাস দেওয়ায় অফিসাররা নিজেদেরকে বাঁচানোর কোন চেষ্টা করেনি। তার উচিত ছিল তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে সেনাবাহিনীকে নিয়োজিত করা। কিন্তু তিনি তা না করে আওয়ামী লীগের কিছু অনভিজ্ঞ নেতাকে রাজনৈতিকভাবে সমাধানের দায়িত্ব দেন। বাহিনীর প্রধানদের যে সময় তাদের সদর দপ্তরে অবস্থান করে সামরিক অভিযান পরিচালনার দিক নির্দেশনা দেওয়ার কথা, এ রকম এক গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি ৩ বাহিনীর প্রধানকে তার বাসভবন যমুনায় ডেকে বসিয়ে রাখেন। ডিজিকে হত্যা করা হয়েছে এ খবরটি এটিএন বাংলার দুপুর ১৪০০ ঘটিকার খবরে প্রচার করা হয়। কামরাঙ্গিরচর থেকে দুপুর ১৪৩০ ঘটিকায় দুইজন অফিসারের লাশ উদ্ধার করা হয়। এসব সংবাদ জানার পরেও তিনি বিকাল ১৬০০ ঘটিকায় হত্যাকারীদের প্রতিনিধি দলের সাথে বৈঠকে তাদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, রাষ্ট্রপতি যে কোনো আদালতের দেওয়া দন্ড ক্ষমা, বিলম্ব বা হ্রাস করতে পারেন। তিনিও এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শক্রমে। এখানে সাধারণ ক্ষমার বিষয়টি নেই। সংবিধান অনুসারে, প্রধানমন্ত্রীর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার কোন ক্ষমতা নেই। তিনি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার জন্য মন্ত্রী পরিষদের কোন অনুমোদন নিয়েছেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রাষ্ট্রপতিকে এই মর্মে কোন পরামর্শ দেয়া হয়েছে, তারও কোন প্রমাণ নেই। সুতরাং, বলা যায়, প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সাধারণ ক্ষমা ঘোষণ ছিল অবৈধ, প্রতারণামূলক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। হত্যাকারীদের অযৌক্তিক দাবি মেনে তিনি সেনাবাহিনীকে পিছু হটার নির্দেশ দেন। তার এসব কর্মকান্ডের

মাধ্যমে তিনি হত্যাকান্ড, লাশ গুম, আলামত ধ্বংস, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ, নারী ও শিশুদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করতে এবং হত্যাকারীদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। দীর্ঘ ৩৬ ঘন্টা তার নির্দেশে রাজনৈতিক সমঝোতার নাটক করা হয়েছে, ফলে হত্যাকারী ও বিদ্রোহীরা নির্বিঘ্নে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে। তারা পালিয়ে যাওয়ার পরই প্রথমে পুলিশকে ও পরবর্তীতে সেনাবাহিনীকে পিলখানায় প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই ষড়যন্ত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত না থাকলে উপর্যুক্ত কর্মকান্ড চালানো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। এই ষড়যন্ত্রে ও হত্যাকান্ডে যুক্ত হওয়ার জন্য নিম্নবর্ণিত সাক্ষ্য ও দলিলভিত্তিক কারণগুলো সহায়ক হয়েছেঃ

(১) ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তৎকালীন কিছু সেনা সদস্য শেখ হাসিনার পিতা তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রতি শেখ মুজিবুর রহমানসহ তার পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যকে হত্যা করে। সে হত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য শেখ হাসিনা এই ষড়যন্ত্রের কুশীলব হিসাবে ছিলেন। জনাব গোলাম রেজা, প্রাক্তন এমপি, তার সাক্ষ্যে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি বিডিআর বিদ্রোহের পর এক সময় শেখ হাসিনাকে বলেন, 'আপনি তো বিডিআর এবং সেনা বাহিনীকে ধ্বংস করে দিলেন।' উত্তরে শেখ হাসিনা বলেন যে, 'তারা আমার পিতা ও পরিবারের অন্য সদস্যদের হত্যা করেনি?' শেখ হাসিনা তার পিতৃ হত্যার প্রতিশোধ নিতে রাজনৈতিতে যোগদান করেছিলেন বলেও সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

(২) ১/১১ এর সেনা সমর্থিত সরকার শেখ হাসিনা ও তার দলের কিছু নেতাকে বন্দী করে একাধিক মামলা দেয়। সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সেসবের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যও তিনি এই ষড়যন্ত্রের কুশীলব হিসেবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকতে পারেন।

(৩) বিডিআর হত্যাকান্ডের পর যে ০২টি তদন্ত কমিটি/আদালত গঠিত হয় তার কোনটিকেই সরকার থেকে প্রকৃত দিক নির্দেশনা দেয়া হয়নি এবং সরকার সহযোগিতা করেনি। বরং ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে তদন্তকে প্রভাবিত করা হয়েছে। সরকার তদন্ত কমিটি/আদালতগুলোকে ঠিক মত কাজ করতে দিলে তখনই এই হত্যাকান্ডের সঠিক কারণ উদঘাটন ও দোষীদের বিচার সম্পন্ন করা সম্ভব হতো। এই ঘটনার কুশীলব না হলে সরকার তদন্ত কমিটি/আদালতগুলোকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করতো।

(৪) এই হত্যাকান্ডের আগাম তথ্য প্রদানে গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি। সেনা বাহিনীর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরাও তাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেননি। যার ফলে ৫৭ জন সেনা অফিসারসহ ৭৪ জন নৃশংসভাবে খুন হয়। অথচ এই ব্যর্থতার জন্য কাউকেই দায়ী করা হয়নি বা কারো বিরুদ্ধে সামান্যতম শাস্তিমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়নি। অপর দিকে যাদের ব্যর্থতায় এই হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে তাদের পুরস্কৃত করা হয়েছে এবং বাধা দানকারীদেরকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সরকার প্রধান নিজেই যদি এই হত্যাকান্ডের কুশীলব না হতেন, তাহলে অবশ্যই ব্যর্থতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকে শাস্তির আওতায় আনতেন।

(৫) বিডিআর সপ্তাহের তারিখ ৪ বার পরিবর্তন হয় এবং সর্বশেষে প্রথম নির্ধারিত তারিখে তা অনুষ্ঠিত হয়। কাকতালীয় হলেও ১৬ ফেব্রুয়ারি ষড়যন্ত্রকারীদের বৈঠকের পরদিনেই বিডিআর সপ্তাহের চূড়ান্ত তারিখ নির্ধারিত হয়। সম্ভবত হত্যাযজ্ঞের প্রস্তুতির সাথে এই তারিখ বদলের বিষয়টি সম্পৃক্ত। শেখ হাসিনাকে অত্র কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(ক) ষড়যন্ত্রকারী
(খ) রাষ্ট্রদ্রোহী
(গ) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির সম্মুখীন করা
(ঘ) হত্যা, লাশগুম, নারী ও শিশু নির্যাতন, আলামত ধ্বংস, অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট, ব্যক্তিগত সম্পদ লুট এবং অপরাধীদের পলায়নে সহায়তাকারী
(ঙ) ইন্ধনদাতা

(চ) ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা

(ছ) জাতির কাছে সত্য গোপন করা

(জ) হত্যাকান্ডসহ সংঘটিত অপরাপর অপরাধ প্রতিরোধে সামরিক অভিযানে বাধা এবং অন্যান্য বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রাখা

(ঞ) মিডিয়ার অপপ্রচার নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ না দিয়ে অপপ্রচারকে সমর্থন করা

(ট) রুলস অভ্ বিজনেস না মানা

(ঠ) অস্ত্র সমর্পণ প্রহসনের নির্দেশ দেয়া

(ড) হত্যাকারীদের অবৈধভাবে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা

(ঢ) দলীয় লোকদের মাধ্যমে বিদ্রোহ সমন্বয় করানো

(ণ) দলীয় আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদেরকে তদন্ত কমিটি/আদালতে নিয়োগ দিয়ে ফরমায়েশি তদন্ত পরিচালনা করা

(ত) সেনাবাহিনীর শৌর্য বীর্যকে ভুলুন্ঠিত করা

(থ) কমিশনে সাক্ষ্য না দিয়ে তদন্ত কাজে অসহযোগিতা করা।

খ। <u>এডভোকেট সাহারা খাতুন</u>। ঘটনার সময় এডভোকেট সাহারা খাতুন বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। ঘটনার পূর্বে বিপথগামী বিডিআর সদস্যরা তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং সিপাহী সেলিম তার সাথে টেলিফোনে কথা বলেছে। সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে আসীন থাকা সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেননি। বিডিআর তার মন্ত্রণালয়ের একটি আইন শৃঙ্খলা বাহিনী হওয়া সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়টি বিডিআরের ডিজিকে জানিয়েছেন এরূপ কোন প্রমাণ নেই। ঘটনার দিন তিনি তার অধীনস্ত পুলিশ ও র‌্যাবকে এই হত্যাকান্ড প্রতিরোধে নিয়োগ করেননি। এমনকি হত্যাকারী বিডিআর সদস্যরা যেন পালিয়ে যেতে না পারে সে জন্যও পুলিশ বা র‌্যাব কে কার্যকরভাবে নিয়োগ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। রাজনৈতিক সমাধানের নাম নিয়ে তিনি সময় ক্ষেপণ করে অফিসারদেরকে হত্যার সুযোগ করে দিয়েছেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ মধ্যরাতে তিনি অস্ত্র সমর্পণের নাটক করে দেশবাসীকে ধোঁকা দিয়েছেন এবং হত্যাকারীদেরকে সময় করে দিয়েছেন। উপরিউক্ত বিষয়াবলী বিবেচনায় নিয়ে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে হয় তিনি নিজে অফিসার হত্যার ষড়যন্ত্রে যুক্ত ছিলেন এবং তিনি তার কর্মকান্ড দ্বারা ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে সহমর্মিতা প্রদর্শন করেছেন। হত্যাকারীদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার বিষয়টি তার কাছে থেকেই এসেছে। বিদ্রোহীদেরকে ইন্ধন দেওয়ার পাশাপাশি তিনি হত্যাকারীদেরকে নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়েছেন। বিডিআরকে ধ্বংস ও দলীয় বাহিনী করার অভিপ্রায়ে ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসকে ডিজি বিডিআর করার প্রস্তাব দিয়েছেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি রাতে পিলখানার কেন্দ্রীয় কোয়ার্টার গার্ডে গিয়ে অস্ত্র সমর্পণের নাটক করা সময় অসংখ্য পরিবার কোয়ার্টার গার্ডে জিম্মি অবস্থায় থাকলেও তিনি তাদেরকে উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা না নিয়ে হত্যাকারীদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি এই হত্যাকান্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এডভোকেট সাহারা খাতুনকে অত্র কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ষড়যন্ত্রকারী

(২) হত্যা, লাশগুম, নারী ও শিশু নির্যাতন, আলামত ধ্বংস, অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট, ব্যক্তিগত সম্পদ লুট এবং অপরাধীদের পলায়নে সহায়তাকারী

(৩) ইন্ধনদাতা

(৪) ঘটনাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা

(৫) জাতির কাছে সত্য গোপন করা

(৬) হত্যাকান্ডসহ সংঘটিত অপরাপর অপরাধ প্রতিরোধে সামরিক অভিযানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি এবং অন্যান্য বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রাখা

(৭) অস্ত্র সমর্পণের নামে প্রহসনের নেতৃত্ব দেয়া

(৮) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ রাতে কয়েকটি পরিবারকে উদ্ধার করে বাকিদেরকে হত্যাকারীদের হাতে ছেড়ে দেয়া

(৯) হত্যাকারীদের সাধারণ ক্ষমা সমর্থন করা।

গ। **ব্যারিস্টার ফজলে নুর তাপস।** ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস ২০০৮ এর নির্বাচনের পূর্ব হতেই হত্যাকারীদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করেছেন এবং পিলখানার ভিতরে ছোট পরিসরে জনসভাও করেছেন। হত্যাকারীদের একটি দল তার সাথে প্রায়ই তার চেম্বারে দেখা করে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা করে। বিদ্রোহীদের দ্বারা অফিসার হত্যার ব্যাপারে তার অনুমোদন ছিল। ঘটনার দিন জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক ও জনাব মির্জা আজম যখন বিডিআর সৈনিকদের সাথে রাজনৈতিক সমাধানের প্রহসনের জন্য যায়, তখন বিডিআরের সৈনিকরা ব্যারিস্টার তাপসকে খুঁজছিল। সুবেদার গোফরান মল্লিকের কথায় উঠে এসেছে যে ব্যারিস্টার তাপসকে বিডিআরের ডিজি করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুনের প্রস্তাব ছিল। ব্যারিস্টার তাপস বিডিআর সৈনিকদের পরিকল্পনা সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবগত হলেও এ বিষয়ে বিডিআরের ডিজিকে কোন কিছুই জানানো হয়নি বলে প্রতীয়মান। ঘটনার দিন হত্যাকারীরা যমুনায় গিয়ে বৈঠক করে বের হবার পর যে সংবাদ সম্মেলন হয় সেখানে ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস হত্যাকারীদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলীকে নির্দেশ দেন এলাকার মসজিদের মাইকে ঘোষণা দিয়ে পিলখানার চারিদিকের ৩ কিমি. এলাকা খালি করে দিতে। এই সুযোগে হত্যাকারীরা পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। সিপাহী মুহিত ও সিপাহী সাজ্জাদের ভাষ্যমতে জনাব তাপস ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দার নূরকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানা হতে বের করে নিয়ে যান। তিনি র‍্যাবের টিএফআই সেলে উপস্থিত হয়ে তদন্ত প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন বলেও সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। জনাব ফজলে নূর তাপসকে অত্র কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী স্যাবস্ত করেঃ

(১) ষড়যন্ত্রকারী
(২) হত্যার অনুমোদন
(৩) হত্যা, লাশগুম, নারী ও শিশু নির্যাতন, আলামত ধ্বংস, অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট, ব্যক্তিগত সম্পদ লুট এবং অপরাধীদের পলায়নে সহায়তাকারী
(৪) ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন সমন্বয় করা
(৫) হত্যাকরীদের সমর্থনে মিছিল সংগঠন করা
(৬) তদন্ত ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা
(৭) হত্যাযজ্ঞ চলাকালে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ এবং পলায়নে সহায়তা
(৮) ইন্ধনদাতা
(৯) কমিশনে সাক্ষ্য না দিয়ে তদন্ত কাজে অসহযোগিতা
(১০) হত্যাকান্ডসহ সংঘটিত অপরাপর অপরাধ প্রতিরোধে সামরিক অভিযানে বাধা
(১১) সত্য গোপন করা
(১২) সামরিক অফিসার অপহরণ
(১৩) সাক্ষীদের নির্যাতন
(১৪) কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্রোহের তথ্য গোপন।

ঘ। **শেখ ফজলুল করিম সেলিম**। একাধিক বিডিআর সদস্য ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ শেখ সেলিমের সাথে তার বাসায় সাক্ষাৎ করে। তিনি সেনা অফিসারদেরকে জিম্মি করার জন্য বিডিআর সদস্যদেরকে উপদেশ দেন এবং পরবর্তী করণীয় তারা করবেন বলে জানান। তিনি আরো বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে গ্রিন সিগন্যাল পেলে তাদেরকে জানাবেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে তিনি সিপাহী মইনুদ্দিন টেলিফোন করে জানান যে, প্রধানমন্ত্রীর নিকট থেকে গ্রিন সিগন্যাল পাওয়া গেছে। জনাব শেখ সেলিমকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষীঃ

(১) ষড়যন্ত্রকারী
(২) হত্যার সবুজ সংকেত প্রদান
(৩) সত্য গোপন করা
(৪) ইন্ধনদাতা
(৫) কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্রোহের তথ্য গোপন
(৬) কমিশনে সাক্ষ্য না দিয়ে তদন্ত কাজে অসহযোগিতা
(৭) হত্যাকারীদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সমর্থন করা।

ঙ। **<u>জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজম</u>।** বিদ্রোহের পূর্বে জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানকের সাথে বিদ্রোহীদের সাক্ষাৎ হয়েছে বলে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। ঘটনার দিন তিনি এবং জনাব মির্জা আজম একটি সাদা কাপড় দেখিয়ে পিলখানার ভিতরে প্রবেশ করেন। হত্যাকারীদের সাথে তাদের পূর্ব হতেই যোগাযোগ না থাকলে এত সহজে ভিতরে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে কোনমতেই সম্ভব হতো না। বরং সাদা পতাকা একটি সংকেত হিসেবেই ব্যবহৃত হয়েছে বলে প্রতীয়মান হয়। ২৫ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১৪০০ ঘটিকার সময় জনাব গোলাম রেজা (প্রাক্তন এমপি) জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক ও জনাব মির্জা আজমকে ডিজির বাংলোর সম্মুখে দেখেন এবং তাদেরকে ডিজির বাসার ভিতরের লাশ দেখানো হয়। তার পরপরই জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক ও জনাব মির্জা আজম দরবার হলে গিয়ে ডিজিসহ অনেক অফিসারের লাশ দেখেন। অথচ বিকেল ১৫৪০ ঘটিকায় বিডিআরের প্রতিনিধি দলকে যমুনায় নিয়ে যাওয়ার পর এ বিষয়টি তারা সম্পূর্ণ গোপন করেন। ডিজিসহ অন্যান্য অফিসারদের হত্যার বিষয়টি জ্ঞাত হওয়ার পরও রাজনৈতিক সমাধানের নামে তারা ইচ্ছাপূর্বক সময় ক্ষেপণ করেছেন এবং সামরিক অভিযান পরিচালনা করতে দেননি। এতে এ বিষয়টি অত্যন্ত স্পষ্ট যে হত্যাকান্ডের বিষয়টি তারা পূর্ব হতে জানতেন এবং সামরিক অপারেশন পরিচালনা করতে না দিয়ে তারা হত্যাকান্ডে এবং হত্যাকারীদের পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন। পিলখানার ভিতরে এ্যাম্বুলেন্স পাঠানো এবং বের করার মাধ্যমে হত্যাকারীদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জনাব নানক হত্যাকারীদের সাধারণ ক্ষমার বিষয়টি ঘোষণা করেছিলেন। তাদের সামনেই হত্যাকারীদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। সুতরাং জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক ও জনাব মির্জা আজম এ ষড়যন্ত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জাহাঙ্গীর কবির নানক ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে লাশ উদ্ধারের সময় দাঁড়িয়ে কিছু নোট করছিলেন এবং সেখান থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের কাছে তথ্য পাঠাচ্ছিলেন। এছাড়াও ২৭ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সাথে এক বৈঠকে হত্যাকারীদের কিছু হবে না বলে আশ্বস্ত করেন। জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক ও জনাব মির্জা আজমকে অত্র কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ষড়যন্ত্রকারী
(২) সামরিক অভিযান পরিচালনায় বাধা
(৩) হত্যাকারীদের পালিয়ে যেতে সহায়তা করা
(৪) সত্য গোপন
(৫) অবৈধ সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার প্রেক্ষাপট তৈরি করা
(৬) হত্যাকারীদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা সমর্থন করা
(৭) হত্যা, লাশগুম, নারী ও শিশু নির্যাতন, আলামত ধ্বংস, অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট, ব্যক্তিগত সম্পদ লুট এবং অপরাধীদের পলায়নে সহায়তাকারী
(৮) হত্যাযজ্ঞ চলাকালে বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ এবং পলায়নে সহায়তা
(৯) ইন্ধনদাতা
(১০) প্রহসনমূলক অস্ত্র সমর্পনে সহায়তা
(১১) হত্যাকান্ডসহ সংঘটিত অপরাপর অপরাধ প্রতিরোধে সামরিক অভিযানে বাধা
(১২) কর্তৃপক্ষের কাছে বিদ্রোহের তথ্য গোপন
(১৩) ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন সমন্বয় করা

চ। **<u>মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম</u>**। তৎকালীন প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ কামরুল ইসলামকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) প্রহসনমূলক অস্ত্র সমর্পণে সহায়তার মাধ্যমে হত্যাযজ্ঞ, নারী ও শিশু নির্যাতনসহ অপরাপর অপরাধ সংঘটনের সুযোগ করে দেয়া
(২) ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহায়তা
(৩) ইন্ধনদাতা
(৪) হত্যাকান্ডসহ সংঘটিত অপরাপর অপরাধ প্রতিরোধে সামরিক অভিযানে বাধা

(৫) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ রাতে কয়েকটি পরিবারকে উদ্ধার করে বাকিদেরকে হত্যাকারীদের হাতে ছেড়ে দেয়া

ছ। **ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল এবং মাহবুব আরা গিনি**। এই দুই জন প্রাক্তন এমপি ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে স্বপ্রণোদিত হয়ে পিলখানায় বিডিআর সদস্যদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য ৪ নং গেইটের কাছে যান। তারা ৪ নং গেইটের নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে হত্যাকারীরা গুলি করা বন্ধ করে দেয় এবং তারা নির্ভয়ে বিনাবাধায় সামনে দিকে অগ্রসর হয়। ষড়যন্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট না হলে এবং পূর্ব থেকে যোগযোগ না থাকলে হত্যাকারীরা গুলি করা বন্ধ করতো না। ২৬ ফেব্রুয়ারি বিকালে হত্যাকারীদের সাথে বৈঠকের নামে তারা সামরিক অভিযান পরিচালনা বাধাগ্রস্ত করেছেন। কমিশন তাদেরকে নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যাস্ত করছেঃ

(১) অবৈধ সাধারণ ক্ষমার প্রেক্ষাপট তৈরি
(২) সামরিক অভিযান পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
(৩) হত্যা, লাশগুম, নারী ও শিশু নির্যাতন, আলামত ধ্বংস, অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট, ব্যক্তিগত সম্পদ লুট এবং অপরাধীদের পলায়নে সহায়তার মাধ্যমে ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহায়তা করা
(৪) সত্য গোপন করা
(৫) কমিশনের তদন্ত কাজে অসহযোগিতা (ওয়ারেসাত হোসেন বেলালের শুধু তার জন্য)

জ। **আসাদুজ্জামান নুর**। জনাব আসাদুজ্জামান নূরকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) সামরিক অভিযান পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি।

ঝ। তানজীম আহমেদ সোহেল তাজ। সিপাহী সেলিমের ভাষ্য অনুযায়ী ২০/২১ জানুয়ারি সেলিমরা জনাব শেখ সেলিমের বাসা হতে চলে যাওয়ার পর জনাব তানজীম আহমেদ সোহেল তাজ এর নেতৃত্বে বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার লোকজন ও জনাব শেখ সেলিমের নিজস্ব কিছু লোকজন নিয়ে বিডিআর সংক্রান্ত একটি মিটিং হয়। জনাব সোহেল তাজ তখন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হিসেবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ঘটনার দিন তিনি বিদেশে ছিলেন দাবি করলেও এরকম একটা ঘটনা যে ঘটবে সে বিষয়ে তিনি জ্ঞাত ছিলেন। বিডিআরের ক্লোদিং স্টোর থেকে নয় থান ইউনিফর্মের কাপড় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জনাব সোহেল তাজের নিকট পাঠানো হয়েছে বলে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। সুতরাং তিনিও ষড়যন্ত্রের অন্যতম অংশীদার। জনাব তানজীম আহমেদ সোহেল তাজকে অত্র কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ষড়যন্ত্র।
(২) দেশ ও জাতির কাছে সত্য লুকানো।
(৩) **দায়িত্বহীনতা**

ঞ। মেজর জেনারেল তারেক আহমেদ সিদ্দিক (অব.)। ২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর মেজর জেনারেল তারেক আহমেদ সিদ্দিককে নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। ঘটনার শুরু থেকেই মেজর জেনারেল তারেক সেনা অভিযান চালানোর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে অফিসারদেরকে হত্যার সুযোগ করে দেন। র‍্যাব যখন পিলখানায় প্রবেশের অনুমতি চায় তখন তিনি এবং মরহুম মেজর জেনারেল আবেদীন (তৎকালীন ডিজি, এসএসএফ) তাতে বাধা দেন। পিলখানার বাইরে সামরিক বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে তিনি একটি 'প্যারালাল কমান্ড' প্রতিষ্ঠা করেন। পিলখানার হত্যাযজ্ঞ প্রতিরোধ করার চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর বাস ভবন যমুনায় নিরাপত্তা রক্ষা করা তার কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তৎকালীন পিএসও এএফডি লে. জেনারেল মুবীনকে তিনি সামরিক অভিযান পরিচালনা না করতে আদেশ দেন। তিনি একাধিকবার টেলিফোন ৯ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল আসহাবকে নির্দেশ দেন কোনভাবেই তার ডিভিশন থেকে ট্যাঙ্ক যেন ঢাকায় না আসতে পারে। তিনি একাধিকবার ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল হাকিম আজিজকে সেনা অভিযান পরিচালনা না করার

জন্য নির্দেশ দেন। মেজর ওয়াকার পিলখানার গেইটের কাছাকাছি চলে আসার পরে তিনি তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করেন। তার নির্দেশেই সেনাবাহিনী পিলখানার গেটের কাছ থেকে তাদের অবস্থান পরিত্যাগ করে পিছনে চলে আসে। হত্যাকরীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় তার সম্মতি ছিল। তিনি সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন কর্মকর্তা হয়েও সেনা অফিসারদেরকে হত্যা প্রতিরোধ করতে সেনা অভিযান চালানোর ব্যাপারে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীকে কোন রকমের উপদেশ দিয়েছিলেন বা অনুরোধ করেছিলেন বলে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তিনি এই ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত। মেজর জেনারেল তারেক আহমেদ সিদ্দিক (অব.) কে অত্র কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) সমান্তরাল কমান্ড প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামরিক বাহিনীর কমান্ড চ্যানেল অকার্যকর করা
(২) সামরিক অভিযানে বাধা দিয়ে হত্যা, লাশগুম, নারী ও শিশু নির্যাতন, আলামত ধ্বংস, অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট, ব্যক্তিগত সম্পদ লুট এবং অপরাধীদের পলায়নে সহায়তাকারী
(৩) হত্যাকারীদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার বিরুদ্ধে কোনো ভূমিকা না রাখা
(৪) সত্য গোপন করা
(৫) হত্যাকান্ডসহ সংঘটিত অপরাপর অপরাধ প্রতিরোধে সামরিক অভিযানে বাধা এবং অন্যান্য বাহিনীকে নিষ্ক্রিয় রাখা
(৬) তদন্ত প্রক্রিয়ায় অবৈধ হস্তক্ষেপ
(৭) সাক্ষ্য না দিয়ে কমিশনের তদন্ত কাজে অসহযোগিতা

ট। **শাহীন সিদ্দিক (স্বামী-মেজর জেনারেল তারেক আহমেদ সিদ্দিক)**। শাহীন সিদ্দিককে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) তদন্ত কাজে বাধা
(২) শহীদ পরিবারের সদস্যদেরকে হুমকি দেয়া

ঠ। **লে. কর্নেল ফারুক খান (অব.)**। লে. কর্নেল ফারুক খানকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহকারী
(২) তদন্ত প্রক্রিয়ায় অবৈধ হস্তক্ষেপ

ড। **মতিয়া চৌধুরী**। মতিয়া চৌধুরীকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) সামরিক অভিযান পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
(২) ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার প্রচেষ্টা

ঢ। **মেহের আফরোজ চুমকি**। মেহের আফরোজ চুমকিকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) সামরিক অভিযান পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি
(২) অবৈধ সাধারণ ক্ষমার প্রেক্ষাপট তৈরি

ণ। **তোরাব আলী**। তোরাব আলীকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ষড়যন্ত্র
(২) বিদ্রোহী ও হত্যাকারীদের সাথে সমন্বয়
(৩) ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহায়তা

ত। **লেদার লিটন (তোরাব আলীর পুত্র)**। লেদার লিটনকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ষড়যন্ত্র
(২) বিদ্রোহী ও হত্যাকারীদের সাথে সমন্বয়
(৩) ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহায়তা
(৪) বিদ্রোহী ও হত্যাকারীদের সমর্থনে মিছিল সংগঠন, মিছিল নিয়ে পিলখানায় অনুপ্রবেশ এবং হত্যাকারীদের পলায়নে সুযোগ করে দেয়া
(৫) তদন্ত কাজে সহায়তা না করা।

থ। **মেজর আব্দুল হাফিজ (অব.) (২৬ লং কোর্স)**। মেজর হাফিজ ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর পূর্বে বেশ কয়েক শুক্রবার পিলখানার ভিতরে অফিসার মেসের পার্শ্বের অফিসার বাসস্থানের নিকট এসে ডিএডি নাসিরের সাথে দেখা করে আলাপ আলোচনা করেছেন। ঘটনা ঘটার পরপরই তিনি ডিএডি নাসিরের সাথে মোবাইলে কথা বলেছেন বলে তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন। ঘটনার দিন তিনি সারাদিন **আওয়ামী লীগ** ব্যক্তিবর্গের সাথে পিলখানার বাইরে কাটিয়েছেন। প্রহসনমূলক অস্ত্র সমর্পণ আয়োজন এবং রাজনৈতিক যোগযোগের নামে বিদ্রোহী ও হত্যাকারীদের সাথে সমন্বয়ে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তার এহেন কর্মকান্ড ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে তার গভীর যোগসাজস প্রমাণ। মেজর খন্দকার আব্দুল হাফিজকে নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ষড়যন্ত্র
(২) হত্যাকারীদের সাথে যোগসাজশ।

দ। **আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যক্রম**।

(১) পিলখানার হত্যাকান্ডের বহু পূর্বে হতেই ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন, জনাব শেখ সেলিম, জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক ও জনাব মির্জা আজম হত্যাকান্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলী বিডিআর ভিতরে ষড়যন্ত্রকারী এবং এসব **আওয়ামী লীগ** নেতার মধ্যে যোগসূত্র হিসেব কাজ করেছেন।

(২) বিডিআর হত্যাকান্ডের ঘটনাটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একক ভাবে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তবে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় উপস্থিত থেকে এ সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছেন। এই সিদ্ধান্তের পরিপেক্ষিতে আওয়ামী লীগের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ যথা সাহারা খাতুন, জাহাঙ্গীর কবির নানক, মির্জা আজম, মাহবুব আরা গিনি, ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, ওয়েরাসাত হোসেন বেলাল এবং আরো অনেকে রাজনৈতিক সমাধানের নাটক করে সামরিক অভিযানকে পরিচালনাকে বাধাগ্রস্ত করেছেন।

(৩) তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাহারা খাতুন, আইন প্রতিমন্ত্রী জনাব কামরুল ইসলাম এবং আরো কয়েক জন আওয়ামী লীগ নেতা ২৫ ফেব্রুয়ারি মধ্যরাতে পিলখানায় প্রহসনমূলক অস্ত্র সমর্পণ সংঘটিত করেন। তথাকথিত অস্ত্র সমর্পণ করার কিছুক্ষণ পরেই বিদ্রোহীরা আবার অস্ত্র তুলে নেয় এবং সেখানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী সাহারা খাতুন ঘোষণা করেন যে, সেনা অভিযান পরিচালনা করা হবে না। এর ফলে বিদ্রোহী ও হত্যাকারীরা অবাধে সব ধরনের অপরাধ করার বিশাল সুযোগ পায়।

(৪) ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস, জাহাঙ্গীর কবির নানক ও মির্জা আজমের নিয়ন্ত্রণে থেকে কিছু এ্যাম্বুলেন্স ২৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যার দিকে একাধিকবার পিলখানায় প্রবেশ করে এবং আহত ব্যক্তিদের ছদ্মবেশে সন্দেহভাজন হত্যাকারীদের নিয়ে বের হয়ে যায়।

(৫) ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় অসংখ্য বিডিআরের পোশাক পরিহিত কিন্তু বড় চুল ওয়ালা ব্যক্তি যাদের দেখে বিডিআর সৈনিক মনে হয়নি এমন ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতির বিষয়ে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। এসব ব্যক্তি স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা তোরাব আলী ও তার ছেলে যুবলীগ নেতা লেদার লিটনের কর্মী-অনুসারী হওয়ায় সম্ভাবনাই বেশি।

(৬) ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানার ৩, ৪ ও ৫ নং গেইটের সামনে আওয়ামী লীগের পক্ষে বেশ কয়েটি মিছিল হয়েছে। এসব মিছিলের দুই-একটি পিলখানার ভিতরে প্রবেশ করেছিল এবং বের হওয়ার সময় হত্যাকারীদের নিয়ে বের হয়েছিল বলে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। মিছিলগুলো প্রবেশ করার সময় ছোট আকারে প্রবেশ করে এবং বের হওয়ার সময় আকারে বড় হয়ে বের হয়ে আসে। মিছিল সংগঠনের দায়িত্ব ছিল তোরাব আলী ও তার ছেলে লেদার লিটনের উপরে।

(৭) স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা বিদ্রোহীদেরকে বিভিন্ন গেইটে খাবার সরবরাহ করেছে বলেও সাক্ষ্য পাওয়া গেছে।

(৮) উপরিউক্ত বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ হতে মাঠ পর্যায়ের কর্মী পর্যন্ত হত্যাকান্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত অথবা সহমর্মী ছিল।

(৯) ঘটনার পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা, বিশেষ করে শীর্ষ পর্যায়ে নেতৃবৃন্দ বিডিআর হত্যাকান্ড ধামাচাপা দেওয়া, ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা, সাক্ষীদের নির্যাতন করে তাদের পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া, সেনাবাহিনীর যে সব অফিসার পিলখানার বিডিআর হত্যাকান্ডের ন্যায় বিচার চেয়েছেন তাদের গুম, চাকরিচ্যুতি ও পদোন্নতি বঞ্চিত করে সেনাবাহিনীতে ভয়ের সংস্কৃতি তৈরি করায় প্রত্যক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন।

১১১। **<u>প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ</u>**।

ক। <u>জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ (প্রাক্তন সেনা প্রধান)</u>। সেনাপ্রধান হিসেবে জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ এর অন্যতম দায়িত্ব ছিল সেনাবাহিনীর প্রতিটি অফিসার ও সৈনিককে নিরাপত্তা প্রদান করা। তার ভাষ্যমতে সকাল নয়টার অব্যবহিত পরেই তিনি জানতে পারেন যে পিলখানায় কিছু একটা হয়েছে। তার কিছুক্ষণ পর ০৯৪৫ ঘটিকায় ডিজি বিডিআর মেজর জেনারেল শাকিল টেলিফোনে বিডিআরে ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা জানান এবং তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য সেনাবাহিনী প্রেরণ করতে অনুরোধ করেন। তিনি তৎক্ষণাৎ ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেডকে পিলখানায় যাওয়ার নির্দেশ দিলেও তাদেরকে অভিযান পরিচালনার জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা দেননি। ৪৬ পদাতিক ব্রিগেডের প্রথম দলটি ১০৪৫ ঘটিকায় পিলখানায় পৌঁছালেও আদেশের অভাবে তারা তড়িৎ আক্রমণ পরিচালনা করতে পারেনি। বরং কিছু কনিষ্ঠ অফিসার আক্রমণ পরিচালনা করতে উদ্যত হলেও তাদেরকে আক্রমণ পরিচালনায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ অপারেশন পরিচালনার ব্যাপারে সিজিএসকে কোন সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা না দিয়ে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন যমুনায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষমান থাকেন। সেনা অপারেশন পরিচালনার জন্য যে মুহূর্তে সেনা সদরে তার উপস্থিতি একান্তভাবে প্রয়োজন ছিল, সে মুহূর্তে তিনি যমুনায় গিয়ে সময় ক্ষেপণ করেছেন। অফিসারদের প্রাণ রক্ষার্থে সেনা অভিযান পরিচালনার জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে তিনি জোরালো আবেদন করেছিলেন এমন কোন প্রমাণ তিনি তার সাক্ষ্যে প্রদান করতে পারেননি। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নিয়েছে জেনেও তিনি এ বিষয়ে কোন পদক্ষেপ নেননি। বরং পিলখানায় সেনা অভিযান চালালে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করবে এবং প্রবেশ করলে আর কখনো ফেরত যাবে না এমন অদ্ভুত যুক্তি কমিশনের সামনে তুলে ধরেছেন।

দুপুর ১২০০ ঘটিকা হতে ১৪০০ ঘটিকার মধ্যে ভারতের এনডিটিভিতে ডিজি বিডিআরকে হত্যার খবর প্রচারিত হয় যা এটিএন বাংলা তাদের দুপুর ১৪০০ ঘটিকার খবরে প্রচার করে (সাংবাদিক জ ই মামুন)। দুপুর ১৪০০ হতে ১৪৩০ ঘটিকার মধ্যে পিলখানার পার্শ্বস্থ কামরাঙ্গির চরে কর্নেল মুজিব ও লে. কর্নেল এনায়েতের মৃতদেহ ভেসে উঠে। সুতরাং জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ সন্দেহাতীত ভাবেই জানতেন যে অফিসারদেরকে হত্যা করা হয়েছে এবং সময় ক্ষেপণ করলে আরো অফিসারকে হত্যা করা হবে। এই পরিস্থিতিতেও তিনি সরকারের রাজনৈতিক সমঝোতার প্রহসন এবং অবৈধ সাধারন ক্ষমাকে সমর্থন দিয়ে গেছেন। এমনকি বিডিআর সদস্যদের যে দল যমুনায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনায় বসে সে আলোচনায়ও তিনি কোনরূপ ভূমিকা রাখার চেষ্টা করেননি। বিডিআর প্রতিনিধি দলের অযৌক্তিক দাবির প্রেক্ষিতে সরকার সেনাবাহিনীকে বিডিআর সদস্যদের দৃষ্টি সীমার বাইরে সরিয়ে নেয়ার নির্দেশ দিলে তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে সে নির্দেশ পালন করেন এবং ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে প্রায় ২ মাইল পিছনে আবাহনী মাঠে সমাবেশ এলাকায় অবস্থান করতে নির্দেশ দেন। তার এ নির্দেশের ফলে যেসব ঘটনা ঘটে তা নিম্নরূপঃ

(১) হত্যাকারীরা অফিসারদের খুঁজে খুঁজে হত্যা করার সুযোগ পায়।

(২) সেনাবাহিনী পিলখানার নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণ ভাবে ছেড়ে চলে আসায় হত্যাকারীরা পিলখানা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার মহাসুযোগকে কাজে লাগায়।

(৩) পিলখানায় ইলেকট্রিসিটি বন্ধ করে দিয়ে অফিসারদের পরিবারসমূহের উপর অমানবিক নির্যাতন চালানোর সুযোগ পায়।

(৪) আবাহনী মাঠে সমাবেশ এলাকায় সমবেত হওয়ার সাথে সাথে ৪৬ স্বতন্ত্র ব্রিগেড হতে পিলখানার নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে হত্যাকারীদের এবং ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে চলে যায়।

(৫) মূল ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের পরিকল্পনা মোতাবেক সম্পূর্ণ হত্যাযজ্ঞ সম্পূর্ণ করার সুযোগ পেয়ে যায়।

জেনারেল মঈন ইউ আহমেদের উপরিউক্ত কর্মকান্ড স্পষ্টতই প্রমাণ করে যে তিনি এই হত্যাযজ্ঞের ষড়যন্ত্রের সাথে যুক্ত ছিলেন। তার এই ষড়যন্ত্রে যুক্ত থাকার পিছনে নিম্নবর্ণিত কারণগুলো সহায়ক হয়ে থাকতে পারেঃ

(১) তিনি ছিলেন ১/১১ এর রূপকার। সেনা সমর্থিত সরকারের মূলত তিনিই ছিলেন চালিকা শক্তি এবং তার অঙ্গুলি হেলনেই দীর্ঘ ২ বছর সবকিছু হয়েছে। সে সময় তিনি আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে বন্দী করেছিলেন। সুতরাং তিনি ভয়ে ছিলেন যে আওয়ামী লীগ সরকার তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবে। সে ভয়েই সরকারকে খুশি করার জন্য তিনি এই ষড়যন্ত্রে অংশ নেন।

(২) জনাব প্রনব মুখার্জী তার Coalition Years বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে জেনারেল মঈন ইউ আহমেদকে আওয়ামীলীগ সরকার রাষ্ট্রপ্রতি বানাতে রাজি হতে পারে। রাষ্ট্রপতি হওয়ার লোভেও তিনি এ ষড়যন্ত্রে সায় দিয়ে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা যায়। তবে জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ তার অনলাইন সাক্ষ্যে জনাব প্রনব মুখার্জির ভাষ্যকে সর্বৈব মিথ্যা বলে দাবি করেছেন।

(৩) **তিনি সম্ভবত সুযোগ খুঁজছিলেন পরিস্থিতির ভয়াবহতার মধ্যে পুনরায় ক্ষমতা দখল করার জন্য।**

জেনারেল মঈন ইউ আহমেদকে অত্র কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(ক) ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সমর্থন

(খ) সেনা অভিযানের মাধ্যমে বিদ্রোহ দমনের শতভাগ নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অভিযান পরিচালনা না করা

(গ) হত্যা, লাশগুম, নারী ও শিশু নির্যাতন, আলামত ধ্বংস, অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট, ব্যক্তিগত সম্পদ লুট, অপরাধীদের পলায়নে সহায়তাকারী

(ঘ) সত্য গোপন

(ঙ) হত্যাকারীদেরকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার বিরুদ্ধে কোনো ভূমিকা না রাখা

(চ) সেনাবাহিনীর মনোবলে আঘাত করা

(ছ) ব্যক্তিগত সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য বিদেশী শক্তির অনুকম্পা প্রার্থনা করা

(জ) বিডিআর বিদ্রোহ দমনে উদ্যোগী, দেশপ্রেমী ও সাহসী সেনা অফিসারদেরকে সেনাবাহিনী থেকে চাকরিচ্যুতি, সাজা প্রদান এবং পদোন্নতি বঞ্চিত করা।

খ। **ভাইস অ্যাডমিরাল জহির উদ্দীন আহম্মেদ (প্রাক্তন নৌ বাহিনী প্রধান)**। ভাইস অ্যাডমিরাল জহির উদ্দীন আহম্মেদকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপ্রধানকে সম্মত করার চেষ্টা করেছে মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

গ। **এয়ার মার্শাল এসএম জিয়াউর রহমান (প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধান)**। এয়ার মার্শাল এসএম জিয়াউর রহমানকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সাবেক প্রধানমন্ত্রী এবং সেনাপ্রধানকে সম্মত করার চেষ্টা করেছে মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি

(২) বিমান বাহিনীর হেলিকপ্টার আক্রান্ত হওয়ার পরেও প্রতি আক্রমণ না করা।

ঘ। **লে. জেনারেল সিনা ইবনে জামালী**। সেনাপ্রধানের অনুপস্থিতিতে সামরিক অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব তার উপরেই বর্তায়। কিন্তু তিনি সামরিক অভিযান পরিচালনার ব্যাপারে ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডকে সঠিক নির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কমিশন তাকে সামরিক অভিযান পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ার দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) সামরিক অভিযান পরিচালনায় উদ্যোগী না হওয়া

(২) সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সাবেক সেনাপ্রধানকে সম্মত করার চেষ্টা করেছে মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ঙ। **জেনারেল আজিজ আহমেদ।** জেনারেল আজিজ আহমেদকে অত্র কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে ঘটনা স্থলে **আওয়ামী লীগ** ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে যাওয়া

(২) বিডিআরে থাকাকালীন সময়ে স্ত্রীর মাধ্যমে নিয়োগ বাণিজ্য করা

(৩) ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায় ফাঁসানো অফিসারদেরকে নিয়ম ভঙ্গ করে ডিজিএফআই এর হাতে হস্তান্ত করা।

(৪) বিডিআর হত্যাকান্ডের মাধ্যমে সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার ধারাবাহিকতায় পরবর্তী সময়ে সেনাপ্রধান হিসেবে দেশপ্রেমী ও মেধাবী সামরিক অফিসারদেরকে চাকরিচ্যুতি, পদোন্নতি বঞ্চিত করা এবং অযোগ্য অফিসারদের রাজনৈতিক বিবেচনায় পদোন্নতি ও নিয়োগ দিয়ে সেনাবাহিনীর সক্ষমতা দুর্বল করার অপচেষ্টা।

চ। **লে. জেনারেল মোঃ মইনুল ইসলাম**। লে. জেনারেল মোঃ মইনুল ইসলামকে নিম্নেবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) তদন্ত ও জিজ্ঞাসাবাদ চলাকালে বিডিআর সদস্যদের অস্বাভাবিক মৃত্যু প্রতিরোধে ব্যর্থতা

(২) ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায় ফাঁসানো অফিসারদেরকে ডিজিএফআই এর হাতে তুলে দেয়া

(৩) সামরিক অফিসারের অধিকার লঙ্ঘন (তাপস হত্যা চেষ্টা মামলায়)

(৪) সংযুক্ত অফিসারদেরকে কোর্ট মার্শালের সময় আইনী সহায়তা প্রদান না করা (তাপস হত্যা চেষ্টা মামলায়)

(৫) ডিজিএফআই-এর কাছে হস্তান্তকৃত অফিসারদের পরিবারকে তথ্য এবং অন্যান্য সহায়তা না দেয়া (তাপস হত্যা চেষ্টা মামলায়)।

ছ। **লে. জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী।** লে. জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দীকে অত্র কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ঘটনাস্থলে গিয়ে বিদ্রোহের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের বদলে **আওয়ামী লীগ** ব্যক্তিদের সাথে একত্মতা প্রকাশ।

(২) সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ।

(৩) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

জ। **ব্রিগেঃ জেনারেল আব্দুল হাকিম আজিজ**। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দুল হাকিম আজিজকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্থ করছেঃ

(১) অপারেশনাল অর্ডার অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ না করা

(২) শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হয়েও প্রতি আক্রমণ না করা

(৩) সামরিক চেইন অভ্ কমান্ড ভঙ্গ করা

(৪) হত্যা এবং নারী ও শিশু নির্যাতনের বিষয় নিশ্চিত হওয়ার পরেও সামরিক অভিযান পরিচালনা না করে সম্পূর্ণ ব্রিগেডকে পশ্চাদপসরণের নির্দেশ দেয়া

(৫) সামরিক অভিযানের সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সাবেক সেনাপ্রধানকে সম্মত করার চেষ্টা করেছে মর্মে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

ঝ। **ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শামসুল আলম চৌধুরী**। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শামসুল আলম চৌধুরী (তৎকালীন লে. কর্নেল) বিডিআর হত্যাকান্ডের সময় পিলখানায় ৪৪ রাইফেলস ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ছিলেন। হত্যাকান্ডের পূর্বে তিনি হত্যাকারীদের সাথে তৎকালীন এমপি জনাব শেখ সেলিমের যোগাযোগ করিয়ে দেন। হত্যাকান্ডের পূর্বের দিনও হত্যাকারীদের সাথে যোগাযোগ করেছেন এবং বিভিন্ন সমন্বয় সাধন করেছেন। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে তিনি হত্যাকান্ডের অন্যতম কশীলব সুবেদার মেজর গোফরান মল্লিকের বাসায় অবস্থান করেন। সুবেদার মেজর গোফরান মল্লিকের বাসা থেকে মোবাইলে তিনি সর্বক্ষণ যমুনায় অবস্থানরত তৎকালীন ডিজি এসএসএফ মেজর জেনারেল আবেদীন এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি তার ব্যবহৃত মোবাইলটি পিলখানার বাইরে এসেছিল। তৎকালীন এমপি জনাব গোলাম রেজা লে. কর্নেল শামসকে দরবার হল এলাকায় মুক্তভাবে চলাচল করতে দেখেছেন। তিনি ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানা থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থায় বের হয়েই তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেওয়ার পদক্ষেপে প্রশংসা করেন।

উপরে বর্ণিত বিষয়সমূহ প্রমাণ করে যে, হত্যাকান্ডের ষড়যন্ত্রের সাথে লে. কর্নেল শামস ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। কমিশন লে. কর্নেল শামসকে নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ষড়যন্ত্র।

(২) হত্যাকারীদের হত্যাকান্ডে সুযোগ করে দেয়া।

(৩) দেশ ও জাতির কাছে সত্য লুকানো।

ঞ। **ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমামুল হুদা**। ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায় অফিসারদেরকে ফাঁসানোর ক্ষেত্রে তার কর্মকান্ডের জন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমামুল হুদাকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায় অফিসারদেরকে ফাঁসানো।

(২) তদন্ত আদালতের সভাপতি হিসেবে আলামত যাচাই না করে অসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা

(৩) কমিশনে মিথ্যা সাক্ষ্য

(৪) নির্যাতনের মাধ্যমে সাদা কাগজে স্বাক্ষর গ্রহণের পর উক্ত কাগজে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী লিখে তদন্ত প্রতিবেদন সম্পন্ন করা

(৫) ঘটনাস্থল পরিদর্শন না করা

(৬) বাদীর সাক্ষ্য গ্রহণ না করা।

ট। **ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদ হোসেন**। ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায় অফিসারদেরকে ফাঁসানোর ক্ষেত্রে তার কর্মকান্ডের জন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদ হোসেনকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) তদন্ত আদালতের সদস্য হিসেবে আলামত যাচাই না করে অসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা

(২) প্রমাণের জন্য কোর্ট মার্শালে নতুন করে সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থান না করে তদন্ত আদালতের উদঘাটিত তথ্যকে চূড়ান্ত হিসেবে বিবেচনা করে কোর্ট মার্শালে প্রসিকিউটর হিসেবে বিচারিক কার্যক্রম শেষ করা

ঠ। **ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুব সারোয়ার**। ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায় অফিসারদেরকে ফাঁসানোর ক্ষেত্রে তার কর্মকান্ডের জন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদ হোসেনকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) তদন্ত আদালতের সদস্য হিসেবে আলামত যাচাই না করে অসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার অপচেষ্টা

(২) Summary of Evidence রেকর্ডিং অফিসার হিসেবে সাক্ষ্য প্রমাণ নতুন করে যাচাই না করে শুধুমাত্র তদন্ত প্রতিবেদনের উপর Summary of Evidence প্রস্তুত করা।

১১২। **ডিজিএফআই**।

ক। **লে. জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবর**। কমিশন লে. জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবরকে নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) লিফলেট বিতরণের বিষয়টি জ্ঞাত হওয়ার পরেও সেটি উদ্ধারের বিষয়ে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

(২) দেশের অন্যতম শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থার ডিজি হওয়া সত্ত্বেও বিডিআর হত্যাকান্ড বিষয়ে কোন আগাম তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হওয়া।

(৩) সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ও তৎকালীন সেনাপ্রধানকে কার্যকর উপদেশ প্রদানে ব্যর্থ হওয়া।

(৪) হত্যাকান্ড চলার সময় ডিজি বিড়িআরের নিহত হওয়া সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও সেটা প্রকাশ না করে সেনাবাহিনী তথা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ করা।

(৫) ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানার চতুর্পার্শ্বে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড অব্যাহতভাবে মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিককে জানিয়ে সেনা অভিযান বাধাগ্রস্থ করা।

(৬) র‍্যাবের পেট্রোল দল কর্তৃক কিছু সংখ্যক পলায়নরত হত্যাকারীকে ধরে আবহানী মাঠে নিয়ে এলে তাদেরকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়া।

(৭) তদন্ত কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করা।

(৮) ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায় ০৫ জন সেনা অফিসারকে ফাঁসানো ও গুম করা।

খ। **লে. জেনারেল মামুন খালেদ**। কমিশন লে. জেনারেল মামুন খালেদকে নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) লিফলেট বিতরণের বিষয়টি জ্ঞাত হওয়ার পরেও সেটি উদ্ধারের বিষয়ে কোন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করা।

(২) দেশের অন্যতম শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থার ডাইরেক্টর সিআইবি হওয়া সত্ত্বেও বিডিআর হত্যাকান্ড বিষয়ে কোন আগাম তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হওয়া।

(৩) সামরিক অভিযান পরিচালনার সুপারিশ করার জন্য ডিজি ডিজিএফআইকে কার্যকর উপদেশ প্রদানে ব্যর্থ হওয়া।

(৪) ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানার চতুর্পার্শ্বে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর কর্মকান্ড অব্যাহতভাবে মেজর জেনারেল তারেক সিদ্দিককে জানিয়ে সেনা অভিযান বাধাগ্রস্ত করা।

(৫) তদন্ত কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করা।

গ। **মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস**। কমিশন মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েসকে নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) দেশের অন্যতম শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআই এর ডাইরেক্টর সিটিআইবি হওয়া সত্ত্বেও বিডিআর হত্যাকান্ড বিষয়ে কোন আগাম তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হওয়া।

(২) সামরিক অভিযান পরিচালনার সুপারিশ করার জন্য ডিজি ডিজিএফআইকে কার্যকর উপদেশ প্রদানে ব্যর্থ হওয়া।

(৩) সামরিক অভিযান পরিচালনা বাধাগ্রস্ত করা।

(৪) ট্যাংকসহ সেনা অভিযান যাতে শুরু না হয় তা নিশ্চিত করা।

(৫) তদন্ত কার্যক্রমে বাধা সৃষ্টি করা।

(৬) ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায় ৫ জন সেনা অফিসারকে ফাঁসানো।

ঘ। **মেজর জেনারেল সুলতানুজ্জামান সালেহ উদ্দীন (অব.)**। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি হত্যাকান্ডের সময় মেজর জেনারেল সালেহ লে. কর্নেল পদবিতে ডিজিএফআই-এ কর্মরত ছিলেন। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ বিকেলে বা রাতে তিনি অপর একজন অফিসারকে নিয়ে এমটিএমসিতে প্রবেশ করেন এবং দীর্ঘক্ষণ নেটওয়ার্ক মনিটরিং করেন। পিলখানায় অবস্থানরত অফিসারদের অবস্থান নির্দিষ্ট করে হত্যাকারীদের জানানো হচ্ছিল বলে অভিযোগ আছে। তিনি যেহেতু অযাচিতভাবে এনটিএমসিতে দীর্ঘক্ষণ মনিটরিং কাজ করেছেন, সুতরাং পিলখানায় অবস্থানরত অফিসারদের অবস্থান নির্দিষ্টকরণের কাজে তার জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায় পাঁচ জন কর্মরত অফিসারকে ফাঁসানোর কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। কমিশন তাকে নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহায়তাকারী

(২) সেনা বাহিনীর মনোবল ধ্বংসে সহায়তা

(৩) ঘটনাকালীন সময়ে চ্যানেল অভ্ কমান্ড ভঙ্গ করে পিলখানার মোবাইল যোগাযোগ মনিটরং

(৪) তাপস হত্যাচেষ্টার মিথ্যা মামলা সাজানো

(৫) ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায় ফাঁসানো অফিসারদেরকে অবৈধভাবে আটক।

(৬) ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায় ফাঁসানো অফিসাদেরকে নির্যাতন করা।

(৭) ফাঁসানো অফিসারদের পরিবারদেরকে ব্ল্যাকমেইল করা।

(৮) আলামত হিসেবে এক ট্র্যাঙ্ক অস্ত্র উদ্ধারের প্রহসন (তাপস হত্যা চেষ্টা ঘটনায়)

(৯) কমিশনে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান (তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায়)।

১১৩। **এনএসআই**।

ক। **মেজর জেনারেল শেখ মুনিরুল ইসলাম**। মেজর জেনারেল শেখ মুনিরুল ইসলামকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করেঃ

(১) এনএসআই-এর ডিজি হিসেবে বিডিআর হত্যাকান্ডের বিষয়ে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থতা।

খ। **মেজর জেনারেল টিএম জোবায়ের**। মেজর জেনারেল জোবায়েরকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) তদন্ত কার্যক্রম থেকে অফিসার প্রত্যাহারের মাধ্যমে তদন্ত কাজে বাধা প্রদান

(২) ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা।

১১৪। **র‍্যাব**

ক। **তৎকালীন ডিজি র‍্যাব জনাব হাসান মাহমুদ খন্দকার**। জনাব হাসান মাহমুদ খন্দকারকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ২৫ ফেব্রুয়ারি ঘটনা শুরুর পর পরই র‍্যাব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেও তাঁদেরকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা।

(২) র‍্যাবকে নিষ্ক্রিয় রাখার মাধ্যমে হত্যা, লাশ গুম, নারী ও শিশু নির্যাতন, আলামত ধ্বংস, অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট, ব্যক্তিগত সম্পদ লুট এবং অপরাধীদের পলায়নে সহায়তা করা।

খ। **মেজর জেনারেল রেজানুর খান**। কমিশন মেজর জেনারেল রেজানূর খানকে নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) নিজ দায়িত্ব ছেড়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় গিয়ে সময় ক্ষেপণ।

(২) পিলখানায় ৩, ৪ ও ৫ নং গেইটে অবস্থানরত র‍্যাবের অগ্রগামী দলসমূহকে গুলি ছুঁড়তে এবং পিলখানায় প্রবেশ করতে বাধা দান।

(৩) তদন্ত কার্যক্রমকে বাধাগ্রস্ত করা।

(৪) ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডে অভিযুক্ত অফিসারদের সংযুক্তকালীন সময়ে তাঁদের উপর নির্যাতনে সহায়তা (তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায়)

(৫) ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডে অভিযুক্ত অফিসারদের কোর্ট মার্শালের সময় আইনী সহায়তা প্রদান না করা (তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায়)

(৬) অফিসারদের স্ত্রীদের হুমকি দেয়া (তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায়)।

গ। **মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান**। মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসানকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) সাক্ষী গুম ও হত্যা

ঘ। **<u>ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আজিম আহমেদ (তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর ইন্টেলিজেন্স র‍্যাব)</u>**। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আজিম আহমেদকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ (তিনি গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় দীর্ঘদিন সিএমএইচ ভর্তি থাকায় তার সাক্ষ্য গ্রহণ সম্ভব হয়নি)।

(১) তদন্তে কাজ ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা।

১১৫। **<u>২০০৯ সালে গঠিত তদন্ত কমিটিসমূহ</u>**

ক। **<u>২০০৯ সালে গঠিত জনাব আনিস-উজ-জামানের নেতৃত্বাধীন জাতীয় তদন্ত কমিটি</u>**। বিষয়োক্ত কমিটির তদন্তের বিষয়ে অত্র কমিশনের মতামত নিম্নরূপঃ

(১) ফরমায়েশি তদন্ত পরিচালনা।
(২) জনাব আনিস-উজ-জামান অত্র কমিশনে সাক্ষী না দিয়ে তদন্ত কাজে অসহযোগিতা করেছেন।

খ। **<u>২০০৯ সালে গঠিত লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন সেনা তদন্ত কমিটি</u>**। বিষয়োক্ত কমিটির তদন্তের বিষয়ে অত্র কমিশনের মতামত নিম্নরূপঃ

(১) ফরমায়েশি তদন্ত পরিচালনা।
(২) তদন্তে অনেক তথ্য উঠে এলেও প্রতিবেদনের মতামত বা সুপারিশে সেগুলোর বিষয়ে কোন কিছু উল্লেখ না করা, অর্থাৎ তথ্য গোপন করা।

১১৬। **<u>বিডিআর</u>**।

ক। **<u>মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ</u>**। মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) অনিয়মকে প্রশ্রয় দেয়া
(২) কমান্ডে শিথিলতা প্রদর্শন
(৩) সরকারকে গোয়েন্দা তথ্য অবহিত না করা
(৪) ক্ষমতার অপব্যবহার।

খ। **<u>কর্নেল মুজিবুল হক</u>**। কর্নেল মুজিবুল হককে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) অনিয়মকে প্রশ্রয় দেয়া

গ। **<u>কর্নেল সাইদুল কবির</u>**। কর্নেল মুজিবুল হককে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে অবহেলা
(২) নিয়ম বহির্ভূত বিষয়ে সুপারিশ করা।

ঘ। **<u>লে. কর্নেল ফোরকান আহমদ</u>**। লে. কর্নেল ফোরকান আহমদকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) কমান্ড দায়িত্ব পালনে অবহেলা
(২) ইউনিট সদস্যদের ষড়যন্ত্রে অংশগ্রহণ নজরদারিতে না রাখা।

ঙ। **<u>মেজর গোলাম মাহবুবুল আলম চৌধুরী</u>**। মেজর গোলাম মাহবুবুল আলম চৌধুরীকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ
(২) ক্ষমতার অপব্যবহার
(৩) সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ
(৪) কমিশনে সাক্ষ্য না দিয়ে তদন্ত কাজে অসহযোগিতা।

১১৭। **পুলিশ**

ক। **আইজিপি নূর মোহাম্মদ**। আইজিপি নূর মোহাম্মদকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ রাতে সমর্পিত অস্ত্র যথাযথভাবে হেফাজতে না নেয়া এবং প্রহসনমূলক অস্ত্র সমর্পণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকা
(২) পুলিশের দায়িত্ব পালন নিশ্চিত না করা
(৩) ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ রাতে পিলখানা থেকে জিম্মি অবস্থা থেকে সকল পরিবারকে উদ্ধার করার দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও শুধু নিজ কন্যা ও গুটি কয়েক পরিবারকে উদ্ধার করে দায়িত্বহীনতার পরিচয় দেওয়া।
(৪) সত্য গোপন করা এবং হত্যাকারীদেরকে সাধারণ ক্ষমার ক্ষেত্র তৈরি করা
(৫) অপরাধীদের পলায়নের সময় তাদেরকে গ্রেফতারের জন্য পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ না করা।

খ। **ডিএমপি কমিশনার নাইম আহমেদ**। ডিএমপি কমিশনার নাইম আহমেদকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ক্রাইম সিন কার্যকর ভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা
(২) অপরাধীদের পলায়ন প্রতিরোধ না করা।

গ। **অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল (এসবি) বাহারুল আলম**। জনাব বাহারুল আলমকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) কমিশনের তদন্তে অনুমানভিত্তিক তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা
(২) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ঘটনায় সরকার বিরোধীদের ফাঁসানো
(৩) মিছিলকারীদেরকে সনাক্ত না করেই বিরোধী দলীয় কর্মীদের উপর দায় চাপানো
(৪) মিছিলকারীদেরকে সনাক্ত না করা
(৫) এসবির তৎকালীন মাঠ পর্যায়ের টিমের পরিচয় না জানিয়ে এবং উক্ত টিম কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য প্রমাণাদি কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী প্রদান না করে কমিশনকে অসহযোগিতা করা।

ঘ। **অতিরিক্ত আইজিপি মনিরুল ইসলাম**। জনাব মনিরুল ইসলামকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) পাঁচ সেনা অফিসারকে ফাঁসানোর জন্য ডিজিএফআই-কে মিথ্যা তথ্য সরবরাহ করা।
(২) তদন্ত কাজে অসহযোগিতা।

ঙ। **অতিরিক্ত ডিআইজি আব্দুল কাহার আকন্দ ও তার অধীন তদন্ত দল**। জনাব আব্দুল কাহার আকন্দ ও তার দলকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) নারী ও শিশুদের শারীরিক, মানসিক নির্যাতন ও ধর্ষণের অভিযোগের ঘটনায় মামলা না করা এবং সাক্ষী থাকা সত্ত্বেও অভিযোগপত্র দাখিল করা না করা
(২) সাক্ষী পাওয়া সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট **আওয়ামী লীগ** ব্যক্তিবর্গের নাম অভিযোগপত্রে যুক্ত না করা।

(৩) মোবাইল ফোন সিডিআর সংগ্রহ করে প্রযুক্তিগত সাক্ষ্য-প্রমাণ অভিযোগপত্রে উপস্থাপন না করা

(৪) সেনা অফিসারগণকে খুন, ঘটনার আলমত ধ্বংস এবং পলায়নের সুযোগ দানকারীদের বিষয় তদন্ত না করা

(৫) সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে জিজ্ঞাসাবাদ না করা।

(৬) বিরোধী দলীয় নিরীহ নেতা কর্মীদের মামলায় ফাঁসিয়ে সাজা প্রদানের ব্যবস্থা করা।

(৭) অত্র কমিশনকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য না দিয়ে অসহযোগিতা করা।

১১৮। **মিডিয়া**

ক। **সাংবাদিক মুন্নী সাহা**। সাংবাদিক মুন্নী সাহাকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা

(২) বিদ্রোহীদের পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ প্রচার করে বিদ্রোহকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করা এবং সামরিক অফিসারদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা

(৩) অপপ্রচারের মাধ্যমে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করা।

খ। **সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল**। সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুলকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) সংবাদের নিরপেক্ষতা নিশ্চিত না করেই সংবাদ প্রচার করার মাধ্যমে জনগণকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা।

গ। **সাংবাদিক জহিরুল ইসলাম মামুন (জ ই মামুন)**। সাংবাদিক জহিরুল ইসলাম মামুনকে কমিশন নিম্নবর্ণিত দোষে দোষী সাব্যস্ত করছেঃ

(১) ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা

(২) বিদ্রোহীদের পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট সংবাদ প্রচার করে বিদ্রোহকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করা এবং সামরিক অফিসারদের হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করা

(৩) অপপ্রচারের মাধ্যমে বিদ্রোহ ছড়িয়ে দিতে সহায়তা করা

অন্যান্য সহায়তাকারী

১১৯। পিলখানায় হত্যাকান্ড শুরু হলে পিলখানার বিভিন্ন গেইটের সামনে আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা মিছিল করে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে হত্যাকারীদের হত্যাযজ্ঞে উদ্বুদ্ধ করে। দুপুর ১২৩০ মিনিট নাগাদ ৩ নং গেইট এর সামনে বিডিআরের পক্ষে শতাধিক মানুষের মিছিল হয়। এদেরকে বিডিআর জওয়ানদের দাবি-দাওয়ার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে 'জয় বাংলা জয় বিডিআর, বিডিআর-জনতা ভাই-ভাই' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে শোনা যায়। এরপর বিদ্রোহীরা প্রায় ২০ মিনিট ধরে এলোপাতাড়ি কয়েক হাজার রাউন্ড গুলি ছোড়ে। এর পরপরই তারা মাইকে জানায়, আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে একা পিলখানায় আসতে হবে। তারা তাদের নিরাপত্তা দেবে।

১২০। বেশ কিছু মিছিল নিউমার্কেট গেইট দিয়ে প্রবেশ করে পিলখানার ভিতরে যায় এবং আকারে বড় হয়ে পিলখানার ভিতর হতে বের হয়ে আসে। ধারণা করা হয় হত্যাকারীদের অনেকেই পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে এসব মিছিলের অংশ হয়ে পিলখানা হতে বের হয়ে যায়। বিদ্রোহের প্রথম প্রহরেই বিদ্রোহীরা ৩ ও ৪ নং গেইটে সশস্ত্র অবস্থান নেয়। ১ ও ৫ নং গেইটের পার্শ্ববর্তী এলাকার কিছু জনসাধারণ তাদের সমর্থন দিয়েছিল। আজিমপুর ও হাজারিবাগ গেইটে (১ ও ৫) বিদ্রোহী জওয়ানদের বিভিন্ন সময়ে স্থানীয় কিছু যুবক কর্তৃক কলা, বিস্কুট, রুটি ও সিগারেট সরবরাহের ঘটনা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীদের সাথে বিদ্রোহীদের সখ্যতা প্রমাণ করে। ২৫ ফেব্রুয়ারি আনুমানিক বেলা ১২৩০ মিনিটে ৫০-৬০ জন যুবক বিদ্রোহীদের সমর্থনে মিছিল করে বিভিন্ন শ্লোগান দিতে দিতে বিদ্রোহীদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে ৫ নং গেইট দিয়ে প্রবেশ করে। মিছিলটি বেরিয়ে যাওয়ার সময় বেশ

কিছুসংখ্যক বিদ্রোহী মিছিলকারীদের সাথে বের হয়ে যায় বলে জানা যায়। এ সমস্ত মিছিল হতে কিছু শ্লোগান দেয়া হয় যেমন 'জয় বাংলা, জয় বিডিআর, "বিডিআর জনতা ভাই-ভাই' ইত্যাদি।

১২১। মিছিলের আয়োজক ও অংশগহণকারীরা বিদ্রোহীদের ইন্ধনদাতা ছিল। এসব মিছিল যারা সংগঠিত করেছিলেন তারা প্রত্যেকেই এই হত্যাকান্ডের সহায়তাকারী। তৎকালীন এসবির সদস্যরা মিছিলকারীদের ছবি তুলেছিলেন। তৎকালীন এডিশনাল আইজি, এসবির মতে ছবির মান ভালো ছিল না বলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা যায়নি।

হত্যাকান্ড পরবর্তী বিষয়সমুহ

১২২। **লাশ উদ্ধার**। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে কামরাঙ্গিরচরের সুয়ারেজ লাইন থেকে ০২ টি লাশ উদ্ধার করা হয়। ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সকাল ০৮৩০ ঘটিকায় কামরাঙ্গিরচর এলাকা থেকে আরো ০৬ টি লাশ উদ্ধার করা হয়। ২৭ ফেব্রুয়ারি একটি গণকবর থেকে ৩৮টি মৃতদেহ এবং পরদিন ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ১৩ রাইফেল ব্যাটালিয়নের এমটি গ্যারেজের পার্শ্বে ০৩ টি গণকবর হতে মোট ১০টিসহ সর্বমোট ৪৮টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। এছাড়া সুয়ারেজ লাইন থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখ ০১টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। সর্বমোট ৪৯ টি মৃতদেহ ৬ স্বতন্ত্র এডিএ ব্রিগেডের অধীনস্ত ৩৬ এডি রেজিমেন্ট আর্টিলারির তত্ত্বাবধানে ময়না তদন্তের জন্য মিডফোর্ড ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। লাশ উদ্ধার এবং আত্মীয়দের কাছে তা হস্তান্তরের সময় যথাযথ প্রক্রিয়া ও সাবধানতা অবলম্বন করা হয়নি। ফলে তিন উত্তরাধিকারী লাশ পায়নি এবং মর্গে তিনটি লাশ অতিরিক্ত ছিল। পরবর্তীতে লাশগুলো অবশিষ্ট তিন উত্তরাধিকারীর মধ্যে বিতরণ করা হয়। তবে ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দার নূরের স্ত্রী তাসনুভা মাহা এখনো তার স্বামীর মৃতদেহ সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করেননি। লাশগুলো হস্তান্তরের পূর্বেই ডিএনএ টেষ্ট করা উচিত ছিল।

১২৩। **ডিজি নিয়োগ**। হত্যাকান্ডের পর পরই ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (পরবর্তীতে লে. জেনারেল) মইনুল ইসলামকে বিডিআর ডিজি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে তিনি বিডিআরের পিলখানায় যোগ দেন। তাঁর সার্বিক কর্মকান্ড নিম্নরূপঃ

ক। লে. জেনারেল মইনুল ইসলামের ভাষ্য মতে বিডিআর মহাপরিচালকের দায়িত্ব পেয়ে তাকে কাজ করতে হয়েছিল এক আশংকাময়, অজানা, অনিশ্চিত, আবেগ তাড়িত এবং ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শের পরিবেশে। যোগদানের পরই তাকে বিডিআর সদস্যদের ফেরত আনা এবং বিডিআর পুনর্গঠনের বিশাল কর্মযজ্ঞে মনোনিবেশ করতে হয়।

খ। তিনি বিডিআরের ডিজি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর পরই তদন্ত কাজ শুরু হয়। বিডিআরের ব্যাটালিয়ন ও স্থাপনাসমূহের নিজস্ব তদন্তের বাইরে হত্যাকান্ডের মূল তদন্ত কাজ রুজুকৃত মামলার ভিত্তিতে জনাব আব্দুল কাহার আকন্দ (পুলিশের বহুল আলোচিত সাবেক এসপি) এর নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। জনাব আব্দুল কাহার আকন্দ ও ৪৪ রাইফেলস্ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল আজিজের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। বিষয়টি কর্নেল নেয়ামুল ইসলাম ফাতেমী কর্তৃক লে. জেনারেল মইনুলকে জানানো হলেও তিনি এ বিষয়ে কোন ব্যবস্থা নেননি।

গ। তিনি ডিজি থাকা অবস্থায় বিডিআর-এর নাম পরিবর্তন করে বিজিবি নামকরণ, বিজিবির নতুন পোশাক ও র‍্যাংকস প্রবর্তন এবং বিজিবি আইন ২০১০ পাশ করা হয়।

ঘ। তার সময়েই বিডিআরের নিজস্ব আইনে বিডিআর বিদ্রোহের বিচার শুরু হয়।

১২৪। মামলা। হত্যাকান্ডের পর পরই ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে লালবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয় যার মামলা নম্বর-৬৫। পরবর্তীতে ০৬ এপ্রিল ২০০৯ তারিখে মামলাটি নিউমার্কেট থানায় আরেকটি মামলা দায়ের করা হয় এবং নতুন মামলা নম্বর হয়-০৯। জনাব কাহার আকন্দ, বিপিএম বার মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা ছিলেন। অভিযোগপত্র দাখিলের মাধ্যমে তিনি নিউমার্কেট থানা মামলাটির তদন্ত নিষ্পত্তি করেছেন। মামলাটির

কার্যক্রম বিচারাধীন থাকায় এবং তার অত্র কমিশনের কর্মপরিধির বাইরে থাকায় অত্র কমিশন সে ব্যাপারে কোন মতামত দেওয়া হতে বিরত থাকলো।

১২৫। <u>তদন্ত চলাকালে সাক্ষীদের নির্যাতন ও মৃত্যু</u>।

ক। জিজ্ঞাসাবাদের সময় বিডিআর বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু সাক্ষীর অস্বাভাবিক মৃত্যুর তথ্য পাওয়া গেছে। মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামি সিপাহী সেলিম তাকে নির্যাতন করে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে বলে সাক্ষ্য দিয়েছেন। হাবিলদার মহিউদ্দিনকে শারীরিক নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে মর্মে মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামিদের কাছে থেকে সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। ২৫ ফেব্রুয়ারি, ২০০৯ তারিখে প্রকাশিত কালের কন্ঠ পত্রিকায়, 'হেফাজতে দুই জওয়ানের মৃত্যুঃ কারণ নির্যাতন, তবু চূড়ান্ত প্রতিবেদন দেয় পুলিশ' শীর্ষক প্রতিবেদনে বিডিআর সদস্য হাবিলদার মহিউদ্দিন এবং নায়েক মোবারক হোসেন এর শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন ছিল বলে ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

খ। বিডিআর মসজিদের পেশ ইমাম সিদ্দিকুর রহমানকে রাজসাক্ষী হওয়ার জন্য প্রবল ভয়-ভীতি ও মানসিক চাপ প্রয়োগ করাতে তিনি আতঙ্কিত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মৃত্যুবরণ করেন মর্মে তার স্ত্রী সাক্ষ্য দিয়েছেন।

গ। কমিশন সদস্যগণ কারাগারে আটক আসামিদের সাক্ষাৎকার নেয়ার সময় তাদের শরীরে নির্যাতনের চিহ্ন সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেছেন। আসামিদের ভাষ্য অনুযায়ী তাদের কাছ থেকে জোরপূর্বক, নির্যাতনের মাধ্যমে সাক্ষ্য আদায় করা হয়। তাদের জবানবন্দি থেকে আওয়ামী লীগ নেতাদের নাম বাদ দেয়ার জন্য নির্যাতন করা হত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতাদের অপরাধমূলক কর্মকান্ডের প্রত্যক্ষদর্শীদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেও নির্যাতন করা হয়েছে।

ঘ। সাক্ষ্য পাওয়া গেছে যে অন্তত একজন বিডিআর সদস্য যিনি হত্যাকান্ডের একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ও লাশ বিকৃত করায় ভূমিকা রেখেছেন, তাকে গুম করে হত্যা করা হয়েছে। বিডিআর বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ডের পর হতে ২৫ ডিসেম্বর ২০১০ পর্যন্ত ৬৪ জন বিডিআর সদস্য নিখোঁজ বা পলাতক, ও কর্মস্থল হতে অনুপস্থিত অবস্থায় রয়েছেন। এদের মধ্যে সিপাহী মইনুদ্দিনের মত মূল ষড়যন্ত্রকারীও আছেন। তাই এদের মধ্যেও কেউ কেউ গুমের বা হত্যার শিকার হয়েছেন এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

ঙ। ০৯ মার্চ থেকে ২০০৯ হতে ২৩ জুলাই ২০০৯ সাল পর্যন্ত মোট ৩৪ জন বিডিআর সদস্য/বিডিআরে চাকরিরত বেসামরিক সদস্য মৃত্যুবরণ করেন। এর মধ্যে ১০ জনের মৃত্যুর স্থান এবং ১০ জনের মৃত্যুর কারণ বিডিআরের নথিপত্রে উল্লেখ নেই, যা প্রচলিত আইনের গুরুতর ব্যত্যয়। এদের মধ্যে একজন হলেন নায়েব সুবেদার মোজাম্মেল হক যার মৃতদেহ ফাঁস লাগানো অবস্থায় ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের টয়লেট এর ভিতর থেকে উদ্ধার করা হয়। কিন্তু বিজিবির নথিতে মৃত্যুর কারণ হিসেবে লেখা আছে, 'তালিকাপত্র উল্লেখ নাই।' নায়েব সুবেদার মোজাম্মেল হক এর মৃতদেহ উদ্ধারের একটি ভিডিও চিত্র কমিশনের হাতে পৌঁছায় যা দেখে তিনি আত্মহত্যা করেছেন কিনা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। বিজিবির নথি পত্রে তার মৃত্যুর কারণ উল্লেখ করা হয়নি।

চ। এছাড়া যে ৩৪ জন বিডিআর সদস্য/বিডিআরে চাকরিরত বেসামরিক সদস্য মৃত্যুবরণ করেন তাদের ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন চেয়ে অত্র কমিশন ১৯ অক্টোবর, ২০২৫ তারিখে বিজিবির নিকট পত্র প্রেরণ করে (পত্রের স্মারক নং-বিডিআরসি ০৪-২০২৫/৩৬৩)। কিন্তু বিজিবি কর্তৃপক্ষ ময়নাতদন্তের প্রতিবেদনসমূহ দাখিল করতে পারেনি।

ছ। এসব তথ্যের আলোকে কমিশন এই মতামতে উপনীত হয় যে বিডিআর বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ডের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের কেউই কেউই জিজ্ঞাসাবাদের সময় নির্যাতনের এবং গুম ও হত্যার শিকার হয়েছে।

বিজিবির তৎকালীন মহাপরিচালক তাদের নির্যাতন ও মৃত্যু প্রতিরোধ এবং মৃত্যুর কারণ উদঘাটনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

১২৬। <u>তদন্ত কমিটি/আদালতের প্রতিবেদন</u>। ঘটনার অব্যবহিত পরেই সরকারের সাবেক সচিব জনাব আনিস-উজ-জামান খানকে প্রধান করে ১২ সদস্যের একটি জাতীয় কমিটি গঠিত হয়। একই সঙ্গে সেনাবাহিনীর তৎকালীন কিউএমজি লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীকে প্রধান করে ২৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি সেনা তদন্ত আদালত গঠিত হয়। জাতীয় কমিটি ১৪ মে ২০০৯ তারিখে এবং সেনা তদন্ত কমিটি জুন ২০০৯ মাসে তাদের তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়।

ক। <u>জাতীয় তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পর্যালোচনা</u>।

(১) জনাব আনিস-উজ-জামানের নেতৃত্বাধীন জাতীয় কমিটির প্রতিবেদনে তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, তাঁরা এই ঘটনার প্রকৃত উদ্দেশ্যে ও কারণ উদঘাটন করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং অধিকতর তদন্তের সুপারিশ করেছেন।

(২) এ কমিটি বিডিআর সদস্যদের মধ্যে শুধুমাত্র সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিরাজমান ক্ষোভ ও বিভিন্ন দাবি দাওয়া নিয়ে অসন্তোষকে মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেননি। কমিটি এখানে নেপথ্যের কুশীলবগণের কথা উল্লেখ করলেও তাদেরকে চিহ্নিত করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

(৩) বিডিআর বিদ্রোহের চূড়ান্ত কারণ হিসেবে তারা যেসব বিষয় উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিডিআরের চেইন অভ্ কমান্ড ধ্বংস করে বিডিআরকে অকার্যকর করা, সেনা কর্মকর্তাদের নৃশংসভাবে নির্যাতন ও হত্যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে সেনা কর্মকার্তাদের বিডিআরে প্রেষণে কাজ করতে নিরুৎসাহিত করা, সেনাবাহিনী ও বিডিআরকে সাংঘর্ষিক অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দেয়া, সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনীর ক্ষতি করা, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করা ইত্যাদি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রতিবেদনে উল্লেখ করে বিডিআর হত্যাকান্ডের সাথে বিষয়টি সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা হয়েছে বলে প্রতীয়মান।

(৪) অত্র কমিশনের নিকট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় কমিটির যে প্রতিবেদন হস্তান্তর করা হয়েছে তাতে সাক্ষীদের কোন স্বাক্ষর নেই। প্রতিবেদনে যাদের সাক্ষ্য আছে তাদের অন্ততঃ দু'জন: জনাব গোলাম রেজা (তৎকালীন এমপি) ও তৎকালীন নৌ বাহিনীর প্রধান মঈন ইউ আহমেদ অত্র কমিশনকে জানিয়েছেন যে তারা সে কমিটির নিকট কোন সাক্ষ্য দেননি।

(৫) এ কমিটি কোন কিছুর জন্যই কাউকে দায়ী করে শাস্তির সুপারিশ করেনি। তবে কমিটি কর্তৃক প্রণীত স্বল্পমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী সুপারিশসমূহ যথার্থ ছিল যদিও কমিটির সুপারিশসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবগত করা হয়নি।

(৬) ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসান নাসির প্রতিবেদনে স্বাক্ষর করতে গিয়ে লিখেছেন যে, '০১টি সুশৃঙ্খল বাহিনীর এহেন বিদ্রোহে সম্পৃক্ততা ও দায়বদ্ধতা জাতীয় স্বার্থে নিরপেক্ষতা ও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা না করা মোটেই বিধেয় নয়।'

(৭) কমিটি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর কোন সাক্ষ্য গ্রহণ করেনি। অবশিষ্ট **আওয়ামী লীগ** নেতাদের লিখিত সাক্ষ্য গ্রহণ করলেও তাদেরকে কোন প্রকার প্রশ্ন করা হয়নি। **আওয়ামী লীগ** নেতারা দায়সারা গোছের সাক্ষ্য দিয়েছেন বলে অত্র কমিশন কনে করে।

(৮) কমিটির কোন সদস্যই তদন্ত কাজে সময় দিতে পারেননি এবং অত্র কমিশনে সাক্ষ্য দিতে এসে বেশিরভাগ সদস্যই দায় এড়িয়ে গেছেন।

খ। সেনাবাহিনী কর্তৃক গঠিত আদালতের তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা

(১) প্রতিবেদনটি অত্যন্ত তথ্যবহুল। ঘটনাপূর্ব প্রস্তুতি, দরবার হলের ঘটনা, দরবার হল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় হত্যার তথ্য, হত্যার সম্ভাব্য স্থান, কোত ও ম্যাগাজিন বিদ্রোহীদের কার্যক্রম, পিলখানার গেইট সমূহের সার্বিক পরিস্থিতি, বিভিন্ন ব্যাটালিয়ন, স্থাপনা, অফিসার মেস, অফিসার বাসস্থান, জেসিও/সৈনিক আবাসিক এলাকা ও কোয়ার্টার গার্ড এর সার্বিক পরিস্থিতির চিত্র যত্নসহকারে প্রতিবেদনটিতে তুলে ধরা হয়েছে।

(২) তথাকথিত রাজনৈতিক যোগাযোগের মাধ্যমে ঘটনা সমাধানের উদ্যোগ, অইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থার কার্যক্রম, র‍্যাব এবং পুলিশের কার্যক্রম প্রতিবেদনটিতে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

(৩) আটককৃত সেনাবাহিনীর অফিসার এবং পারিবারবর্গের উদ্ধার কার্যক্রম এবং মৃতদেহ সমূহে উদ্ধারপর্বের বিস্তারিত বর্ণনাও প্রতিবেদনটিতে স্থান পেয়েছে।

(৪) বিডিআর সদস্যদের পলায়নের বিস্তারিত বর্ণনাও প্রতিবেদনটিতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

(৫) ঘটনা পরবর্তী বিষয় সমূহের মধ্যে সেনাবাহিনী কর্তৃক পিলখানার দায়িত্বগ্রহণ, গণকবর আবিস্কার ও পরবর্তী ব্যবস্থা, অপারেশন রেবেল হান্ট পরিচালনা এবং টিএফআই সেল গঠন ও সেটির কার্যক্রম উল্লেখ করা হয়েছে।

(৬) এ ছাড়াও পিলখানার অভ্যন্তরে বসবাসরত অফিসারদের ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ, বিডিআরের নিজস্ব ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ, নিহত ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কিত তথ্যাবলী, অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যদের গৃহীত বিবৃতি, বিডিআর পিলখানার লে-আউট প্ল্যান, পলাতক বিডিআর সদস্যদের ছবিসহ নামীয় তালিকা, প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে বিডিআর সদর দপ্তর কর্তৃক ইস্যুকৃত নিরাপত্তা নির্দেশিকা এবং ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে প্রচারকৃত লিফলেট এর কপি আদালতের প্রতিবেদনের সাথে ক্রোড়পত্র হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

(৭) তবে, প্রতিবেদনটিতে বিদ্রোহের কারণসমূহ উল্লেখ করার সময় সমস্যার গভীরে প্রবশ না করে গতাণুগতিকতার আশ্রয় নেয়া হয়েছে।

(৮) হত্যাকান্ডে জঙ্গী সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে দেশী ও বিদেশী কোন জঙ্গী সংগঠনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য, সমর্থন এবং সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে কোন তথ্য আলামত বা পূর্বাভাস পাওয়া যায়নি। রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে বিডিআরের কতিপয় সদস্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে কতিপয় বেসামরিক ব্যক্তিবর্গ ও **আওয়ামী লীগ** নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮ এর পূর্বে ও পরে যোগযোগ করে। প্রতিবেদনটিতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, বেসামরিক ও **আওয়ামী লীগ** ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়টিকে নিজেদের প্রতিশোধের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে। আদালতের মতামতে **আওয়ামী লীগ** ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করা হয়নি। স্থানীয় আওয়ামীলীগ (আওয়ামী লীগ শব্দ দু'টি প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি) নেতা বিডিআরের অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার তোরাব আলী ও তার ছেলে সন্ত্রাসী লেদার লিটন এবং নায়েব সুবেদার (অব.) কাঞ্চন এর সন্তান জাকির বিডিআর বিদ্রোহের ঘটনায় ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুবেদার তোরাব আলীর কল লিস্ট পর্যালোচনা করে বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে একাধিকবার বিদেশে কথা বলার তথ্য পাওয়া গেছে। তিনি ভারতের ও সিংগাপুরের টেলিফোন নম্বরসমূহে কথা বললেও দেশ দু'টির নাম মতামতে যেমন উল্লেখ করা

হয়নি তেমনি এ বিষয়ে তদন্তে অগ্রসর না হয়ে আরো তদন্তের সুপারিশ করা হয়েছে। অথচ সুবেদার তোরাব আলী তখনও পুলিশ হেফাজতে বেঁচে ছিলেন এবং তাকে অধিকতর জিজ্ঞাসাবাদ করা অত্যন্ত সহজ কাজ ছিল। কমিটি তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে যে বিডিআর বিদ্রোহের পিছনে অন্য কোন প্রতিষ্ঠান, সংস্থা অথবা ব্যক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সাহায্য ও সমর্থন আছে কিনা তা উদঘাটনের জন্য উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত আয়োজন করা প্রয়োজন অন্যথায় ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের ক্ষতি সাধনের সম্ভাবনা থেকে যাবে। তবে তদন্ত প্রতিবেদনের এই মতামত অনুযায়ী তৎকালীন সরকার পরবর্তীতে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

(৯) বিদ্রোহ দমনে ব্যর্থতার জন্য প্রতিবেদনে পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক সমঝোতার চেষ্টাকে দায়ী করা হলেও প্রত্যক্ষভাবে দায়ী করা হয়নি।

(১০) প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে যে স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানকের নেতৃত্বে যে দলটি আলোচনার মধ্যমে সমস্যা সমাধানের জন্য পিলখানায় যায় তাদের কোন সশস্ত্র বিদ্রোহ দমনের পূর্ব অভিজ্ঞতা বা সামরিক বিষয় সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় বিদ্রোহ দমনে দলটির সদস্যগণ সময়োপযোগী ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে যথেষ্ট প্রস্তুতি ছাড়া বিদ্রোহ দমনে গমন করায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অস্ত্র সমর্পণের বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পরেননি। অথচ প্রতিবেদনের পরবর্তী স্তবকেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন ও প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানকসহ অন্যান্য সহযোগীদেরকে সমস্যা সমাধানে চরম সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে নিজ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পিলখানায় গমন করার জন্য প্রশংসা করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী পর্যবেক্ষণের সাথে সম্পূর্ণরূপে সাংঘর্ষিক।

(১১) হত্যাকান্ড, নারী ও শিশু নির্যাতন, লুটতরাজ, জিম্মিকরণ, লাশ গুম অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরসহ আরো অনেক অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

(১২) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) সশস্ত্র বিডিআর বিদ্রোহে বিদ্রোহী বিডিআর সদস্যগণ কর্তৃক ভ্রান্ত ও ভুল তথ্যসমূহের প্রচারণার বিপরীতে সঠিক তথ্য উপস্থাপন এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া ব্যবস্থাপনায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হলেও তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ প্রতিবেদনে করা হয়নি।

(১৩) কমিটির মতামতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হত্যাকান্ডে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহন করলেও ৪৪ রাইফেল ব্যাটালিয়নের সদস্যরা তাদের ব্যাটালিয়নের সকল অফিসারকে রক্ষা করেছে। অপরদিকে ৩৬ রাইফেল ব্যাটালিয়ন তাদের সৈনিক লাইনে অবস্থান নেয়া ঢাকা সেক্টর কমান্ডার এবং নিজ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক ও উপ-অধিনায়ক হত্যা করেছে। বিষয়টিকে প্রতিবেদনে রহস্যজনক হিসেবে উল্লেখ করলেও এ বিষয়ে অধিকতর তদন্তে যায়নি যদিও সকল সাক্ষীই তখন তাদের কাছে উপস্থিত ছিল।

(১৪) বিডিআর বিদ্রোহে নৃশংস হত্যাকান্ডসহ সংঘটিত অন্যান্য সকল অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গকে সেনা আইনের আওতায় এনে দ্রুত বিচারের মাধ্যমে শাস্তি প্রদানের জন্য কমিটি সুপারিশ করলেও হত্যাকান্ড ও অন্যান্য অপরাধ সংঘটন প্রতিরোধ করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য কমিটি কারো বিরুদ্ধে শাস্তির সুপারিশ করেনি। তবে ঘটনার পূর্ব আলামত ও তথ্য লাভে ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে গোয়েন্দা সংস্থা সমূহকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান ও পুনর্গঠনের জন্য উক্ত কমিটি সুপারিশ করেছিল।

(১৫) সার্বিকভাবে বলা যায় যে, সেনা তদন্ত কমিটি তথ্য উদঘাটনে যথেষ্ট যত্নবান ও উদ্যোগী ছিলেন। তবে মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে কমিটি কিছুটা ‘ধরি মাছ না ছুঁই পানি’ প্রক্রিয়ায় শরণাপন্ন হয়েছেন। বেশ কিছু ক্ষেত্রে কমিটি সুনির্দিষ্ট ভাবে ব্যক্তি/গোষ্ঠী/সংস্থার পক্ষে বা বিরুদ্ধে মতামত না

দিয়ে ইঙ্গিতের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট মতামত ব্যক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ায় কমিটির সুপারিশসমূহও গতানুগতিকতার ধারা থেকে বের হতে পারেনি।

১২৭। **তথাকথিত তাপস হত্যাচেষ্টা মামলা।**

ক। ঘটনার কয়েক মাস পর তথাকথিত ব্যারিস্টার তাপস হত্যাচেষ্টা মামলায় ০৫ জন অফিসারকে সেনা আইনে অভিযুক্ত করে সিভিল জেল দেওয়া হয়। এ বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রধান ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমামুল হুদা (অবসরপ্রাপ্ত) তার সাক্ষ্যে জানান যে, অফিসারদের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন প্রমাণ কমিটি পায়নি। তবে পারিপার্শ্বিক প্রমাণাদির উপর ভিত্তি করে অফিসাদেরকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। ভুক্তভোগী অফিসারদের ভাষ্য অনুযায়ী তারা কোন ভাবেই এ ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না। পরবর্তীতে পুলিশ মামলাটিকে ভিত্তিহীন বলে তাদের চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান করে।

খ। অফিসারদের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে এবং পুলিশের চূড়ান্ত রিপোর্ট দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে ভুক্তভোগী অফিসারদেরকে উদ্দেশ্যেমূলকভাবে ফাঁসানো হয়েছিল।

বিবিধ

১২৮। **ঘটনার সুদুরপ্রসারী প্রভাব।** ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর ঘটনাটি ঘটানো হয়েছিল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি দুর্বল, মেরুদন্ডহীন ও পরনির্ভরশীল বাহিনীতে পরিণত করার জন্য। ঘটনাটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে প্রকৃত অর্থেই সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছে। প্রথমত, সেনাবাহিনী ৫৭ জন মেধাবী ও যোগ্য কর্মকর্তাকে হারিয়েছে যারা সেনাবাহিনী, দেশ ও জাতিকে তাদের মেধা ও মননশীলতার সাহায্যে অনেক কিছু দিতে পারতো। জাতি তাদের সেবা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। জনগণের কাছে সশস্ত্রবাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। তাছাড়া সশস্ত্র বাহিনীর সিনিয়র ও জুনিয়র কর্মকর্তাদের মধ্যে সুক্ষ্ম অবিশ্বাসের জন্ম দিয়েছে। সশস্ত্রবাহিনীর মনোবল প্রচন্ডভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং দীর্ঘদিনেও তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি। বিডিআর হত্যাকান্ড আজও চাকরিরত এবং অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্যদের কাছে একটি দুঃস্বপ্ন। জবানবন্দী দিতে এসে বহু অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মকর্তা অঝোরে কেঁদেছেন। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে দুর্বল করার যে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল, বিগত দীর্ঘ ১৬ বছরে তা অনেকটাই সফল হয়েছে বলে কমিশন বিশ্বাস করে। এ দীর্ঘ সময়ে অসংখ্য পেশাগতভাবে নীতিহীন, চরিত্রহীন এবং রাজনীতিবিদদের পদলেহনকারী অফিসার সেনাবাহিনীর শীর্ষ পর্যায়ে আরোহন করতে সমর্থ হয়েছে। দীর্ঘ সময়ের পরিক্রমায় অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে অসংখ্য সৎ, নীতিপরায়ন ও যোগ্য অফিসারকে চাকরিচ্যুত করা হয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় ২০১৯ সালে বিদেশী পার্মান্যন্ট রেসিডেন্টশিপ থাকার অভিযোগে ৫৭ জন অফিসারকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করা হয়।

১২৯। **আলামত ধ্বংস।** এ বিষয়ে কমিশন কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ পায়নি।

১৩০। **কল লিস্ট পর্যালোচনা।** অত্র কমিশন কর্তৃক বিভিন্ন ব্যক্তি হতে প্রাপ্ত কল লিস্টসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিদ্রোহীদেরকে সিঙ্গাপুর এবং ভারত হতে বেশকিছু টেলিফোন কল করা হয়েছিল। কমিশন এসব কলের বিস্তারিত তথ্য বের করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ায় সংশ্লিষ্ট কোন সংস্থাই এ বিষয়ে কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহয়তা করতে পারেনি। ২০০৯ সালে গঠিত তদন্ত কমিটিসমূহ সামান্য চেষ্টা করলেই এসব কলের বিস্তারিত তথ্য জানতে পারতো।

১৩১। **বিদ্রোহ প্রতিহতকারী বিডিআর সদস্য।**

ক। কমিশন পিলখানায় অবস্থানরত অফিসার, তাদের পরিবারবর্গ এবং বিডিআরের সদস্যদেরকে প্রশ্ন করেছিল তারা কেউ কোন বিডিআর সদস্যকে বিদ্রোহ/হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখেছে কিনা। প্রত্যেকেরই উত্তর ছিল না সূচক।

খ। তবে বিদ্রোহ প্রতিহত করার চেষ্টার জন্য সেন্ট্রাল সুবেদার মেজর মো. নূরুল হককে সরকার ইতোমধ্যেই শহীদ ঘোষণা করেছে। অত্র কমিশন এডি খন্দকার আব্দুল আউয়াল এর সুরতহাল এবং ময়না তদন্ত রিপোর্ট পর্যালোচনা করে দেখেছে যে, তার মৃত্যু ঘটেছে ধারালো অস্ত্রের আঘাতে। ধারণা করে নেওয়া যায় যে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যাওয়ার জন্যই তাকে বেয়নেটের আঘাতে হত্যা করা হয়েছে। সুতরাং তিনি বিদ্রোহ ও হত্যাকান্ড দমন করতে গিয়েই নিহত হয়েছে। এছাড়াও, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (তৎকালীন লে. কর্নেল) মো. শামছুল আলম চৌধুরী স্বচক্ষে দেখেছেন সুবেদার সহকারী আবুল কাশেমকে কিছু হত্যাকারী কর্তৃক গুলি করে হত্যা করতে। তিনিও হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে যাওয়ায় তাকে হত্যা করা হয়েছে।

১৩২। **তাপস হত্যাচেষ্টার ঘটনা**।

ক। আটকের কারণ। পাঁচজন অফিসারকে ডিজিএফআই কর্তৃক কোনো আইনি প্রক্রিয়ায় আটক করা হয়নি, মৌখিক আদেশে আটক করা হয় এবং আটকের পূর্বে বা পর লিখিতভাবে কোনো অভিযোগ জানানো হয়নি। তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগের প্রেক্ষিতে ডিজিএফআই কর্তৃক তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয় যেখানে বিডিআর বিদ্রোহ সম্পর্কিত ও জঙ্গি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। এই পাঁচজন অফিসার বিডিআর বিদ্রোহ নিয়ে সোচ্চার ছিলেন এবং তাঁরা তাঁদের পদাধিকার বলে বিদ্রোহ সংক্রান্ত তদন্তের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জেনে গিয়েছিলেন। ভারতীয় এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য সরকার এবং সরকারের আনুকূল্য পাবার জন্য কিছু অফিসার সেনা বাহিনীর নেতৃত্বকে দুর্বল করার জন্য মেধাবী ও দেশপ্রেমী অফিসারদেরকে পরিকল্পিতভাবে সেনাবাহিনী থেকে বের করে দেয়া, গুম, খুন, পদোন্নতি বঞ্চিত করার কাজে নিয়োজত হন। ০৫ জন অফিসার এই চক্রের শিকার এবং তাঁদের বিরুদ্ধে তাপস হত্যা চেষ্টার অভিযোগ আনা হয়। ভুক্তভোগী অফিসারদের মতে এই ঘটনার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল শেখ পরিবারের আজীবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তৎকালীন ডিজি বিডিআর মেজর জেনারেল মইনুল বিডিআরে কর্মরত অফিসাদেরকে কর্নেল (পরবর্তীতে জেনারেল) আজিজ আহমেদের মাধ্যমে ডিজিএফআইতে পাঠান। কমান্ড ব্যাটালিয়নে কর্মরত অফিসারদেরকে তৎকালীন সিজিএস ও ডাইরেক্টর মিলিটারি অপারেশনের সম্মতিতে ডিজিএফআই-এ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঠানো হয়। পুরো আটক প্রক্রিয়াটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ।

খ। তাপস হত্যাচেষ্টার অভিযোগের তদন্ত কার্যক্রম

(১) অভিযোগের সূত্র। তৎকালীন ডিজি ডিজিএফআই এর নির্দেশে সাবেক পরিচালক সিটিআইবি মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস জনাব মনিরুল ইসলাম অতিরিক্ত আইজিপি (বর্তমানে পলাতক) এর কাছ থেকে তাপস হত্যার মামলা গ্রহণ করেন। মামলার আলামত হিসেবে জনাব মনিরুল ইসলাম একটি মোবাইল যোগাযোগের নকশা দিয়েছিলেন এবং সাথে কিছু মোবাইল ফোন নম্বর ছিল।

(২) প্রাথমিক তদন্ত। অফিসারদেরকে ডিজিএফআই-এ আটক রেখে জেআইসিতে নির্যাতনের মাধ্যমে মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস প্রাথমিক তদন্তে অফিসাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না পেয়ে ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা করেছিলেন যেখানে মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস নিরপেক্ষ তদন্ত ও বিচারিক কাজে বাধার সৃষ্টি করেছিলেন।

(৩) প্রথম তদন্ত আদালত। মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস প্রাথমিক তদন্তে অফিসাদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না পাওয়ায় অফিসারদেরকে অফিসার মেস 'বি'তে আটক রেখে ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদার নেতৃত্বে গঠিত তদন্ত আদালতের তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়। এই তদন্ত চলাকালে ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা তদন্ত আদলতের সদস্যদেরকে নিয়ে ডিজিএফআই এর ব্রিফিং এর জন্য গিয়েছিলেন। ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা, মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস এবং মেজর জেনারেল সালেহ তদন্ত আদালতের সদস্যদেরকে ব্রিফিং দেননি বলে কমিশনে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই তদন্ত চলাকালে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য অফিসারদেরকে পালাক্রমে জেআইসি-তে নিয়ে যাওয়া হতো যা ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা জানতেন। এই তদন্ত শেষে অফিসারদের

বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। এই তদন্ত শেষে ব্রিঃ জেনারেল ইমামুল হুদা অফিসারদেরকে না জানিয়ে তাদেরকে এআইসি (Army Interrogation Cell)-তে প্রেরণের নির্দেশ দেন। ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদার নির্দেশে ব্রি. জেনারেল ফেরদৌসুল শাহাব অফিসারদেরকে এএইচকিউ মেসে নিয়ে যাবার কথা বলে এআইসি-তে হস্তান্তর করেন। ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা অফিসারদেরকে এআইসি প্রেরণের নির্দেশ দেয়ার বিষয়টি স্বীকার করেননি। জেআইসিতে অফিসারদেরকে আটক এবং নির্যাতনের দায় মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস এবং মেজর জেনারেল সালেহর উপর বর্তায় ।

(৪) <u>এআইসি</u>। এআইসিতে অফিসারদের উপর অমানবিক নির্যাতন করা হয়। প্রায় এক মাস অফিসারদেরকে এআইসিতে আটক রাখা হয় এবং নির্যাতনের মাধ্যমে তাঁদেরকে দিয়ে একাধিক সাদা কাগজে স্বাক্ষর করানো হয়। আটক অফিসারদের কাছ থেকে জোরপূর্বক সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেওয়া হয় যা সম্পূর্ণ বেআইনি, অগ্রহণযোগ্য এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর দায় ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদার উপর বর্তায়।

(৫) <u>অফিসারদের আটক রাখা অবস্থায় তাঁদের পরিবারের অবস্থা</u>। অফিসারদেরকে ডিজিএফআই এবং এআইসিতে আটক রাখা হয়। অফিসারদের পরিবার তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে কিছু জানতে পারেনি এবং তাঁরা পাগলের মত ছুটাছুটি করেছেন। তাঁরদেরকে ডিজিএফআইতে নিয়ে নির্যাতন করা হয়েছে এবং এআইসিতে নির্যাতনকালে অফিসারদেরকে তাঁদের পরিবারের লাইভ ভিডিও দেখিয়ে স্বীকারোক্তি না দিলে পরিবারের বিপদ হবে মর্মে ভয় দেখনো হয়েছে। তৎকালীন ৪৬ স্বতন্ত্র পতাদিক ব্রিগেড কমান্ডার মেজর জেনারেল রেজানূর আটককৃত পরিবারদেরকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী না দিলে অফিসারদের অবস্থান জানানো হবে না। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের উদ্দেশ্যে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের লাইভ ভিডিও দেখানো বা তাঁদের নিরাপত্তার প্রতি ইঙ্গিত করে ভয়ভীতি সৃষ্টি করা গুরুতর বেআইনি ও সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। আটককৃত অফিসারদেরকে মুক্ত করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তাঁদের স্ত্রীদের ব্ল্যাকমেইল করা হয় যা একটি অত্যন্ত গুরুতর, নিন্দনীয় এবং শাস্তিযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ।

ডিজিএফআই, জেআইসি এবং এআইসিতে আটককালে অফিসারদের উপর উল্লিখিত ঘটনাগুলি ঘটেছে। সাবেক ডিজি ডিজিএফআই লে. জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবর, সাবেক পরিচালক সিটিআইবি মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস, সাবেক জি-১ সিটিআইবি মেজর জেনারেল সালেহ, ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা এবং সাবেক কমান্ডার ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড মেজর জেনারেল রেজানূর তাঁদের সংশ্লিষ্টতা এড়াতে পারেন না।

(৬) <u>দ্বিতীয় তদন্ত আদালত</u>। এআইসি থেকে অফিসারদেরকে নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করার পর তাঁদেরকে পুরাতন সেনাসদর অফিসার মেসে আটক করা হয় এবং ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদার নেতৃত্বে নতুন সদস্যদের সমন্বয়ে পুনরায় তদন্ত কার্যক্রম শুরু হয়। ভুক্তভোগী অফিসারদের মতে এআইসিতে স্বাক্ষরিত সাদা কাগজে ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী টাইপ করিয়ে অফিসারদেরকে দেখিয়ে তদন্ত কার্যক্রম শেষ করেন এবং হুমকি দেন যে এই জবানবন্দী অস্বীকার করলে পুনরায় তাঁদেরকে এআইসিতে প্রেরণ করা হবে এবং অফিসারদেরকে এআইসিতে নিয়ে যাবার জন্য গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে মর্মে একটি গাড়ি দেখানো হতো। জোর করে অফিসারদের কাছ থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর নেয়া এবং পরবর্তীতে সেই কাগজে স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য টাইপ করে/লিখে নেয়া ফৌজদারি অপরাধ, সম্পূর্ণ বেআইনি, অগ্রহণযোগ্য এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তদন্ত আদালতের সভাপতি ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা এবং তদন্ত আদালতের প্রধান দুই সদস্য ব্রি. জেনারেল মাহমুদ হাসান এবং ব্রিঃ জেনারেল মাহবুব সারোয়ার এর দায় এড়াতে পারেন না।

(৭) **আলামত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং যাচাই (Chain of Custody)**. তাপস হত্যা চেষ্টা মামলায় তদন্ত আদালত তিনটি আলামতের কথা উল্লেখ করেছে যেখানে Chain of Custody রক্ষা করা হয়নি যা আলামতসমূহকে অগ্রণযোগ্য করে ফেলেছে। বিস্তারিত নিম্নে দেয়া হলোঃ

(ক) অফিসার কর্তৃক ব্যবহৃত মোবাইল সিম। মোবাইল সিম গুলি অফিসারদের নামে ক্রয় করা ছিল না এবং কোনো কর্তৃপক্ষ (ডিজিএফআই এবং তদন্ত আদালত) সিম ক্রয়ের সূত্র যাচাই করেনি।

(খ) প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, আইইডি সরঞ্জাম, ডেটোনেটর। দ্বিতীয় তদন্ত আদালতের সভাপতি এবং সদস্যরা বলেছেন যে ক্যাপ্টেন রাজিব ইউনিট প্রশিক্ষণের সময় অল্প অল্প করে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, আইইডি সরঞ্জাম, ডেটোনেটর সরিয়ে রাখতেন। অধিনায়ক প্যারা কমান্ডো ব্যাটালিয়ন সাক্ষ্য দিয়েছেন যে বিষয়টি অসম্ভব কারণ প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, আইইডি সরঞ্জাম, ডেটোনেটর ইত্যাদি এককভাবে কারো পক্ষে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না। এনসিও, জেসিও ও অফিসারদের সমন্বিত অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্লাস্টিক এক্সপ্লোসিভ, আইইডি সরঞ্জাম, ডেটোনেটর ইত্যাদি স্টোর থেকে বের করা, ব্যবহার করা এবং হিসেব রাখা হয়। এই কাজে বাইরে থেকেও অফিসার থাকেন। অগোচরে কিছু করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এই বিষয়ে একাধিকবার স্টক টেকিং হয়েছে এবং তদন্ত আদালত হয়েছে যেখানে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি। তদন্ত আদালতের কোন সদস্য এই বিষয়ে ইউনিট পরিদর্শন করেনি।

(গ) এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র উদ্ধার। ১৬ ইসিবির ক্যাম্প এলাকা থেকে এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে মর্মে তদন্ত আদালত আলামত হিসেবে উল্লেখ করেছে। ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদা এবং ব্রি. জেনারেল মাহমুদ কমিশনে জানিয়েছেন যে, যথাযথ প্রক্রিয়ায় আলামত উদ্ধার করা হয়েছে। মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস এবং মেজর জেনারেল সালেহর বক্তব্য অনুযায়ী মেজর জেনারেল সালেহ একজন অফিসারকে এবং অভিযুক্ত ক্যাপ্টেন রাজিবকে নিয়ে ইউনিট যান এবং ক্যাপ্টেন রাজিব ক্যাম্প থেকে এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র নিয়ে আসেন। তাপস হত্যা চেষ্টা একটি অত্যন্ত গুরুতর ঘটনা যা সামরিক অফিসারের শৃঙ্খলা ও বিশ্বস্ততা এবং সামগ্রিকভাবে সেনাবাহিনীর অস্ত্র ও গোলাবারুদের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। আলামত হিসেবে এক ট্রাঙ্ক অস্ত্র উদ্ধার ও সংরক্ষণ দেশের আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়নি। যেমন তদন্ত ও বিচারের জন্য ক্রাইম সিনের ইন্টেগ্রিটি নিশ্চিতকরণ, ক্রাইম সিনের প্রবেশাধিকার নিয়ন্ত্রণ করা, এলাকার নকশা তৈরি করা, একটি পরিধি স্থাপন, প্রতিটি পদক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা যাতে আঙুলের ছাপ, ডিএনএ এবং Physical evidence রক্ষা করা যায় এবং সকল ক্ষেত্রে ইউনিটকে সম্পৃক্ত করা অপরিহার্য ছিল। এত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি না করায় ঘটনার সত্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক এবং অফিসারগণ তাঁদের ইউনিটে এই জাতীয় ঘটনা ঘটে নাই বলে কমিশনকে জানেন। তাপস হত্যা চেষ্টা একটি গুরুতর অপরাধ যেখানে আলামতের ফরেন্সিক পরীক্ষা এবং Chain of Custody সংরক্ষণ না কারার কারণে আইন লঙ্ঘিত হয়েছে এবং অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। এর দায় মেজর জেনারেল সালেহ এবং ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদার উপর বর্তায় ।

গ। কোর্ট মার্শাল। তদন্ত আদালতের সভাপতি ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদার ভাষ্য অনুযায়ী তদন্ত আদালতের প্রতিবেদন অসম্পূর্ণ থাকার কারণে এটি কোর্ট মার্শালের জন্য ইনভ্যালিড ছিল। তাছাড়া তদন্ত আদালতের প্রতিবেদন কোর্ট মার্শালের সিদ্ধান্তের জন্য চূড়ান্ত দলিল নয় এবং এই তদন্ত প্রতিবেদন কোর্ট মার্শালের নিয়মিত সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থাপন, যাচাই, ক্রস এক্সামিনেশন বারিত করে না। কোর্ট মার্শালের প্রসিকিউটর এবং সামারি অভ্ এভিডেন্স রেকর্ডকারী অফিসার কমিশনে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে তারা তদন্ত আদালতের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীর উপর ভিত্তি করে অভিযোগ প্রমাণ করেছেন যেখানে তাঁরা সাক্ষ্য

প্রমাণ উপস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। অভিযুক্তদের ফ্রেন্ড অভ্ দি একিউজড ছিল না, তাঁদেরকে এমবিএমএল ও অন্যান্য আইনি সহায়তা দেয়া হয়নি এবং এক ঘন্টার মধ্যে কোর্ট মার্শাল সম্পন্ন করা হয়। প্রসিকিউটর এবং সামারি অভ্ এভিডেন্স রেকর্ডকারী অফিসার উভয়েই তদন্ত আদালতের সদস্য ছিলেন যারা আলামতের Chain of Custody নিশ্চিত করেননি। এই প্রেক্ষিতে তাঁরা উভয়েই নিরপেক্ষতা হারিয়েছেন এবং যথাযত প্রক্রিয়া অনুসরণ না করে সুবিচার নিশ্চিত করেননি। যাদের কাস্টোডিতে অভিযুক্ত অফিসারগণ ছিলেন তাঁদের আইনি দায়িত্ব ছিল অভিযুক্ত অফিসারদেরকে আইনী সহায়তা প্রদান করা যা তাঁরা করেননি। একই সাথে অফিসারদের প্রতিষ্ঠানের অধিনায়ক/প্রতিষ্ঠান প্রধানদের দায়িত্ব ছিল অফিসারদেরকে আইনী সহায়তা প্রদান করা যা তাঁরা করেননি। অফিসারগণ ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেডের সাথে সংযুক্ত ছিলেন এবং আইনী সহায়তা দেয়ার দায়িত্ব ছিল সাবেক ৪৬ স্বতন্ত্র পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডারের উপর।

ঘ। <u>পুলিশের চূড়ান্ত প্রতিবেদন</u>। জনাব ফজলে নূর তাপস বাদী হয়ে বিস্ফোরক আইনে মামলা করেন। তদন্তে বাদী কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করতে পারেননি এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা দীর্ঘ তদন্তের পর কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ পাননি। তাঁরা আরও উল্লেখ করেন যে এই মামলায় কোনো সামরিক অফিসারের সম্পৃক্ততা নেই।

ঙ। <u>ঘটনাকালীন অফিসারদের অবস্থান</u>। ২১ অক্টোবর ২০০৯ সন্ধ্যায় যখন তথাকথিত ঘটনা ঘটেছে বলে প্রচারিত হয়েছে বলা হয়, কিন্তু সেই দিন সন্ধ্যায় ক্যাপ্টেন রাজিব ইউনিটের রোল কলে উপস্থিত ছিলেন, ক্যাপ্টেন ফুয়াদ পিলখানায় যৌথবাহিনীর সমন্বয় সভায় উপস্থিত ছিলেন, ক্যাপ্টেন রেজা পিলখানার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন, ক্যাপ্টেন সুবায়েল তৎকালীন ডিজির ভারপ্রাপ্ত এডিসি এবং মেজর হেলাল তৎকালীন ডিজির কর্ড হিসেবে দায়িত্বরত ছিলেন। তৎকালীন ডিজি লে. জেনারেল মইনুল ইসলাম কনফারেন্সে সকল অফিসাদেরকে সতর্ক করে অপরিচিত ব্যক্তির মোবাইল কল রিসিভ না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। ঘটনাকালীন সময়ে অফিসারদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ায় দায়িত্ব ছিল সাবেক ডিজি ডিজিএফআই লে. জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবর, সাবেক পরিচালক সিটিআইবি মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস, সাবেক জি-১ সিটিআইবি মেজর জেনারেল সালেহ, তদন্ত আদালতের সভাপতি ব্রি. জেনারেল ইমামুল হুদার উপর, যারা বিষয়টি তৎকালীন ডিজি বিডিআরের সাক্ষ্য নিয়ে প্রমাণ করেছিলেন কি না তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

চ। <u>ঘটনা সম্পর্কে নিরপেক্ষ অফিসারদের বক্তব্য</u>। একাধিক অফিসার সাক্ষ্য দিয়েছেন যে ঘটনাটি সাজানো এবং দেশেপ্রেমী ও বিডিআরের বিচার নিয়ে সোচ্চার অফিসারদেরকে সেনাবাহিনী থেকে বের করে দেয়ার একটি প্রক্রিয়া।

ছ। সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তার সাক্ষ্যের ভিত্তিতে তাপস হত্যা চেষ্টার বাস্তবতা পাওয়া যায়নি। অপর দিকে অভিযোগ প্রমাণের ডিজিএফআই এবং সেনা তদন্ত আদালত কর্তৃক যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি, যার মধ্যে Chain of Custody পাওয়া যায়নি এবং কোনো ফরেন্সিক পরীক্ষা করা হয়নি। কোর্ট মার্শাল পরিচালিত হয়েছে ইনভ্যালিড কোর্ট অভ্ ইনকোয়েরির উপর।

জ। তাপস হত্যা চেষ্টা মামলা ও শাস্তি ছিল ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত। একই সাথে এই ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিবর্গ সেনা আইন লঙ্ঘন, মিথ্যা অভিযোগ তৈরি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো অপরাধ সংঘটিত করেছে। সংশ্লিষ্ট সামরিক অফিসারগণ কমিশনে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার মাধ্যমে সত্য উদঘাটনে বাধা সৃষ্টি করেছেন।

১৩৩। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে সংঘটিত বিডিআর হত্যাকান্ড হতে মূল শিক্ষণীয় বিষয়ঃ

ক। কোন বাহিনীকে তার ক্লাসিক্যাল রোলের বাইরে নিয়োজিত করা উচিত নয়। তাতে একদিকে যেমন দুর্নীতির প্রসার ঘটে তেমনি সংশ্লিষ্ট বাহিনী তার পেশাদারিত্ব হারায়।

খ। অফিসার ও জওয়ানদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক যে কোন বাহিনীর জন্যই অত্যাবশ্যক।

গ। রাজনীতিবিদ, বিশেষ করে শাসক রাজনৈতিক দল, দেশপ্রেমিক না হলে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে বিডিআর হত্যাকান্ডের সময় কিছু রাজনীতিবিদ তাদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দিয়ে বিডিআরকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল এবং সেনাবাহিনীর মনোবল সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে দিয়েছিল। কেড়ে নিয়েছিল ৫৭ জন চাকরিরত চৌকষ অফিসারসহ ৭৪টি তাজা প্রাণ।

ঘ। বাহিনীর নেতৃত্ব রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্বাচিত হলে বাহিনী তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে।

ঙ। বাহিনীর শীর্ষ নেতৃত্ব রাজনৈতিক আনুকূল্য পাওয়ার আশায় রাজনীতিবিদদের লেজুরবৃত্তি করলে সে বাহিনী ব্যর্থ হতে বাধ্য।

চ। যে কোন বাহিনী তার দায়িত্বে সফল হতে হলে সে বাহিনীর প্রত্যেক স্তরের কমান্ডারদের তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা থাকা একান্ত আবশ্যক।

ছ। যে কোন বাহিনীর সদস্যরা নিজেরাই ষড়যন্ত্রে জড়িত হয়ে পরা সে বাহিনীর জন্য একান্তভাবেই দূর্ভাগ্যের বিষয়। বাহিনীর কোন সদস্য যেন এরূপ কোন কাজে জড়িয়ে পরতে না পারে সে বিষয়ে বাহিনীর নেতৃত্বকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

জ। সামরিক ও বেসামরিক পরিমন্ডলে পদোন্নতি এবং পদায়নের ক্ষেত্রে পেশাদারিত্ব এবং যোগ্যতা উপেক্ষিত হলে অপেশাদার ও অযোগ্য নেতৃত্বের কারণে সেই প্রতিষ্ঠানসমূহ অকার্যকর হয়ে যাওয়া অবশ্যম্ভাবী। পিলখানার হত্যাযজ্ঞ এর একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

কমিশনের সুপারিশ

সাধারণ।

১৩৪। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর পিলখানা হত্যাকান্ড বাংলাদেশের তথা সারা বিশ্বের ইতিহাসে একটি নিকৃষ্টতম, বর্বরতম ও নৃশংসতম ঘটনা যা শুধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকেই নয় বরং পুরো দেশ ও বিশ্বকে বিস্ময়ে হতবাক করে তুলেছিল। কর্মরত ৫৭ জন সেনা অফিসারকে হত্যা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মূলে আঘাত করার শামিল। দেশ ও জাতি ভবিষ্যতে এ ধরণের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কখনোই দেখতে চায়না। ভবিষ্যতে এরূপ যে কোন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে অত্র কমিশন সরকারের সদয় বিবেচনা ও কার্যকর পদক্ষেপের জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশসমূহ প্রস্তাব করছেঃ

প্রাতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতি

১৩৫। **সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া**। ব্যক্তি সিদ্ধান্তের পরিবর্তে প্রতিষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। যে কোন জাতীয় সংকট ও দুর্যোগ মোকাবেলায় জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভা ডেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কোন দুর্যোগ ও জাতীয় সংকট না হলেও নিয়মিতভাবে জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলের সভা অনুষ্ঠিত হতে হবে, যেন যেকোন জাতীয় সংকটের মুহূর্তে এ কমিটিকে তাৎক্ষণিকভাবে সক্রিয় করা যায়।

১৩৬। **সশস্ত্র বাহিনীকে দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে রাখা**। সশস্ত্র বাহিনীকে কোন কাজে নিয়োজিত করলে তাদেরকে কোন রকম রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই কাজ করতে দিতে হবে। প্যারালাল কমান্ড স্থাপন হবে আত্মঘাতী।

১৩৭। **ক্লাসিক্যাল রোল।** দেশের কোন বাহিনীকেই সে বাহিনীর ‘ক্লাসিক্যাল রোল’ এর বাইরে নিয়োজিত না করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

শাস্তি।

১৩৮। কমিশনের মতামতের ১১০ হতে ১১৮ পর্যন্ত স্তবকে বর্ণিত কৃত অপরাধসমূহের জন্য পরবর্তী স্তবক সমূহের বর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তি ব্যবস্থা করতে সুপারিশ করা হলো।

১৩৯। **রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ**

ক। শেখ হাসিনা।
খ। ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস।
গ। শেখ ফজলুল করিম সেলিম।
ঘ। জাহাঙ্গীর কবির নানক
ঙ। মির্জা আজম।
চ। মোহাম্মদ কামরুল ইসলাম।

ছ। ওয়ারেসাত হোসেন বেলাল
জ। মাহবুব আরা গিনি।
ঝ। আসাদুজ্জামান নূর।
ঞ। তানজীম আহমেদ সোহেল তাজ।
ট। মেজর জেনারেল তারিক আহমেদ সিদ্দিক (অব.)।
ঠ। শাহীন সিদ্দিক (স্বামী-মেজর জেনারেল তারেক আহমেদ সিদ্দিক)।
ড। লে. কর্নেল ফারুক খান (অব.)।
ঢ। মেহের আফরোজ চুমকি।
ণ। লেদার লিটন (তোরাব আলীর পুত্র)।
ত। **মেজর খন্দকার আব্দুল হাফিজ (অব.)।**

১৪০। **প্রাক্তন সামরিক কর্মকর্তাবৃন্দ**।

ক। জেনারেল মঈন ইউ আহমেদ (প্রাক্তন সেনা প্রধান)।
খ। ভাইস অ্যাডমিরাল জহির উদ্দীন আহম্মেদ (প্রাক্তন নৌ বাহিনী প্রধান)।
গ। এয়ার মার্শাল এসএম জিয়াউর রহমান (প্রাক্তন বিমান বাহিনী প্রধান)।
ঘ। লে. জেনারেল সিনা ইবনে জামালী।
গ। **জেনারেল আজীজ আহমেদ।**
ঘ। লে. জেনারেল মোঃ মইনুল ইসলাম।
ঘ। **লে. জেনারেল চৌধুরী হাসান সারওয়ার্দী।**
ঙ। ব্রিগে. জেনারেল আব্দুল হাকিম আজিজ।
চ। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ শামসুল আলম চৌধুরী।
চ। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইমামুল হুদা।
ছ। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহমুদ হোসেন।
জ। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মাহবুব সারোয়ার।

১৪১। **ডিজিএফআই**।

ক। লে. জেনারেল মোল্লা ফজলে আকবর (অব.)।
খ। লে. জেনারেল মামুন খালেদ (অব.)।
গ। মেজর জেনারেল ইমরুল কায়েস (অব.)।
ঘ। মেজর জেনারেল সুলতানুজ্জামান সালেহ উদ্দীন (অব.)।

১৪২। **এনএসআই**।

ক। মেজর জেনারেল শেখ মুনিরুল ইসলাম (অব.)।
খ। মেজর জেনারেল টিএম জোবায়ের (অব.)।

১৪৩। **র‍্যাব**

ক। তৎকালীন ডিজি র‍্যাব জনাব হাসান মাহমুদ খন্দকার।
খ। মেজর জেনারেল রেজানুর রহমান খান (অব.)।
গ। মেজর জেনারেল জিয়াউল আহসান (অব.)।
ঘ। ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আজিম আহমেদ (তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত ডাইরেক্টর ইন্টেলিজেন্স র‍্যাব)।

১৪৪। **২০০৯ সালে গঠিত তদন্ত কমিটি সমূহ**

ক। ২০০৯ সালে গঠিত জনাব আনিস-উজ-জামানের নেতৃত্বাধীন জাতীয় তদন্ত কমিটি। (কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের নাম উদঘাটিত তথ্যবলীর প্যারা ৫৯-তে বর্ণিত আছে। কমিটির প্রতিবেদনের সাথে একমত না হওয়ায় ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হাসান নাসিরের নাম বাদ দেওয়ার সুপারিশ করা হলো)।

খ। ২০০৯ সালে গঠিত লে. জেনারেল জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন সেনা তদন্ত কমিটি। (কমিটির সভাপতি ও সদস্যদের নাম উদঘাটিত তথ্যাবলীর প্যারা ৬০-তে বর্ণিত আছে। কমিটির মতামত ও সুপারিশে সংগত কারণে কোন অবদান না থাকায় লে. কর্নেল ও তদনিম্ন পদবির অফিসারদেরকে বাদ দেওয়া সুপারিশ করা হলো)।

১৪৫। **বিডিআর**।

ক। কর্নেল সাইদুল কবির (অব.)।
খ। লে. কর্নেল ফোরকান আহমদ (অব.)।
গ। মেজর গোলাম মাহবুবুল আলম চৌধুরী (অব.)।

১৪৬। **পুলিশ**

ক। আইজিপি নূর মোহাম্মদ।
খ। ডিএমপি কমিশনার নাইম আহমেদ।
গ। তৎকালীন অতিরিক্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল (এসবি) বাহারুল আলম।
ঘ। অতিরিক্ত আইজিপি মনিরুল ইসলাম।
ঙ। অতিরিক্ত ডিআইজি আব্দুল কাহার আকন্দ ও তাঁর অধীনস্থ তদন্ত দল।

১৪৭। **মিডিয়া**

ক। সাংবাদিক মুন্নী সাহা।
খ। সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুল।
গ। সাংবাদিক জহিরুল ইসলাম মামুন (জ ই মামুন)।

১৪৮। জাতীয় স্বাধীন তদন্ত কমিশন দীর্ঘ তদন্তের মাধ্যমে যে ব্যক্তির্গের বিরুদ্ধে অপরাধ, কর্তব্যে অবহেলা, অনিয়ম ও ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে সহায়তার প্রমাণ পেয়ে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তির জন্য সুপারিশ করেছে, তাঁদেরকে আগামীতে সরকারি তথা রাষ্ট্রীয় কোনো দায়িত্ব বা নিয়োগ না দেয়ার জন্য সুপারিশ করছে।

বিজিবি সংক্রান্ত সুপারিশ।

১৪৯। বিডিআর হত্যাকান্ডের পর প্রায় ১৭ বছর পেরিয়ে গেছে এবং ইতোমধ্যে বিডিআরের নাম পরিবর্তন করে বিজিবি করা হয়েছে। সাংগঠনিক কাঠামোতেও আনা হয়েছে বড় ধরনের পরিবর্তন। তবে বিজিবির ব্যাটালিয়নসমূহে অফিসারের সংখ্যা এখনো অপ্রতুল। এত কম সংখ্যক অফিসার দিয়ে বিজিবি সৈনিকদের সাথে কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন ও নিয়মিত পরিদর্শন করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। ফলে অফিসার ও সৈনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখনো তেমন কোন উন্নতি সাধিত হয়নি। বিজিবিতে যথেষ্ট সংখ্যক অফিসার দেয়ার জন্য সেনাবাহিনীকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে মেজর ও লে. কর্নেল পদবির অফিসারদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে বিজিবিতে অফিসারের সংখ্যা বৃদ্ধি করার সুপারিশ করা হলো।

১৫০। বিজিবি সদস্যদের নিয়মিত প্রেষণা প্রদানের মাধ্যমে কমান্ড চ্যানেলের প্রতি অনুগত রাখার ব্যবস্থা করতে হবে। এখন যেহেতু ৫টি রিজিয়নের পাঁচজন রিজিয়ন কমান্ডার আছেন, তারা এবং সেক্টর কমান্ডাররা নিয়মিত দরবার গ্রহণ করে অধীনস্ত সবাইকে চলমান ঘটনাবলী এবং বিজিবির বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত রাখতে পারেন।

১৫১। বিজিবির সাংগঠনিক কাঠামোতে এখন গার্ডস সিকিউরিটি ব্যুরো সংযোজন করা হয়েছে। এদের কার্যক্রম কোম্পানি পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্যে হবে বর্ডার এলাকায় প্রতিপক্ষের এবং চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ। পাশাপাশি বাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন অসন্তোষ সম্পর্কে উপরস্থ কমান্ড চ্যানেলকে অবহিত করাও এ সংস্থার কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে।

১৫২। ন্যাশনাল সিকিউরিটি ইন্টেলিজেন্স এবং ডিজিএফআই-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বিজিবির মধ্যে চালু করা অত্যন্ত জরুরি।

১৫৩। বিজিবি সদস্যদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী মিশনে প্রেরণ করা হলে বাহিনীর মনোবল বৃদ্ধি পাবে এবং অপরাধ সংঘটনে নিরুৎসাহিত হবে।

১৫৪। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল বাহিনীর বেতন কাঠামো ও পদ মর্যাদায় সমতা আনয়ন করা।

১৫৫। বিজিবি সদস্যদের পরিবারের চিকিৎসা এবং শিক্ষার মান ও আওতা বৃদ্ধি করা।

১৫৬। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিজিবি ক্যাম্প ও বিওপিতে রসদ সরবরাহ এবং রোগী স্থানান্তর ব্যবস্থা নিশ্চিত করণের জন্য বিজিবি এয়ার উইং এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রতিপক্ষের সক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি রেখে ক্যাম্প ও বিওপিসমূহে অবজারভেশন টাওয়ার স্থাপন, বিদ্যুতের ব্যাবস্থা করণ ও যানবাহন প্রদান করা অত্যন্ত জরুরি। বর্ডার রোড নির্মাণ এখন সময়ের দাবি।

১৫৭। সকল বিজিবি ক্যাম্প ও বিওপিতে পাকা আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

১৫৮। **বিজিবিতে নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ায় অফিসার নিয়োগ দেওয়া যেতে পারেঃ**

ক। উপ-পরিচালক পর্যন্ত পদসমূহের শতকরা ৫০ ভাগ পদ বিজিবি থেকে পূরণ করা যেতে পারে। পরিচালক ও তদূর্ধ্ব পদবিসমূহ সেনাবাহিনী হতে আসা অফিসার দিয়ে পূরণ করা আবশ্যক।

খ। উপ-পরিচালক পর্যন্ত শতকরা ৫০ ভাগ পদ নিম্নবর্ণিত উপায়ে পূরণ করাঃ

(১) সর্বোচ্চ পাঁচ থেকে দশ বছর চাকরি সম্পন্ন ইউনিফর্মধারী বিজিবি সদস্যদের মধ্য হতে লিখিত, মৌখিক ও ডাক্তারি পরীক্ষার ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করতঃ আইএসএসবি কর্তৃক সংক্ষিপ্ত মনস্তাত্ত্বিক, শারীরিক ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন শেষে বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে স্বল্প মেয়াদী (তিন মাস) প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। উপরোল্লিখিত প্রশিক্ষণ শেষে বিজিটিসিএন্ডসি-তে ছয় অথবা নয় মাস ব্যাপী কোর্স শেষে পাসিং আউট প্যারেডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা প্রথম শ্রেণীর অফিসার (এডি) হিসেবে বিজিবির বিভিন্ন ইউনিটে যোগদান করতে পারে। ইউনিটে দুই বছর চাকরি সমাপনান্তে তাদেরকে বিজিবির বিভিন্ন সদর দপ্তরে নিয়োগ করা।

(২) ক্রমান্বয়ে তারা সহকারী পরিচালক হতে পদোন্নতি প্রাপ্ত হয়ে সিনিয়র সহকারী পরিচালক, অতিরিক্ত পরিচালক ও বিশেষ ক্ষেত্রে পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন।

১৫৯। **যোগ্য নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণ।** ইউনিট পর্যায়ে দক্ষ, মানবিক ও অংশগ্রহণমূলক নেতৃত্ব তৈরি করা। কর্মকর্তাদের জন্য নিয়মিত 'Leadership Ethics and Moral' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের পাশাপাশি প্রভাববলয় ও গ্রুপিং প্রতিরোধে অফিসার থেকে শুরু করে সকল সদস্যদের নিয়মিত Rotation এর ব্যবস্থা করা।

১৬০। **শৃংখলার কঠোর প্রয়োগ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা।** বাহিনীর সকল স্তরে যে কোন অনিয়ম ও অসদাচরণ স্বচ্ছতার ভিত্তিতে বিচারের মাধ্যমে দ্রুত নিস্পন্ন করা। বিজিবি এ্যাক্ট ও আচরণ বিধির বিষয়ে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা।

১৬১। **কল্যাণমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি এবং মনোবল ও নৈতিকতার উন্নয়ন।** পদোন্নতি ও পুরস্কার প্রদান প্রক্রিয়ায় লিখিত ও ঘোষিত নীতিমালার আলোকে সম্পূর্ণ মেধা ও যোগ্যতা ভিত্তিক নীতি অনুসরণ করার পাশাপাশি সবার জন্য উন্নত রেশন, বাসস্থান, চিকিৎসা ও পারিবারিক সুবিধা প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকরণ, মানসিক ও নৈতিক সহায়তা প্রদানে প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং এর পাশাপাশি বিশেষ ক্ষেত্রে 'স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ও সাইকোলজিক্যাল ইভালুয়েশন প্রোগ্রাম' চালু করা।

১৬২। **প্রাতিষ্ঠানিক আস্থা বৃদ্ধি।** বাহিনীর সদস্যদের জাতীয় উন্নয়ন, ত্রাণ ও উদ্ধার কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা। Esprit de Corps ও দেশপ্রেমের চেতনা জোরদার করতে সাংস্কৃতিক ও নৈতিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণ। জাতীয় বীরদের এবং বিজিবির মধ্যে উদাহরণ সৃষ্টিকারী সদস্যদের বীরত্বগাঁথা প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে সংযোজিত করতে হবে।

১৬৩। **গুজব ও অপপ্রচার দমন।** যেকোনো অপপ্রচার কিংবা গুজব দমনের লক্ষ্যে ডিজিটাল মনিটরিং এবং Physical Security এর পাশাপাশি নিয়মিত সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন চালু রাখা।

১৬৪। **চেইন অভ্ কমান্ড।** সকল স্তরের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিকতা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে। চেইন অভ্ কমান্ডকে স্বচ্ছতার সাথে এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন কোন অপতথ্য, অব্যবস্থাপনা বা অনিয়ম থেকে কোন স্তরে ক্ষোভের জন্ম না নেয়।

১৬৫। পার্বত্য চট্টগ্রামে দায়িত্ব পালনকালে প্রণোদনার ব্যবস্থা করা।

১৬৬। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) নামের পরিবর্তে বাহিনীটির নাম বাংলাদেশ বর্ডার রাইফেলস্ (বিবিআর) অথবা রাইফেলস্ শব্দটি সম্বলিত অন্য কোনো নাম রাখার সুপারিশ করা হলো।

১৬৭। উপরিউক্ত সুপারিশসমূহ বাংলাদেশের অন্যান্য প্যারা মিলিটারি ফোর্সের জন্যও প্রযোজ্য করতে সুপারিশ করা হলো।

১৬৮। এডি ও তদূর্ধ্ব কর্মকর্তাদের সীমান্ত ভাতা প্রদান করা।

সশস্ত্র বাহিনী

১৬৯। সশস্ত্র বাহিনী দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও বিডিআর হত্যাকান্ড প্রতিরোধে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। এ ব্যর্থতার সিংহভাগ দায়ভার সেনা নেতৃত্বের উপর বর্তালেও সার্বিকভাবে এ ব্যর্থতার দায় পুরো সেনাবাহিনীর উপরই বর্তায়। সশস্ত্র বাহিনীকে ভবিষ্যতে এরূপ ব্যর্থতার দায়ভার থেকে বাঁচানোর জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলোঃ

ক। সব রকম ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক সংকীর্ণতার উর্ধ্বে উঠে সম্পূর্ণ পেশাদারিত্বের উপর ভিত্তি করে সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্ব নির্বাচনে সরকারকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

খ। ১/১১ এর সেনা সমর্থিত সরকারের আমলে সশস্ত্র বাহিনীর কর্মকান্ডের একটি ফল হলো বিডিআর হত্যাকান্ড। সুতরাং যেভাবেই হোক সশস্ত্র বাহিনীকে রাজনৈতিক ক্ষমতা হরণের সর্বনাশা উচ্চাশা থেকে দূরে রাখতে হবে।

গ। যুদ্ধের ময়দানে 'ফগ ও ফ্রিকশন' অবশ্যম্ভাবী বিষয়। সঠিক সময়ে সঠিক আদেশ যুদ্ধের ময়দানে সব সময় পাওয়া যাবেনা। এসব ক্ষেত্রেও একজন সেনা কমান্ডারের একান্ত কর্তব্য পরিস্থিতির বিচারে নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ। বিডিআর হত্যাকান্ডের সময় সেনা নেতৃত্বের প্রতিটি স্তরে এর ব্যত্যয় ঘটেছে এবং সেনা নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছেন। সেনা নেতৃত্ব গড়ে তোলার সময় প্রশিক্ষণ ও কর্মস্থলে কাজের প্রতিটি পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি চালু করতে হবে।

ঘ। বিডিআর বিদ্রোহের সময় বিভিন্ন ডিভিশনের জিওসিগণ সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় ছিলেন। এরকম একটি জাতীয় দুর্যোগে জিওসিদের উচিৎ ছিল পরিস্থিতি সমন্ধে নিজ উদ্যোগে অবগত হওয়া এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে সেনাপ্রধানকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও সেনা অভিযান পরিচালনার পক্ষে সমর্থন প্রদান করা।

ঙ। সশস্ত্র বাহিনীর নেতৃত্বের প্রতিটি পর্যায়ে নৈতিক/অনৈতিক এবং ন্যায়/অন্যায় আদেশের পার্থক্য নিরূপণ করতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। প্রতিটি পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যক্রমে এসব বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

চ। যেকোন অফিসারকে সশস্ত্র বাহিনীর বাইরে প্রেষণে (Deputation) পাঠানোর পূর্বে সে অফিসারকে সংশ্লিষ্ট বাহিনী এবং বাহিনীর কর্মকান্ড সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদান করতে হবে এবং তার করণীয়/বর্জনীয় সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা দিতে হবে।

ছ। সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাকে ঢেলে সাজাতে হবে সেখানে নিম্নবর্ণিত বিষয় সমূহকে গুরুত্ব দিতে হবেঃ

(১) জীবন দিয়ে হলেও দেশপ্রেম এবং স্বাধীনতার ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রত্যয় সৃষ্টি।
(২) Fellow feeling.
(৩) এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা।
(৪) ন্যায়/অন্যায় আদেশ পৃথকীকরণের ক্ষমতা।
(৫) মানবিক মূল্যবোধ।
(৬) নৈতিকতা।
(৭) পদোন্নতি ও পোস্টিং এর জন্য অসুস্থ প্রতিযোগিতা হতে বিরত থাকা।

পুলিশ-র‍্যাব

১৭০। পুলিশ ও র‍্যাব তাদের নিজস্ব আইন অনুযায়ী স্ব-প্রণোদিত হয়ে যেকোন ক্রাইম সিন এ অভিযান চালাতে পারে। কিন্তু বিডিআর হত্যাকান্ডে পিলখানার ভিতরে ক্রিমিনাল অফেন্স ঘটছে সন্দেহাভীতভাবে জানতে পেরেও বাহিনীর সদস্যরা কোন ব্যবস্থা নেয়নি। এ রকম জাতীয় ক্রান্তিকালে স্ব-প্রণোদিত হয়ে নিজস্ব কর্মকান্ড চালানোর জন্য পুলিশ ও র‍্যাবকে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে।

১৭১। পুলিশ কোন স্ট্রাইকিং ফোর্স না হলেও কর্ডন করা ও অপরাধী পালানো থেকে তাদেরকে বাধা দেয়ার মত কাজে তারা পারদর্শী। র‍্যাবের অভিযানিক ক্ষমতাও উৎকৃষ্ট মানের। কিন্তু বিডিআর হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে পুলিশ ও র‍্যাব কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। প্রশিক্ষণে কোন ঘাটতির কারণে এরূপ ঘটে থাকলে সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে।

১৭২। র‍্যাব-২ ও র‍্যাব-৩ এর অগ্রগামী দলসমূহ যে সময় পিলখানার যথাক্রমে ৩ ও ৪ নং গেইটে এ পৌঁছেছিল সে সময় আদেশের অপেক্ষা না করে আক্রমণ করলে বিডিআর হত্যাকান্ড সম্ভবত ঘটতোই না। তবে ঘটনাটি যেহেতু অন্য একটি বাহিনীতে ঘটেছিল সেজন্য র‍্যাবের ব্যাটালিয়ন এবং নিম্ন পর্যায়ের অফিসারদেরকে 'Benefit of

Doubt' দিয়ে শাস্তির সুপারিশ করা হলো না। তবে র‍্যাবের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় স্ব-প্রণোদিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অভিযান পরিচালনার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।

১৭৩। জাতির এ রকম ক্রান্তিলগ্নে পুলিশকে একান্তভাবেই নিস্ক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা গেছে। পুলিশের আইজিপি ও ডিএমপি কমিশনারসহ সবাই ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও হত্যাকারীদের দাবির প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনী পিছনে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করলে পুলিশ এলাকা কর্ডন করার জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেনি। পুলিশের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ও প্রশিক্ষণে জাতির এরকম ক্রান্তিকালে স্ব-প্রণোদিত হয়ে কর্মকান্ড পরিচালনার সক্ষমতা গড়ে তুলতে হবে।

গোয়েন্দা সংস্থা

১৭৪। সকল গোয়েন্দা সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য পুনর্বণ্টন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা কার্যক্রম সমন্বয় কমিটি (Central Intelligene Coordination Committee-CICC) গঠনের মাধ্যমে সকল গোয়েন্দা তথ্য পর্যালোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো। পূর্বের তদন্ত কমিটিসমূহ এই প্রস্তাব করলেও এখনো বাস্তবায়িত হয়নি। এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি।

১৭৫। **এনএসআই**। নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলোঃ

ক। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এনএসআইকে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে গড়ে তোলা।

খ। সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংস্থাটিকে প্রয়োজনীয় লোকজন ও প্রযুক্তি দিয়ে ঢেলে সাজানো।

গ। আইন প্রণয়ন করে এনএসআই এর দলীয় রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ করা।

ঘ। বিজিবির নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা ও এনএসআই এর মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ে একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি গড়ে তোলা।

ঘ। বিডিআর হত্যাকান্ডের মত পরিস্থিতিতে ঘটনা চলাকালীন সময়ে Real Time Intelligence সংগ্রহ করার সক্ষমতা গড়ে তোলা।

ঙ। এনএসআই এর প্রশিক্ষণ যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা।

১৭৬। **ডিজিএফআই**। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর বিডিআর হত্যাকান্ডের পূর্বে, ঘটনার সময় এবং ঘটনার পরে দেশের অন্যতম শীর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা হিসেবে ডিজিএফআইর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত নেতিবাচক। সংস্থাটি এ হত্যাকান্ডের আগাম কোন তথ্য দিতে পারেনি বা এ বিষয়ে কোন তথ্য সংগ্রহের চেষ্টাও করেনি। ঘটনার সময় সংস্থাটির শীর্ষ ব্যক্তিরা প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষে অবস্থান নিয়ে সেনা অভিযান পরিচালনার বিরুদ্ধে কাজ করেছিল। ঘটনার পরে তদন্ত কার্যক্রমকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্য সংস্থাটির কর্তা ব্যক্তিরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। পরবর্তীতে তাপস হত্যাচেষ্টা ঘটনায় কিছু নিরপরাধ অফিসারকে ফাঁসিয়ে দিয়ে ঘোরতর অন্যায় করেছেন। এসব অন্যায়ে কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের শাস্তির আওতায় আনা ছাড়াও সংস্থা হিসেবে ডিজিএফআইর কিছু সংস্কার প্রয়োজন। ডিজিএফআইর সংস্কারের জন্য নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করা হলোঃ

ক। ডিজিএফআইকে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা কার্যক্রম সমন্বয় কমিটির অধীনে ন্যাস্ত করা।

খ। আইন প্রণয়ন করে ডিজিএফআই এর দলীয় রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ করা।

গ। যে কোন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী অফিসারদেরকে ডিজিএফআই-এ পদায়ন বন্ধ করা।

ঘ। সংস্থাটির বেশ কিছু কর্মকর্তা সংস্থাটিকে তাদের পদোন্নতি ও সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বের আনুকূল্য পাবার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। এই প্রবণতা বন্ধ করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ঙ। বাহিনীসমূহে নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থা ও ডিজিএফআই-এর মধ্যে গোয়েন্দা তথা বিনিময়ের সক্ষমতা গড়ে তোলা।

চ। ব্যারিস্টার তাপস হত্যাকান্ড ঘটনার মতো সামরিক অফিসারদেরকে ফাঁসানো এবং গুম খুনের মতো কর্মকান্ডে জড়ানো থেকে সংস্থাটিকে দূরে রাখতে হবে।

১৭৭। **এসবি।**

ক। রিয়েল টাইম ইন্টেলিজেন্স সংগ্রহের সক্ষমতা গড়ে তোলা।

খ। স্থানীয় জনগণের সাথে মিশে তাদের মধ্যে থেকে উস্কানিদাতা, প্ররোচনাকারী এবং ষড়যন্ত্রকারী বা তাদের সমর্থন দানকারীদেরকে চিহ্নিত করার সক্ষমতা গড়ে তোলা।

গ। এসবির দলীয় রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।

ঘ। প্রশিক্ষণকে আধুনিকায়ন করতে হবে।

ঙ। এসবি বিষয়ে প্রশিক্ষিত কর্মকর্তাদের পদায়ন করতে হবে।

আওয়ামী লীগ

১৭৮। আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ নিজেরাই এ ষড়যন্ত্রের সাথে লিপ্ত ছিল। এছাড়াও স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীবৃন্দ সবাই ষড়যন্ত্রকারী ও হত্যাকারীদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করেছে। হত্যাকারীদের সমর্থনে মিছিল করা থেকে শুরু করে তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করা এবং পালানোর কাজে সহায়তা করেছে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব বিরোধী এহেন কাজের জন্য দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুপারিশ করা হলো।

১৭৯। উপরিউক্ত বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে যেসব ভিডিও/ছবি বিভিন্ন সংস্থার কাছে গচ্ছিত আছে সেগুলো পর্যালোচনা করে মিছিলে নেতৃত্বদানকারীদের সনাক্ত করতঃ তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

গণমাধ্যম

১৮০। বিডিআর হত্যাকান্ডে বিভিন্ন গণমাধ্যম খবরের সত্যতা যাচাই ছাড়াই কান্ডজ্ঞানহীন প্রচারণার মাধ্যমে বিদ্রোহকে উস্কে দিয়েছে এবং হত্যাকারীদেরকে হত্যাকান্ডে উৎসাহিত করেছে। দেশের প্রায় সকল গণমাধ্যম বিশেষ করে এটিএন বাংলা হত্যাকান্ডের প্রথম দিন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছে। দেশের শীর্ষ স্থানীয় দৈনিক প্রথম আলো পিলখানা হত্যাকান্ড শেষ হওয়ার পরের দিনেই তাদের সম্পাদকীয়তে শেখ হাসিনার রাজনৈতিক সমাধানের নামে কালক্ষেপণকে অকুন্ঠ সমর্থন করেছে। একই দিনে প্রথম আলো পত্রিকায় জনাব আসিফ নজরুল এর মতো কলাম লেখক আওয়ামী লীগের নেতাদের, যারা ষড়যন্ত্র বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছেন, তাদের প্রশংসা করে লিখেন, ‘জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কয়েকজন মন্ত্রী ও সাংসদ অকুস্থলে ছুটে গেছেন .... তিনি জরুরি বৈঠকে মন্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে আওয়ামী লীগের পোড় খাওয়া নেতাদের ডেকেছেন। এ নেতাদের তিনি সার্বক্ষণিক এবং আরও নিবিড় ভাবে পেতে পারেন মন্ত্রিসভায় (বিশেষ করে অত্যন্ত স্পর্শকাতর মন্ত্রণালয়গুলোতে) তাদের অন্তত কয়েকজনকে অন্তর্ভুক্ত করে’। The Daily Star এর মতো পত্রিকা তাদের প্রতিবেদনে কোনো সূত্র উল্লেখ না করেই পিলখানা হত্যাকান্ডকে জঙ্গি-সন্ত্রাসীদের কাজ বলে দাবি করেছে এবং আরো বলেছে এসব জঙ্গি-সন্ত্রাসীরা বিডিআরে নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রবেশ করেছিল। কোনো সূত্র উল্লেখ না করে এবং সত্যতা যাচাই না করে এহেন সংবাদ প্রকাশ ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার অপচেষ্টা মাত্র। বিডিআর হত্যাকান্ডের মতো এমন জাতীয় দুর্যোগে গণমাধ্যমের এরকম দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকান্ড কোন মতেই কাম্য নয়।

১৮১। অতএব, অত্র কমিশন গণমাধ্যমের ব্যাপারে নিম্নবর্ণিত সুপারিশ করেঃ

ক। দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার প্রতি যত্নশীল হতে হবে।

খ। সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি মিডিয়ার একটি ধারণাগত সমস্যা আছে। সেই ধারণাগত সমস্যা সমাধান করার দায়িত্ব সশস্ত্র বাহিনী সচেষ্ট হতে হবে।

গ। বাংলাদেশের প্রিন্ট এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় Strategic Analyst এবং Defence Analyst গড়ে তোলা সময়ের দাবি।

ঘ। তথ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্য অধিদপ্তর সা অধীনে একটি কেন্দ্রীয় মিডিয়া সমন্বয় সেল গঠনের সুপারিশ করা।

ঙ। তথ্য মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্ব মিডিয়া বিষয়ে একটি জাতীয় নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে মিডিয়াসমূহের মধ্যে অসুস্থ প্রতিযোগিতা বন্ধ করা।

মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম

১৮২। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর বিডিআর হত্যাকান্ড, লাশগুম এবং নারী ও শিশু নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক চরম অধ্যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এ বিষয়ে কোন প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি এবং তাদের কোনো সভায় বিষয়টি আলোচিত হয়নি যা কোনোভাবেই কাম্য নয়। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে এ বিষয়ে যত্নবান হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো।

বেসামরিক প্রশাসন

১৮৩। পিলখানা হত্যাকান্ডে বেসামরিক প্রশাসন ছিল সম্পূর্ণরূপেই নির্বিকার। বিডিআর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অধীন একটি প্যারা মিলিটারি ফোর্স হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই ঘটনার সময় সরকারের সকল সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়ের দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপর বর্তালেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পূর্ণভাবে নিস্ক্রিয় ছিল। ভারপ্রাপ্ত সচিব কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেননি কারণ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করতে পারেননি এবং স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র সচিব বিদেশে অবস্থান করছিলেন।

১৮৪। সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের বিশেষ করে তথ্য মন্ত্রণালয়ের কোন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়নি। ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে মিডিয়া যখন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিষোদগারের মাধ্যমে অপপ্রচার করছিল তখন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রেস উইং, তথ্য মন্ত্রণালয় ও তথ্য অধিদপ্তর মিডিয়াকে সঠিক তথ্য দিয়ে অপপ্রচার থেকে বিরত রাখার কোন চেষ্টা করেনি।

১৮৫। প্রকৃতপক্ষে বেসামরিক প্রশাসন হত্যাকান্ডের সময় সম্পূর্ণরূপে নিস্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এরূপ জাতীয় দুর্যোগ সরকারের প্রতিটি মন্ত্রণালয় যেন স্বউদ্যোগে এগিয়ে আসতে পারে সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১৮৬। বাংলাদেশের বেসামরিক আমলাতন্ত্রে সততা, নৈতিকতা, নিরাপত্তা, জবাবদিহিতা, নিঃস্বার্থতা, স্বচ্ছতা ও নেতৃত্ব বিকাশের জন্য শুদ্ধি অভিযান চালাতে হবে। আমলাতন্ত্রের প্রশিক্ষণের মূলনীতি হতে হবে সততা, নৈতিকতা, নিরাপত্তা, জবাবদিহিতা, নিঃস্বার্থতা, স্বচ্ছতা ও নেতৃত্বের বিকাশ এবং দেশপ্রেম। বেসামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের এই মূলনীতি কর্মস্থলে প্রয়োগ করতে হবে। দলীয় লেজুরবৃত্তি পরিহার করে আত্মমর্যাদার সাথে কাজ করতে হবে।

১৮৭। পদোন্নতি, বদলি ও মূল্যায়নে রাজনৈতিক প্রভাব দূর করতে হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি কার্যকর করতে হবে। এই ক্ষেত্রে সিঙ্গাপুর এর সিভিল সার্ভিস থেকে শিক্ষা নেয়া যেতে পারে।

১৮৮। হুইসেল ব্লোয়ার সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে কর্মকর্তাদের নিরাপদে অনিয়ম প্রকাশে উৎসাহিত করা যেতে পারে। একই সাথে গভর্নেন্স ও ওপেন ডেটা প্ল্যাটফর্ম চালু করে নাগরিকদের তথ্য প্রাপ্তি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যেতে পারে।

ক্ষতিপূরণ

১৮৯। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ তারিখে পিলখানায় সেনাবাহিনীর ৫৭ জন চাকরিরত অফিসার ০১ জন অবসরপ্রাপ্ত অফিসার এবং ০১ জন সৈনিকসহ মোট ৫৯ জন শাহাদত বরণ করেছেন। শাহাদত বরণকারী অফিসার এবং সৈনিকের প্রত্যেকের পরিবারকে বেশ কিছু আর্থিক ও অন্যান্য সুবিধা দেওয়া হয়েছে। স্বামী, পিতা বা সন্তান হারানোর তুলনায় উপরিউক্ত অনুদান নিতান্তই অপ্রতুল। প্রত্যেকটি পরিবারের সন্তানরা নিজের পায়ে দাঁড়ানো পর্যন্ত পরিবারগুলোকে পূর্ণ সহায়তা প্রদান করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

১৯০। বিডিআর হত্যাকান্ডের সময় নিহত ০৫ জন বেসামরিক ব্যক্তির পরিবারকে পরবর্তী ১০ বছর পর্যন্ত একটি মাসিক ভাতা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হলো।

১৯১। ২৫-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ বিডিআর বিদ্রোহের সময় বিডিআর সদর দপ্তর পিলখানায় এবং ঢাকার বাইরে সরকারি বাসস্থানে বসবাসকারী যেসব অফিসারের বাসস্থান ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ ও ব্যক্তিগত মালামাল লুটপাট হয়েছে তাদের কে উপযুক্ত ক্ষতি পূরণ প্রদানের সুপারিশ করা হলো।

<u>পুনর্বাসন</u>

১৯২। বিডিআর হত্যাকান্ডের পর তৎকালীন সেনাবাহিনীর প্রধানের বক্তৃতা ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতার সময় যে সব অফিসার আবেগ প্রবণ হয়ে কথা বলেছিলেন তাদের মধ্যে ০৬ জন অফিসারকে পরবর্তীতে চাকরিচ্যুত করা হয়। সহকর্মী অফিসারদের মর্মান্তিক মৃত্যুতে ব্যথিত হয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়া অত্যন্ত সাভাবিক। চাকরিচ্যুত এই ০৬ জন অফিসারকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনর্বাসন করার জন্য সুপারিশ করা হলো। অফিসারদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক। বিএ-৩১৩২ লে. কর্নেল মোঃ সামসুল ইসলাম
খ। বিএ-৩৩৬০ লে. কর্নেল মাহদী নাছরুল্লাহ শাহীর, বিপি
গ। বিএ-৩৫৬৩ লে. কর্নেল মোঃ শফিউল হক চৌধুরী
ঘ। বিএ-২৬১৭ মেজর মোঃ মোহসিনুল করিম
ঙ। বিএ-৬৪৯১ ক্যাপ্টেন হাবিবা ইসলাম
চ। বিএ-৬৫৬০ ক্যাপ্টেন এ কে এম আন্নুর হোসেন

১৯৩। তাপস হত্যাচেষ্টা মামলায় ফাঁসিয়ে অন্যায়ভাবে ০৫ জন অফিসারকে চাকরিচ্যুতিসহ জেল দেওয়া হয়। এ ০৫ জন অফিসারের শাস্তি প্রত্যাহার পূর্বক তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পুনর্বাসন করার জন্য সুপারিশ করা হলো। অফিসারদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক। বিএ-৫৫৯০ মেজর ডা. হেলাল মুহাম্মদ খান, পিএসসি
খ। বিএ-৬১১৫ ক্যাপ্টেন মোঃ রেজাউল করিম
গ। বিএ-৬৪২৫ ক্যাপ্টেন খন্দকার রাজীব হোসেন
ঘ। বিএ-৬৪২৮ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ ফুয়াদ খান শিশির
ঙ। বিএ-৬৭০১ ক্যাপ্টেন মোঃ খান সুবায়েল বিন রফিক

<u>শহীদ ঘোষণা</u>

১৯৪। যে তিনজন বিডিআর সদস্য বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাদের আত্মত্যাগের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শণ করা উচিত। কেন্দ্রীয় সুবেদার মেজর মোঃ নূরুল হককে ইতোমধ্যেই শহীদ ঘোষণা করা হয়েছে। আরডিও-৮৭ এডি খন্দকার আব্দুল আউয়াল এবং জেসিও-৪৩৭৭ সুবেদার সহকারী মোঃ আবুল কাশেমকে শহীদ ঘোষণা করে জাতীয় স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য সুপারিশ করা হলো।

১৯৫। বিডিআর হত্যাকান্ডের সময় বিডিআরের মালিসহ যে পাঁচ জন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন তাদেরকে শহীদ ঘোষণা এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করার জন্য সুপারিশ করা হলো। এঁরা হলেনঃ

ক। কল্পনা বেগম (আয়া, ডিজির বাস ভবন)।
খ। হৃদয় বেপারী (সবজি বিক্রেতা)।

গ। তারেক আজিজ (ছাত্র)।
ঘ। আমজাদ হোসেন (রিকশা চালক)।
ঙ। এম-১৬৩ মালি মোঃ ফিরোজ মিয়া।

ইমিগ্রেশন

১৯৬। ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ হতে ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ পর্যন্ত ৮২৭ জন ভারতীয় পাসপোর্টধারী এবং বিদেশি পাসপোর্টধারী ভারতীয় নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করেছেন। তাদের মধ্যে ৬৫ জনের বাংলাদেশ থেকে বহির্গমনের তথ্য পাওয়া যায়নি। একইভাবে ঐ তারিখের মধ্যে ১২২১ জনের বহির্গমনের তথ্য ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট থাকলেও তাদের মধ্যে ৫৭ জনের আগমনের কোন তথ্য তাদের নিকট নেই। বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষকে তদন্ত করে দেখার সুপারিশ করা হলো।

বৈদেশিক সম্পৃক্ততা

১৯৭। বিভিন্ন সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা বিডিআর হত্যাকান্ডে বৈদেশিক সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। বিদেশী ভাষার কথা শুনতে পাওয়া, বিদেশি ব্যক্তিবর্গের এ্যাম্বুলেন্স যোগে পলায়ন, তোরাব আলীর কল লিস্টে বিদেশি কলের উপস্থিতি, ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দার নূরের সাথে তার স্ত্রীর সর্বশেষ টেলিফোনে ক্যাপ্টেন তানভীর হায়দারের বক্তব্য ইত্যাদি প্রমাণ করে যে এ ঘটনায় বিদেশী সংশ্লিষ্টতা ছিল।

১৯৮। এ হত্যাকান্ডের মূল উদ্দেশ্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে উদ্দেশ্যগুলো সফল হলে (যার অনেক গুলোই সফল হয়েছে) তার সুবিধাভোগী হতো ভারত। অপরদিকে ভারতীয় গণমাধ্যম ও বিভিন্ন ভারতীয় গবেষক তাদের গবেষণা পত্রে নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০০৯ এর ঘটনার পর শেখ হাসিনাকে উদ্ধার করার উদ্দেশ্যে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশে সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য সীমান্তে সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছিল। বাংলাদেশের বর্তমান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৎকালীন সরকার ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তির বরাত দিয়ে বলেছেন যে 'The threat was real'। তৎকালীন সেনাপ্রধান মঈন ইউ আহমেদও বলেছেন যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী পিলখানা আক্রমণ করলে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে প্রবেশ করত এবং আর ফিরে যেত না। বিএসএফ এর সঙ্গেও ভারতে আশ্রয়ের জন্য অনেক বিডিআর সদস্যের যোগোযোগ হয়েছিল।

১৯৯। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ ঘটনায় প্রতিবেশী দেশের এহেন তৎপরতা কোনভাবেই গ্রহনযোগ্য নয়। প্রতিবেশী দু'দেশের সম্পর্ক কোন রাজনৈতিক দলের বা ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল না হয়ে দু'দেশের জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভরশীল হওয়া উচিত। সম্পর্ক স্থাপিত হবে পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ ও সমতার ভিত্তিতে। বিডিআর হত্যাকান্ডের সময় ভারতের কর্মকান্ড ও প্রতিক্রিয়া সুপ্রতিবেশী সুলভ ছিলনা।

২০০। উপরিউক্ত বক্তব্যের ভিত্তিতে ২০০৯ সালে বিডিআর বিদ্রোহে ভারতের সম্পৃক্ততা ও ভারতীয় গবেষকদের দাবির সত্যতার বিষয়ে ভারতের কাছে ব্যাখ্যা চাওয়াসহ যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করা হলো। ভবিষ্যতে দু'দেশের সম্পর্ক পরস্পরের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও নিরাপত্তা সহযোগিতা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা, জনগণের সাথে জনগণের সম্পৃক্ততা এবং কুটনৈতিক সংলাপের ভিত্তিতে স্থাপনে যত্নবান হতে ভারতকে অনুরোধ করারও সুপারিশ করা হলো।

পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তি

২০১। 'বিডিআর হত্যাকান্ড ও এর সুদূরপ্রসারি প্রভাব' সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপ্রস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

স্বাধীন তদন্ত সংস্থা

২০২। অত্র কমিশনের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে সরকার বিচার শুরু করলে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল (ICT)-এর তদন্ত সংস্থার আদলে একটি স্বাধীন তদন্ত সংস্থা গঠনের মাধ্যমে বিডিআর হত্যাকান্ডের ষড়যন্তকারী ও সহায়তাকারীদের অপরাধ তদন্তের জন্য সুপারিশ করা হলো।

শহীদ সেনা দিবস

২০৩। ইতোমধ্যে ঘোষিত সেনা শহীদ দিবসকে ‘গ’ শ্রেণি হতে উপরের শ্রেণিতে উন্নীত করার সুপারিশ করা হলো। এই দিনে সশস্ত্র বাহিনী ও অন্য সকল বাহিনীতে বিডিআর হত্যাকান্ডের শহিদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার এবং হত্যাকান্ডের ষড়যন্তকারী ও সহায়তাকারীদের স্বরূপ উন্মোচনের মাধ্যমে এই ঘটনার প্রকৃত ইতিহাস চর্চা করার জন্য সুপারিশ করা হলো।

মৃতদেহ সনাক্তকরণে জটিলতার সমাধান

২০৪। বিডিআর হত্যাকন্ডের পর তিনটি মৃতদেহ অসনাক্ত অবস্থায় ছিল। অপরদিকে তিন জনের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। পরবর্তীতে অসনাক্ত মৃতদেহ তিনটি যাদের মৃতদেহ পাওয়া যায়নি তাদের আত্মীয়-স্বজনকে দেয়া হয়। মেজর সৈয়দ গায়ালী দস্তগীর এবং ডিএডি মোঃ ফসিহ উদ্দিন এর আত্মীয়স্বজনের এ বিষয়ে কোন অভিযোগ না থাকলেও মেজর মো. তানভীর হায়দার নূরের স্ত্রী তাসনুভা মাহা এখন পর্যন্ত প্রদত্ত মৃতদেহটিকে তার স্বামীর মৃতদেহ হিসেবে গ্রহণ করেননি। মিসেস তাসনুভা মাহার দাবির প্রতি সম্মান রেখে তার স্বামীকে ‘মিসিং ইন এ্যাকসন’ দেখিয়ে দেশের প্রচলিত আইন/সেনা আইন অনুযায়ী বিষয়টি সুরাহা করার সুপারিশ করা হলো।

সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের ক্ষমতা বৃদ্ধি

২০৫। জাতীয় বিপর্যয়ে সামরিক বাহিনীর নিরেপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর অপারেশনাল মোতায়েনের ক্ষেত্রে সাংবাধানিকভাবে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের ক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়টি পর্যালোচনা করার সুপারিশ করা হলো।

উপসংহার

২০৬। বর্তমান সরকার গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সংগঠিত একটি বিপ্লবী সরকার। দীর্ঘ প্রায় ১৬ বছরের স্বৈরাচার ও বিদেশের আজ্ঞাবহ সরকার বিদায় হলেও পুনরায় আরেক স্বৈরাচার যেন আর কখনো প্রতিষ্ঠিত না হতে পারে এবং বিডিআর হত্যাকান্ডের মত ঘটনা ঘটিয়ে দেশের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ফেলতে না পারে, সে জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং এই কমিশনের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের জন্য আশু পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ করা হলো।

সভাপতিঃ

তারিখঃ নভেম্বর ২০২৫ মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান, এনডিসি, পিএসসি (অব.)

সদস্যঃ

১। তারিখ নভেম্বর ২০২৫ মেজর জেনারেল মোঃ জাহাঙ্গীর কবির তালুকদার (অব.)

২। তারিখঃ নভেম্বর ২০২৫ ব্রি. জেনারেল মোঃ সাইদুর রহমান, বীর প্রতীক (অব.)

৩। তারিখঃ নভেম্বর ২০২৫ মুন্সী আলাউদ্দিন আল আজাদ, এনডিসি, সচিব (অব.)

৪। তারিখঃ নভেম্বর ২০২৫ ড. এম আকবর আলী, অতি. আইজিপি (অব.)

৫। তারিখঃ নভেম্বর ২০২৫ অধ্যাপক মোঃ শরীফুল ইসলাম

৬। তারিখঃ নভেম্বর ২০২৫ মোঃ শাহনেওয়াজ খান চন্দন, সহকারী অধ্যাপক

৭। তারিখঃ নভেম্বর ২০২৫ মেজর এটিকেএম ইকবাল, পিএসসি (অব.)